সাধনা।

মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চতুর্থ বর্ষ

প্রথম ভাগ

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত :

৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি।

১৩০২ ১৩০১ সাল।

আগে চল্ আগে চল ভাই।
পড়ে' থাকা পিছে, মরে' থাকা মিছে,
বেঁচে মরে' কিবা ফল ভাই।
আগে চল্ আগে চল্ ভাই।

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র।

(১৩০১ অগ্রহায়ণ হইতে ১৩০২ বৈশাখ পর্য্যন্ত)

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
কৃষ্ণচরিত্র …	২৬৩, ৩৪১
কৌতুকহাস্য …	১১৮
কৌতুকহাস্যের মাত্রা …	৩৬৪
গান …	২৮৭
গার্গী …	১৯৩
গ্রন্থ সমালোচনা	৯৪, ১৮৭, ২৮৭, ৪০১, ৪৮৭, ৫৮৭
চড়ক সংক্রান্তি …	৫৩৭
জ্যোতিষ্কগণের দূরত্ব নির্দ্ধারণ	২১৬
দিদি …	৪১৫
দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি	১৭৫
দেবোত্তর বিষয়	১৭১
দেবোত্তর বিষয়ে পূর্ব্বের আলোচনা	৩৫৮
ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন	৩০৬
নিশীথে	১৯৫
নীতির ধর্ম্ম	২৭১
নূতন অবতার	১২০
নৃত্যকলা …	৪৩৫
পঞ্জিকার ভ্রম …	২৪
পুরাতন ভৃত্য …	৪৩০
পৌষ সংক্রান্তি	২৫৫
প্রায়শ্চিত্ত	৪
প্রেম পত্রিকা	৫৮৫
ফয়জাবাদের সমাধিমন্দির	৫২৮
ফুলজানি	৬৭

সাধনা।

সাধনা।

দেবি! অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণ তলে
অনেক অর্ঘ্য আনি;
আমি অভাগা এনেছি বহিয়া অশ্রুজলে
ব্যর্থ সাধন খানি।
তুমি জান মোর মনের বাসনা,
যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না,
তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা
দিবস নিশি।
মনে যাহা ছিল হয়ে গেল আর,
গড়িতে ভাঙ্গিয়া গেল বার বার,
ভালয় মন্দে আলোয় আঁধার
গিয়েছে মিশি।
তবু ওগো, দেবি, নিশিদিন করি পরাণপণ,
চরণে দিতেছি আনি
মোর জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ সাধের ধন
ব্যর্থ সাধন খানি।
ওগো ব্যর্থ সাধন খানি
দেখিয়া হাসিছে সার্থকফল
সকল ভক্ত প্রাণী।

তুমি যদি দেবি পলকে কেবল,
কর কটাক্ষ স্নেহ-সুকোমল,
একটি বিন্দু ফেল আঁখি জল
করুণা মানি'
সব হতে তবে সার্থক হবে
ব্যর্থ সাধন খানি।

দেবি! আজি আসিয়াছে অনেক যন্ত্রী শুনাতে গান
অনেক যন্ত্র আনি।
আমি আনিয়াছি ছিন্নতন্ত্রী নীরব ম্লান
এই দীন বীণা খানি।
তুমি জান ওগো করি নাই হেলা,
পথে প্রান্তরে করি নাই খেলা,
শুধু সাধিয়াছি বসি সারাবেলা
শতেক বার।
মনে যে গানের আছিল আভাস,
যে তান সাধিতে করেছিনু আশ,
সহিল না সেই কঠিন প্রয়াস,
ছিঁড়িল তার।
স্তবহীন তাই রয়েছি দাঁড়ায়ে সারাটি ক্ষণ,
আনিয়াছি গীতহীনা
আমার প্রাণের একটি যন্ত্র বুকের ধন
ছিন্ন তন্ত্রী বীণা!
ওগো ছিন্ন তন্ত্রী বীণা
দেখিয়া তোমার গুণীজন সবে
হাসিছে করিয়া ঘৃণা।

তুমি যদি এরে লহ কোলে তুলি,
তোমার শ্রবণে উঠিবে আকুলি
সকল অগীত সঙ্গীত গুলি,
হৃদয়াসীনা!
ছিল যা আশায় ফুটাবে ভাষায়
ছিন্নতন্ত্রী বীণা।

দেবি! এ জীবনে আমি গাহিয়াছি বসি অনেক গান,
পেয়েছি অনেক ফল;
সে আমি সবারে বিশ্বজনারে করেছি দান,
ভরেছি ধরণীতল।
যার ভাল লাগে সেই নিয়ে যাক্,
যত দিন থাকে ততদিন থাক্,
যশ অপযশ কুড়ায়ে বেড়াক্
ধূলার মাঝে।
বলেছি যে কথা করেছি যে কাজ
আমার সে নয়, সবার সে আজ,
ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসার মাঝ
বিবিধ সাজে।
যা কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠদান
দিতেছি চরণে আসি—
অকৃত কার্য্য, অকথিত বাণী, অগীত গান,
বিফল বাসনা রাশি।

ওগো বিফল বাসনা রাশি
হেরিয়া আজিকে ঘরে পরে সবে
হাসিছে হেলার হাসি।
তুমি যদি দেবি লহ কর পাতি,
আপনার হাতে রাখ মালা গাঁথি,
নিত্য নবীন রবে দিনরাতি
সুবাসে ভাসি,
সফল করিবে জীবন আমার
বিফল বাসনা রাশি

৪ কার্ত্তিক।
১৩০১।

প্রায়শ্চিত্ত

স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মাঝখানে একটা অনির্দ্দেশ্য অরাজক স্থান আছে যেখানে ত্রিশঙ্কু রাজা ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, যেখানে আকাশ-কুসুমের অজস্র আবাদ হইয়া থাকে। সেই বায়ুদুর্গবেষ্টিত মহা-দেশের নাম "হইলে-হইতে-পারিত"। যাঁহারা মহৎ কার্য্য করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন, যাঁহারা সামান্য ক্ষমতা লইয়া সাধারণ মানবের মধ্যে সাধারণভাবে সংসারের প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য সাধনে সহায়তা করিতেছেন তাঁহারাও ধন্য; কিন্তু যাঁহারা অদৃষ্টের ভ্রমক্রমে হঠাৎ দুয়ের মাঝখানে পড়িয়াছেন তাঁহাদের আর কোন উপায় নাই! তাঁহারা একটা কিছু হইলে

হইতে পারিতেন কিন্তু সেই কারণেই তাঁহাদের পক্ষে কিছু একটা হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা অসম্ভব।

আমাদের অনাথবন্ধু সেই মধ্যদেশবিলম্বিত বিধিবিড়ম্বিত যুবক। সকলেরই বিশ্বাস তিনি ইচ্ছা করিলে সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। কিন্তু কোন কালে তিনি ইচ্ছাও করিলেন না এবং কোন বিষয়ে তিনি কৃতকার্য্যও হইলেন না এবং সকলের বিশ্বাস তাঁহার প্রতি অটল রহিয়া গেল। সকলে বলিল তিনি পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হইবেন, তিনি আর পরীক্ষা দিলেন না। সকলের বিশ্বাস, চাকরীতে প্রবিষ্ট হইলে যে কোন ডিপার্টমেণ্টের উচ্চতম স্থান তিনি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিবেন,—তিনি কোন চাকরিই গ্রহণ করিলেন না। সাধারণ লোকের প্রতি তাঁহার বিশেষ অবজ্ঞা, কারণ তাহারা অত্যন্ত সামান্য; অসাধারণ লোকের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না কারণ মনে করিলেই তিনি তাহাদের অপেক্ষা অসাধারণতর হইতে পারিতেন।

অনাথবন্ধুর সমস্ত খ্যাতিপ্রতিপত্তিসুখসম্পদসৌভাগ্য দেশকালাতীত অনসম্ভবতার ভাণ্ডারে নিহিত ছিল—বিধাতা কেবল বাস্তবরাজ্যে তাঁহাকে একটি ধনী শ্বশুর এবং একটি সুশীলা স্ত্রী দান করিয়াছিলেন। স্ত্রীর নাম বিন্ধ্যবাসিনী।

স্ত্রীর নামটি অনাথবন্ধু পছন্দ করেন নাই এবং স্ত্রীটিকেও রূপেগুণে তিনি আপন যোগ্য জ্ঞান করিতেন না, কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনীর মনে স্বামীসৌভাগ্যগর্ব্বের সীমা ছিল না। সকল স্ত্রীর সকল স্বামীর অপেক্ষা তাহার স্বামী, যে, সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এ সম্বন্ধে তাহার কোন সন্দেহ ছিল না এবং তাহার স্বামীরও কেমন সন্দেহ ছিল না এবং সাধারণের ধারণাও এই বিশ্বাসের অনুকূল ছিল।

এই স্বামীগর্ব্ব পাছে কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় এজন্য বিন্ধ্যবাসিনী সর্ব্বদাই সশঙ্কিত ছিলেন। তিনি যদি আপন হৃদয়ের অভ্রভেদী অটল ভক্তিপর্ব্বতের উচ্চতম শিখরের উপরে এই স্বামীটিকে অধিরোহণ করাইয়া তাঁহাকে মূঢ় মর্ত্ত্যলোকের সমস্ত কটাক্ষপাত হইতে দূরে রক্ষা করিতে পারিতেন তবে নিশ্চিন্তচিত্তে পতিপূজায় জীবন উৎসর্গ করিতেন। কিন্তু জড়জগতে কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারা ভক্তিভাজনকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া রাখা যায় না এবং অনাথবন্ধুকেও পুরুষের আদর্শ বলিয়া মানে না এমন প্রাণী সংসারে বিরল নহে। এই জন্য বিন্ধ্যবাসিনীকে অনেক দুঃখ পাইতে হইয়াছে।

অনাথবন্ধু যখন কালেজে পড়িতেন তখন শ্বশুরালয়েই বাস করিতেন। পরীক্ষার সময় আসিল পরীক্ষা দিলেন না এবং তাহার পরবৎসর কালেজ ছাড়িয়া দিলেন।

এই ঘটনায় সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে বিন্ধ্যবাসিনী অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। রাত্রে মৃদুস্বরে অনাথবন্ধুকে বলিলেন, "পরীক্ষাটা দিলেই ভাল হ'ত!"

অনাথবন্ধু অবজ্ঞাভরে হাসিয়া কহিলেন, "পরীক্ষা দিলেই কি চতুর্ভুজ হয় না কি? আমাদের কেদারও ত পরীক্ষায় পাস্ হইয়াছে!"

বিন্ধ্যবাসিনী সান্ত্বনা লাভ করিলেন। দেশের অনেক গো-গর্দ্দভ যে পরীক্ষায় পাস করিতেছে সে পরীক্ষা দিয়া অনাথবন্ধুর গৌরব কি আর বাড়িবে!

প্রতিবেশিনী কমলা তাহার বাল্যসখী বিন্দিকে আনন্দ সহকারে খবর দিতে আসিল যে, তাহার ভাই রমেশ এবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জলপানী পাইতেছে। শুনিয়া বিন্ধ্যবাসিনী অকারণে মনে করিল কমলার এই আনন্দ বিশুদ্ধ আনন্দ নহে ইহার মধ্যে তাহার স্বামীর প্রতি কিঞ্চিৎ গূঢ় শ্লেষ আছে। এই জন্য সখীর উল্লাসে

উল্লাস প্রকাশ না করিয়া বরং গায়ে পড়িয়া কিঞ্চিৎ ঝগড়ার সুরে শুনাইয়া দিল, যে, এল্, এ, পরীক্ষা একটা পরীক্ষার মধ্যেই গণ্য নহে; এমন কি, বিলাতের কোন কালেজে বি, এ,র নীচে পরীক্ষাই নাই।—বলা বাহুল্য এ সমস্ত সংবাদ এবং যুক্তি বিন্ধ্য স্বামীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছে।

কমলা সুখসংবাদ দিতে আসিয়া সহসা পরম প্রিয়তমা প্রাণসখীর নিকট হইতে এরূপ আঘাত পাইয়া প্রথমটা কিছু বিস্মিত হইল। কিন্তু সেও না কি স্ত্রীজাতীয় মনুষ্য এই জন্য মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই বিন্ধ্যবাসিনীর মনের ভাব বুঝিতে পারিল এবং ভ্রাতার অপমানে তৎক্ষণাৎ তাহারও রসনাগ্রে এক বিন্দু তীব্র বিষ সঞ্চারিত হইল; সে বলিল আমরা ত ভাই বিলাতেও যাই নাই, সাহেব স্বামীকেও বিবাহ করি নাই অত খবর কোথায় পাইব! মূর্খ মেয়েমানুষ, মোটামুটি এই বুঝি যে, বাঙ্গালীর ছেলেকে কালেজে এল, এ, দিতে হয়;—তাও ত ভাই সকলে পারে না। অত্যন্ত নিরীহ সুমিষ্ট এবং বন্ধুভাবে এই কথাগুলি বলিয়া কমলা চলিয়া আসিল। কলহবিমুখ বিন্ধ্য নিরুত্তরে সহ্য করিল এবং ঘরে প্রবেশ করিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

অল্পকালের মধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটিল। একটি দূরস্থ ধনী কুটুম্ব কিয়ৎকালের জন্য কলিকাতায় আসিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর পিত্রালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তদুপলক্ষ্যে তাহার পিতা রাজকুমার বাবুর বাড়িতে বিশেষ একটা সমারোহ পড়িয়া গেল। জামাই বাবু বাহিরের যে বড় বৈঠকখানাটি অধিকার করিয়া থাকিতেন নবঅভ্যাগতদের বিশেষ সমাদরের জন্য সেই ঘরটি ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে মামা বাবুর ঘরে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় লইতে অনুরোধ করা হইল।

এই ঘটনায় অনাথবন্ধুর অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। প্রথমতঃ স্ত্রীর নিকট গিয়া তাহার পিতৃনিন্দা করিয়া তাহাকে কাঁদাইয়া দিয়া শ্বশুরের উপর প্রতিশোধ তুলিলেন। তাহার পরে অনাহার প্রভৃতি অন্যান্য প্রবল উপায়ে অভিমান প্রকাশের উপক্রম করিলেন। তাহা দেখিয়া বিন্ধ্যবাসিনী নিরতিশয় লজ্জিত হইল। তাহার মনে যে একটি সহজ আত্মসম্ভ্রমবোধ ছিল তাহা হইতেই সে বুঝিল এরূপ স্থলে সর্ব্বসমক্ষে অভিমান প্রকাশ করার মত লজ্জাকর আত্মাবমাননা আর কিছুই নাই। হাতে পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া বহু কষ্টে সে তাহার স্বামীকে ক্ষান্ত করিয়া রাখিল।

বিন্ধ্য অবিবেচক ছিল না এই জন্য সে তাহার পিতা মাতার প্রতি কোন দোষারোপ করিল না সে বুঝিল ঘটনাটি সামান্য ও স্বাভাবিক কিন্তু এ কথাও তাহার মনে হইল যে, তাহার স্বামী শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া কুটুম্বের আদর হইতে বঞ্চিত হইতেছেন।

সেই দিন হইতে প্রতিদিন সে তাহার স্বামীকে বলিতে লাগিল আমাকে তোমাদের ঘরে লইয়া চল; আমি আর এখানে থাকিব না। অনাথবন্ধুর মনে অহঙ্কার যথেষ্ট ছিল কিন্তু আত্মসম্ভ্রমবোধ ছিল না। তাঁহার নিজগৃহের দারিদ্র্যের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে কিছুতেই তাঁহার অভিরুচি হইল না। তখন তাঁহার স্ত্রী কিছু দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়া কহিল, তুমি যদি না যাও ত আমি একলাই যাইব।

অনাথবন্ধু মনে মনে বিরক্ত হইয়া তাঁহার স্ত্রীকে কলিকাতার বাহিরে দূর ক্ষুদ্র পল্লীতে তাঁহাদের মৃত্তিকানির্ম্মিত থোড়ো ঘরে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। যাত্রাকালে রাজকুমার বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী, কন্যাকে আরও কিছুকাল পিতৃগৃহে থাকিয়া যাই-

বার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, কন্যা নীরবে নতশিরে গম্ভীর মুখে বসিয়া মৌনভাবে জানাইয়া দিল—না, সে হইতে পারিবে না! তাহার সহসা এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া পিতা মাতার সন্দেহ হইল, যে, অজ্ঞাতসারে বোধ করি কোনরূপে তাহাকে আঘাত দেওয়া হইয়াছে। রাজকুমার বাবু ব্যথিতচিত্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, আমাদের কোন অজ্ঞানকৃত আচরণে তোমার মনে কি ব্যথা লাগিয়াছে? বিন্ধ্যবাসিনী তাহার পিতার মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিল, এক মুহূর্ত্তের জন্যও নহে। তোমাদের এখানে বড় সুখে বড় আদরে আমার দিন গিয়াছে!—বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল! কিন্তু তাহার সংকল্প অটল রহিল। বাপ মা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিলেন, যত স্নেহে যত আদরেই মানুষ কর, বিবাহ দিলেই মেয়ে পর হইয়া যায়।

অবশেষে অশ্রুনেত্রে সকলের নিকট বিদায় লইয়া আপন আজন্মকালের স্নেহমণ্ডিত পিতৃগৃহ এবং পরিজন ও সঙ্গিনীগণকে ছাড়িয়া বিন্ধ্যবাসিনী পাল্কীতে আরোহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কলিকাতার ধনীগৃহে এবং পল্লিগ্রামের গৃহস্থঘরে বিস্তর প্রভেদ। কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনী একদিনের জন্যও ভাবে অথবা আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করিল না। প্রফুল্লচিত্তে গৃহকার্য্যে শাশুড়ির সহায়তা করিতে লাগিল। তাহাদের দরিদ্র অবস্থা জানিয়া পিতা নিজব্যয়ে কন্যার সহিত একটি দাসী পাঠাইয়াছিলেন। বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীগৃহে পৌছিয়াই তাহাকে বিদায় করিয়া দিল। তাহার শ্বশুর ঘরের দারিদ্র্য দেখিয়া বড় মানুষের ঘরের দাসী প্রতি

মুহূর্ত্তে মনে মনে নাসাগ্র আকুঞ্চিত করিতে থাকিবে এ আশঙ্কাও তাহার অসহ্য বোধ হইল।

শাশুড়ি স্নেহবশতঃ বিন্ধ্যকে শ্রমসাধ্য কার্য্য হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিতেন কিন্তু বিন্ধ্য নিরলস অশ্রান্তভাবে প্রসন্ন মুখে সকল কার্য্যে যোগ দিয়া শাশুড়ির হৃদয় অধিকার করিয়া লইল এবং পল্লিরমণীগণ তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া গেল।

কিন্তু ইহার ফল সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হইল না। কারণ, বিশ্ব-নিয়ম নীতিবোধ প্রথমভাগের ন্যায় সাধুভাষায় রচিত সরল উপ-দেশাবলী নহে। নিষ্ঠুর বিদ্রূপপ্রিয় সয়তান মাঝখানে আসিয়া সমস্ত নীতিসূত্রগুলিকে ঘাঁটিয়া জট পাকাইয়া দিয়াছে। তাই ভাল কাজে সকল সময়ে উপস্থিতমত বিশুদ্ধ ভাল ফল ঘটে না, হঠাৎ একটা গোল বাধিয়া ওঠে।

অনাথবন্ধুর দুইটি ছোট এবং একটি বড় ভাই ছিল। বড় ভাই বিদেশে চাকরি করিয়া যে গুটিপঞ্চাশেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন তাহাতেই তাহাদের সংসার চলিত এবং ছোট দুটি ভাইয়ের বিদ্যা-শিক্ষা হইত।

বলা বাহুল্য, আজকালকার দিনে মাসিক পঞ্চাশ টাকায় সংসা-রের শ্রীবৃদ্ধি সাধন অসম্ভব কিন্তু বড় ভাইয়ের স্ত্রী শ্যামাশঙ্করীর গরিমাবৃদ্ধির পক্ষে উহাই যথেষ্ট ছিল। স্বামী সম্বৎসরকাল কাজ করিতেন এই জন্য স্ত্রী সম্বৎসরকাল বিশ্রামের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। কাজকর্ম্ম কিছুই করিতেন না অথচ এমন ভাবে চলিতেন যেন তিনি কেবলমাত্র তাঁহার উপার্জ্জনক্ষম স্বামীটির স্ত্রী হইয়াই সমস্ত সংসারটাকে পরম বাধিত করিয়াছেন।

বিন্ধ্যবাসিনী যখন শ্বশুরবাড়ি আসিয়া গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় অহর্নিশি ঘরের কাজে প্রবৃত্ত হইল তখন শ্যামাশঙ্করীর সঙ্কীর্ণ অন্তঃকরণটুকু

কে যেন কসিয়া আঁটিয়া ধরিতে লাগিল। তাহার কারণ বোঝা শক্ত। বোধ করি বড় বৌ মনে করিল, মেজবৌ বড় ঘরের মেয়ে হইয়া কেবল লোক দেখাইবার জন্য ঘরকন্নার নীচ কাজে নিযুক্ত হইয়াছে, উহাতে কেবল তাঁহাকে লোকের চক্ষে অপদস্থ করা হইতেছে। যে কারণেই হোক্, মাসিক পঞ্চাশ টাকার স্ত্রী কিছুতেই ধনীবংশের কন্যাকে সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তাহার নম্রতার মধ্যে অসহ্য দেমাকের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন।

এদিকে অনাথবন্ধু পল্লিতে আসিয়া লাইব্রেরি স্থাপন করিলেন; দশ বিশ জন স্কুলের ছাত্র জড় করিয়া সভাপতি হইয়া খবরের কাগজে টেলিগ্রাম প্রেরণ করিতে লাগিলেন; এমন কি, কোন কোন ইংরাজি সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদ দাতা হইয়া গ্রামের লোকদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন কিন্তু দরিদ্র সংসারে এক পয়সা আনিলেন না, বরঞ্চ বাজে খরচ অনেক হইতে লাগিল।

একটা কোন চাকুরি লইবার জন্য বিন্ধ্যবাসিনী তাঁহাকে সর্ব্বদাই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তিনি কান দিলেন না। স্ত্রীকে বলিলেন, তাঁহার উপযুক্ত চাক্‌রী আছে বটে কিন্তু পক্ষপাতী ইংরাজ গবর্মেণ্ট সে সকল পদে বড় বড় ইংরাজকে নিযুক্ত করে, বাঙ্গালী হাজার যোগ্য হইলেও তাহার কোন আশা নাই।

শ্যামাশঙ্করী তাঁহার দেবর এবং মেঝযা'র প্রতি লক্ষ্যে এবং অলক্ষ্যে সর্ব্বদাই বাক্যবিষ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। গর্ব্বভরে নিজেদের দারিদ্র্য আস্ফালন করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমরা গরীব মানুষ, বড় মানুষের মেয়ে এবং বড় মানুষের জামাইকে পোষণ করিব কেমন করিয়া? সেখানে ত বেশ ছিলেন কোন দুঃখ ছিল না—এখানে ডালভাত খাইয়া এত কষ্ট কি সহ্য হইবে?

শাশুড়ি বড়বৌকে ভয় করিতেন, তিনি দুর্ব্বলের পক্ষ অবলম্বন

করিয়া কোন কথা বলিতে সাহস করিতেন না। মেজবৌও মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের ডাল ভাত এবং তদীয় স্ত্রীর বাক্য ঝাল খাইয়া নীরবে পরিপাক করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে বড় ভাই ছুটিতে কিছুদিনের জন্য ঘরে আসিয়া স্ত্রীর নিকট হইতে অনেক উদ্দীপনাপূর্ণ ওজোগুণসম্পন্ন বক্তৃতা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিদ্রার ব্যাঘাত যখন প্রতিরাত্রেই গুরুতর হইয়া উঠিতে লাগিল তখন একদিন অনাথবন্ধুকে ডাকিয়া শান্তভাবে স্নেহের সহিত কহিলেন, তোমার একটা চাক্‌রির চেষ্টা দেখা উচিত, কেবল আমি একলা সংসার চালাইব কি করিয়া?

অনাথবন্ধু পদাহত সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, দুই বেলা দুই মুষ্টি অত্যন্ত অখাদ্য মোটা ভাতের পর এত খোঁটা সহ্য হয় না। তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে লইয়া শ্বশুরবাড়ি যাইতে সংকল্প করিলেন।

কিন্তু স্ত্রী কিছুতেই সম্মত হইল না। তাহার মতে ভাইয়ের অন্ন এবং ভাজের গালিতে কনিষ্ঠের পারিবারিক অধিকার আছে কিন্তু শ্বশুরের আশ্রয়ে বড় লজ্জা। বিন্ধ্যবাসিনী শ্বশুর বাড়িতে দীন-হীনের মত নত হইয়া থাকিতে পারে কিন্তু বাপের বাড়িতে সে আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া মাথা তুলিয়া চলিতে চায়।

এমন সময় গ্রামের এণ্ট্রেন্সস্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালি হইল। অনাথবন্ধুর দাদা এবং বিন্ধ্যবাসিনী উভয়েই তাঁহাকে এই কাজটি গ্রহণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। তাহাতেও হিতে বিপরীত হইল। নিজের ভাই এবং একমাত্র ধর্ম্মপত্নী, যে, তাঁহাকে এমন একটা অত্যন্ত তুচ্ছ কাজের যোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন ইহাতে তাঁহার মনে দুর্জ্জয় অভিমানের সঞ্চার

হইল এবং সংসারের ও সমস্ত কাজকর্ম্মের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ বৈরাগ্য জন্মিয়া গেল!

তখন আবার দাদা তাঁহার হাতে ধরিয়া মিনতি করিয়া তাঁহাকে অনেক করিয়া ঠাণ্ডা করিলেন। সকলেই মনে করিলেন ইহাকে আর কোন কথা বলিয়া কাজ নাই, এ এখন কোন প্রকারে ঘরে টিঁকিয়া গেলেই ঘরের সৌভাগ্য।

ছুটি অন্তে দাদা কর্ম্মক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন; শ্যামাশঙ্করী রুদ্ধ আক্রোশে মুখখানা গোলাকার করিয়া তুলিয়া একটা বৃহৎ কুদর্শন চক্র নির্ম্মাণ করিয়া রহিলেন। অনাথকৃষ্ণ বিন্ধ্যবাসিনীকে আসিয়া কহিলেন, আজকাল বিলাতে না গেলে কোন ভদ্র চাকরী পাওয়া যায় না। আমি বিলাতে যাইতে মনস্থ করিতেছি, তুমি তোমার বাবার কাছ হইতে কোন ছুতায় কিছু অর্থ সংগ্রহ কর।

এক ত বিলাত যাইবার কথা শুনিয়া বিন্ধ্যর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল; তাহার পরে পিতার কাছে কি করিয়া অর্থ ভিক্ষা করিতে যাইবে, তাহা সে মনে করিতে পারিল না এবং মনে করিতে গিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল।

শ্বশুরের কাছে নিজমুখে টাকা চাহিতেও অনাথবন্ধুর অহঙ্কারে বাধা দিল অথচ বাপের কাছ হইতে কন্যা কেন যে ছলে অথবা বলে অর্থ আকর্ষণ করিয়া না আনিবে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। ইহা লইয়া অনাথ অনেক রাগারাগি করিলেন এবং মর্ম্মপীড়িত বিন্ধ্যবাসিনীকে বিস্তর অশ্রুপাত করিতে হইল।

এমনি করিয়া কিছুদিন সাংসারিক অভাবে এবং মনের কষ্টে কাটিয়া গেল।

অবশেষে শরৎকালে পূজা নিকটবর্ত্তী হইল। কন্যা এবং জামাতাকে সাদরে আহ্বান করিয়া আনিবার জন্য রাজকুমারবাবু বহু-

সমারোহে যানবাহনাদি প্রেরণ করিলেন। এক বৎসর পরে কন্যা স্বামীসহ পুনরায় পিতৃভবনে প্রবেশ করিল। ধনী কুটুম্বের যে আদর তাঁহার অসহ্য হইয়াছিল জামাতা এবার তদপেক্ষা অনেক বেশি আদর পাইলেন। বিন্ধ্যবাসিনীও অনেককাল পরে মাথার অবগুণ্ঠন ঘুচাইয়া অহর্নিশি স্বজনস্নেহে ও উৎসবতরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

আজ ষষ্ঠী। কাল সপ্তমী পূজা আরম্ভ হইবে। ব্যস্ততা এবং কোলাহলের সীমা নাই। দূর এবং নিকটসম্পর্কীয় আত্মীয় পরিজনে অট্টালিকার প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ একেবারে পরিপূর্ণ।

সে রাত্রে বড় শ্রান্ত হইয়া বিন্ধ্যবাসিনী শয়ন করিল। পূর্ব্বে যে ঘরে শয়ন করিত এ সে ঘর নহে; এবার বিশেষ আদর করিয়া মা জামাতাকে তাঁহার নিজের ঘর ছাড়িয়া দিয়াছেন। অনাথবন্ধু কখন্ শয়ন করিতে আসিলেন তাহা বিন্ধ্য জানিতেও পারিল না। সে তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল।

খুব ভোরের বেলা হইতে শানাই বাজিতে লাগিল কিন্তু ক্লান্তদেহ বিন্ধ্যবাসিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল না। কমল এবং ভুবন দুইসখী বিন্ধ্যর শয়নদ্বারে আড়ি পাতিবার নিস্ফল চেষ্টা করিয়া অবশেষে পরিহাসপূর্ব্বক বাহির হইতে উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল; তখন বিন্ধ্য তাড়াতাড়ি জাগিয়া উঠিয়া দেখিল তাহার স্বামী কখন্ উঠিয়া গিয়াছেন সে জানিতে পারে নাই। লজ্জিত হইয়া শয্যা ছাড়িয়া নামিয়া দেখিল তাহার মাতার লোহার সিন্ধুক খোলা এবং তাহার মধ্যে তাহার বাপের যে ক্যাশবাক্সটি থাকিত সেটিও নাই।

তখন মনে পড়িল, কাল সন্ধ্যাবেলায় মায়ের চাবির গোচ্ছা হারাইয়া গিয়া বাড়িতে খুব একটা গোলোযোগ পড়িয়া গিয়াছিল। সেই চাবি চুরি করিয়া কোন একটি চোর এই কাজ করিয়াছে সে বিষয়ে

কোন সন্দেহ নাই। তখন হঠাৎ আশঙ্কা হইল পাছে সেই চোর তাহার স্বামীকে কোনরূপ আঘাত করিয়া থাকে! বুকটা ধড়াস্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বিছানার নীচে খুঁজিতে গিয়া দেখিল খাটের পায়ের কাছে তাহার মায়ের চাবির গোচ্ছার নীচে একটি চিঠি চাপা রহিয়াছে।

চিঠি তাহার স্বামীর হস্তাক্ষরে লেখা। খুলিয়া পড়িয়া জানিল, তাহার স্বামী তাহার কোন এক বন্ধুর সাহায্যে বিলাতে যাইবার জাহাজভাড়া সংগ্রহ করিয়াছে; এক্ষণে, সেখানকার খরচ পত্র চালাইবার অন্য কোন উপায় ভাবিয়া না পাওয়াতে গত রাত্রে শ্বশুরের অর্থ অপহরণ করিয়া বারান্দাসংলগ্ন কাঠের সিঁড়ি দিয়া অন্দরের বাগানে নামিয়া প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। অদ্যই প্রত্যুষে জাহাজ ছাড়িয়া দিয়াছে।

পত্রখানা পাঠ করিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর শরীরের সমস্ত রক্ত হিম হইয়া গেল। সেইখানেই খাটের খুরা ধরিয়া সে বসিয়া পড়িল। তাহার দেহের অভ্যন্তরে কর্ণকুহরের মধ্যে নিস্তব্ধ মৃত্যুরজনীর ঝিল্লিধ্বনির মত একটা শব্দ হইতে লাগিল। তাহারই উপরে, প্রাঙ্গন হইতে, প্রতিবেশিদের বাড়ি হইতে এবং দূর অট্টালিকা হইতে বহুতর শানাই বহুতর সুরে তান ধরিল। সমস্ত বঙ্গদেশ তখন আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে!

শরতের উৎসব-হাস্য-রঞ্জিত রৌদ্র সকৌতুকে শয়ন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। এত বেলা হইল তথাপি উৎসবের দিনে দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া ভুবন ও কমল উচ্চহাস্যে উপহাস করিতে করিতে গুম্ গুম্ শব্দে দ্বারে কিল্ মারিতে লাগিল। তাহাতেও কোন সাড়া না পাইয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া উর্দ্ধকণ্ঠে "বিন্দী" "বিন্দী" করিয়া ডাকিতে লাগিল। বিন্ধ্যবাসিনী ভগ্নরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "যাচ্চি;

তোরা এখন যা!" তাহারা সখীর পীড়া আশঙ্কা করিয়া মাকে ডাকিয়া আনিল। মা আসিয়া কহিলেন,—"বিন্দু, কি হয়েছে মা—এখনো দ্বার বন্ধ কেন!" বিন্ধ্য উচ্ছ্বসিত অশ্রু সম্বরণ করিয়া কহিল, একবার বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে এস!

মা অত্যন্ত ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজকুমার বাবুকে সঙ্গে করিয়া দ্বারে আসিলেন। বিন্ধ্য দ্বার খুলিয়া তাঁহাদিগকে ঘরে আনিয়া তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দিল।

তখন বিন্ধ্য ভূমিতে পড়িয়া তাহার বাপের পা ধরিয়া বক্ষ শতধা বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, বাবা, আমাকে মাপ কর, আমি তোমার সিন্দুক হইতে টাকা চুরি করিয়াছি।

তাঁহারা অবাক্ হইয়া বিছানায় বসিয়া পড়িলেন। বিন্ধ্য বলিল, তাহার স্বামীকে বিলাতে পাঠাইবার জন্য সে এই কাজ করিয়াছে।

তাহার বাপ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের কাছে চাহিস্ নাই কেন?

বিন্ধ্যবাসিনী কহিল, পাছে বিলাত যাইতে তোমরা বাধা দেও!

রাজকুমার বাবু অত্যন্ত রাগ করিলেন। মা কাঁদিতে লাগিলেন, মেয়ে কাঁদিতে লাগিল এবং কলিকাতার চতুর্দ্দিক হইতে বিচিত্র সুরে আনন্দের বাদ্য বাজিতে লাগিল।

যে বিন্ধ্য বাপের কাছেও কখনও অর্থ প্রার্থনা করিতে পারে নাই এবং যে স্ত্রী স্বামীর লেশমাত্র অসম্মান পরমাত্মীয়ের নিকট হইতেও গোপন করিবার জন্য প্রাণপণ করিতে পারিত, আজ একেবারে উৎসবের জনতার মধ্যে তাহার পত্নী-অভিমান, তাহার দুহিতৃ সম্ভ্রম, তাহার আত্মমর্য্যাদা চূর্ণ হইয়া প্রিয় এবং অপ্রিয়, পরিচিত এবং অপরিচিত সকলের পদতলে ধূলির ন্যায় লুণ্ঠিত হইতে

লাগিল। পূর্ব্ব হইতে পরামর্শ করিয়া, ষড়যন্ত্রপূর্ব্বক চাবি চুরি করিয়া, স্ত্রীর সাহায্যে রাতারাতি অর্থ অপহরণপূর্ব্বক অনাথবন্ধু বিলাতে পলায়ন করিয়াছে এ কথা লইয়া আত্মীয়কুটুম্বপরিপূর্ণ বাড়িতে একটা ঢী ঢী পড়িয়া গেল। দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ভুবন, কমল এবং আরো অনেক স্বজন প্রতিবেশী দাস দাসী সমস্ত শুনিয়াছিল। রুদ্ধদ্বার জামাতৃগৃহে উৎকণ্ঠিত কর্ত্তাগৃহিণীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলেই কৌতূহলে এবং আশঙ্কায় ব্যগ্র হইয়া আসিয়াছিল।

বিন্ধ্যবাসিনী কাহাকেও মুখ দেখাইল না। দ্বার রুদ্ধ করিয়া অনাহারে বিছানায় পড়িয়া রহিল। তাহার সেই শোকে কেহ দুঃখ অনুভব করিল না। ষড়যন্ত্রকারিণীর দুষ্ট বুদ্ধিতে সকলেই বিস্মিত হইল। সকলেই ভাবিল বিন্ধ্যর চরিত্র এতদিন অবসরাভাবে অপ্রকাশিত ছিল। নিরানন্দগৃহে পূজার উৎসব কোন প্রকারে সম্পন্ন হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অপমান এবং অবসাদে অবনত হইয়া বিন্ধ্য শ্বশুর বাড়ি ফিরিয়া আসিল। সেখানে পুত্রবিচ্ছেদকাতরা বিধবা শাশুড়ির সহিত পতিবিরহবিধুরা বধূর ঘনিষ্ঠতর যোগ স্থাপিত হইল। উভয়ে পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া নীরব শোকের ছায়াতলে সুগভীর সহিষ্ণুতার সহিত সংসারের সমস্ত তুচ্ছতম কার্য্যগুলি পর্য্যন্ত স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। শাশুড়ি যে পরিমাণে কাছে আসিল পিতামাতা সেই পরিমাণে দূরে চলিয়া গেল। বিন্ধ্য মনে মনে অনুভব করিল, শাশুড়ি দরিদ্র, আমিও দরিদ্র, আমরা এক

দুঃখবন্ধনে বদ্ধ; পিতামাতা ঐশ্বর্য্যশালী, তাঁহারা আমাদের অবস্থা হইতে অনেক দূরে। একে দরিদ্র বলিয়া বিন্ধ্য তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক দূরবর্ত্তী, তাহাতে আবার চুরি স্বীকার করিয়া সে আরও অনেক নীচে পড়িয়া গিয়াছে। স্নেহসম্পর্কের বন্ধন এত অধিক পার্থক্যভার বহন করিতে পারে কি না কে জানে!

অনাথবন্ধু বিলাত গিয়া প্রথম প্রথম স্ত্রীকে রীতিমত চিঠিপত্র লিখিতেন। কিন্তু ক্রমেই চিঠি বিরল হইয়া আসিল, এবং পত্রের মধ্যে একটা অবহেলার ভাব অলক্ষিতভাবে প্রকাশ হইতে লাগিল। তাঁহার অশিক্ষিতা গৃহকার্য্যরতা স্ত্রীর অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধিরূপগুণ সর্ব্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠতর অনেক ইংরাজ কন্যা অনাথবন্ধুকে সুযোগ্য, সুবুদ্ধি এবং সুরূপ বলিয়া সমাদর করিত এমত অবস্থায় অনাথবন্ধু আপনার একবস্ত্রপরিহিতা অবগুণ্ঠনবতী অগৌরবর্ণা স্ত্রীকে কোন অংশেই আপনার সমযোগ্য জ্ঞান করিবেন না ইহাতে বিচিত্র নাই।

কিন্তু, তথাপি যখন অর্থের অনটন হইল, তখন এই নিরুপায় বাঙ্গালীর মেয়েকেই টেলিগ্রাফ করিতে তাঁহার সঙ্কোচ বোধ হইল না। এবং এই বাঙ্গালীর মেয়েই দুই হাতে কেবল দুই গাছি কাঁচের চুড়ি রাখিয়া গায়ের সমস্ত গহনা বেচিয়া টাকা পাঠাইতে লাগিল। পাড়াগাঁয়ে নিরাপদে রক্ষা করিবার উপ-যুক্ত স্থান নাই বলিয়া তাহার সমস্ত বহুমূল্য গহনাগুলি পিতৃগৃহে ছিল। স্বামীর কুটুম্বভবনে নিমন্ত্রণে যাইবার ছল করিয়া নানা উপলক্ষ্যে বিন্ধ্যবাসিনী একে একে সকল গহনাই আনাইয়া লইল। অবশেষে হাতের বালা, রূপার চুড়ি, বেনারসি সাড়ি এবং শাল পর্য্যন্ত বিক্রয় শেষ করিয়া বিস্তর বিনীত অনুনয়পূর্ব্বক মাথার দিব্য দিয়া, অশ্রুজলে পত্রের প্রত্যেক অক্ষর পংক্তি বিকৃত করিয়া বিন্ধ্য স্বামীকে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিল।

স্বামী চুল খাট করিয়া দাড়ি কামাইয়া কোট্‌প্যাণ্ট্‌লুন্‌ পরিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এবং হোটেলে আশ্রয় লই-লেন। পিতৃগৃহে বাস করা অসম্ভব, প্রথমতঃ উপযুক্ত স্থান নাই, দ্বিতীয়তঃ পল্লিবাসী দরিদ্রগৃহস্থ জাতিনষ্ট হইলে একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়ে। শ্বশুরগণ আচারনিষ্ঠ পরম হিন্দু; তাঁহারাও জাতিচ্যুতকে আশ্রয় দিতে পারেন না।

অর্থাভাবে অতি শীঘ্রই হোটেল হইতে বাসায় নামিতে হইল। সে বাসায় তিনি স্ত্রীকে আনিতে প্রস্তুত নহেন। বিলাত হইতে আসিয়া স্ত্রী এবং মাতার সহিত কেবল দিন দুই তিন দিনের বেলায় দেখা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আর সাক্ষাৎ হয় নাই। দুইটি শোকার্ত্তা রমণীর কেবল এক সান্ত্বনা ছিল যে অনাথবন্ধু স্বদেশে আত্মীয়বর্গের নিকটবর্ত্তী স্থানে আছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে অনাথবন্ধুর অসামান্য ব্যারিষ্টরী কীর্ত্তিতে তাহাদের মনে গর্ব্বের সীমা রহিল না। বিন্ধ্যবাসিনী আপনাকে যশস্বী স্বামীর অযোগ্য স্ত্রী বলিয়া ধিক্কার দিতে লাগিল, পুনশ্চ, অযোগ্য বলিয়াই স্বামীর অহঙ্কার অধিক করিয়া অনুভব করিল। সে দুঃখে পীড়িত এবং গর্ব্বে বিস্ফারিত হইল। ম্লেচ্ছ আচার সে ঘৃণা করে, তবু স্বামীকে দেখিয়া মনে মনে কহিল, আজকাল ঢের লোক ত সাহেব হয় কিন্তু এমন ত কাহাকেও মানায় না—একেবারে ঠিক যেন বিলাতী সাহেব! বাঙ্গালী বলিয়া চিনিবার যো নাই!

বাসাখরচ যখন অচল হইয়া আসিল, যখন অনাথবন্ধু মনের ক্ষোভে স্থির করিলেন অভিশপ্ত ভারতবর্ষে গুণের সমাদর নাই এবং তাঁহার স্বব্যবসায়ীগণ ঈর্ষাবশতঃ তাঁহার উন্নতিপথে গোপনে বাধা স্থাপন করিতেছে; যখন তাঁহার খানার ডিশে আমিষ অপেক্ষা উদ্ভিজ্জের পরিমাণ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, দগ্ধ কুক্কুটের সম্মানকর

স্থান ভর্জ্জিত চিংড়ি একচেটে করিবার উপক্রম করিল, বেশভূষার চিক্কণতা এবং ক্ষৌরমসৃণ মুখের গর্ব্বোজ্জ্বল জ্যোতি ম্লান হইয়া আসিল -- যখন সুতীব্র নিখাদে বাঁধা জীবন-তন্ত্রী ক্রমশঃ সকরুণ কড়ি মধ্যমের দিকে নামিয়া আসিতে লাগিল এমন সময় রাজকুমার বাবুর পরিবারে এক গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিয়া অনাথবন্ধুর সঙ্কটসঙ্কুল জীবনযাত্রায় পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। একদা গঙ্গাতীরবর্ত্তী মাতুলালয় হইতে নৌকাযোগে ফিরিবার সময় রাজকুমার বাবুর একমাত্র পুত্র হরকুমার ষ্টীমারের সংঘাতে স্ত্রী এবং বালক পুত্র সহ জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। এই ঘটনায় রাজকুমারের বংশে কন্যা বিন্ধ্যবাসিনী ব্যতীত আর কেহ রহিল না।

নিদারুণ শোকের কথঞ্চিৎ উপশম হইলে পর রাজকুমার বাবু অনাথবন্ধুকে গিয়া অনুনয় করিয়া কহিলেন,--"বাবা, তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে হইবে। তোমরা ব্যতীত আমার আর কেহ নাই!"

অনাথবন্ধু উৎসাহসহকারে সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি মনে করিলেন,যে সকল বার্-লাইব্রেরী-বিহারী স্বদেশীয় বারিষ্টারগণ তাঁহাকে ঈর্ষ্যা করে এবং তাঁহার অসামান্য ধীশক্তির প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রকাশ করে না এই উপায়ে তাহাদের প্রতি প্রতিশোধ লওয়া হইবে।

রাজকুমার বাবু পণ্ডিতদিগের বিধান লইলেন। তাঁহারা বলিলেন অনাথবন্ধু যদি গোমাংস না খাইয়া থাকে তবে তাহাকে জাতে তুলিবার উপায় আছে।

বিদেশে যদিচ উক্ত নিষিদ্ধ চতুষ্পদ তাঁহার প্রিয় খাদ্যশ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত হইত তথাপি তাহা অস্বীকার করিতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিলেন না। প্রিয় বন্ধুদের নিকট কহিলেন—সমাজ

যখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা কথা শুনিতে চাহে তখন একটা মুখের কথায় তাহাকে বাধিত করিতে দোষ দেখি না। যে রসনা গোরু খাইয়াছে সে রসনাকে গোময় এবং মিথ্যা কথা নামক দুটো কদর্য্য পদার্থ দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া আমাদের আধুনিক সমাজের নিয়ম; আমি সে নিয়ম লঙ্ঘন করিতে চাহি না।

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে উঠিবার একটা শুভদিন নির্দ্দিষ্ট হইল। ইতিমধ্যে অনাথবন্ধু কেবল যে ধুতি চাদর পরিলেন তাহা নহে, তর্ক এবং উপদেশের দ্বারা বিলাতী সমাজের গালে কালি এবং হিন্দু সমাজের গালে চূণ লেপন করিতে লাগিলেন। যে শুনিল সকলেই খুসী হইয়া উঠিল।

আনন্দে গর্ব্বে বিন্ধ্যবাসিনীর প্রীতিসুধাসিক্ত কোমল হৃদয়টি সর্ব্বত্র উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। সে মনে মনে কহিল, "বিলাত হইতে যিনিই আসেন একেবারে আস্ত বিলাতী সাহেব হইয়া আসেন, দেখিয়া বাঙ্গালী বলিয়া চিনিবার যো থাকে না, কিন্তু আমার স্বামী একেবারে অবিকৃত ভাবে ফিরিয়াছেন বরঞ্চ তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে ভক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছে।

যথানির্দ্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে রাজকুমার বাবুর ঘর ভরিয়া গেল। অর্থ ব্যয়ের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। আহার এবং বিদায়ের আয়োজন যথোচিত হইয়াছিল।

অন্তঃপুরেও সমারোহের সীমা ছিল না। নিমন্ত্রিত পরিজনবর্গের পরিবেশন ও পরিচর্য্যায় সমস্ত প্রকোষ্ঠ ও প্রাঙ্গণ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই ঘোরতর কোলাহল এবং কর্ম্মরাশির মধ্যে বিন্ধ্যবাসিনী প্রফুল্ল মুখে শারদরৌদ্ররঞ্জিত প্রভাতবায়ুবাহিত লঘু মেঘখণ্ডের মত আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। আজিকার দিনের সমস্ত বিশ্বব্যাপারের প্রধান নায়ক তাহার

স্বামী। আজ যেন সমস্ত বঙ্গভূমি একটি মাত্র রঙ্গভূমি হইয়াছে এবং যবনিকা উদঘাটন পূর্ব্বক একমাত্র অনাথবন্ধুকে বিস্মিত বিশ্ব দর্শকের নিকট প্রদর্শন করাইতেছে। প্রায়শ্চিত্ত যে অপরাধ-স্বীকার তাহা নহে; এ যেন অনুগ্রহপ্রকাশ। অনাথ বিলাত হইতে ফিরিয়া হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়া হিন্দুসমাজকে গৌর-বান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। এবং সেই গৌরবচ্ছটা সমস্ত দেশ হইতে সহস্র রশ্মিতে বিচ্ছুরিত হইয়া বিন্ধ্যবাসিনীর প্রেমপ্রমুদিত মুখের উপরে অপরূপ মহিমাজ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। এতদিন-কার তুচ্ছ জীবনের সমস্ত দুঃখ এবং ক্ষুদ্র অপমান দূর হইয়া সে আজ তাহার পরিপূর্ণ পিতৃগৃহে সমস্ত আত্মীয় স্বজনের সমক্ষে উন্নত মস্তকে গৌরবের আসনে আরোহণ করিল। স্বামীর মহত্ত্ব আজ অযোগ্য স্ত্রীকে বিশ্বসংসারের নিকট সম্মানাস্পদ করিয়া তুলিল।

অনুষ্ঠান সমাধা হইয়াছে। অনাথবন্ধু জাতে উঠিয়াছেন। অভ্যাগত আত্মীয় ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত একাসনে বসিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার শেষ করিয়াছেন।

আত্মীয়েরা জামাতাকে দেখিবার জন্য অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জামাতা সুস্থচিত্তে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে প্রসন্ন-হাস্যমুখে আলস্যমন্থরগমনে ভূমিলুণ্ঠ্যমান চাদরে অন্তঃপুরে যাত্রা করিলেন।

আহারান্তে ব্রাহ্মণগণের দক্ষিণার আয়োজন হইতেছে এবং ইত্যবসরে তাঁহারা সভাস্থলে বসিয়া তুমুল কলহসহকারে পাণ্ডিত্য বিস্তার করিতেছেন। কর্ত্তা রাজকুমার বাবু ক্ষণকাল বিশ্রাম-উপলক্ষে সেই কোলাহলাকুল পণ্ডিত সভায় বসিয়া স্মৃতির তর্ক শুনিতেছেন এমন সময় দ্বারবান গৃহস্বামীর হস্তে এক কার্ড দিয়া খবর দিল "এক সাহেবলোগকো মেম আয়া।"

রাজকুমার বাবু চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই কার্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তাহাতে ইংরাজিতে লেখা রহিয়াছে -মিসেস্ অনাথ বন্ধু সরকার। অর্থাৎ অনাথবন্ধু সরকারের স্ত্রী।

রাজকুমার বাবু অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কিছুতেই এই সামান্য একটি শব্দের অর্থগ্রহ করিতে পারিলেন না। এমন সময়ে বিলাত হইতে সদ্যপ্রত্যাগতা, আরক্তকপোলা, আতাম্র-কুন্তলা, আনীললোচনা, দুগ্ধফেনশুভ্রা, হরিণলঘুগামিনী ইংরাজ মহিলা স্বয়ং সভাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রত্যেকের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিচিত প্রিয়মুখ দেখিতে পাইলেন না। অকস্মাৎ মেমকে দেখিয়া সংহিতার সমস্ত তর্ক থামিয়া সভা-স্থল শ্মশানের ন্যায় গভীর নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

এমন সময়ে ভূমিলুণ্ঠমান চাদর লইয়া অলসমন্থরগামী অনাথ-বন্ধু রঙ্গভূমিতে আসিয়া পুনঃপ্রবেশ করিলেন। এবং মুহূর্ত্তের মধ্যেই ইংরাজ মহিলা ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া তাঁহার তাম্বুলরাগরক্ত ওষ্ঠাধরে দাম্পত্যের মিলন-চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

সে দিন সভাস্থলে সংহিতার তর্ক আর উত্থাপিত হইতে পারিল না।

পঞ্জিকার ভ্রম।

ক্রান্তিপাত ও মন্দোচ্চের গতি।

সমতল টেবিলের উপর একটি লাটিম ঘুরাইয়া দিলে লাটিমটি তাহার ধ্রুবরেখার * চারিদিকে দ্রুতবেগে ঘুরে, কিন্তু ধ্রুবরেখাটি অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী শলাকাটি ঠিক উর্দ্ধাধোভাবে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কখন কখন দেখা যায়, শলাকাটি স্থির না থাকিয়া ঈষৎ হেলিয়া ধীরগতিতে একটি ক্ষুদ্র বৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবীর পক্ষেও ঠিক্ এইরূপ। পৃথিবীর ধ্রুবরেখাও ঠিক স্থির না থাকিয়া ধীর গতিতে একটি বৃত্তাকার পথে প্রায় ২৫০০০ বৎসরে একবার ঘুরিয়া আসে। আজ যে স্থির নক্ষত্রের অভিমুখে পৃথিবীর ধ্রুবরেখা লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে, কয়েক শত বৎসর পরে আর ঠিক সে নক্ষত্রের অভিমুখে লক্ষ্য করিয়া থাকিবে না। সুতরাং আজ যে নক্ষত্রকে আমরা ধ্রুব তারা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি, কয়েক শত বৎসর পরে আর তাহার ধ্রুবত্ব থাকিবে না। আবার পঁচিশহাজার বৎসর পরে সে ধ্রুবত্ব লাভ করিবে।

পৃথিবী যদি সম্পূর্ণ বর্ত্তুলাকার হইত, যদি তাহার মেরুপ্রদেশ চাপা ও নিরক্ষদেশ স্ফীত না হইত, তাহা হইলে এই ধ্রুবরেখার গতি ঘটিত না; ধ্রুবতারা চিরদিনই ধ্রুবতারা থাকিত। ক্রান্তিপাতের গতি অথবা অয়নচলের সম্ভাবনা থাকিত না। জ্যোতির্ব্বিদগণের দুর্ভাগ্যবশে পৃথিবীর ধ্রুবরেখা চিরকাল একমুখে না থাকিয়া ধীরে ধীরে ঘুরে। তাই এই গোলযোগের উৎপত্তি।

অয়নচলন ব্যতীত আর একটা গতির উল্লেখ করা আবশ্যক।

* ধ্রুবরেখা অর্থে axis of rotation.

ক্রান্তিপাত পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম মুখে চলে; কিন্তু মন্দোচ্চস্থল পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে চলে। সূর্য্যের পথ (অথবা পৃথিবীর পথ) ঠিক বৃত্তাকার নহে, সেই জন্য পৃথিবী সর্ব্বদা সূর্য্য হইতে সমান দূরে থাকে না। যে স্থানে দূরত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, সেই স্থলের নাম মন্দোচ্চ। ইহার ইংরাজি নাম apogee। সূর্য্য কখন একটু বেশী দূরে যায়, কখন একটু নিকটে আসে সেই জন্য সূর্য্যের মণ্ডল কখন একটু ছোট দেখায়, কখন একটু বড় দেখায়। সংবৎসরের মধ্যে সূর্য্যমণ্ডলের ব্যাস কখন একটু বড় কখন একটু ছোট দেখায়। এই ইতরবিশেষ এত সামান্য, যে সহজ চোখে ধরা পড়ে না। যন্ত্রযোগে সহজেই ধরা পড়ে। যেমনেই হউক এই ইতরবিশেষটুকু মাপিতে পারিলেই সূর্য্যের ন্যূনতম ও অধিকতম দূরত্বের মধ্যে কত তফাত জানিতে পারা যায়। সূর্য্যের পথ বৃত্ত হইতে কত তফাত তাহাও ইহা হইতে বুঝা যায়। সুতরাং সূর্য্যমণ্ডলের ব্যাস কোন্ সময়ে কতবড় দেখায়, অর্থাৎ কোন্ সময়ে আকাশ মণ্ডলের কতটুকু জায়গা লইয়া থাকে, সূক্ষ্মভাবে পরিমাণের প্রয়োজন। আজিকাল অবশ্য যন্ত্র সহকারে এই পরিমাণ সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেকালে সূক্ষ্ম যন্ত্র ছিল না; অন্য উপায় অবলম্বিত হইত।

মনে কর আজ সূর্য্যমণ্ডলের ব্যাস কত বড় দেখায়, অর্থাৎ আকাশ মণ্ডলে কত ডিগ্রি ব্যাপিয়া আছে, বাহির করিতে হইবে। প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ঘড়ী লইয়া খোলা মাঠে অথবা উঁচু ছাদের উপর বসিয়া থাক। ঠিক্ কোন্ সময়ে সূর্য্যমণ্ডলের এক প্রান্ত, অর্থাৎ পশ্চিমপ্রান্ত, চক্রবাল রেখায় দেখা দিল, স্থির কর। তার পর কতক্ষণ পরে সূর্য্যমণ্ডলের অপর প্রান্ত অর্থাৎ পূর্ব্বপ্রান্ত, চক্রবালে দেখা দিল, অর্থাৎ কি না, ঠিক্ সমগ্র মণ্ডলটি উদিত হইল, তাহা স্থির কর। এই সময়টুকু সমগ্রমণ্ডলের উদয় কাল।

এই সময়টুকু স্থির হইলেই ব্যাসের পরিমাণ স্থির করিতে আর বেশী কষ্ট পাইতে হইবে না। পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনহেতু সূর্য্যমণ্ডল প্রায় ৬০ দণ্ডে সমগ্র আকাশমণ্ডলটা অর্থাৎ ৩৬০ ডিগ্রি পরিমিত স্থান ঘুরিয়া আসে। ঠিক ৬০ দণ্ডে নহে; কোন দিন একটু অধিক সময়ে কোন দিন একটু অল্প সময়ে। যাহাই হউক, ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরিয়া আসিতে কতটুকু সময় আবশ্যক জানা থাকিলেই, সমগ্র মণ্ডলের উদয়কালে কত ডিগ্রি গতি হইয়াছে জানা যায়। সেইটাই সূর্য্যমণ্ডলের ব্যাসের পরিমাণ। এই ব্যাসের পরিমাণ প্রায় বত্রিশ কলা, অর্থাৎ আধ ডিগ্রির কিছু অধিক।

আজ কাল সূর্য্যের দূরত্ব পয়লা জুলাই তারিখে, অর্থাৎ পূরা গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সব চেয়ে অধিক হয়; সেই সময় সূর্য্য মন্দোচ্চে থাকে তখন সূর্য্যমণ্ডলের ব্যাস প্রায় ৩১৷৷০ কলা পরিমিত দেখায়। আর ৩১সে ডিসেম্বর তারিখে অর্থাৎ প্রবল শীতের মাঝামাঝি, সূর্য্যের দূরত্ব সবচেয়ে কম হয়; তখন সূর্য্যমণ্ডল অপেক্ষাকৃত বড় দেখায়; ব্যাস ৩২৷৷০ কলার একটু অধিক দেখায়।

১লা জুলাই তারিখে ৩১৷৷০ কলা, আর ছয় মাস পরে ৩১সে ডিসেম্বর তারিখে প্রায় ৩২৷৷০ কলায় এক কলার তফাত; পৃথিবীর পথ ঠিক বৃত্তাকার হইলে, আর সূর্য্য তাহার কেন্দ্রবর্ত্তী থাকিলে এই তফাতটুকু ঘটিত না। পথ বৃত্তাকার নহে আর সূর্য্যও ঠিক কেন্দ্রবর্ত্তী নাই, একটু একপাশ ঘেঁষিয়া আছে; সেই জন্য ছয় মাসের মধ্যে এই এক কলার তফাত। ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সূর্য্যের দূরত্ব যদি ৩০ ধরা যায়; ১লা জুলাই তারিখে দূরত্ব ৩০এর বেশী, প্রায় ৩১ হইবে। মোট দূরত্ব প্রায় ৩০; আর সংবৎসরে দূরত্বের ব্যত্যয় প্রায় ১; অর্থাৎ সমগ্র দূরত্বের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ। এই ভগ্নাংশের ইংরাজি নাম Eccentricity। ইহার পরিমাণ

জানা থাকিলে সূর্য্যের গতি বৎসরের মধ্যে কোন্ সময়ে কিরূপ হইবে, বাহির করা চলে।

আধুনিক মতে সূর্য্যের ব্যাসের পরিমাণ ৩২ কলা; সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মতে ব্যাসের পরিমাণ ৩২ কলা ২৪ বিকলা; কখন ইহার একটু বেশী; কখন ইহার একটু কম। সূর্য্য সিদ্ধান্তে যে Eccentricity ধরা আছে তাহা আধুনিক মতানুযায়ী পরিমাণ হইতে একটু তফাত; একটু অধিক। আধুনিক মতে যাহা ১১৫, সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মতে তাহা ১৩০; অর্থাৎ প্রায় দুই আনা পরিমাণে অধিক। তবে এরূপ তফাত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে।

সূর্য্য ১লা জুলাই তারিখে মন্দোচ্চ থাকে; মন্দোচ্চ হইতে যত দূরে যায় ততই দূরত্ব একটু একটু কমে, দেখিতেও একটু একটু বড় হয়, যেহেতু একটু একটু বাড়ে। সুতরাং বৎসরের মধ্যে কোন্ তারিখে সূর্য্য মন্দোচ্চ হইতে কতদূরে আছে না জানিলে সূর্য্যের গতিগণনা চলে না। প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রে এইরূপে সূর্য্য মন্দোচ্চ হইতে কতদূরে আছে, প্রথমে স্থির করিয়া, পরে সূর্য্যের প্রকৃত অবস্থিতিস্থান নির্দ্ধারিত হইত। আধুনিক জ্যোতিষেও ঠিক সেই প্রণালীতে গণনা হইয়া থাকে। উভয়ের প্রণালীগত কোন বিভেদ নাই।* কিন্তু এইখানে একটু সাবধান হইতে হয়। সূর্য্যের পথের মন্দোচ্চ স্থান ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া সরিয়া যাইতেছে। আজকাল ১লা জুলাই তারিখে সূর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী থাকে কিছু দিন পরে আর ঠিক ১লা জুলাই তারিখে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হইবে না, কিছু পরে হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ক্রান্তিপাত ক্রমশঃ

---

* মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম প্রয়োগ দ্বারা সৌরজগতের অন্তর্গত জ্যোতিষ্কগণের গতি আজকাল যেরূপ সূক্ষ্মতার সহিত নির্দ্ধারিত হয়, এস্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন দেখি না।

পশ্চিমে সরিতেছে। মন্দোচ্চও তেমনি ক্রমশ পূর্ব্বমুখে সরিতেছে। সুতরাং বৎসর বৎসর মন্দোচ্চ কতটুকু করিয়া সরিতেছে না জানিলে গণনায় চিরকাল ঠিকফল পাওয়া যাইবে না। এই মন্দোচ্চের গতি নিরূপণ কিছু কঠিন ব্যাপার, বিশেষতঃ যখন সূক্ষ্ম যন্ত্রাদির সাহায্য না পাওয়া যায়; কেবলমাত্র সূর্য্যমণ্ডলের বিস্তার চোখে দেখিয়া পরিমাণ করিয়া নিরূপণ করিতে হয়। মন্দোচ্চ যে পূর্ব্ব-মুখে ক্রমশঃ সরিতেছে, তাহা প্রাচীনকালে স্থির হইয়াছিল; কিন্তু এই গতির পরিমাণ নির্দ্ধারণে বড়ই ভুল ঘটিয়াছিল। প্রাচীন মতে ইহার পরিমাণ সংবৎসরে এক বিকলার প্রায় দশভাগের এক ভাগ মাত্র। কিন্তু ইহার প্রকৃত পরিমাণ প্রায় ১১ বিকলা। এই ভ্রম নিতান্ত কম নহে। এবং এই ভ্রমের দরুণ আমাদের পঞ্জিকার গণনার সহিত দৃষ্ট ফলের ঐক্য হইবার সম্ভাবনা নাই, এই ভ্রান্তিটুকু আমাদের পঞ্জিকার সংশোধন করা আবশ্যক। কিন্তু সংশোধন করিবে কে? সংশোধন গ্রহণ করিতেই বা সাহসী কে?

ফলতঃ মন্দোচ্চের বার্ষিক গতির পরিমাণে এই ভ্রান্তিটুকু থাকিয়া আমাদের পঞ্জিকার গণনায়ও প্রকৃত ফলে বৎসর বৎসর তফাৎ দাঁড়াইয়া যাইতেছে। তবে একটা কারণে তফাৎ যতটুকু দাঁড়ান উচিত ছিল অদ্যাপি ততটা দাঁড়াইতে পায় নাই। সেটাও অন্যদিকে আর একটা ভ্রমের দরুণ।

ক্রান্তিপাতের পশ্চিম-মুখে গতি বৎসরে প্রায় ৫০।০ বিকলা; আর মন্দোচ্চের পূর্ব্বমুখে গতি বৎসরে প্রায় ১১।০ বিকলা; উভয় স্থল প্রতি বৎসর প্রায় ৬১॥ বিকলা হিসাবে পরস্পর হইতে সরিয়া যাইতেছে। এখনি সংবৎসরে শীতার্দ্ধ গ্রীষ্মার্দ্ধের চেয়ে সাত দিন কম; এই গতিপ্রযুক্ত কালে শীতার্দ্ধ আরও ছোট হইবে। আমাদের পঞ্জিকায় মন্দোচ্চের বার্ষিক গতি যৎসামান্য, কিন্তু ক্রান্তিপাতের

গতি ৫৪ বিকলা ধরা হয়। সুতরাং মোটের উপর বৎসরে ৭॥০ বিকলা ভুল পড়িয়া যাইতেছে। মন্দোচ্চের গতি আমরা প্রকৃত অপেক্ষা কম ধরি, আর ক্রান্তিপাতের গতি প্রকৃতের অপেক্ষা কিছু বেশী ধরি। একটা ভুলে আর একটা ভুল কিয়ৎ পরিমাণে সংশোধিত হইতেছে।

সুবিচারের অধিকার।

সংবাদপত্রপাঠকগণ অবগত আছেন অল্পকাল হইল সেতারা জিলায় বাই নামক নগরে তেরো জন সম্ভ্রান্ত হিন্দু জেলে গিয়াছেন। তাঁহারা অপরাধ করিয়া থাকিবেন, এবং আইনমতেও হয়ত তাঁহারা দণ্ডনীয়—কিন্তু ঘটনাটি সমস্ত হিন্দুর হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে এবং আঘাতের ন্যায্য কারণও আছে।

উক্ত নগরে হিন্দু সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা অনেক অধিক এবং পরস্পরের মধ্যে কোন কালে কোন বিরোধের লক্ষণ দেখা যায় নাই। একটি মুসলমান সাক্ষীও প্রকাশ করিয়াছে যে, সে স্থানে হিন্দুর সহিত মুসলমানের কোন বিবাদ নাই—বিবাদ হিন্দুর সহিত গবর্মেণ্টের।

অকস্মাৎ ম্যাজিষ্ট্রেট্ অশান্তি আশঙ্কা করিয়া কোন এক পূজা উপলক্ষ্যে হিন্দুদিগকে বাদ্য বন্ধ করিতে আদেশ করেন। হিন্দুগণ ফাঁপরে পড়িয়া রাজাজ্ঞা ও দেবসম্মান উভয় রক্ষা করিতে গিয়া কোনটাই রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহারা চির নিয়মানুমোদিত বাদ্যাড়ম্বর বন্ধ করিয়া একটি মাত্র সামান্য বাদ্যযোগে কোনমতে উৎসব পালন করিলেন। ইহাতে দেবতা সন্তুষ্ট হইলেন

কিনা, জানিনা, মুসলমানগণ অসন্তুষ্ট হইলেন না, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট্ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। নগরের তেরো জন ভদ্র হিন্দুকে জেলে চালান করিয়া দিলেন।

হাকিম খুব জবর্দস্ত, আইন খুব কঠিন, শাসন খুব কড়াক্কড়, কিন্তু এমন করিয়া স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হয় কি না সন্দেহ। এমন করিয়া যেখানে বিরোধ নাই সেখানে বিরোধ বাধিয়া উঠে, যেখানে বিদ্বেষের বীজমাত্র আছে সেখানে তাহা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিতে থাকে। প্রবল প্রতাপে শান্তি স্থাপন করিতে গিয়া মহা-সমারোহে অশান্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলা হয়।

সকলেই জানেন অনেক অসভ্যদের মধ্যে আর কোন প্রকার চিকিৎসা নাই কেবল ভূতঝাড়ানো আছে। তাহারা গর্জ্জন করিয়া নৃত্য করিয়া রোগীকে মারিয়া ধরিয়া প্রলয়কাণ্ড বাধাইয়া দেয়। ইংরাজ হিন্দুমুসলমানবিরোধব্যাধির যদি সেই রূপ আদিম প্রণালী মতে চিকিৎসা সুরু করেন তাহাতে রোগীর মৃত্যু হইতে পারে কিন্তু ব্যাধির উপশম না হইবার সম্ভাবনা। এবং ওঝা ভূত ঝাড়িতে গিয়া যে ভূত নামাইয়া আনেন তাহাকে শান্ত করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

অনেক হিন্দুর বিশ্বাস, বিরোধ মিটাইয়া দেওয়া গবর্মেণ্টের আন্তরিক অভিপ্রায় নহে। পাছে কন্‌গ্রেস্ প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দু মুসলমানগণ ক্রমশঃ ঐক্যপথে অগ্রসর হয় এই জন্য তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মবিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিতে চান্, এবং মুসলমানের দ্বারা হিন্দুর দর্পচূর্ণ করিয়া মুসলমানকে সন্তুষ্ট ও হিন্দুকে অভিভূত করিতে ইচ্ছা করেন।

অথচ লর্ডল্যান্সডাউন্ হইতে আরম্ভ করিয়া লর্ডহ্যারিস্ পর্য্যন্ত সকলেই বলিতেছেন এমন কথা যে মুখে আনে সে পাষণ্ড মিথ্যা-

বাদী। ইংরাজ গবর্মেণ্ট হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের প্রতি যে অধিক পক্ষপাত প্রকাশ করিতেছেন এ অপবাদকেও তাঁহারা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন।

আমরাও তাঁহাদের কথা অবিশ্বাস করি না। কন্‌গ্রেসের প্রতি গবর্মেণ্টের সুগভীর প্রীতি না থাকিতে পারে এবং মুসলমানগণ হিন্দুদের সহিত যোগ দিয়া কন্‌গ্রেসকে বলশালী না করুক এমন ইচ্ছাও তাঁহাদের থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব, তথাপি রাজ্যের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের অনৈক্যকে বিরোধে পরিণত করিয়া তোলা কোন পরিণামদর্শী বিবেচক গবর্মেণ্টের অভিপ্রেত হইতে পারে না। অনৈক্য থাকে সে ভালি, কিন্তু তাহা গবর্মেণ্টের সুশাসনে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকিবে। গবর্মেণ্টের বারুদখানায় বারুদ যেমন শীতল হইয়া আছে অথচ তাহার দাহিকাশক্তি নিবিয়া যায় নাই—হিন্দুমুসলমানের আভ্যন্তরিক অসদ্ভাব গবর্মেণ্টের রাজনৈতিক শস্ত্রশালায় সেইরূপ সুশীতলভাবে রক্ষিত হইবে এমন অভিপ্রায় গবর্মেণ্টের মনে থাকা অসম্ভব নহে।

এই কারণে, গবর্মেণ্ট হিন্দুমুসলমানের গলাগলি দৃশ্য দেখিবার জন্যও ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন না, অথচ লাঠালাঠি দৃশ্যটাও তাঁহাদের সুশাসনের হানিজনক বলিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন।

সর্ব্বদাই দেখিতে পাই দুই পক্ষে যখন বিরোধ ঘটে এবং শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা উপস্থিত হয় তখন ম্যাজিষ্ট্রেট সূক্ষ্মবিচারের দিকে না গিয়া উভয় পক্ষকেই সমানভাবে দমন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। কারণ, সাধারণ নিয়ম এই যে, এক হাতে তালি বাজে না। কিন্তু হিন্দুমুসলমানবিরোধে সাধারণের বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধমূল হইয়াছে, যে, দমনটা অধিকাংশ হিন্দুর উপর দিয়াই চলিতেছে এবং প্রশ্রয়টা অধিকাংশ মুসলমানেরাই লাভ করিতেছেন। এরূপ

বিশ্বাস জন্মিয়া যাওয়াতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষানল আরো অধিক করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। এবং যেখানে কোনকালে বিরোধ ঘটে নাই সেখানেও কর্ত্তৃপক্ষ আগেভাগে অমূলক আশঙ্কার অবতারণা করিয়া একপক্ষের চিরাগত অধিকার কাড়িয়া লওয়াতে অন্যপক্ষের সাহস ও স্পর্দ্ধা বাড়িতেছে এবং চিরবিরোধের বীজ বপন করা হইতেছে।

হিন্দুদের প্রতি, গবর্মেণ্টের বিশেষ একটা বিরাগ না থাকারই সম্ভব কিন্তু একমাত্র গবর্মেণ্টের পলিসির দ্বারাই গবর্মেণ্ট চলে না—প্রাকৃতিক নিয়ম একটা আছে। স্বর্গরাজ্যে পবনদেবের কোন প্রকার অসাধু অভিপ্রায় না থাকিতে পারে তথাচ উত্তাপের নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার মর্ত্ত্যরাজ্যের অনুচর উনপঞ্চাশ বায়ু অনেক সময় অকস্মাৎ ঝড় বাধাইয়া বসে। আমরা গবর্মেণ্টের স্বর্গ-লোকের খবর ঠিক করিয়া বলিতে পারি না, সে সকল খবর লর্ড্ ল্যান্স্‌ডাউন্ এবং লর্ড্ হ্যারিস্ জানেন কিন্তু আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকের হাওয়ার মধ্যে একটা গোলোযোগ অনুভব করিতেছি। স্বর্গধাম হইতে মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দ আসিতেছে কিন্তু আমাদের নিকটবর্ত্তী দেবচরগণের মধ্যে ভারি একটা উষ্মার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। মুসলমানেরাও জানিতেছেন তাঁহাদের জন্য বিষ্ণুদূত অপেক্ষা করিয়া আছে, আমরাও হাড়ের মধ্যে কম্পসহকারে অনুভব করিতেছি আমাদের জন্য যমদূত দ্বারের নিকটে গদাহস্তে বসিয়া আছে এবং উপরন্তু সেই যমদূতগুলার খোরাকী আমাদের নিজের গাঁঠ হইতে দিতে হইবে।

হাওয়ার গতিক আমরা যেরূপ অনুভব করিতেছি তাহা যে নিতান্ত অমূলক এ কথা বিশ্বাস হয় না। অল্পকাল হইল ষ্টেট্স্‌-

ম্যান্ পত্রে গবর্মেণ্টের উচ্চ উপাধিধারী কোন শ্রদ্ধেয় ইংরাজ সিভিলিয়ান প্রকাশ করিয়াছেন যে, আজকাল সাধারণ ভারতবর্ষীয় ইংরাজের মনে একটা হিন্দুবিদ্বেষের ভাব ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং মুসলমান জাতির প্রতিও একটি আকস্মিক বাৎসল্যরসের উদ্রেক দেখা যাইতেছে। মুসলমান ভ্রাতাদের প্রতি ইংরাজের স্তনে যদি ক্ষীর সঞ্চার হইয়া থাকে তবে তাহা আনন্দের বিষয় কিন্তু আমাদের প্রতি যদি কেবলই পিত্তসঞ্চার হইতে থাকে তবে সে আনন্দ অকপটভাবে রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে।

কেবল রাগদ্বেষের দ্বারা পক্ষপাত এবং অবিচার ঘটিতে পারে তাহা নহে ভয়েতে করিয়াও ন্যায়পরতার নিক্তির কাঁটা অনেকটা পরিমাণে কম্পিত বিচলিত হইয়া উঠে। আমাদের এমন সন্দেহ হয়, যে, ইংরাজ মুসলমানকে মনে মনে কিছু ভয় করিয়া থাকেন। এই জন্য রাজদণ্ডটা মুসলমানের গা ঘেঁষিয়া ঠিক হিন্দুর মাথার উপরে কিছু জোরের সহিত পড়িতেছে।

ইহাকে নাম দেওয়া যাইতে পারে "ঝিকে মারিয়া বৌকে শেখানো"-রাজনীতি। ঝিকে কিছু অন্যায় করিয়া মারিলেও সে সহ্য করে, কিন্তু বৌ পরের ঘরের মেয়ে, উচিত শাসন উপলক্ষ্যে গায়ে হাত তুলিতে গেলেও বরদাস্ত না করিতেও পারে। অথচ বিচার কার্য্যটা একেবারে বন্ধ করাও যায় না। যেখানে বাধা স্বল্পতম সেখানে শক্তিপ্রয়োগ করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায় এ কথা বিজ্ঞানসম্মত। অতএব হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্বে, শান্তপ্রকৃতি, ঐক্যবন্ধনহীন, আইন ও বেআইনসহিষ্ণু হিন্দুকে দমন করিয়া দিলে মীমাংসাটা সহজে হয়। আমরা বলিনা যে, গবর্মেণ্টের এইরূপ পলিসি, কিন্তু কার্য্যবিধি স্বভাবত, এমন কি, অজ্ঞানত, এই পথ অবলম্বন করিতে পারে। যেমন, নদীস্রোত কঠিন মৃত্তি-

কাকে পাশ কাটাইয়া স্বতই কোমল মৃত্তিকাকে খনন করিয়া চলিয়া যায়।

অতএব, হাজার গবর্মেণ্টের দোহাই পাড়িতে থাকিলেও গবর্মেণ্ট্ যে ইহার প্রতিকার করিতে পারেন এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা কন্‌গ্রেসে যোগ দিয়াছি, বিলাতে আন্দোলন করিতেছি, অমৃতবাজারে প্রবন্ধ লিখিতেছি, ভারত-বর্ষের উচ্চ হইতে নিম্নতন ইংরাজ কর্ম্মচারীদের কার্য্য স্বাধীন-ভাবে সমালোচন করিতেছি, অনেক সময় তাঁহাদিগকে অপদস্থ করিতে কৃতকার্য্য হইতেছি এবং ইংলণ্ডবাসী অপক্ষপাতী ইংরাজের সহায়তা লইয়া ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অনেক রাজবিধি সংশোধন করিতেও সক্ষম হইয়াছি—এই সকল ব্যবহারে ইংরাজ এতদূর পর্য্যন্ত জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছে, যে, ভারত-রাজ্যতন্ত্রের বড় বড় ভূধর-শিখর হইতেও রাজনীতি-সম্মত মৌন ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে আগ্নেয় স্রাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। অপরপক্ষে, মুসলমানগণ রাজভক্তি ভরে অবনতপ্রায় হইয়া কন্‌গ্রেসের উদ্দেশ্য-পথে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই সকল কারণে ইংরাজের মনে একটা বিকার উপস্থিত হইয়াছে—গবর্মেণ্টের ইহাতে কোন হাত নাই!

কেবল ইহাই নহে। কন্‌গ্রেস্ অপেক্ষা গোরক্ষণী সভাটাতে ইংরাজের মনে অধিক আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। তাঁহারা জানেন ইতিহাসের প্রারম্ভকাল হইতে যে হিন্দুজাতি আত্মরক্ষার জন্য কখনও একত্র হইতে পারে নাই, চাই কি গোরক্ষার জন্য সে জাতি একত্র হইতেও পারে। অতএব, সেইসূত্রে যখন হিন্দু মুসলমানের বিরোধ আরম্ভ হইল তখন স্বভাবতই মুসলমানের প্রতিই ইংরাজের দরদ বাড়িয়া গিয়াছিল। তখন উপস্থিতক্ষেত্রে

কোন্ পক্ষ অধিক অপরাধী, অথবা উভয় পক্ষ ন্যূনাধিক অপরাধী কি না তাহা অবিচলিতচিত্তে অপক্ষপাত সহকারে বিচার করিবার ক্ষমতা অতি অল্প ইংরাজের ছিল। তখন তাঁহারা ভীত চিত্তে একটা রাজনৈতিক সঙ্কট কিরূপে নিবারণ হইতে পারে সেইদিকেই অধিক মনোযোগ দিয়াছিলেন। তৃতীয় খণ্ড সাধনায় "ইংরাজের আতঙ্ক" নামক প্রবন্ধে আমরা সাঁওতাল দমনের উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছি, ভয় পাইলে সুবিচার করিবার ধৈর্য্য থাকে না এবং যাহারা জ্ঞানতঃ অথবা অজ্ঞানতঃ ভীতির কারণ, তাহাদের প্রতি একটা নিষ্ঠুর হিংস্র ভাবের উদয় হয়। এই কারণে—গবর্মেণ্ট নামক যন্ত্রটি যেমনি নিরপেক্ষ থাক গবর্মেণ্টের ছোটবড় যন্ত্রীগুলি যে আদ্যোপান্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা বারম্বার অস্বীকার করিলেও লক্ষণে স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছিল এবং এখনো প্রকাশ পাইতেছে। এবং সাধারণ ভারতবর্ষীয় ইংরাজের মনে বিবিধ স্বাভাবিক কারণে একবার এইরূপ বিকার উপস্থিত হইলে তাহার যে ফল সে ফলিতে থাকিবেই;—ক্যান্যুট যেমন সমুদ্রতরঙ্গকে নিয়মিত করিতে পারেন নাই গবর্মেণ্টও সেইরূপ স্বাভাবিক নিয়মকে বাধা দিতে পারিবেন না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে কেনই বা বৃথা আন্দোলন করা এবং আমারই বা এ প্রবন্ধ লিখিতে বসিবার আবশ্যক কি ছিল?

গবর্মেণ্টের নিকট সকরুণ অথবা সাভিমান স্বরে আবেদন বা অভিযোগ করিবার জন্য প্রবন্ধ লিখার কোন আবশ্যক নাই সে কথা আমি সহস্রবার স্বীকার করি। আমাদের এই প্রবন্ধ কেবল আমাদের স্বজাতীয়ের জন্য। আমরা নিজেরা ব্যতীত আমাদের নিজেদের প্রতি অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

ক্যান্যুট সমুদ্রতরঙ্গকে যেখানে থামিতে বলিয়াছিলেন, সমুদ্র-তরঙ্গ সেখানে থামে নাই—সে জড়শক্তির নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া যথোপযুক্ত স্থানে গিয়া আঘাত করিয়াছিল। ক্যান্যুট মুখের কথায় বা মন্ত্রোচ্চারণে তাহাকে ফিরাইতে পারিতেন না বটে কিন্তু বাঁধ বাঁধিয়া তাহাকে প্রতিহত করিতে পারিতেন।

স্বাভাবিক নিয়মানুগত আঘাতপরম্পরাকে যদি অর্দ্ধপথে বাধা দিতে হয় তবে আমাদিগকেও বাঁধ বাঁধিতে হইবে। সকলকে এক হইতে হইবে। সকলকে সমহৃদয় হইয়া সমবেদনা অনুভব করিতে হইবে।

দল বাঁধিয়া যে বিপ্লব করিতে হইবে তাহা নহে—আমাদের সে শক্তিও নাই। কিন্তু দল বাঁধিলে যে একটা বৃহত্ত্ব এবং বল লাভ করা যায় তাহাকে লোকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে না। শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে না পারিলে সুবিচার আকর্ষণ করা বড় কঠিন।

কিন্তু বালির বাঁধ বাঁধিবে কি করিয়া? যাহারা বারম্বার নিহত পরাহত হইয়াছে অথচ কোন কালে সংহত হইতে শিখে নাই, যাহাদের সমাজের মধ্যে অনৈক্যের সহস্র বিষবীজ নিহিত রহিয়াছে তাহাদিগকে কিসে বাঁধিতে পারিবে? ইংরাজ যে আমাদের মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতে পারে না এবং ইংরাজ ঔষধের দ্বারা চিকিৎসার চেষ্টা না করিয়া কঠিন আঘাতের দ্বারা আমাদের হৃদয়ব্যথা চতুর্গুণ বর্দ্ধিত করিবার উদ্যোগ করিতেছে এই বিশ্বাসে উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে সমস্ত হিন্দুজাতির হৃদয় অলক্ষিতভাবে প্রতিদিন পরস্পর নিকটে আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। আমাদের স্বজাতি এখনও আমাদের স্বজাতীয়ের পক্ষে ধ্রুব আশ্রয় ভূমি হইয়া

উঠিতে পারেন নাই। এই জন্য বাহিরের ঝটিকা অপেক্ষা আমাদের গৃহভিত্তির বালুকাময় প্রতিষ্ঠা-স্থানকে অধিক আশঙ্কা করি। খরবেগ নদীর মধ্যস্রোত অপেক্ষা তাহার শিথিলবন্ধন ভগ্নপ্রবণ তটভূমিকে পরিহার করিয়া চলিতে হয়।

অতএব বাঁধ বাঁধিবার পূর্ব্বে অনেকগুলি নির্ভীক অন্যায়-অসহিষ্ণু আত্মবিসর্জ্জনপর মহাদাশয় লোকের আবশ্যক। তাঁহারা এক একটি বনস্পতির ন্যায় আপন অমোঘ মূলজাল চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত করিয়া দিয়া ভারতবর্ষের শিথিল মৃত্তিকাকে দৃঢ়বলে আঁটিয়া ধরিবেন। সমস্ত জাতিকে অটল করিয়া তুলিতে হইলে কতকগুলি লোককে একলা দাঁড়াইতে হইবে—খ্যাতি এবং কৃতজ্ঞতা তাঁহারা প্রত্যাশা করিবেন না—পরজাতির নিকট হইতে উপহাস ও উৎপীড়ন এবং স্বজাতির নিকট হইতে অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য তাঁহাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে।

আমরা জানি, বহুকাল পরাধীনতায় পিষ্ট হইয়া আমাদের জাতীয় মনুষ্যত্ব ও সাহস চূর্ণ হইয়া গেছে, আমরা জানি যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি দণ্ডায়মান হইতে হয় তবে সর্ব্বাপেক্ষা ভয় আমাদের স্বজাতিকে—যাহার হিতের জন্য প্রাণপণ করা যাইবে সেই আমাদের প্রধান বিপদের কারণ, আমরা যাহার সহায়তা করিতে যাইব তাহার নিকট হইতে সহায়তা পাইব না, কাপুরুষগণ সত্য অস্বীকার করিবে, নিপীড়িতগণ আপন পীড়া গোপন করিয়া যাইবে, আইন আপন বজ্রমুষ্টি প্রসারিত করিবে এবং জেলখানা আপন লৌহ বদন ব্যাদান করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিবে কিন্তু তথাপি অকৃত্রিম মহত্ত্ব এবং স্বাভাবিক ন্যায়প্রিয়তাবশতঃ আমাদের মধ্যে দুই চারিজন লোকও যখন শেষ পর্য্যন্ত অটল থাকিতে পারিবে তখন আমাদের জাতীয় বন্ধনের সূত্রপাত

হইতে থাকিবে এবং তখন আমরা ন্যায়বিচার পাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইব।

জানি না হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ অথবা ভারতবর্ষীয় ও ইংরাজের সংঘর্ষস্থলে আমরা যাহা অনুমান ও অনুভব করিয়া থাকি তাহা সত্য কি না, আমরা যে অবিচারের আশঙ্কা করিয়া থাকি তাহা সমূলক কি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানি, যে, কেবলমাত্র বিচারকের অনুগ্রহ ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির উপর বিচারভার রাখিয়া দিলে সুবিচারের অধিকারী হওয়া যায় না। রাজ্যতন্ত্র যতই উন্নত হউক্ প্রজার অবস্থা নিতান্ত অবনত হইলে সে কখনই আপনাকে উচ্চে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না, কারণ, মানুষের দ্বারাই রাজ্য চলিয়া থাকে, যন্ত্রের দ্বারাও নহে, দেবতার দ্বারাও নহে। তাহাদের নিকট যখন আমরা আপনাদিগকে মনুষ্য বলিয়া প্রমাণ দিব তখন তাহারা সকল সময়েই আমাদের সহিত মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিবে। যখন ভারতবর্ষে অন্ততঃ কতকগুলি লোকও উঠিবেন যাঁহারা আমাদের মধ্যে অটল সত্যপ্রিয়তা ও নির্ভীক ন্যায়পরতার উন্নত আদর্শ স্থাপন করিবেন, যখন ইংরাজ অন্তরের সহিত অনুভব করিবে যে ভারতবর্ষ ন্যায়বিচার নিশ্চেষ্টভাবে গ্রহণ করে না, সচেষ্টভাবে প্রার্থনা করে, অন্যায় নিবারণের জন্য প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয় তখন তাহারা কখনও ভ্রমেও আমাদিগকে অবহেলা করিবে না এবং আমাদের প্রতি ন্যায়বিচারে শৈথিল্য করিতে তাহাদের স্বভাবতই প্রবৃত্তি হইবে না।

স্বরলিপি।

রাগিণী মিশ্র সিন্ধু—তাল একতালা।

(তবু) পারিনে সঁপিতে প্রাণ।
পলে পলে মরি সেও ভাল, সহি
পদে পদে অপমান।

(মিছে কথার বাঁধুনী কাঁদুনীর পালা
চোখে নাই কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা
বহে' বহে' নত শির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছি ছি একি লাজ,
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,
আপনি করিনে আপনার কাজ,
(করি) পরের পরে অভিমান।
(ছি ছি) পরের কাছে অভিমান।

(ওগো) আপনি নামাও কলঙ্কপসরা
যেও না পরের দ্বার;
পরের পায়ে ধরে মান ভিক্ষা করা
সকল ভিক্ষার ছার।
দাও দাও বলে' পরের পিছু পিছু
কাঁদিয়ে বেড়ালে মেলে না ত কিছু,
(যদি) মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও
প্রাণ আগে কর দান।

২।৺

১ ২´ ৩

॥ না র্সা -নর্সর্রা। র্সা ঞ্ধা পা। মা ঙ্গরা সা।
॥ ত বু — । পা রি নে। সঁ পি তে।

০ ১ ॥

। ন্সরা -া -া। -া -া া। সসা -া ন্সরা। রা রা রা।
। প্রা — —। — ণ্ । পলে — পঁ । লে ম রি।

। মমা -া ঙ্গরা। সা -া গমা। পা র্সা র্রা।
। সেও — ভা। ল — সহি প দে প।

। নর্সর্রা র্সা ঞ্ধা। পা -া -া॥ সসা -া ন্সরা।
। দে অ প । মা — ন্॥ কথা — -র ।

। রা রা রা। রা মা ঙ্গমঙ্গা। -া রা স্রা। পা পধঞ্া ঞ্ধা।
। বাঁ ধু নী। কাঁ দু নী । -ঃ পা লা। চো খে না ।

। পধপা মা গমা। রগ মা -া -া। -া -া া। পা না না।
। হি কা রো। নী — — । — র্ । আ বে দ ।

। না র্সা -া। ননা -র্রা র্সা। ঞ্ধা পা মগ্মা।
। ন আ র্। নিবে — দ। নের্ থা লা ।

। পপা -র্সা ঞ্ধা। পধপা মা গমা। রগমা -া -া ।
। বহে — ব । হে ন ত। শি — —।

। -া -া া। না না না। ননা -া ঃ-র্সঃ। র্সর্সা -নর্সর্রা র্রর্সা।
। — র্ - । কাঁ দি য়ে। সোহা— গ্ । ছিছি — এ ।

। র্সা র্সা -া । পা র্সনা র্সা । -া র্রা র্রর্সা । র্রর্মর্গা ঃ-র্রঃ র্সর্রা ।
। কি না -জ্ । জ গ তে । -র্ মা ঝে । ভিখা — রী ।

। র্সা র্সর্রর্সা না । পা না না । র্সা র্সা র্সা । ঞা র্সা ঞর্সঞা ।
। র সা জ্ । আ প নি । ক রি নে । আ প না ।

। ধপা পা ধা । ঞর্সা -া ঞধা । পধপা মা গমা ।
। -র্ কা জ্ । পরের্ — প । রে অ ভি ।

। রগমা -া -া ॥ সসা -ন্সরা রা । রা রা -া । রপা -া মা ।
। মা — ন্ ॥ আপ — নি । না মা ও । কল — ঙ্ক ।

। র্গমর্গাঃ -রঃ সা । পা পধঞা ঞধা । পধপা মা গমা ।
। প -স রা । যে ও না । প রে র্ ।

। রগমা -া -া । -া -া া । পনা -া পা । না র্সা র্সা ।
। দ্বা — — । — র্ । পরে -র্ পা । য়ে ধ রে ।

। র্সর্রর্সা -া ঞধা । পা মগা মা । পর্সা -া ঞধা ।
। মা -ন্ ভি । ক্ষা ক রা । সক — ল ।

। পধপা মা গমা । রগমা -া -া । -া -া া । না -া না ।
। ভি ক্ষা র । দ্বা — — । — র্ । দা ও দা ।

। -া না না । র্সর্সা -া র্সা । র্সাঃ -র্সঃ র্সা ।
। ও ব লে । পরে -র্ পি । ছু পি ছু ।

। পর্সা -া না । র্সা র্রা র্রর্সা । র্র^ম র্গা^ম র্গা ।
। কাঁদি — য়া । বে ড়া লে । মে লে না ।

। ঋর্রা র্রা র্সনা। পা-না না। র্সা র্সা -া। নর্সর্রা -র্সা ঞধা।
। ত কি ছু । মা - নূপে। তে চা ও। প্রা -ণ্ পে ।

। পা মগা মা । পধা -ঞর্সা ঞধা । পধপা মা গমা ।
। তে চা ও । প্রা ণ্ আ । গে ক র ।

। রগমা -া -া ॥
। দা — -ন ॥

ব্যাখ্যা।

১। তালের খাতিরে এই গানের কতকগুলি কথা, গাহিবার সময় ছাড়িয়া দিতে হয়। তাই, স্বরলিপিতে সেই কথাগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে।

২। পার্শ্বস্থ যুগলচ্ছেদ আস্থায়ীতে ফিরিয়া যাইবার চিহ্ন। ফিরিয়া গিয়া যেখানে শিরোদেশে যুগলচ্ছেদ দেখিবে, সেইখানে ছাড়িয়া দিয়া, অন্তরা ধরিবে।

৩। এই গানের আরম্ভেই প্রথম তালি পড়ে। "পারি নে"—ইহার মধ্যে "পা" শব্দটির উপর দ্বিতীয় তালি সম্ পড়ে। তালি-সংখ্যার উপর রেফ্ চিহ্ন থাকিলে সমের স্থান বুঝায়।

৪। ঋ=কোমল গ; ঞ=কোমল ন।

৫। ।=এক মাত্রা; ঃ=অর্দ্ধ মাত্রা। যে সুর কেবল ছুঁইয়া যায় মাত্র তাহাকে স্পর্শমাত্রার সুর কহে; এই সুর, ছোট অক্ষরে, মূল সুরের গায়ে শিরোদেশে লিখিত হয়।

৬। আকার যখন কোন সুরের সহিত হাইফেনের দ্বারা যুক্ত না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে থাকে, তখন তাহাতে একমাত্রা কাল বিরাম বুঝায়। অর্থাৎ সে স্থলে একমাত্রা কাল থামিয়া থাকিতে হয়।

বোম্বায়ের রাজপথ।

নাট্যশালা রঙ্গমঞ্চ দৃশ্যপট বাদ্যভাণ্ড সমস্তই আধুনিক হইতে পারে কিন্তু তথাপি যখন শকুন্তলার অভিনয় দেখা যায় তখন কোথা হইতে সেই পুরাতন তপোবন, সেই চন্দ্রবংশীয় রাজার পুরাতন রাজপুরী, সেই অতীত প্রাচীন ভারতবর্ষ সমস্ত আধুনিকতাকে অভিভূত করিয়া হৃদয়ের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠে। বোম্বাই সহরটি দেখিলে সেইরূপ মনে হয় যে, এই নূতন নাট্যশালা ইংরাজের রচিত; ইংরাজ ইহাকে সুচিত্রিত করিয়াছে, ইংরাজ ইহার প্রদীপ জ্বালাইয়া দিতেছে এবং সমস্ত অভিনয়ের মধ্যে মধ্যে ইংরাজী যন্ত্রে ইংরাজের সঙ্গীত বাজিয়া উঠিতেছে; তথাপি সমস্ত অতিক্রম করিয়া ইহার মধ্যে একটি সুকোমলা প্রাচ্যশ্রী দর্শকের চক্ষে মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দিতেছে।

সমুদ্রের উপকূলে বৃহৎ বোম্বাইপুরী যেন পাশ্চাত্য শিল্পীর অঙ্কিত বিস্তীর্ণ পটের উপরে প্রাচ্য উপন্যাসের একখানি মায়াচিত্র। মালাবার শৈলশিখর হইতে তরুণ শ্যামিমা নামিয়া আসিয়া নিম্নভূমির নারিকেলতরুকুঞ্জে নিঃশব্দে মিশিয়া গিয়াছে এবং এই মোহময়ী প্রকৃতির নিবিড় কুঞ্জবনমধ্য হইতে সহস্র অভ্রংলিহ প্রাসাদশিখররাজি উঠিয়া বোম্বায়ের রবিকরদীপ্ত সমুদ্রবেলায় একটি চিত্রার্পিত রমণীয়তা অর্পণ করিয়াছে। রাজপথে বিচিত্র জনতা—এই মায়াপুরীরই রাজপথ—এবং সে জনতাও এমনি মোহকর। বিচিত্র উষ্ণীষ, বিবিধ বর্ণ, বহুবিধ বেশভূষা, নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী, সমস্ত মিলিয়া দর্শকের মনে একটি সুদূর স্বপ্নাবেশ সঞ্চারিত করিয়া দেয়—এবং এই বিচিত্রবর্ণ গতিবিধি মৃদু সন্ধ্যারুণরাগে শুধু একটি বর্ণময়ী ছায়াসমাগমের মত প্রতিভাত হয়।

কলিকাতার নগ্নশির দীনবেশ কৃষ্ণকান্তি জনপ্রবাহ হইতে আসিয়া বোম্বায়ের এই বিচিত্র বর্ণতরঙ্গের মধ্যে উদ্ভ্রান্ত চিত্ত প্রশ্ন করিয়া উঠে, এ সমস্ত সত্য কি স্বপ্ন, কায়া কি ছায়া, বাস্তব কি চিত্রার্পিত মাত্র। সমস্তই যেন অত্যন্ত প্রাচ্য এবং প্রাচীন উপন্যাসবর্ণিতবৎ। —অর্দ্ধাচ্ছাদিত কর্ণীরথে বসিয়া বণিককন্যাগণ সমস্বরে স্বদেশীয় গাথা গান করিতে করিতে চলিয়াছে—পরিধানে বিচিত্রচিত্রিত শাটিকা এবং চারু নীল পীত হরিৎ বর্ণের উজ্জ্বল বক্ষাবরণ। রথের দ্রুত গতিবশে গোকণ্ঠবিলম্বিত ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা-সকল রিণিরিণি ধ্বনিত হইতে থাকে এবং অন্যমনস্ক পথিকজনকে রথচক্রপথ হইতে দূরে সরিয়া যাইবার জন্য সতর্ক করিয়া দেয়। মস্তকে দুগ্ধভাণ্ড লইয়া সুগঠনা তন্বঙ্গী আহীরবালিকারা সরল অঙ্গযষ্টির অবলীলাগতিভঙ্গে সৌন্দর্য্যের একটি হিল্লোল তুলিয়া যায় এবং পিত্তল কঙ্কন মুহুর্মুহু কাংস্যভাণ্ডে আহত হইয়া পশ্চাতে একটি লঘু ধ্বনি সমুত্থিত করিয়া তুলে। নিরবগুণ্ঠনা মহারাষ্ট্রকুল-কামিনীগণ নিঃসঙ্কোচ অস্খলিতপদে রাজপথে ইতস্ততঃ গতায়াত করেন—পুষ্পমাল্যবিভূষিত কঠিনদৃঢ়বদ্ধ ব্রাহ্মণীয় বেণী মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে কুণ্ডলিত হইয়া থাকে; যেন কোন্ পুরাতন ভাস্কর্য্য এই দক্ষিণ দেশে আসিয়া সহসা সজীব হইয়া উঠিয়াছে মনে হয়। শাড়ীর বিচিত্র ভাঁজ, বিলম্বিত দৃঢ় কচ্ছ, বাম স্কন্ধদেশ হইতে দক্ষিণ বাহূপরি বিলুণ্ঠিত অঞ্চলপ্রান্ত, ঈষৎ ব্যক্ত বক্ষসন্নদ্ধ চোলিকা—সকলই বিচিত্র; শুধু বর্ণ এবং আভা, ছায়া এবং আলোক, বসন ভূষণ এবং ধ্বনি-বৈচিত্র্যের তরঙ্গ। এবং এই তরঙ্গায়িত বৈচিত্র্যমধ্যে শুভ্রবস্ত্র-নিবদ্ধকেশপাশ বিচিত্রাভ চীনাংশুকপরিহিতা পারসীক সুন্দরী-গণের মৃদুস্মিত স্নিগ্ধশোভা একটি নূতন রমণীয়তা সঞ্চার করিয়াছে। ভারতবর্ষের সহস্র জাতি বর্ণ দ্বিকোণ চতুষ্কোণ গোলাকার

বক্রচূড় শুভ্র নীল পীত রক্ত বিবিধ উষ্ণীষরাজিতে শোভিত হইয়া এই চিত্রার্পিত জনতার শোভা সম্পাদন করিতেছে এবং কুবলয়-স্নিগ্ধদৃষ্টি কুলকামিনীগণ সমাগমে এই রমণীয় জনতা অধিকতর উজ্জ্বল ও মনোহর হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচ্য ভারতে এমন উজ্জ্বল সজীব অথচ চিত্রার্পিতবৎ সুন্দর দৃশ্য আর কোথাও দেখা যায় না।

বোম্বায়ের পার্শ্বে কলিকাতার চিত্রপট অত্যন্ত ম্লান—না আছে এ উষ্ণীষখচিত প্রাচ্য বৈচিত্র্য, না আছে এ কুলাঙ্গনাদৃষ্টিউজ্জ্বল চিত্তহারী বর্ণবিন্যাস। সৌন্দর্য্য সেথানে ইষ্টকস্তূপের মধ্যে অসূর্য্য-স্পশ্যা এবং রাজপথ এই শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকারাজির মধ্য দিয়া বৈচিত্র্যহীন জনতাপ্রবাহ মাত্র।

কলিকাতারও দৃশ্যপট অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। যেথানে সমস্ত অন্ধকার ছিল সেথানে এখন ক্বচিৎ কদাচিৎ দুইটি স্নেহনিস্যন্দিনী উজ্জ্বল দৃষ্টি দুর্ভাগ্য পথিকজনের অন্তরে মৃদু আশার সঞ্চার করে। রাজপথে রথবাতায়ন পূর্ব্বের ন্যায় আর নীরন্ধ্র অর্গলিত হয় না। এবং "পথে নারী বিবর্জ্জিতা" দাম্পত্যের মধু-কলহের বাহিরে কদাচ শুনা যায়। কিন্তু মহারাষ্ট্রভূমির সহিত তুলনায় এটুকু কিছুই নহে। সুদীর্ঘ মুসলমানশাসননিপীড়িত বাঙ্গলায় সমাজের যে অর্দ্ধাঙ্গ সকলপ্রকার সামাজিকতা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া পরিবারের মধ্যেও অত্যন্ত সঙ্গোপন অন্তঃপুরে অন্তরিত হইয়াছে, স্বাধীন মহারাষ্ট্রভূমিতে সে অর্দ্ধাঙ্গ চিরদিন অপ-রার্দ্ধের সহচরীরূপে অভ্যাগতকে সমাদর করিয়াছে, যজ্ঞস্থলে স্বহস্তে অন্ন পরিবেশন করিয়াছে, রণস্থলে অশ্বপৃষ্ঠে আসন অটল রাখিয়াছে; সুতরাং তাহার সে সহজ শোভন সম্ভ্রম, সে সুদৃঢ়পদচারিণী অবলীলাগতি, সে নিরবগুণ্ঠন নিঃসঙ্কোচ লজ্জাশীলতা অন্তঃপুর-অন্ত-

রিত, বঙ্গগৃহের বদ্ধাকাশে আশা করা যায় না। কলিকাতার দৃশ্যপটে ক্বচিৎ কদাচিৎ সন্ত্রস্তসকরুণদৃষ্টি বঙ্গকুললক্ষ্মী যেন ছায়ার মত ক্ষণকালের জন্য দেখা দিয়া' তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া যাইতে চাহেন। নেপথ্যের চিরাভ্যস্ত অসূর্য্যম্পশ্য কক্ষ হইতে দিবালোকিত রঙ্গমঞ্চে সহস্র দৃষ্টির মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইতে সহজেই তাঁহার সঙ্কোচ বোধ হয়। বাহিরের সহস্র তীব্রদৃষ্টি যেন নিতান্ত নিদারুণ পরিহাসের মত সর্ব্বাঙ্গে বিঁধিতে থাকে। তিনি যেন ব্যাধানুসারিতা হরিণীর ন্যায় ভয়ে পথভ্রান্তা এবং লজ্জায় সঙ্কোচে একান্ত অভিভূতা।

বোম্বাইপুরী পূর্ব্ব পশ্চিমের মিলনতীর্থ। ভারতলক্ষ্মী এখানে পশ্চিম সমুদ্রের তটপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা সমুদ্র পার হইয়া এইখানে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রাচী এবং প্রতীচী উভয়েই এখানে উজ্জ্বল অম্লান লাবণ্যে উদ্ভাসিত। নগরী শোভা স্বাস্থ্যে সমুজ্জ্বল, রাজপথ প্রশস্ত ও পরিষ্কার, কর্ম্মস্রোত নিত্য প্রবাহিত, রাজপথে লৌহবর্ত্মে রথচক্র নিরন্তর ঘর্ঘরিত; এবং এই বেগবান্ পাশ্চাত্য ঐশ্বর্য্যপ্রবাহের মাঝখান দিয়া দক্ষিণ ভারতবর্ষের উজ্জ্বলবর্ণধারিণী শুচিশোভা তরণীখানি সুন্দরভাবে ভাসিয়া চলিয়াছে।

সভ্যতাসঙ্গমের তীর্থতটবর্ত্তী বোম্বায়ের এই কুহক অন্যত্র দুর্লভ। ইহার মধ্যে যে একটি মোহকরী প্রাচীনতা আছে—ইহার জনতায়, উষ্ণীষে, উৎসব-আনন্দে যে প্রাচীন সভ্যতার সজীবতা অনুভূত হয়, আর্য্যাবর্ত্তের বড় বড় সহরে কোথাও এই প্রাচীন মোহটুকু নাই। ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে, যে উদীয়মান শক্তি-প্রভাবে মহারাষ্ট্রীয়গণ অনতিকালপূর্ব্বে সমস্ত ভারতবর্ষে ক্রমশঃ আপন প্রতাপ বিকীর্ণ করিতেছিল সেই উদ্যৎ শক্তির দীপ্তি আজ ভস্মাচ্ছন্ন

হইলেও সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হয় নাই। সেই শক্তি এবং সেই জ্যোতি মহারাষ্ট্রদেশে হিন্দুসমাজকে সজীব ও উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। মহারাষ্ট্রের তেজস্বী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিশুদ্ধ পৌরাণিক আদর্শ একটি সজীব আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। বিদেশীয় উপপ্লবে সমতল উত্তর ভারত বারম্বার প্লাবিত হইয়া নব নব স্তরপাতে মিশ্রতা লাভ করিয়াছে; মহারাষ্ট্রদেশ অপেক্ষাকৃত অক্ষুব্ধ ছিল; দিল্লি মহানগরীর প্রবল আবর্ত্তবেগ দাক্ষিণাত্যে ক্ষীণতর হইয়া প্রবেশ করিত। আর একটি কারণ এই যে, কালিদাস ও ভবভূতির অমর কাব্য দক্ষিণ ভারতবর্ষকে চিরকালের জন্য পুরাতন করিয়া রাখিয়াছে। তীর্থ বহু আছে, দেবধানীর অন্ত নাই, বর্ষে বর্ষে বহু ব্যয়ে নানা স্থানে বহু উৎসব সুসম্পন্ন হয়; কিন্তু যদি কোথাও রাজপথের বিচিত্র জনতার মুখশ্রীতে একটি প্রাচীন সভ্যতা মুদ্রিত হইয়া গিয়া থাকে ত সে বোম্বায়ে। বোম্বাই সংস্কৃত ভারতবর্ষের একখানি চারু চিত্র।

আমি বোম্বায়ের একটি মাত্র উৎসব দেখিয়াছি। তখন ভাদ্রপদ মাস, সমুদ্র বোম্বায়ের কূলে কূলে উছলিত, আকাশে ক্ষণে মেঘ, ক্ষণে রৌদ্র, এবং নবাগত শরৎ রৌদ্র ও বৃষ্টি দিয়া মেঘে মেঘে নব নব আভা এবং বর্ণের লূতাতন্তু রচনা করে। এই মায়াচন্দ্রাতপতলে গণপতির মহোৎসব। সহস্র ক্ষুদ্র বৃহৎ গণপতি শিবিকারোহণে, বাহকস্কন্ধে সমুদ্রবেলায় সমাগত। দেহের বর্ণে একটি অতি মৃদু গোলাপী আভা, পরিধানে শুভ্র বস্ত্র, কুণ্ডলীকৃতাগ্রভাগ দীর্ঘ শুণ্ড উদরপিণ্ডোপরি প্রায় লুটাইয়া পড়িয়াছে, এবং এই গজগাম্ভীর্য্যের মধ্য হইতে জ্ঞানের সরল প্রশান্ত মহিমা অনতিউজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রকাশ পাইতেছে। সহস্র মশালের আলোক, ভক্তবৃন্দের উন্মত্ত অঙ্গভঙ্গীসহকারে নিরন্তর জয়দেবধ্বনি, ঘনঘন ঢক্কানিনাদ এবং

বৃহৎ লোকারণ্যসমুত্থিত মহাকলরব একত্র মিশিয়া এই সন্ধ্যাছায়ালীন সমুদ্রোপকূলে গণপতির উৎসব নিবিড়তর করিয়া তুলিয়াছে।—অজ্ঞান বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছে, উচ্চৈঃস্বরে বন্দনাগান গাহিয়া আবেগভরে করতালি দিতেছে, মশাল জ্বালিয়া ঢক্কানিনাদ করিয়া উৎসব ঘোষণা করিতেছে; জ্ঞান অটল গাম্ভীর্য্যে নিশ্চল স্তিমিত—চক্ষে পলক পড়ে না, অঙ্গ উচ্ছ্বাসে আন্দোলিত হয় না, বেদনা ভাষাহীন হইয়া অন্তর্নিরুদ্ধ এবং মুখশ্রী ভাবে সর্ব্বদাই বিকসিত।

এই গণেশউৎসব বোম্বাই নাট্যশালার একটি প্রধান দৃশ্য। অভিনয় অধিক নহে, কিন্তু এরূপ সুবৃহৎ জনতা কদাচ দেখা যায়। সে দিন সমুদ্রোপকূলে রাজপথে সমস্ত বোম্বাই সহর ভাঙ্গিয়া পড়ে। এবং উন্মুক্ত প্রাসাদবাতায়নসকল হইতে কুলললনাগণের কুবলয়দৃষ্টি নিপতিত হইয়া এই উষ্ণীষখচিত বিবিধবেশ বর্ণবৈচিত্র্যকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলে। এবং একে একে যখন আলোক নিভিয়া আসে, প্রতিমাসকল সমুদ্রগর্ভে বিসর্জ্জিত হয়, জনতা সহস্র পথ দিয়া গৃহাভিমুখী হইতে থাকে, বোম্বায়ের বর্ষব্যাপী এক অঙ্কের অভিনয় যেন সমাপ্ত হইয়া আসে—একবার যেন ক্ষণকালের জন্য পটক্ষেপ হয়। এবং দর্শকের মনে কেবল এই বসনভূষণ বর্ণ ধ্বনি, এই আকাশ সমুদ্র এবং আকাশপটে মুদ্রিত শ্যাম শৈলশ্রেণী ও সমুদ্রগর্ভে প্রতিবিম্বিত চারু বোম্বাই সহর, এই কোলাহল কলরব উৎসব মোহবৎ ঘনীভূত হইয়া আসে এবং সমস্ত শিরা ও স্নায়ুর মধ্যে একটি তড়িত্তরঙ্গের অনুকম্পন বহুক্ষণ ধরিয়া স্পন্দিত হইতে থাকে।

কাব্যের তাৎপর্য্য।

(পাঞ্চভৌতিক সভায় আলোচিত)

সভার সভ্যগণ।

ক্ষিতি।

স্রোতস্বিনী (অপ্)

দীপ্তি (তেজ)।

সমীরণ (মরুৎ)

ব্যোম

এবং সেক্রেটারি।

স্রোতস্বিনী আমাকে কহিলেন, কচ-দেবযানীসংবাদ সম্বন্ধে তুমি যে কবিতা লিখিয়াছ তাহা তোমার মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি।

শুনিয়া আমি মনে মনে কিঞ্চিৎ গর্ব্ব অনুভব করিলাম, কিন্তু দর্পহারী মধুসূদন তখন সজাগ ছিলেন তাই দীপ্তি অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি রাগ করিয়ো না, সে কবিতাটার কোন তাৎপর্য্য কিম্বা উদ্দেশ্য আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ও লেখাটা ভাল হয় নাই।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। মনে মনে কহিলাম, আর একটু বিনয়ের সহিত মত প্রকাশ করিলে সংসারের বিশেষ ক্ষতি অথবা সত্যের বিশেষ অপলাপ হইত না, কারণ, লেখার দোষ থাকাও যেমন আশ্চর্য্য নহে তেমনি পাঠকের কাব্যবোধশক্তির খর্ব্বতাও নিতান্তই অসম্ভব বলিতে পারি না। মুখে বলিলাম, যদিও নিজের রচনা সম্বন্ধে লেখকের মনে অনেক সময়ে অসন্দিগ্ধ মত থাকে তথাপি তাহা যে ভ্রান্ত হইতে পারে ইতিহাসে এমন অনেক প্রমাণ

আছে,—অপর পক্ষে সমালোচক সম্প্রদায়ও যে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নহে ইতিহাসে সে প্রমাণেরও কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই। অতএব কেবল এইটুকু নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, আমার এ লেখা ঠিক তোমার মনের মত হয় নাই ; সে নিশ্চয় আমার দুর্ভাগ্য—হয়ত তোমার দুর্ভাগ্যও হইতে পারে।

দীপ্তি গম্ভীর মুখে অত্যন্ত সংক্ষেপে কহিলেন, তা' হইবে !—বলিয়া একখানা বই টানিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

ইহার পরে স্রোতস্বিনী আমাকে সেই কবিতা পড়িবার জন্য আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিলেন না।

ব্যোম জানালার বাহিরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া যেন সুদূর আকাশতলবর্ত্তী কোন এক কাল্পনিক পুরুষকে সম্বোধন করিয়া কহিল, যদি তাৎপর্য্যের কথা বল, তোমার এবারকার কবিতার আমি একটা তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছি।

ক্ষিতি কহিল, আগে বিষয়টা কি বল দেখি ? কবিতাটা পড়া হয় নাই সে কথাটা কবিবরের ভয়ে এতক্ষণ গোপন করিয়াছিলাম, এখন ফাঁস করিতে হইল।

ব্যোম কহিল, শুক্রাচার্য্যের নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত বৃহস্পতির পুত্র কচকে দেবতারা দৈত্যগুরুর আশ্রমে প্রেরণ করেন। সেখানে কচ সহস্রবর্ষ স্বর্গীয় নৃত্যগীতবাদ্যদ্বারা শুক্রতনয়া দেবযানীর মনোরঞ্জন করিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যালাভ করিলেন। অবশেষে যখন বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল তখন দেবযানী তাঁহাকে প্রেম জানাইয়া আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। দেবযানীর প্রতি অন্তরের আসক্তি সত্ত্বেও কচ নিষেধ না মানিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। গল্পটুকু এই। মহাভারতের সহিত একটুখানি অনৈক্য আছে কিন্তু সে সামান্য।

ক্ষিতি কিঞ্চিৎ কাতর মুখে কহিল—গল্পটি বারোহাত কাঁকুড়ের অপেক্ষা বড় হইবে না কিন্তু আশঙ্কা করিতেছি ইহা হইতে তেরো হাত পরিমাণের তাৎপর্য্য বাহির হইয়া পড়িবে।

ব্যোম ক্ষিতির কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিয়া গেল—কথাটা দেহ এবং আত্মা লইয়া।

শুনিয়া সকলেই সশঙ্কিত হইয়া উঠিল।

ক্ষিতি কহিল, আমি এইবেলা আমার দেহ এবং আত্মা লইয়া মানে মানে বিদায় হইলাম।

সমীরণ দুইহাতে তাহার জামা ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া কহিল, সঙ্কটের সময় আমাদিগকে একলা ফেলিয়া যাও কোথায়?

ব্যোম কহিল, জীব স্বর্গ হইতে এই সংসারাশ্রমে আসিয়াছে। সে এখানকার সুখ দুঃখ বিপদ সম্পদ হইতে শিক্ষা লাভ করে। যতদিন ছাত্র অবস্থায় থাকে, ততদিন তাহাকে এই আশ্রমকন্যা দেহটার মন যোগাইয়া চলিতে হয়। মন যোগাইবার অপূর্ব্ব বিদ্যা সে জানে। দেহের ইন্দ্রিয়বীণায় সে এমন স্বর্গীয় সঙ্গীত বাজাইতে থাকে, যে, ধরাতলে সৌন্দর্য্যের নন্দনমরীচিকা বিস্তারিত হইয়া যায় এবং সমুদয় শব্দ গন্ধ স্পর্শ আপন জড়শক্তির যন্ত্রনিয়ম পরিহার-পূর্ব্বক অপরূপ স্বর্গীয় নৃত্যে স্পন্দিত হইতে থাকে।

বলিতে বলিতে স্বপ্নাবিষ্ট শূন্যদৃষ্টি ব্যোম উৎফুল্ল হইয়া উঠিল,—চৌকিতে সরল হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল—যদি এমনভাবে দেখ, তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা অনন্তকালীন প্রেমাভিনয় দেখিতে পাইবে। জীব তাহার মূঢ় অবোধ নির্ভরপরায়ণা সঙ্গিনীটিকে কেমন করিয়া পাগল করিতেছে দেখ! দেহের প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে এমন একটি আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করিয়া দিতেছে, দেহধর্ম্মের দ্বারা যে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি নাই। তাহার চক্ষে যে সৌন্দর্য্য

আনিয়া দিতেছে দৃষ্টিশক্তির দ্বারা তাহার সীমা পাওয়া যায় না—তাই সে বলিতেছে "জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল;" -তাহার কর্ণে যে সঙ্গীত আনিয়া দিতেছে শ্রবণশক্তির দ্বারা তাহার আয়ত্ত হইতে পারে না, তাই সে ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে,—"সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ শ্রুতিপথে পরশ না গেল!" আবার এই প্রাণপ্রদীপ্ত মূঢ় সঙ্গিনীটিও লতার ন্যায় সহস্র শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রেমপ্রতপ্ত সুকোমল আলিঙ্গনপাশে জীবকে আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন করিয়া ধরে, অল্পে অল্পে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া আনে, অশ্রান্ত যত্নে ছায়ার মত সঙ্গে থাকিয়া বিবিধ উপচারে তাহার সেবা করে, প্রবাসকে যাহাতে প্রবাস জ্ঞান না হয় যাহাতে আতিথ্যের ত্রুটি না হইতে পারে সে জন্য সর্ব্বদাই সে তাহার চক্ষু কর্ণ হস্ত পদকে সতর্ক করিয়া রাখে। এত ভালবাসার পরে তবু একদিন জীব এই চিরানুগতা অনন্যাসক্তা দেহলতাকে ধূলিশায়িনী করিয়া দিয়া চলিয়া যায়! বলে, প্রিয়ে, তোমাকে আমি আত্মনির্ব্বিশেষে ভালবাসি, তবু আমি কেবল একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসমাত্র ফেলিয়া তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব! কায়া তখন তাহার চরণ জড়াইয়া বলে "বন্ধু অবশেষে আজ যদি আমাকে ধূলিতলে ধূলিমুষ্টির মত ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে, তবে এতদিন তোমার প্রেমে কেন আমাকে এমন মহিমাশালিনী করিয়া তুলিয়াছিলে? হায়, আমি তোমার যোগ্য নই—কিন্তু তুমি কেন আমার এই প্রাণপ্রদীপদীপ্ত নিভৃত সোনার মন্দিরে একদা রহস্যান্ধকারনিশীথে অনন্ত সমুদ্র পার হইয়া অভিসারে আসিয়াছিলে? আমার কোন্ গুণে তোমাকে মুগ্ধ করিয়াছিলাম?" এই করুণ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া এই বিদেশী কোথায় চলিয়া যায় তাহা কেহ জানে না। সেই আজন্মমিলনবন্ধনের অবসান, সেই মাথুরযাত্রার বিদায়ের দিন, সেই কায়ার

সহিত কায়াধিরাজের শেষ সম্ভাষণ—তাহার মত এমন শোচনীয় বিরহ দৃশ্য কোন প্রেম কাব্যে বর্ণিত আছে!

ক্ষিতির মুখভাব হইতে একটা আসন্ন পরিহাসের আশঙ্কা করিয়া ব্যোম কহিল—তোমরা ইহাকে প্রেম বলিয়া মনে কর না; মনে করিতেছ আমি কেবল রূপক অবলম্বনে কথা কহিতেছি! তাহা নহে। জগতে ইহাই সর্ব্বপ্রথম প্রেম। এবং জীবনের সর্ব্বপ্রথম প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা যেমন প্রবল হইয়া থাকে জগতের সর্ব্বপ্রথম প্রেমও সেইরূপ সরল অথচ সেইরূপ প্রবল। এই আদি প্রেম এই দেহের ভালবাসা যখন সংসারে দেখা দিয়াছিল তখনও পৃথিবীতে জলে স্থলে বিভাগ হয় নাই—সে দিন কোন কবি উপস্থিত ছিল না, কোন ঐতিহাসিক জন্মগ্রহণ করে নাই—কিন্তু সেই দিন এই জলময় পঙ্কময় অপরিণত ধরাতলে প্রথম ঘোষিত হইল, যে, এ জগৎ যন্ত্রজগৎমাত্র নহে;-প্রেম নামক এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দময় বেদনাময় ইচ্ছাশক্তি পঙ্কের মধ্য হইতে পঙ্কজবন জাগ্রত করিয়া তুলিতেছেন—এবং সেই পঙ্কজবনের উপরে আজ ভক্তের চক্ষে সৌন্দর্য্যরূপা লক্ষ্মী এবং ভাবরূপা সরস্বতীর অধিষ্ঠান হইয়াছে।

ক্ষিতি কহিল—আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে, যে, এমন একটা বৃহৎ কাব্যকাণ্ড চলিতেছে শুনিয়া পুলকিত হইলাম—কিন্তু সরলা কায়াটির প্রতি চঞ্চলস্বভাব আত্মাটার ব্যবহার সন্তোষজনক নহে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমি একান্তমনে আশা করি যেন আমার জীবাত্মা এরূপ চপলতা প্রকাশ না করিয়া অন্ততঃ কিছু দীর্ঘকাল দেহদেবযানীর আশ্রমে স্থায়ীভাবে বাস করে! তোমরাও সেই আশীর্ব্বাদ কর।

সমীরণ কহিল—ভ্রাতঃ ব্যোম, তোমার মুখে ত কখনও শাস্ত্র-

বিরুদ্ধ কথা শুনি নাই। তুমি কেন আজ এমন খৃষ্টানের মত কথা কহিলে? জীবাত্মা স্বর্গ হইতে সংসারাশ্রমে প্রেরিত হইয়া দেহের সঙ্গ লাভ করিয়া সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া পরিণতি প্রাপ্ত হইতেছে, এ সকল মত ত তোমার পূর্ব্বমতের সহিত মিলিতেছে না।

ব্যোম কহিল—এ সকল কথায় মতের মিল করিবার চেষ্টা করিও না। এ সকল গোড়াকার কথা লইয়া আমি কোন মতের সহিতই বিবাদ করি না। জীবনযাত্রার ব্যবসায়ে প্রত্যেক জাতিই নিজরাজ্য-প্রচলিত মুদ্রা লইয়া মূলধন সংগ্রহ করে—কথাটা এই দেখিতে হইবে, ব্যবসা চলে কি না। জীব সুখদুঃখবিপদসম্পদের মধ্যে শিক্ষা লাভ করিবার জন্য সংসার-শিক্ষাশালায় প্রেরিত হইয়াছে এই মতটিকে মূলধন করিয়া লইয়া জীবনযাত্রা সুচারুরূপে চলে, অতএব আমার মতে এ মুদ্রাটি মেকি নহে। আবার যখন প্রসঙ্গক্রমে অবসর উপস্থিত হইবে, তখন দেখাইয়া দিব, যে, আমি যে ব্যাঙ্কনোট্‌টি লইয়া জীবন-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, বিশ্ববিধাতার ব্যাঙ্কে সে নোটও গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

ক্ষিতি করুণস্বরে কহিল—দোহাই ভাই, তোমার মুখে প্রেমের কথাই যথেষ্ট কঠিন বোধ হয়—অতঃপর বাণিজ্যের কথা যদি অবতারণ কর তবে আমাকেও এখান হইতে অবতারণ করিতে হইবে, আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করিতেছি। যদি অবসর পাই তবে আমিও একটা তাৎপর্য্য শুনাইতে পারি।

ব্যোম চৌকিতে ঠেসান্ দিয়া বসিয়া জান্‌লার উপর দুই পা তুলিয়া দিল। ক্ষিতি কহিল, আমি দেখিতেছি এভোল্যুশন থিয়রি অর্থাৎ অভিব্যক্তিবাদের মোট কথাটা এই কবিতার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। সঞ্জীবনী বিদ্যাটার অর্থ, বাঁচিয়া থাকিবার বিদ্যা। সংসারে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে একটা লোক সেই বিদ্যাটা অহরহ

অভ্যাস করিতেছে—সহস্র বৎসর কেন, লক্ষ সহস্র বৎসর ধরিয়া। কিন্তু যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে সেই বিদ্যা অভ্যাস করিতেছে সেই প্রাণীবংশের প্রতি তাহার কেবল ক্ষণিক প্রেম দেখা যায়। যেই একটা পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইয়া যায় অমনি নিষ্ঠুর প্রেমিক চঞ্চল অতিথি তাহাকে অকাতরে ধ্বংশের মুখে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায়। পৃথিবীর স্তরে স্তরে এই নির্দ্দয় বিদায়ের বিলাপগান প্রস্তর-পটে অঙ্কিত রহিয়াছে;—

দীপ্তি ক্ষিতির কথা শেষ না হইতে হইতেই বিরক্ত হইয়া কহিল—তোমরা এমন করিয়া যদি তাৎপর্য্য বাহির করিতে থাক তাহা হইলে তাৎপর্য্যের সীমা থাকে না। কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়া দিয়া অগ্নির বিদায় গ্রহণ, গুটি কাটিয়া ফেলিয়া প্রজাপতির পলায়ন, ফুলকে বিশীর্ণ করিয়া ফলের বহিরাগমন, বীজকে বিদীর্ণ করিয়া অঙ্কুরের উদ্গম, এমন রাশি রাশি তাৎপর্য্য স্তূপাকার করা যাইতে পারে।

ব্যোম গম্ভীরভাবে কহিতে লাগিল, ঠিক বটে। ও গুলা তাৎ-পর্য্য নহে, দৃষ্টান্ত মাত্র। উহাদের ভিতরকার আসল কথাটা এই, সংসারে আমরা অন্ততঃ দুই পা ব্যবহার না করিয়া চলিতে পারি না।—বাম পদ যখন পশ্চাতে আবদ্ধ থাকে দক্ষিণপদ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যায়, আবার দক্ষিণ পদ সম্মুখে আবদ্ধ হইলে পর বামপদ আপন বন্ধন ছেদন করিয়া অগ্রে ধাবিত হয়। আমরা একবার করিয়া আপনাকে বাঁধি, আবার পরক্ষণেই সেই বন্ধন ছেদন করি। আমাদিগকে ভাল বাসিতেও হইবে এবং সে ভালবাসা কাটিতেও হইবে;—সংসারের এই মহত্তম দুঃখ, এবং এই মহৎ দুঃখের মধ্য দিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হয়।

সমীরণ কহিল—গল্পটার সর্ব্বশেষে যে একটি অভিশাপ আছে

তোমরা কেহ সেটার উল্লেখ কর নাই। কচ যখন বিদ্যা লাভ করিয়া দেবযানীর প্রেমবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া যাত্রা করেন তখন দেবযানী তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন, যে, তুমি যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে সে বিদ্যা অন্যকে শিক্ষা দিতে পারিবে কিন্তু নিজে ব্যবহার করিতে পারিবে না। আমি সেই অভিশাপসমেত একটা তাৎপর্য্য বাহির করিয়াছি যদি ধৈর্য্য থাকে ত বলি।

ক্ষিতি কহিল, ধৈর্য্য থাকিবে কি না পূর্ব্বে হইতে বলিতে পারি না। প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া শেষে প্রতিজ্ঞা রক্ষা না হইতেও পারে। তুমিত আরম্ভ করিয়া দাও শেষে যদি অবস্থা বুঝিয়া তোমার দয়ার সঞ্চার হয় থামিয়া গেলেই হইবে।

সমীরণ কহিল—ভাল করিয়া জীবন ধারণ করিবার বিদ্যাকে সঞ্জীবনী বিদ্যা বলা যাক। মনে করা যাক্ কোন কবি সেই বিদ্যা নিজে শিখিয়া অন্যকে দান করিবার জন্য জগতে আসিয়াছে। সে তাহার সহজ স্বর্গীয় ক্ষমতায় সংসারকে বিমুগ্ধ করিয়া সংসারের কাছ হইতে সেই বিদ্যা উদ্ধার করিয়া লইল। সে যে সংসারকে ভাল বাসিল না তাহা নহে কিন্তু সংসার যখন তাহাকে বলিল তুমি আমার বন্ধনে ধরা দাও,সে কহিল, ধরা যদি দিই, তোমার আবর্ত্তের মধ্যে যদি আকৃষ্ট হই তাহা হইলে এ সঞ্জীবনী বিদ্যা আমি শিখাইতে পারিব না ;. সংসারে সকলের মধ্যে থাকিয়াও আপনাকে বিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে। তখন সংসার তাহাকে অভিশাপ দিল, তুমি যে বিদ্যা আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ সে বিদ্যা অন্যকে দান করিতে পারিবে কিন্তু নিজে ব্যবহার করিতে পারিবে না।—সংসারের এই অভিশাপ থাকাতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যে, গুরুর শিক্ষা ছাত্রের কাজে লাগিতেছে কিন্তু সংসারজ্ঞান নিজের জীবনে ব্যবহার করিতে তিনি বালকের ন্যায় অপটু। তাহার

কারণ, নির্লিপ্তভাবে বাহির হইতে বিদ্যা শিখিলে বিদ্যাটা ভাল করিয়া পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বদা কাজের মধ্যে লিপ্ত হইয়া না থাকিলে তাহার প্রয়োগ শিক্ষা হয় না। সেই জন্য পুরাকালে ব্রাহ্মণ ছিলেন মন্ত্রী, কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজা তাঁহার মন্ত্রনা কাজে প্রয়োগ করিতেন। ব্রাহ্মণকে রাজাসনে বসাইয়া দিলে ব্রাহ্মণও অগাধ জলে পড়িত এবং রাজ্যকেও অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিত।

তোমরা যে সকল কথা তুলিয়াছিলে সে গুলা বড় বেশি সাধারণ কথা। মনে কর যদি বলা যায়, রামায়ণের তাৎপর্য্য এই যে, রাজার গৃহে জন্মিয়াও অনেকে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, অথবা শকুন্তলার তাৎপর্য্য এই যে, উপযুক্ত অবসরে স্ত্রী পুরুষের চিত্তে পরস্পরের প্রতি প্রেমের সঞ্চার হওয়া অসম্ভব নহে তবে সেটাকে একটা নূতন শিক্ষা বা বিশেষ বার্ত্তা বলা যায় না।

স্রোতস্বিনী কিঞ্চিৎ ইতস্তত করিয়া কহিল—আমার ত মনে হয় সেই সকল সাধারণ কথাই কবিতার কথা। রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও সর্ব্বপ্রকার সুখের সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমৃত্যুকাল অসীম দুঃখ রাম ও সীতাকে সঙ্কট হইতে সঙ্কটান্তরে ব্যাধের ন্যায় অনুসরণ করিয়া ফিরিয়াছে; সংসারের এই অত্যন্ত সম্ভবপর, মানবাদৃষ্টের এই অত্যন্ত পুরাতন দুঃখ কাহিনীতেই পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট এবং আর্দ্র হইয়াছে। শকুন্তলার প্রেমদৃশ্যের মধ্যে বাস্তবিকই কোন নূতন শিক্ষা বা বিশেষ বার্ত্তা নাই কেবল এই নিরতিশয় প্রাচীন এবং সাধারণ কথাটি আছে যে, শুভ অথবা অশুভ অবসরে প্রেম অলক্ষিতে অনিবার্য্যবেগে আসিয়া দৃঢ়বন্ধনে স্ত্রী পুরুষের হৃদয় এক করিয়া দেয়। এই অত্যন্ত সাধারণ কথা থাকাতেই সর্ব্বসাধারণে উহার রসভোগ করিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের বিশেষ অর্থ এই যে, মৃত্যু এই জীবজন্তুতরু-

লতাতৃণাচ্ছাদিত বসুমতীর বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছে কিন্তু বিধাতার আশীর্ব্বাদে কোনকালে তাহার বসনাঞ্চলের অন্ত হইতেছে না, চিরদিনই সে প্রাণময় সৌন্দর্য্যময় নববস্ত্রে ভূষিত থাকিতেছে। কিন্তু সভাপর্ব্বে যেখানে আমাদের হৃৎপিণ্ডের রক্ত তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং অবশেষে সঙ্কটাপন্ন ভক্তের প্রতি দেবতার কৃপায় দুই চক্ষু অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়াছিল সে কি এই নূতন এবং বিশেষ অর্থ গ্রহণ করিয়া? না,অত্যাচারপীড়িতা রমণীর লজ্জা ও সেই লজ্জা-নিবারণ, নামক অত্যন্ত সাধারণ, স্বাভাবিক এবং পুরাতন কথায়? কচদেবযানীসংবাদেও মানবহৃদয়ের এক অতি চিরন্তন এবং সাধারণ বিষাদ কাহিনী বিবৃত আছে সেটাকে যাঁহারা অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন এবং বিশেষ তত্ত্বকেই প্রাধান্য দেন তাঁহারা কাব্যরসের অধিকারী নহেন।

সমীরণ হাসিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন- শ্রীমতী স্রোতস্বিনী আমাদিগকে কাব্যরসের অধিকারসীমা হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন এক্ষণে স্বয়ং কবি কি বিচার করেন একবার শুনা যাক্।

স্রোতস্বিনী অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া বারম্বার এই অপবাদের প্রতিবাদ করিলেন।

আমি কহিলাম,—এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যখন কবিতাটা লিখিতে বসিয়াছিলাম তখন কোন অর্থই মাথায় ছিল না, তোমাদের কল্যাণ এখন দেখিতেছি লেখাটা বড় নিরর্থক হয় নাই— অর্থ অভিধানে কুলাইয়া উঠিতেছে না। কাব্যের ঐকটা গুণ এই যে, কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয় তখন স্ব স্ব প্রকৃতিঅনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য্য, কেহবা নীতি, কেহবা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন। এ যেন আতসবাজিতে আগুন

ধরাইয়া দেওয়া—কাব্য সেই অগ্নিশিখা, পাঠকদের মন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আতসবাজি। আগুন ধরিবামাত্র কেহবা হাউয়ের মত একেবারে আকাশে উড়িয়া যায়, কেহবা তুবড়ির মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কেহবা বোমার মত আওয়াজ করিতে থাকে। তথাপি মোটের উপরে শ্রীমতী স্রোতস্বিনীর সহিত আমার মতবিরোধ দেখিতেছি না। অনেকে বলেন, আঁঠিই ফলের প্রধান অংশ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা তাহার প্রমাণ করাও যায়। কিন্তু তথাপি অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তি ফলের শস্যটি খাইয়া তাহার আঁঠি ফেলিয়া দেন। তেমনি কোন কাব্যের মধ্যে যদিবা কোন বিশেষ শিক্ষা থাকে, তথাপি কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি তাহার রসপূর্ণ কাব্যাংশ-টুকু লইয়া শিক্ষাংশটুকু ফেলিয়া দিলে কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা আগ্রহসহকারে কেবল ঐ শিক্ষাংশটুকুই বাহির করিতে চাহেন আশীর্ব্বাদ করি তাঁহারাও সফল হউন এবং সুখে থাকুন। আনন্দ কাহাকেও বলপূর্ব্বক দেওয়া যায় না। কুসুম্ভফুল হইতে কেহবা তাহার রং বাহির করে, কেহবা তৈলের জন্য তাহার বীজ বাহির করে, কেহ বা মুগ্ধনেত্রে তাহার শোভা দেখে। কাব্য হইতে কেহবা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহবা দর্শন উদ্ঘাটন করেন, কেহবা নীতি, কেহবা বিষয় জ্ঞান—আবার কেহবা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না—যিনি যাহা পাইলেন তাহাই লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিতে পারেন—কাহারও সহিত বিরোধের আবশ্যক দেখি না—বিরোধে ফলও নাই!

কেরাণী।

(১)

খেটে খেটে খেটে ;—

সারাদিন আপিসে কাগজ 'পত্তর' ঘেঁটে,—

লিখে লিখে ব্যথা হোল আঙ্গুলগুলোর গিঁটে ;

যেন এক হোয়ে গেল মাজায়, ঘাড়ে, পীঠে ;

পায়ে ধর্‌ল বাত ;

অসাড় হোল হাত ;

ঘুরে গেল মাথা, বসে সকাল থেকে রাত ;

কোথা সেই ১১ কোথা সেই ৬টা,—

শরীর হোল আগুণ ; মেজাজ হোল চটা।

(২)

খেটে খেটে খেটে ;—

তাড়াতাড়ি খেয়ে চারটি, চাদর চাপকান এঁটে ;

গেলাম সেই আপিসে একটু না থেমে,

ওচট্ আর ধূলো খেয়ে, দুপর রোদে ঘেমে ;

হুঁকো টেনে ক'সে,

ভাঙ্গা 'চ্যারে' ব'সে,

মণ খানিক কাগজে কলম ঘ'সে ঘ'সে—

মাথায় বেরোল ঘাম ; ঠোঁটে লাগ্‌ল কালি ;

গোঁফ গেল ঝুলে, খেয়ে সাহেবের গালি।

(৩)

খেটে খেটে খেটে ;

আসি রোজ রোজ শ্বেত পদযুগ চেটে ;—

কালো মূর্ত্তি দেখিলেই সাহেব যায় ক্ষেপে ;
গোরামুখ দেখিলেই প্রাণ উঠে কেঁপে ;
তার একটি তাড়ায়,
যেন ভূত ঝাড়ায় ;
ইচ্ছা হয়, চ'লে যাই ছেড়ে এই পাড়ায় ;
স্ত্রীর উপর হয় রাগ, জীবনে হয় ঘৃণা ;
সংসার হয় অসহ্য—গুড়গুড়ি বিনা।

(৪)

খেটে খেটে খেটে ;
ক্লান্ত দেহে এলাম যদি ক্রোশখানিক হেঁটে,—
গাড়ুতে নাই জল ; গামছা গ্যাছে হারিয়ে ;
ছুতর আজো চারপায়খানা দেয়নিক সারিয়ে ;
ধুতি গেছে উড়ে ;
দিয়েছে কে ছুঁড়ে
একপাট চটি বিছানায়, একপাট' আঁস্তাকুড়ে ;
বিশু গ্যাছে বাজারে ; ঘুমোয় রামা কুঁড়ে ;
বামুন দিয়েছে ঝির সঙ্গে মহাতর্ক জুড়ে।

(৫)

খেটে খেটে খেটে ;
ক্ষুধায় যেন দাবানল জ্বলে যায় পেটে ;
বাহিরের অবস্থাটা শোচনীয় দেখে,
এলাম যদি বাড়ির মধ্যে চাপকান বাইরে রেখে,
খেতে খেতে খাবি,
জলখাবার ভাবি ;
—সব ফক্কিকার—গিন্নির হারিয়ে গ্যাছে চাবি ;

—আসে নাই সন্দেশ ; দুধ ফেলে দিয়েছে মেয়ে ;
গ্যাছে সব রুটিগুলো কুকুরেতে খেয়ে।

(৬)

খেটে খেটে খেটে ;
—বলিতে দুঃখের কথা বুক যায় ফেটে—
চাইলাম অন্ন ত গিন্নী এলেন তেড়ে,
তাঁর সুদর্শন চক্র, স্বর্ণনথ নেড়ে ;—
"সারাদিন থাটি,
শরীর কোরে মাটি,
পোড়ার মুখো, কাহিল হোলাম যেন একটি কাটি ;
ছেলে কোলে বেড়িয়ে বেড়িয়ে ফুলে গেল পা টা ;
তবু বলে 'শুয়ে আছ' নিয়ে আয় ত ঝাঁটা।"

(৭)

খেটে খেটে খেটে ;—
মাথায় ধুলো, দেহে ঘর্ম্ম, দাবানল পেটে,—
এলাম তখন প্রিয়া, শচী, ইন্দ্রালয় ছাড়ি,
একবারে বাহিরেতে সটাং দিয়ে পাড়ি ;
—হায়রে অধর্ম্ম
ছেড়ে সব কর্ম্ম,
যাঁর গয়না দিতে দিতে বেরিয়ে যায় ঘর্ম্ম,
সেই ধায় ঝাঁটা নিয়ে বোলে 'পোড়ার মুখো' ;
—কলিকাল।—অরে রামা নিয়ে আয়ত হুঁকো।

(৮)

খেটে খেটে খেটে,—
এলাম যদি খেয়ে স্ত্রীর ঝাঁটা 'কড়ামিঠে'—

কোণেতে জড়ান দেখি তক্তাপোষের পাটি ;
ফরাসের সতরঞ্চে এককোমর মাটি ;
পুত্রবর গিয়ে
হুঁকোটি নিয়ে,
ভেঙ্গে সেটি, কালি মেখে, কক্ষে ফেলে দিয়ে,
ঘুনসি পোরে তাকিয়ায় করিছেন নৃত্য ;—
ঘুমোচ্ছেন পার্শ্বে তাঁর রামকান্ত ভৃত্য।

(৯)

খেটে খেটে খেটে,—
খেলাম চারটি ছোলা আর দুটো আঁব কেটে ;
চিবিয়ে একটি পান—আর হোলে তামাক সাজা,
দিলাম তিন টান, তখন ভাব্‌লাম 'আমি রাজা'।
রামাকে দিয়ে তাড়া
প্রদীপ কোল্লেম খাড়া
ডেস্কোর উপর ; আর তখন ফরাস হোলে ঝাড়া,
বোস্‌লেম তার উপরে পেতে একটি পাটি ;
তবলা নিয়ে ধাঁই কোরে দিলাম তিন চাটী।

(১০)

খেটে খেটে খেটে ;—
এলে কয়টী এয়ার তিন চা'র পাড়া ঝেঁটে,
ত্রিশ বাজি তাস আর তিন বাজি পাশা,
খেলে, উঠে হোল খেতে বাড়ির মধ্যে আসা ;
—রাঁধুনীর গুণ—
ডালে ঘোর নুন
মুখ গেল পুড়ে—পানে ভয়ঙ্কর চুণ,—

রাঁধুনীকে বোকে, গিন্নীর উপর রেগে,
চলিলাম শয়নের ইন্দ্রালয়ে বেগে।

(১১)

খেটে খেটে খেটে,
চলিলাম ক্রুদ্ধ যদি অন্নপূর্ণা-ভেটে,
অন্নপূর্ণার বিমুদিত ইন্দাবর আঁখি ;
বুঝিলাম তখনই গিন্নীর সব ফাঁকি ;—
গোঁফে দিয়ে চাড়া,
নথে দিলাম নাড়া ;
গিন্নী তখনি উঠিলেন হোয়ে ঠিক খাড়া ;
—বেধে গেল যুদ্ধ ; হোল বরিষণ প্রীতি-
পূর্ণ বহু ভাষা ; পড়্‌ল ঘুমের দফায় ইতি।

(১২)

"খেটে খেটে খেটে"
বোল্লেন গিন্নী "কড়া পড়্‌ল হাতে বাট্‌না বেঁটে—
গায়ে হোল বাত, চুল গেল উঠে
মেয়ে কোলে কোরে কোরে ;—আমি কি তোর মুটে ?
—হায় কোন্ পাপে
হতচ্ছারা কাপে
কুলীনের মেয়েকে বিয়ে দিল বাপে ?
তার উপর আবার চোপা ; আমার উপর আবার চটা ;
নিয়ে আয়না আন্‌তে পারিস্ আমার মত কর্টা ?

(১৩)

"খেটে খেটে খেটে
হলাম কি দ্যাখ্ নির্লজ্জ, পাষণ্ড, বোম্বেটে।"

দৌড়ল রসনা গিন্নীর দ্রুত ও সটাং,
আর আমার মেজাজটি ছিল সে দিন চটাং;
আর অভ্যাস দুবেলা
বাজিয়ে বাজিয়ে তবলা,
সব সময় জ্ঞান থাকে না তবলা কি অবলা;
বিনা বহু বাক্যব্যয়ে,—অতি পরিপাটি
ঠিক গিন্নীর বাঁ মাথায় দিলাম এক চাঁটী।

(১৪)

খেটে খেটে খেটে
হয় গিন্নী ছিলেন কিছু কাবু; নয় ফেটে
কিম্বা ছিঁড়ে গেল কোন শিরা কিম্বা ধমনী;
তাহা ঠিক জানি না; কিন্তু জানি, অমনি
গিন্নী সেই চড়ে,
সটাং গেলেন প'ড়ে,
মূর্চ্ছা; যেন তাল গাছ আশ্বিনের ঝড়ে;
আর হোল যখন জ্ঞান, এমন বদ্‌লে গেল তাঁর
সেই কড়া মেজাজ—যে সে অতি চমৎকার।

(১৫)

খেটে খেটে খেটে—
হাড় হোল মাটি; ঘর হোল মেটে;
শয্যা হোল তক্তাপোষ; না খেয়ে না দেয়ে,
বিব্রত নিয়ে তিন আইবুড় মেয়ে;
বেছে বুড় বরে
কুলীনের ঘরে
দিলাম বিয়ে যত্ন, ব্যয়, পরিশ্রম কোরে;

স্ত্রী হোলেন গত্নাসু, শোকতপ্ত অমনি—
আমি কোল্লাম বিয়ে এক ন বর্ষীয়া রমণী।

(১৬)

খেটে খেটে খেটে—
হ'য়ে গেলাম ঘোরতর কাহিল ও বেঁটে ;—
প'ড়ে গেল কপালে বড় বড় রেখা ;
কাণে যায় না শোনা ; চোখে যায় না দেখা ;
চল্লিশ বছর থেকেই
চুল গেল পেকে ;
মাংস গেল ঝুলে ; শরীর গেল বেঁকে ;
দাঁত হোল জীর্ণ ; ভুঁড়ি গেল থেমে ;
চিবুক গেল উঠে, নাক গেল নেমে।

(১৭)

খেটে খেটে খেটে—
দিন গেল মাস গেল, বর্ষ গেল কেটে—
স্ত্রীর, মেয়ের ভাবনায় বাঙ্গালী বাবু
খেটে, খেটে, না খেয়ে চল্লিশেই কাবু ;—
ক্রমে ও ক্রমে,
রক্ত গেল জমে,
শীর্ণ হোল দেহ ; জোর গেল কমে ;
মাথাটা বসে না যেন ভাল আর ঘাড়ে ;
মাংসে ধর্‌ল ছাতা, ঘুন ধর্‌ল হাড়ে।

(১৮)

খেটে খেটে খেটে
যে কদিন বাকি আছে তাও যাবে কেটে ;

বিধাতার আদালতে পরকালে গিয়ে,
উত্তর দেবার আছে—"দিইছি তিন মেয়ের বিয়ে;
তাহাই আমার ধর্ম্ম,
তাহাই আমার কর্ম্ম,
বিয়ে দিতে দিতে প্রায় কেটে গ্যাছে জন্ম;
আর, নিজে দুই বিয়ে কোরে ফুরিয়ে গ্যাল 'প্রমায়';
আর কিছু করিবারে পাইনিক সময়"।

ফুলজানি *।

সহরে বিচিত্র জটিল ঘটনা, লোকজনের গতিবিধি, গাড়ি ঘোড়া কলকারখানায় সমস্ত মানুষ ছোট হইয়া যায়। মানুষ স্বরচিত শিল্পে, স্বপ্রবর্ত্তিত ইতিহাসে, এবং স্বকণ্ঠোচ্ছ্বসিত কোলাহলে আপনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সহরে কে বাঁচিল কে মরিল,কে খাইল কে না খাইল তাহার খবর কেহ রাখে না—সেখানে বড় লাট ছোট লাটের কীর্ত্তি, চীনে জাপানে লড়াই, অথবা একটা অসামান্য ঘটনা নহিলে সর্ব্বসাধারণের কানেই উঠিতে পারে না।

কিন্তু পল্লিগ্রামে ছোট বড় সকল মানুষ এবং মনুষ্যজীবনের প্রতি দিন প্রতি মুহূর্ত্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠে; এমন কি, নদীনালা পুষ্করিণী মাঠঘাট পশুপক্ষী রৌদ্র বৃষ্টি সকাল বিকাল সমস্তই বিশেষ রূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেখানকার লোকালয়ে সুখদুঃখের সামান্যতম লহরীলীলা পর্য্যন্ত গণনার বিষয় হয়, এবং প্রকৃতির

* ফুলজানি। শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা।

মুখশ্রীর সমস্ত ছায়ালোকসম্পাত একটি ক্ষুদ্র দিগন্তসীমার মধ্যে মহৎ প্রাধান্য লাভ করে।

উপন্যাসের মধ্যেও সেইরূপ সহর-পল্লিগ্রামের প্রভেদ আছে। কোনও উপন্যাসে অসাধারণ মানবপ্রকৃতি, জটিল ঘটনাবলী, এবং প্রচণ্ড হৃদয়বৃত্তির সংঘর্ষ বর্ণিত হইয়া থাকে - সেখানে সাধারণ মনুষ্যের প্রাত্যহিক সুখ দুঃখ অণুআকারে দৃষ্টির অতীত হইয়া যায়; আবার কোনও উপন্যাস উন্মত্ত ঘটনাবর্ত্তের কোলাহল হইতে, উত্তুঙ্গ কীর্ত্তিস্তম্ভমালার দিগন্তপ্রসারিত ছায়া হইতে, ঘনজনতা-বন্যার সর্ব্বগ্রাসী প্রলয়বেগ হইতে বহুদূরে ধূলিশূন্য নির্ম্মল নীলাকাশ-তলে, শস্যপূর্ণ শ্যামল প্রান্তরপ্রান্তে ছায়াময় বিহঙ্গকূজিত নিভৃত গ্রামের মধ্যে আপন রঙ্গভূমি স্থাপন করে যেখানে মানবসাধারণের সকল কথাই কানে আসিয়া প্রবেশ করে এবং সকল সুখ দুঃখই মমতা আকর্ষণ করিয়া আনে।

শ্রীশ বাবুর ফুলজানি এই শেষোক্ত শ্রেণীর উপন্যাস। ইহার স্বচ্ছতা, সরলতা, ইহার ঘটনার বিরলতাই ইহার প্রধান সৌন্দর্য্য। এবং, পল্লীর বাগানের উপর প্রভাতের স্নিগ্ধ সূর্য্যকিরণ যেমন করিয়া পড়ে; কোথাও বা চিকণ পাতার উপরে ঝিক্‌ঝিক্ করিয়া উঠে, কোথাও বা পাতার ছিদ্র বাহিয়া অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে চুমকি বসাইয়া দেয়, কোথাও বা জীর্ণ গোয়ালঘরের প্রাঙ্গণের মধ্যে পড়িয়া মলিনতাকে ভূষিত করিতে চেষ্টা করে, কোথাও বা ঘন-ছায়াবেষ্টিত দীর্ঘিকাজলের একটি মাত্র প্রান্তে নিকষের উপর সোনার রেখা কষিয়া দেয়; - তেমনি এই উপন্যাসের ইতস্ততঃ যেখানে একটু অবকাশ পাইয়াছে সেইখানেই লেখকের একটি নির্ম্মল স্নিগ্ধহাস্য সকৌতুকে প্রবেশ করিয়া সমস্ত লোকালয় দৃশ্য-টিকে উজ্জ্বলতায় অঙ্কিত করিয়াছে।

শ্রীশ বাবু আমাদিগকে বাঙ্গলাদেশের যে একটি পল্লীতে লইয়া গিয়াছেন সেখানে আমরা সকলের সকল খবর রাখিতে চাই, সকল লোকের সহিত আলাপ করিতে চাই, বিশ্রব্ধভাবে সকল স্থানে প্রবেশ করিতে চাই, তদপেক্ষা গুরুতর কিছুই প্রত্যাশা করি না। আমরা অভ্রভেদী এমন একটা কিছু ব্যাপার চাহি না যাহাতে আর সকলকেই তুচ্ছ করিয়া দেয়, যাহাতে একটি বিস্তীর্ণ শান্তিময় শ্যামল সমগ্রতাকে বিদীর্ণ ও খর্ব্ব করিয়া ফেলে। এখানে সুগুনির মা এবং নিস্তারিণী, ফমুসেখ এবং নায়েব মহাশয় সকলেই আমাদের প্রতিবেশী—পরস্পরের মধ্যে ছোট বড় ভেদ যতই থাক্, তথাপি সকলেরই ঘরের কথা আমাদের জিজ্ঞাস্য, প্রতিদিনের সংবাদ আমাদের আলোচ্য বিষয়। এরূপ উপন্যাস সুপরিরিচিত স্থানের ন্যায় আমাদের মনের পক্ষে অত্যন্ত বিরামদায়ক; এখানে অপ্রত্যাশিত কিছু নাই, মনকে কিছুতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয় না, প্রত্যেক পদক্ষেপে এক একটা দুরূহ সমস্যা জাগ্রত হইয়া উঠে না, সৌন্দর্য্যরস এত সহজে সম্ভোগ করা যায় যে, তাহার জন্য কোনরূপ কৃত্রিম মালমসলার আবশ্যক করে না।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থকার নিজের প্রতিভায় নিজে সন্তুষ্ট নহেন; তিনি আপনাকে আপনি অতিক্রম করিতে চেষ্টা করেন। অরসিকদের. চক্ষে যাহা সহজ তাহা তুচ্ছ; গ্রন্থকার ক্ষমতাশালী লেখক হইয়াও সেই অরসিকমণ্ডলীর নিকট প্রতিপত্তির প্রলোভনটুকু কাটাইতে পারেন নাই। তিনি হঠাৎ এক সময় আপন প্রতিভার স্বাভাবিক গতিকে বলপূর্ব্বক প্রতিহত করিয়া তাহাকে অসাধারণ চরিত্র ও রোমহর্ষণ ঘটনাবলীর মধ্যে অসহায়ভাবে নিক্ষেপ করিয়াছেন। পরিচিত সহজ সৌন্দর্য্যের সহিত সুন্দরভাবে সহজে পরিচয় সাধন করাইয়া দেওয়া অসামান্য

ক্ষমতার কাজ; বাঙ্গালার লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীশ বাবুর সেই অসামান্য ক্ষমতাটি আছে,কিন্তু তিনি তদপেক্ষা আরও অধিক ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া পাঠককে চমৎকৃত করিতে চাহেন,এবং সেই কাজ করিতে গিয়া নিজের প্রতিভার মধ্যে অনর্থক একটা আত্মবিরোধ বাধাইয়া বসেন। প্রতিভাবহির্গামী এই দুরাশায় তাঁহার প্রথম রচিত উপন্যাস "শক্তিকাননে"র মাঝখানে দাবানল জ্বালাইয়া ছারখার করিয়া দিয়াছে, এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ "ফুলজানি"রও একটি প্রান্তভাগে তাহার একটি শিখা আপন প্রলয়রসনা বিস্তার করিয়াছে—সৌভাগ্যক্রমে সম্পূর্ণ গ্রাস করিতে পারে নাই।

সার্ব্বভৌম মহাশয়ের মেয়েটির নাম কালী, তাঁহার স্বভাবটি যেমন মিষ্ট তেমনি দুষ্ট তেমনি স্বাভাবিক; গ্রন্থের নায়িকা ফুলকুমারীর প্রতি তাহার যে সুদৃঢ় ভালবাসা সেও বড় স্বাভাবিক; কারণ, ফুল নিতান্ত নিরুপায় ভীরুস্বভাব—এত অধিক নির্জ্জীব, যে, পাঠকের হৃদয়াকর্ষণে সে সম্পূর্ণ সক্ষম নহে;—কিন্তু এইরূপ নির্ভরপরায়ণ সামর্থ্যহীনের জন্যই বলিষ্ঠ তেজস্বীস্বভাব আপনাকে একান্ত বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। ফুলকুমারী যদিও গ্রন্থের নায়িকা, কিন্তু তাহাকে একটি শূন্যপটের মত অবলম্বন করিয়া তাহার উপরে গ্রন্থকার কালীকেই অঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছেন। এই সামান্য পল্লীর কালো মেয়েটি অসাধারণ হয় নাই কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে কখন্ যে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে তাহা জানিতেও পারা যায় না। বোসেদের ফুলবাগানের মধ্যে, তালপুকুরের ধারে এই দুটি ক্ষুদ্র বালিকার সখীত্ব আমরা সস্নেহে সানন্দে নিরীক্ষণ করিতেছিলাম; তাহার মধ্যে পাঠশালার ছেলেদের দৌরাত্ম্যকোলাহল, বালকবিদ্বেষী উত্যক্ত বাগ্দি বুড়ির অভিশাপমন্ত্র, মধ্যাহ্নে পক্ষীনীড়লুণ্ঠক ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক আন্দোলিত ঘন আম্রবনের ছায়া এবং নিভৃত দীর্ঘিকার সন্তরণাকুল

অগাধশীতল জলের তরঙ্গভঙ্গ মিশ্রিত হইয়া একটি মনোহর সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছিল। আমরা পাঠকবর্গ ইহাতেই সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলাম, ইহার অধিক আর কিছুই প্রার্থনা করি নাই, এমন সময় হরিশপুর পল্লীর সেই স্নিগ্ধ আম্রবনচ্ছায়ার মধ্যে একটুখানি অলৌকিকের ছায়া আসিয়া পড়িল। ফুল স্বপ্নে দেখিল যে, তাহার আসন্ন বিবাহ শুভ হইবে না, এবং বাগ্‌দি বুড়ির মুখেও যেন সেই অভিশাপ শুনিতে পাইল, এবং বটবৃক্ষের শাখা হইতেও সেই অভিশাপ ধ্বনিত হইতে লাগিল। তখনই বুঝিলাম, ফুলকুমারীর বিবাহও সুখের হইবে না, এবং পাঠকের কাব্যরসসম্ভোগের আনন্দেও অভিশাপ লাগিয়াছে। কিছুকাল পরে ফুলকুমারীও তাহার দুঃস্বপ্ন ভুলিয়া গেল পাঠকও পুনশ্চ ক্ষুদ্র পল্লীর লোকসমাজে প্রবেশ করিয়া ভুলিয়া গেলেন যে তাঁহার একটা ফাঁড়া আছে।

সেখানে প্রবেশ করিয়া নায়েব মহেশ্বর ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শান্তিসৌন্দর্য্যময় পল্লিটির মধ্যে ইনিই রুদ্ররসের অবতারণা করিয়াছেন। রৌদ্রীশক্তিতে গৃহিণী জগদ্ধাত্রী আবার স্বামীকেও অভিভূত করিয়াছেন। দেখিয়া মনে হয়, যে, প্রজাবর্গ, অসহায় হস্তীর ন্যায়, পড়িয়া আছে; নায়েব, সিংহের ন্যায়, তাহাদের স্কন্ধের উপর চড়িয়া রুধির শোষণ করিতেছেন, এবং গৃহিণী জগদ্ধাত্রী, দেবী জগদ্ধাত্রীর ন্যায়, এই প্রচণ্ড সিংহের স্কন্ধে পা রাখিয়া বসিয়া আছেন।

ছেলেটির নাম পুরন্দর। যদিচ তিনিই এই গ্রন্থের নায়ক, তথাপি সাধারণ ছেলের মত পাঠশালা হইতে পলায়ন করিয়া থাকেন, বট গাছে চড়িয়া কাঁকের ছানা পাড়িয়া আমোদ অনুভব করেন, গাছের ডাল হইতে ঝুপ্ করিয়া দিঘির জলের মধ্যে পড়িয়া

ফুৎকারে আকাশে জলক্ষেপ করিতে করিতে চিৎসাঁতার কাটেন—দেখিয়া আমাদের বড় আশা হইয়াছিল পাঠকের কপালগুণে ছেলেটি আর যাহাই হৌক্ অসাধারণ হইবে না। কিন্তু "আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায় তাই ভাবি মনে!" কিন্তু সে কথা পরে হইবে।

শান্ত, মধুর অথচ সুদৃঢ়স্বভাব নিস্তারিণীর চরিত্র সুন্দর অঙ্কিত হইয়াছে। এই নিস্তারিণীর কন্যা ফুলকুমারীর সহিত যথাকালে নায়েব মহাশয়ের পুত্র পুরন্দরের বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু নায়েব মহাশয় এবং তাঁহার স্ত্রী জগদ্ধাত্রী তাঁহাদের বেহাইনের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। বিবাহের পর উভয় বৈবাহিক পক্ষে ছোট-খাট পল্লীযুদ্ধ চলিতে লাগিল। নায়েব মহাশয় পুত্র পুরন্দরকে, তাঁহার বেহাইনের প্রভাব হইতে দূরে রাখিবার জন্য, সঙ্গে করিয়া আপন কর্ম্মস্থানে লইয়া গেলেন।

এইখানে আসিয়া মৌলভির নিকট হাফেজ পড়িয়া এবং পণ্ডি-তের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া পুরন্দর একটা নূতনতর মানুষ হইয়া উঠিল। মানুষের পরিবর্ত্তন কিছুই অসম্ভব নহে এবং পুরন্দরের স্বভাবে পরিবর্ত্তনের প্রচুর কারণও ছিল। কিন্তু আমরা যে গ্রাম-দৃশ্য, যে সরল লোকসমাজ, যে অনতিতরঙ্গিত ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে এতক্ষণ যাপন করিতেছিলাম নূতনীকৃত পুরন্দর তাহাকে যেন অত্যন্ত অতিক্রম করিবার উপক্রম করিল। পুরন্দর ভাল ছেলে হউক্ সে ভাল; তাহার দানধ্যানে মতি হউক্, হরিনামে প্রীতি হউক্, শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি এবং হাফেজে অনুরাগ বাড়িতে থাক্, আমাদের দেশে সচরাচর যেরূপ ভাবে অনেক লোকের মনে সং-সারবৈরাগ্য উদয় হইয়া থাকে পুরন্দরের হৃদয়েও সেইরূপ বৈরা-গ্যের সঞ্চার হউক্ তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই কিন্তু তাহার

বেশি কিছু হইতে গেলে তাহাকে আর সহ্য করা যায় না। কারণ, ফুলজানি উপন্যাসকে সম্পূর্ণতা দেওয়াই পুরন্দরচরিত্রের একমাত্র সার্থকতা। অসাধারণ মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে গিয়া যদি তিনি উপন্যাস নষ্ট করেন তবে আমরা তাঁহাকে মার্জ্জনা করিতে পারিব না। প্রথম পরিচ্ছেদের আরম্ভ হইতে ফুলজানিতে যে এক স্বচ্ছ সুন্দর সারল্যস্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল পুরন্দর হঠাৎ অসাধারণ উচ্চ হইয়া উঠিয়া তাহাকেই প্রতিহত করিয়া দিয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা পুরন্দর সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল তাহার গতি এবং প্রকৃতি বিষাদের দিকে। মানুষ সংসারে, যে কারণেই হউক, দুঃখকষ্ট সহিতে আসিয়াছে, এই রকম তাহার মনের ভাব। আত্মজীবনের একটা লক্ষ্য তাহার তখনও স্থির হয় নাই কিন্তু আপনার বিষয়ে ভাবিতে বসিলেই তাহার মনে হইত, অতিঘোর আঁধারে তাহার ভবিষ্যৎ সমাচ্ছন্ন। মনের এই অবস্থায় আনন্দের ভিতরেও সে মনশ্চক্ষে দেখিত, যে কেহ তাহার সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট সকলেরই জীবন অল্প-বিস্তর দুঃখযন্ত্রণাময়।" পুরন্দরের এই অনাসৃষ্টি দুঃখভাবের গূঢ়-কারণ অনতিপরেই একটি ঘটনায় প্রকাশ পাইয়াছে। একদা তিনি এবং তাঁহার বন্ধু ব্রজ বেড়াইতে গিয়া দেখিলেন, গঙ্গাতীরের এক শালিকের কোটরের নিকট এক বিষধর সাপের সহিত শুক-দম্পতির যুদ্ধ চলিতেছে। সেই পক্ষীদের নিরীহ শাবকগুলি এখনি সর্পের কবলস্থ হইবে মনে করিয়া পুরন্দরের চক্ষে এক ফোঁটা জল আসিল। তাহার সঙ্গী ব্রজ অসাধারণ বালক নহে এই জন্য সে এক ফোঁটা জল না ফেলিয়া এক খণ্ড লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিল। তাহাতে অধিক কাজ হইল, আহত সর্পটা জলে পড়িয়া গেল। ব্রজ পুনশ্চ তাহার প্রতি লোষ্ট্রবর্ষণ করাতে পুরন্দর তাহা সহিতে

পারিল না, বারণ করিল। "সে ভাবিতেছিল খাদ্যখাদকের, অহি-নকুলের যে বিষম বিদ্বেষ ভাব, ইহার জন্য কে দায়ী? ভগবানের সংসার প্রেমময় না হইয়া কেন এমন হিংসাদ্বেষসঙ্কুল হইল?" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল বক্তৃতা শুনিয়া "ব্রজ সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না, কিন্তু তাহার প্রিয় সুহৃদের হৃদয়ে ব্যথা কোন্ খানে, বুঝিতে পারিল। বুঝিল, পুরনের দুঃখ ব্যক্তিগত নহে।"

টার্পিন্‌তেল মালিশ করিলে যে সকল ব্যথা সারে, অভাব মোচন হইলে যে সকল দুঃখ দূর হয় উপস্থিতক্ষেত্রে সেই সকল ব্যথা এবং সেই সকল দুঃখই ভাল। প্রচলিত প্রবাদে গরীবের ছেলের ঘোড়ারোগকে যেরূপ অনর্থের হেতু বলিয়াছে, বাঙ্গলা দেশীয় পল্লির ছেলের এ সকল বড় বড় ব্যথা এবং উঁচুদরের দুঃখও সেইরূপ সর্ব্বনাশের কারণ।

পুরন্দরের পিতা পুরন্দরকে লইয়া বাড়ি ফিরিবার সময় পথি-মধ্যে অসন্তুষ্ট প্রজাগণকর্ত্তৃক নিহত হইলেন, তাঁহার স্ত্রী জগদ্ধাত্রী সহমৃতা হইলেন। পুরন্দর এই আঘাতে পীড়িত হইয়া বাড়ি গেলেন সেখানে তাঁহার স্ত্রীর শুশ্রূষায় জীবন লাভ করিলেন, এবং তাঁহা-দিগকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া বিধবা নিস্তারিণী শ্রীক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন।

এইখানে গ্রন্থ শেষ হইল কিন্তু গ্রন্থকার ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি আবার শেষকে নিঃশেষ করিতে বসিলেন। অকস্মাৎ একদল যবন এবং যবনী মিলিয়া কালী ও ফুলকে চুরি করিয়া লইয়া গেল—কালী জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মরিল—ফুল সিরাজউদ্দৌলার অন্তঃ-পুরে প্রবেশ করিল,—পুরন্দর তাহাকে উদ্ধার করিতে গেল এবং উভয়ে ঘাতকহস্তে বিনষ্ট হইল।

এ সমস্ত কেন? আগাগোড়া গল্পের সহিত ইহার কি যোগ? প্রথম হইতে এমন কি সকল অনিবার্য্য কারণ একত্র হইয়াছিল যাহাতে গ্রন্থের এই বিচিত্র পরিণাম অবশ্যম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রন্থকার যদি বলিতেন গ্রামে হঠাৎ একটা মড়ক হইল এবং সকলেই মরিয়া গেল তবে কাব্যহিসাবে তাহার সহিত ইহার প্রভেদ কি? ১৬৬ পাতায় বইখানি সমাপ্ত—১২২ পাতায় নিস্তারিণী তীর্থে গেলেন। তাহার পর ৪৪টি পত্রে গ্রন্থকার হঠাৎ একটা সম্পূর্ণ নূতন কাণ্ড ঘটাইয়া পাঠকগণকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে ইহার কোন সূত্রপাত ছিল না, ফুলকুমারীর চরিত্রের সঙ্গেও ইহার কোন যোগ ছিল না। এতক্ষণ গ্রন্থকার ১২২ পৃষ্ঠায় যে একটি সুন্দর সরল সমগ্র কাব্যটি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসবশতঃ শেষের ৪৪ পৃষ্ঠায় অতি সংক্ষেপে একটি আকস্মিক বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। আমরা শকুন্তলার তপোবনচারীর ন্যায় দুই হস্ত উদ্যত করিয়া বলিতেছি—

> নখলু নখলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্
> মৃদুনি মৃগশরীরে পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ।
> ক্ববত হরিণকানাং জীবিতঞ্চাতিলোলং
> ক্বচ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে!

বুদ্ধের সিদ্ধিলাভ।

নৈরঞ্জনা নদীতীরে একটি শালবন ছিল। সিদ্ধার্থ সমস্ত দিবস সেই বনের শীতল ছায়া সম্ভোগ করিয়া অবশেষে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষতলে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় একটি উচ্চভূমি নির্ব্বাচন

করিয়া তাহা লতা পাতা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া লইলেন এবং বলিয়া উঠিলেন—"আমি এই স্থানে এখন সাধনে নিযুক্ত হইব। যদি এই-বার প্রকৃত জ্ঞান না পাই, তাহা হইলে আমার অস্থি চর্ম্ম যেন এই স্থানেই সংলগ্ন হইয়া থাকে এবং আমার রক্তপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়!" তাহার পর অশ্বত্থকে পশ্চাতে রাখিয়া, পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট হইলেন। মন্ত্রের সাধন বা শরীর পতন ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইল। কিন্তু মার তাঁহার পশ্চাতে ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা অনুগমন করিতেছিল। সে বলিল—"এ পৃথিবী আমার অধিকার। আমিই ইহার অধিপতি। সিদ্ধার্থ যে আমার রাজ্যে রাজত্ব করিবে তাহা আমি হইতে দিব না।"• এই ভাবিয়া সে সিদ্ধার্থের সহিত ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সর্ব্বপ্রথমে সে কোন উদ্ধত ভাব দেখাইল না। আস্তে আস্তে সিদ্ধার্থের নিকট গিয়া বলিল—"তুমি করিতেছ কি? দেবদত্ত তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তোমার রাজবাটী, স্ত্রী পুত্র পরিবার, সকলই তাহার হস্তগত হইয়াছে। এখানে আর থাকিও না। শীঘ্র গিয়া যশো-ধরাকে লজ্জা, অপমান ও অধর্ম্ম হইতে রক্ষা কর।" তাহার পর সিদ্ধার্থ নানাবিধ মায়ারূপ দেখিতে লাগিলেন। যশোধরা তাঁহার কল্পনা-দৃষ্টিতে পড়িলেন—সেই রাজবাটী, সেই কপিলবাস্তু, সেই শাক্যজাতি—কিন্তু তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া আরও ধ্যানে মগ্ন হইলেন। তাহার পর নানা প্রকার বিভীষিকা উপস্থিত হইল। মার তাঁহাকে ভয় দ্বারা পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিল। কথিত আছে যে, হঠাৎ এমন ঝড় উঠিল যে তাহাতে উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গসকল উৎপাটিত হইয়া স্থানান্তরে নিক্ষিপ্ত হইল, অর-ণ্যের বৃক্ষসমূহ ভূপাতিত হইল, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহার পর প্রস্তরবৃষ্টি, তরবারি ও খড়্গবৃষ্টি পর্য্যন্ত হইল। চারি-

দিক ঘন ধূম ও অগ্নিশিখাতে আচ্ছন্ন হইল এবং তাহার পর ঘোর তমোরাশি আকাশ ও পৃথিবীকে ঢাকিয়া ফেলিল। কিন্তু সিদ্ধার্থ একান্ত মনে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। শিলারাশি পুষ্পমালা হইয়া তাঁহার শরীরকে শোভিত করিল। তাঁহার দেহের লাবণ্যে অন্ধকার অপসারিত হইল। মার লোভ দেখাইয়া, ভয় দেখাইয়া কিছুই করিতে পারিল না। অবশেষে তাহার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইল। তাহার তিন দুহিতা ছিল, তাহাদিগের নাম রতি, রাগ এবং তৃষ্ণা। মার ইহাদিগকে সিদ্ধার্থের নিকট প্রেরণ করিল। ইহারা মায়াবেশ ধারণ পূর্ব্বক নানা প্রকার মোহিনী শক্তি প্রয়োগে সিদ্ধার্থকে বশে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নৃত্য, গীত, হাবভাব, যত প্রকার প্রলোভন তাহাদের সম্বল ছিল সকলই চালনা করিল। কিন্তু সিদ্ধার্থ পর্ব্বতের ন্যায় অচল, অটল—কামের প্রচণ্ড বাত্যার মধ্যে অবিচলিত ভাবে রহিলেন। সেই সৌম্যমূর্ত্তি তখন কি মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছিল! পাপের ভয়ঙ্কর কোলাহলে, কামের প্রচণ্ড আলোড়নে, রিপুকুলের ঘোর নির্যাতনে তিনি শান্তভাবে কেবল অপার্থিব বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া ছিলেন। সংসার নানা উপায়ে তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তিনি তখন সংসারের অতীত রাজ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মারদুহিতাদিগের কোন আক্রমণই তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারিল না। তাহারা পরাভূত হইয়া সিদ্ধার্থকে প্রণাম করিয়া প্রত্যাগত হইল, এবং পিতার নিকট নিজ দুঃখের কাহিনী নিবেদন করিল। অবশেষে সংসার নিস্তব্ধ হইল, সিদ্ধার্থ ঘোর চিন্তায় মগ্ন রহিলেন। বিশুদ্ধ চিন্তার পক্ষে সংসারই একমাত্র প্রতিবন্ধক। একদিকে পাপবাসনা, অপর দিকে সংসারভাবনা, কত প্রকার বিষয় মনকে বিচলিত করে। সেই জন্য সংসারের

ভিতর থাকিয়া অপার্থিব বিষয়ে মনঃসংযোগ করা মানুষের পক্ষে এত দুরূহ ব্যাপার। ঋষি মুনিরা গৃহ পরিবার ছাড়িয়া অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। কিন্তু সেখানেও পাপের কোলাহল মনের ভিতর দিয়া শ্রুত হইত। যোগের ব্যাঘাত গৃহে অরণ্যে সমানই থাকে। সিদ্ধার্থ এখন নিষ্পাপ হইলেন। ছয় বৎসর ঘোর তপস্যা সাধন করিয়া শরীর মনের শৃঙ্খল একটি একটি করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এখন তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। আর শরীর পাপের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইবে না, আর মন কামনা-অগ্নিতে দগ্ধ হইবে না। আত্মারূপ মন্দিরে আপনার বলিয়া আর কেহ রহিল না। যাহা কিছু তাহার মধ্যে দূষিত ও দুর্গন্ধ ছিল সকলই দূরীভুত হইল। আত্মা এবং অনন্ত জগৎ, এ উভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান রহিল না। আত্মারূপ পক্ষী অনন্ত আকাশে উড়িল।

পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করা মহাপুরুষদিগের জীবনের আরম্ভ মাত্র। ইহার কারণ সহজে বুঝা যায়। মনুষ্যের প্রাণ কত সূত্রে শরীরের সঙ্গে গ্রথিত আছে তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? মৃত্যুর সময় এই সমুদয় সূত্র, সমুদয় গ্রন্থি, সমুদয় বন্ধন ছিন্ন হইলে তবে ইহকাল হইতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। যদি শারীরিক বিয়োগ এত যন্ত্রণাদায়ক হয়, তাহা হইলে মানসিক বিচ্ছেদ কতই না ভয়ঙ্কর হইবে! জন্মাবধি কতপ্রকার বন্ধন আসিয়া আমাদিগকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কত মায়া, কত মমতা, কত আশা, কত সুখ, কত সম্ভোগ – কত প্রকার আকর্ষণ আমাদিগকে পৃথিবীর দিকে টানিয়া রাখে। মোক্ষার্থী এই সকল বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলে তবে ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করিবার প্রত্যাশা করিতে পারেন। মন যখন ধর্ম্মার্থী হয় তখন প্রথমতঃ সে এই সকল বন্ধন ছিন্ন করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু সে কি সহজে কৃতকার্য্য হয়? মন মনের সঙ্গে

সংগ্রাম করিতেছে এ যুদ্ধ বড় ভয়ানক যুদ্ধ। ইহার সঙ্গে তুলনা করিলে মানুষে মানুষে যে যুদ্ধ হয় তাহা বাল্যক্রীড়া মাত্র। ইহার সঙ্গে তুলনা করিলে কোথায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ,কোথায় বা ওয়াটার্লুর যুদ্ধ, কোন যুদ্ধই দণ্ডায়মান হইতে পারে না। মানবদিগের যুদ্ধে ঘোর রক্তস্রাব, অগণ্য অস্ত্রশস্ত্রের সঞ্চালনা, বৃহদাকার কামানের বিকট রব, ক্ষতবিক্ষতদিগের আর্ত্তনাদ, উভয় পক্ষের আস্ফালন শব্দ, এই সমস্ত কারণে চক্ষু নিপীড়িত হয়, কর্ণ বধির হয় এবং হৃদয় ভয়ে উদ্যমহীন হয় বটে ;—কিন্তু এ সকল যুদ্ধের আরম্ভ হয়, এবং ইহাদিগের শেষও আছে। পাপসংগ্রাম আর এক বিপরীত কাণ্ড। মনে'কন্দ্র একটি মনকে রিপুকুল সংহার করিতে চেষ্টা করিতেছে,সহস্র প্রলোভন তাহাকে প্রলুব্ধ করিতেছে। একটি একটি পাপ মরিতেছে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে মরিতেছে সেই মুহূর্ত্তেই যেন রক্তবীজের ন্যায় পুনর্জীবিত হইতেছে। পাপ মরিয়াও মরে না, এবং এ যুদ্ধের শেষও হয় না। একজন সাধু বলিয়া গিয়াছেন যে মনুষ্যের পরাক্ষার শেষ ইহকালে লক্ষিত হয় না। একজন বীরপুরুষ হয়ত ইহ সংসারে সকল যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জয়ধ্বজা লইয়া পরলোকগামী হইতেছেন। তিনি স্বর্গধামের দ্বারে আসিয়া হয়ত দেখিবেন যে একজন সুন্দরী কামিনী তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য উপস্থিত আছে। শাক্যের জীবনে আমরা এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিনি যত অগ্রসর হইতেছেন, যতবার জয়লাভ করিতেছেন, ততই যেন পরীক্ষা এবং প্রলোভন আরও ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে। মার তাঁহাকে ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিতেছে। শেষ পর্য্যন্ত এই সংগ্রাম চলিয়াছে। মায়া, ভয়, সুখের আশা, ধনের আশা, রাজত্বের আশা ক্রমান্বয়ে তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন সকলকে পরাভব করিলেন, যখন মুক্তি সম্মুখে,

ঠিক সেই সময়ে মারের দুহিতারা মোহিনী স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে সম্ভোগে আহ্বান করিতেছে। এ যুদ্ধ ভয়ানক যুদ্ধ। লক্ষ লক্ষ লোক ইহাতে পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসে। কেবল যুগে যুগে এক একজন মহাপুরুষ ইহাদিগকে পদদ্বারা দলন করিয়া পৃথিবীকে আশান্বিত করিয়া গিয়াছেন।

সিদ্ধার্থের মনে আর পাপ কিম্বা পাপচিন্তা রহিল না। মোহ-কুজ্ঝটিকা দূরীভূত হইলে পুণ্য তাহার বিমল জ্যোতি চারিদিকে বিকাশিত করিল। দুরূহ বৃহৎ কার্য্য সাধনের পক্ষে পাপ-চিন্তাই একমাত্র প্রতিবন্ধক। সে প্রতিবন্ধক এখন বিনষ্ট হইল, সিদ্ধার্থ এখন তাঁহাব মহৎ ব্রতে ব্রতী হইতে পারিলেন। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল; জলাশয়ের ন্যায় ইহার চঞ্চলতা। সামান্য বায়ুর হিল্লোলে ইহার বক্ষ চঞ্চল হইয়া থাকে। প্রথমে একটি ক্ষুদ্র গোলাকার দৃষ্ট হয়, গোলাকার বৃহৎ, বৃহত্তর, বৃহত্তম হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হয়। মনও সেইরূপ কোন চিন্তায় নিমগ্ন হইতে চাহিলে প্রথমে সুস্থিরতা অবলম্বন করে। কিন্তু কোথা হইতে একটি সামান্য সংসারচিন্তা বা অর্থচিন্তা বা কামচিন্তা আসিয়া পড়ে। সেই চিন্তা ক্রমে সমুদায় মনকে অধিকার করিয়া বসে এবং যতক্ষণ অধিকার করিয়া থাকে মন আপন ব্রত বিস্মৃত হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার চেতনা লাভ করিয়া সে যখন নিজ ব্রতসাধনপথে ফিরিয়া আসে আবার অন্য কোন চিন্তা তাঁহাকে অন্যদিকে লইয়া যায়। এইরূপ চঞ্চলতা বশতঃ সাধারণ লোকে কোন রূপ প্রকৃত কার্য্য করিতে পারে না। কেবল সংসার-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া অসার বিষয়ে মগ্ন থাকে। সেই জন্য পাপচিন্তা কার্য্য-সাধনের প্রধান প্রতিবন্ধক। সিদ্ধার্থ সেই পাপচিন্তা হইতে এক-বার নিষ্কৃতি পাইলেন। সূর্য্য অস্ত যাইবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তিনি

মারকে পরাস্ত করেন। এখন রাত্রি সম্মুখে। প্রকৃতি নিস্তব্ধ। দূরস্থিত গ্রামসমূহের জনতারব ক্রমে ক্রমে শ্রুতি হইতে তিরোহিত হইল। পক্ষীসকল ক্রমে নীরব হইল। দিবসের আলোক ম্লান হইয়া জ্যোৎস্নার সুস্নিগ্ধ কিরণে পরিণত হইল। আকাশে কেবল একমাত্র পূর্ণ চন্দ্র এবং কতিপয় উজ্জ্বল নক্ষত্র পৃথিবীতে যে অসাধারণ কাণ্ড ঘটিতেছিল তাহার সাক্ষীস্বরূপে বিরাজমান ছিল। বাহিরে সকলই নিস্তব্ধ, সিদ্ধার্থের মনের ভিতরও সমুদয় নিস্তব্ধ। আর সে পাপদাহের শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল না। অশ্বত্থ বৃক্ষের প্রতি পৃষ্ঠদেশ রাখিয়া যোগশাস্ত্রের অনুমোদিত নিয়ম অনুযায়ী হস্ত পদস্থাপন করিয়া সিদ্ধার্থ অপূর্ব্ব চিন্তারাজ্যে প্রবেশ করিলেন। একটি চিন্তার পর আর একটি চিন্তা আসিল। কথিত আছে যে সেই সময় অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখাসমূহ তাঁহার উপর অবনত হইয়া যেন তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। জীবনের যতগুলি দুরূহ প্রশ্ন তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছিল এক এক করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। প্রথমে এই প্রশ্নটি উত্থিত হইল—এই জগতে দুঃখ এবং মরণ আছে তাহার কারণ কি? প্রশ্নের উত্তর সহজে আসিল—জন্ম আছে বলিয়া। জন্মের পূর্ব্বাবস্থা কি? ভব, অর্থাৎ কর্ম্মফলজনিত বিশেষ কোন জীবের শরীরগ্রহণ যে শরীর লইয়া জীব জন্মগ্রহণ করে। ভব কি হইতে আসে? উপাদান অর্থাৎ একটি প্রিয় প্রস্তর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন। উপাদানের কারণ কি? তৃষ্ণা অর্থাৎ কাম্য বস্তু সম্ভোগের বাসনা। তৃষ্ণা কি হইতে হয়? বেদনা* অর্থাৎ বাহ্য জগতের সহিত চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয়দিগের সংস্পর্শ হইলে মনের মধ্যে যে সুখকর বা দুঃখকর অবস্থা হয়। বেদনার কারণ

* ইংরাজীতে Sensation.

কি? স্পর্শ অর্থাৎ বাহ্য জগতের সহিত ইন্দ্রিয়দিগের সংস্পর্শ। কোন দ্রব্যের প্রতিমা চক্ষে প্রতিবিম্বিত হইলে আমরা তাহাকে স্পর্শ বলি। স্পর্শের কারণ কি? ষড়ায়তন, অর্থাৎ ছয় ইন্দ্রিয়, যথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং মন। ষড়ায়তনের কারণ কি? নামরূপ, অর্থাৎ বাহ্যজগতের প্রকাশ—জগত যেরূপে আমাদিগের গোচর হয়। নামরূপ কি হইতে আসে? বিজ্ঞান, অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে Consciousness বলে। বিজ্ঞানের কারণ সংস্কার, অর্থাৎ অনুভব বা কল্পনা। ইহা দ্বারা আমরা যাহা মিথ্যা বা অসার তাহাকে সার বলিয়া কল্পনা করি। এই জগত কেবল মাত্র ছায়া এবং ইহার প্রকাশ কেবল মাত্র ছায়া-বাজি। এখনি যাহা প্রকাশিত হইতেছে, পর মুহূর্ত্তে তাহার পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু মানবেরা এই ছায়াকে সার পদার্থ বলিয়া অনুভব করে। সংস্কারের কারণ কি? অবিদ্যা। এই অবিদ্যা তবে জরা মৃত্যুর কারণ, এবং এই অবিদ্যাকে দূর করিতে পারিলে জন্ম, জন্মঘটিত দুঃখ এবং তৎপরবর্ত্তী মৃত্যু এ সকলকে দূর করিতে পারা যায়। *

---

* এই কার্য্যকারণশৃঙ্খলা বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব। সিদ্ধার্থ যে ঠিক এই শৃঙ্খলা অবলম্বন করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে। তিনি যে প্রণালী দিয়া জ্ঞান লাভ করুন না কেন, তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার ভাবটিকে বহু শাখা প্রশাখা দিয়া এই কার্য্যকারণসূত্র রচনা করিয়াছেন, ইহাও বিশ্বাস করা যাইতে পারে। যাঁহারা ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুমোদিত শাস্ত্র সকল আয়ত্ত করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে হয়ত এই শৃঙ্খলাটি সংলগ্ন ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতে না পারে। সেই জন্য ইউরোপীয় টীকাকারদিগের ব্যাখ্যা আমাদিগের নিকট তত পরিষ্কার ও যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। ইহাঁদিগের মধ্যে মহামান্য Burnouf যে অর্থ দিয়াছেন আমরা আপাততঃ তাহারই পক্ষ অনেকটা সমর্থন করিলাম। কিন্তু ইহাতেও যে কার্য্যকারণ তত্ত্বের প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশিত হইল তাহা আমরা বলিতেছি না। বাস্তবিক বৌদ্ধ দার্শনিকেরা বহির্জগত ও অন্ত-

যথন সিদ্ধার্থ কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা এইরূপে নির্ণয় করিলেন, তখন তিনি মনে মনে এই চিন্তা করিলেন—"এইবার আমি যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়াছি। অবিদ্যাই সকল অনিষ্টের মূল, যেহেতু অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, ষড়াতয়ন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জন্ম, জন্ম হইতে জরা মৃত্যু উৎপন্ন হয়। এই অবিদ্যা হইতে জীব সকল জন্মিতেছে, এই অবিদ্যা হইতে পরিবর্ত্তনশীল জগত্ নিত্য ও স্থায়ী বলিয়া বোধ হইতেছে। এই অবিদ্যার অন্ধকারে জীবজগত মগ্ন হইয়া আছে। কি প্রকারে এই অবিদ্যাকে দূর করিয়া দেওয়া যায়? কেননা অবিদ্যা গেলে বৃথা কল্পনা বা সংস্কার থাকে না। যাহা অসার তাহাকে সার বলিয়া কল্পনা করিব না। সংস্কার গেলে বিজ্ঞান থাকিবে না। সেই বিজ্ঞান অর্থাৎ মিথ্যা জগতের অস্তিত্ব জ্ঞান যদি চলিয়া যায়, তাহা হইলে নামরূপও থাকে না। ইহারা জগতের গুণসমষ্টি অর্থাৎ properties। নামরূপ চলিয়া গেলে ইন্দ্রিয় সকলও থাকিবেনা। যেহেতু ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়াই বাহ্যজগত ও নামরূপ আমাদিগের গোচর হইতেছে। যদি দ্রষ্টব্য পদার্থ না থাকে, চক্ষের আর ব্যবহার থাকে না।

জগত, সাকার নিরাকার, abstract, concrete এ সকলকে কার্য্যকারণ সূত্রে গ্রথিত করিতে গিয়া এখনকার মতে এত ন্যায়বিরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন যে তাহা হইতে কোন অর্থ টানিয়া বাহির করা সহজ নহে।

এ স্থলে কার্য্য কারণ শব্দের অর্থ স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। যে ভাবে আমরা ভগবানকে জগতের কারণ (First cause) বলি, সে ভাবে কারণ এস্থলে ব্যবহৃত হইতেছে না। কারণের অর্থ পূর্ব্বাবস্থা, অর্থাৎ যে অবস্থা হইলে আর একটি অবস্থা হইতেই হইবে। পূর্ব্বাবস্থাকে কারণ বলে। যথা, পক্ষিশাবকের কারণ ডিম্ব, মৃত্যুর কারণ শরীরের মধ্যে কোন বিশেষ বিকার, বৃক্ষের কারণ বীজ, ঋতুর কারণ পৃথিবী সূর্য্যের এক পার্শ্বে থাকা ইত্যাদি।

ইন্দ্রিয় যদি না থাকে স্পর্শ কোথা হইতে আসিবে? এবং স্পর্শ যদি না হয়,তাহা হইলে বেদনা কোথায় পাইব? যদি কাম্য বস্তু না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে দেখিব কোথা হইতে? বেদনা যদি না আসে, তৃষ্ণাও আসিবেনা, এবং যদি তৃষ্ণা চলিয়া যায়, কোন প্রিয় পদার্থের প্রতি আমার মন দৌড়াইবে না। প্রিয়পদার্থের সম্ভোগ না হইলে জন্ম হইবে না, এবং জন্ম না হইলে মৃত্যুও থাকিবে না। অতএব অবিদ্যাকে মূলে কাটা উচিত।"

পাঠকেরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে আমরা অনেকবার এই কার্য্যকারণশৃঙ্খলা আরম্ভ হইতে শেষ এবং শেষ হইতে আরম্ভ পর্য্যন্ত সিদ্ধার্থকে দিয়া আবৃত্তি করাইয়া লইলাম! ইহার কারণ এই যে যখন সিদ্ধার্থ এই শৃঙ্খলাটি মনে মনে অনুভব করিলেন, তখন তিনি ইহার সত্য প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ইহাকে বারবার আবৃত্তি করিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন যে ইহাতে কোন ভ্রম নাই, তখন তিনি আর একটি যুক্তিমার্গে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার মনে হইল যে চারিটি মহাসত্য জানিতে পারিলেই মনুষ্য ভ্রম এবং অবিদ্যা হইতে রক্ষা পায়। সে চারিটি মহা সত্য কি? (১) জীবন দুঃখে পূর্ণ। (২) সে দুঃখের কারণ আছে। সে কারণ তৃষ্ণা—যে তৃষ্ণা কখন চরিতার্থ হয় না। (৩) সে কারণ দূর করিয়া দেওয়া যায়। (৪) সে কারণ দূর করিবার একটি পথ বা মার্গ আছে।

(১) দুঃখ কি? না জন্ম, বার্দ্ধক্য, জরা, মৃত্যু, যাহা অরুচিকর তাহার সঙ্গে সংশ্রব, যাহাতে চিত্ত অনুরক্ত তাহা হইতে বিচ্ছেদ, মায়া।

(২) দুঃখের কারণ কি? যে কাম্য বস্তু মায়াবৎ, ভ্রমমূলক, যাহা কখন সম্ভোগ করা যায় না, তাহার জন্য অনবরত কামনা বা তৃষ্ণা। কোন সুন্দর বাহ্য পদার্থ ইন্দ্রিয়ে অভিঘাত হইলে তাহা পাইবার

জন্য ইচ্ছা হয় কিম্বা দেখিলে আহ্লাদ হয়। এই তৃষ্ণা ক্রমাগত থাকাতে জীবনের উপর মায়া জন্মে। ইহাই দুঃখের কারণ।

(৩) দুঃখ বিনষ্ট হয় কিসে? এই তৃষ্ণা, এই জীবনের কামনাকে সম্পূর্ণরূপ বিনাশ করিলেই দুঃখ বিনষ্ট হয়।

(৪) দুঃখ বিনাশের উপায় কি? ধর্ম্মজীবনই একমাত্র উপায়। ধর্ম্মজীবন অষ্ট প্রকারে হইতে পারে, যথা (১) বিশুদ্ধ মত, (২) বিশুদ্ধ ভাব, (৩) বিশুদ্ধ কথা, (৪) বিশুদ্ধ কার্য্য (৫) বিশুদ্ধ জীবনোপায়, (৬) বিশুদ্ধ চেষ্টা, (৭) বিশুদ্ধ স্মৃতি (৮) বিশুদ্ধ চিন্তা। অর্থাৎ কথায়, চিন্তায়, ভাবে এবং কার্য্যে শুদ্ধি লাভ করিতে পারিলেই দুঃখ বিনষ্ট হয়। যিনি বিশুদ্ধ নীতি অবলম্বন করেন, তিনিই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া দুঃখসমূহের অতীত হইতে পারেন।

আর্য্য গাথা। *

গ্রন্থখানি সঙ্গীতপুস্তক এই জন্য ইহার সম্পূর্ণ সমালোচনা সম্ভবে না। কারণ, গানে কথার অপেক্ষা সুরেরই প্রাধান্য। সুর খুলিয়া লইলে অনেক সময় গানের কথা অত্যন্ত শ্রীহীন এবং অর্থশূন্য হইয়া পড়ে এবং সেইরূপই হওয়া উচিত। কারণ, সঙ্গীতের দ্বারা যখন আমরা ভাব ব্যক্ত করিতে চাহি তখন কথাকে উপলক্ষ্য মাত্র করাই আবশ্যক; কথার দ্বারাই যদি সকল কথা বলা হইয়া যায় তবে সঙ্গীত সেখানে খর্ব্ব হইয়া পড়ে। কথার দ্বারা আমরা যাহা ব্যক্ত করিয়া থাকি তাহা বহুল পরিমাণে সুস্পষ্ট সুপরিস্ফুট—

* আর্য্য গাথা। দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত।

কিন্তু আমাদের মনে অনেক সময় এমন সকল ভাবের উদয় হয় যাহা নামরূপে নির্দ্দেশ বা বর্ণনায় প্রকাশ করিতে পারি না, যাহা কথার অতীত, যাহা অহেতুকী -- সেই সকল ভাব, অন্তরাত্মার সেই সমস্ত আবেগ উদ্বেগগুলি সঙ্গীতেই বিশুদ্ধরূপে ব্যক্ত হইতে পারে। হিন্দুস্থানী গানে কথা এতই যৎসামান্য, যে, তাহাতে আমাদের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না—ননদিয়া, গগরিয়া, চুনরিয়া আমরা কানে শুনিয়া যাই মাত্র কিন্তু সঙ্গীতের সহস্রবাহিনী নির্ঝরিণী সেই সমস্ত কথাকে তুচ্ছ উপলখণ্ডের মত প্লাবিত করিয়া দিয়া আমাদের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যবেগ, এক অনির্ব্বচনীয় আকুলতার আন্দোলন সঞ্চার করিয়া দেয়। সামান্যতঃ পাথরের নুড়ি বালকের খেলেনা মাত্র, হিন্দী গানের কথাও সেইরূপ ছেলেখেলা—কিন্তু নির্ঝরের তলে সেই নুড়িগুলি ঘাতে প্রতিঘাতে জলস্রোতকে মুখরিত করিয়া তোলে, বেগবান্ প্রবাহকে বিবিধ বাধা দ্বারা উচ্ছ্বসিত করিয়া অপরূপ বৈচিত্র্য দান করে;—হিন্দিগানের কথাও সেইরূপ সুরপ্রবাহকে বিচিত্র শব্দসংঘর্ষ এবং বাধার দ্বারা উচ্ছ্বসিত ও প্রতিধ্বনিত করিয়া তোলে, অর্থগৌরব বা কাব্যসৌন্দর্য্যের দ্বারা তাহাকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করে না। ছন্দ সম্বন্ধেও একথা খাটে। নদী যেমন আপনার পথ আপনি কাটিয়া যায় গানও তেমনি আপনার ছন্দ আপনি গড়িয়া গেলেই ভাল হয়। অধিকাংশ স্থলেই হিন্দীগানের কথায় কোন ছন্দ থাকে না—সেই জন্যই ভাল হিন্দিগানের তালের গতিবৈচিত্র্য এমন অভাবিতপূর্ব্ব ও সুন্দর—সে ইচ্ছামত হ্রস্বদীর্ঘের সামঞ্জস্য বিধান করিতে করিতে চলে, স্বাধীনতার সহিত সংযমের সমন্বয় সাধন করিতে করিতে বিজয়ী সম্রাটের ন্যায় গুরুগম্ভীর ভেরিধ্বনি সহকারে অগ্রসর হইতে থাকে। তাহাকে পূর্ব্বকৃত বাঁধা ছন্দের মধ্য দিয়া চালনা করিয়া লইয়া

গেলে তাহার বৈচিত্র্য এবং গৌরবের হানি হইয়া থাকে। কাব্য স্বরাজ্যে একাধিপত্য করিতে পারে কিন্তু সঙ্গীতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে গেলে তাহার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা হয়।

বিশুদ্ধ কাব্য এবং বিশুদ্ধ সঙ্গীত স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে স্বতন্ত্র ভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে কিন্তু বিদ্যাদেবীগণের মহল পৃথক হইলেও তাঁহারা কখন কখন একত্র মিলিয়া থাকেন। সঙ্গীতে ও কাব্যে মধ্যে মধ্যে সেরূপ মিলন দেখা যায়। তখন উভয়েই পরস্পরের জন্য আপনাকে কথঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিয়া লন, কাব্য আপন বিচিত্র অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া নিরতিশয় স্বচ্ছতা ও সরলতা অবলম্বন করেন, সঙ্গীতও আপন তালসুরে উদ্দাম লীলাভঙ্গকে সম্বরণ করিয়া সখ্যভাবে কাব্যের সাহচর্য্য করিতে থাকেন।

হিন্দুস্থানে বিশুদ্ধ সঙ্গীত প্রাবল্য লাভ করিয়াছে কিন্তু বঙ্গদেশে কাব্য ও সঙ্গীতের সম্মিলন ঘটিয়াছে। গানের যে একটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য, একটি স্বাধীন পরিণতি তাহা এদেশে স্থান পায় নাই। কাব্যকে অন্তরের মধ্যে ভাল করিয়া ধ্বনিত করিয়া তুলিবার জন্যই এদেশে সঙ্গীতের অবতারণা হইয়াছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি বড় বড় কাব্যও সুর সহকারে সর্ব্বসাধারণের নিকট পঠিত হইত। বৈষ্ণবকবিদিগের গানগুলিও কাব্য—কেবল চারিদিকে উড়িয়া ছড়াইয়া পড়িবার জন্য সুরগুলি তাহাদের ডানা-স্বরূপ হইয়াছিল। কবিরা যে কাব্যরচনা করিয়াছেন সুর তাহাই ঘোষণা করিতেছে মাত্র।

বঙ্গদেশের কীর্ত্তনে কাব্য ও সঙ্গীতের সম্মিলন এক আশ্চর্য্য আকার ধারণ করিয়াছে; তাহাতে কাব্যও পরিপূর্ণ এবং সঙ্গীতও প্রবল! মনে হয় যেন ভাবের বোঝাই; পূর্ণ সোনার কবিতা ভরা-

সুরের সঙ্গীতনদীর মাঝখান দিয়া বেগে ভাসিয়া চলিয়াছে। সঙ্গীত কেবল যে কবিতাটিকে বহন করিতেছে তাহা নহে তাহার নিজেরও একটা ঐশ্বর্য্য এবং ঔদার্য্য এবং মর্য্যাদা প্রবলভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থখানিতে উভয় শ্রেণীরই গান দেখা যায়। ইহার মধ্যে কতকগুলি গান আছে যাহা সুখপাঠ্য নহে, যাহার ছন্দ ও ভাববিন্যাস সুরতালের অপেক্ষা রাখে, সেগুলি সাহিত্যসমালোচকের অধিকারবহির্ভূত। আর কতকগুলি গান আছে যাহা কাব্য হিসাবে অনেকটা সম্পূর্ণ—যাহা পাঠমাত্রেই হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক ও সৌন্দর্য্যের সঞ্চার করে। যদিচ সে গানগুলির মাধুর্য্যও সম্ভবত সুরসংযোগে অধিকতর পরিস্ফুটতা, গভীরতা এবং নূতনত্ব লাভ করিতে পারে তথাপি ভাল এন্‌গ্রেভিং হইতে তাহার আদর্শ অয়েল্‌পেণ্টিংয়ের সৌন্দর্য্য যেমন অনেকটা অনুমান করিয়া লওয়া যায় তেমনি কেবলমাত্র সেই সকল কবিতা হইতে গানের সমগ্র মাধুর্য্য আমরা মনে মনে পূরণ করিয়া লইতে পারি। উদাহরণস্বরূপে "একবার দেখে যাও দেখে যাও কত দুখে যাপি দিবা নিশি" কীর্ত্তনটির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। এমন বেদনায় পরিপূর্ণ, অনুরাগে অনুনয়ে পরিপ্লুত গান অল্পই দেখা যায়। পাঠ করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে ইহার আকুতি-পূর্ণ সঙ্গীতটি আমাদের কল্পনায় ধ্বনিত হইতে থাকে। সম্ভবতঃ যে সুরে এই গান বাঁধা হইয়াছে তাহা আমাদের কল্পনার আদর্শের সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। না হইবারই কথা। কারণ, এই কবিতাটি কিঞ্চিৎ বৃহৎ এবং বিচিত্র; এবং আমাদের সঙ্গীত সাধারণতঃ একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত স্থায়ীভাব অবলম্বন করিয়া আত্ম-প্রকাশ করে; ভাব হইতে ভাবান্তরে বিচিত্র আকারে ও নব নব

ভঙ্গীতে অভিব্যক্ত হইয়া উঠে না। এই জন্য আমাদের বক্ষ্যমান কবিতাটির উপযুক্ত রাগিণী আমরা সহজে প্রত্যাশা করিতে পারি না। কিন্তু কোন সুর না থাকিলেও ইহাকে আমরা গান বলিব—কারণ, ইহাতে আমাদের মনের মধ্যে গানের একটা আকাঙ্ক্ষা রাখিয়া দেয়—যেমন ছবিতে একটা নির্ঝরিণী আঁকা দেখিলে তাহার গতিটি আমরা মনের ভিতর হইতে পূরণ করিয়া লই। গান এবং কবিতার প্রভেদ আমরা এই গ্রন্থ হইতেই তুলনার দ্বারা দেখাইয়া দিতে পারি।

সে কে ?—এজগতে কেহ আছে, অতি উচ্চ মোর কাছে
যার প্রতি তুচ্ছ অভিলাষ ;
সে কে ?—অধীন হইয়ে, তবু রহে যে আমার প্রভু ;
প্রভু হয়ে আমি যার দাস ;
সে কে ?—দূর হতে দূরাত্মীয় প্রিয়তম হতে প্রিয়,
আপন হইতে যে আপন ;
সে কে ?—লতা হতে ক্ষীণ তারে বাঁধে দৃঢ় যে আমারে,
ছাড়াতে পারিনা আজীবন ;
সে কে ?—দুর্ব্বলতা যার বল ; মর্ম্মভেদী অশ্রুজল ;
প্রেম-উচ্চারিত রোষ যার ;
সে কে ?—যার পরিতোষ মম সফল জনমসম ;
সুখ—সিদ্ধি সব সাধনার ;
সে কে ?—হলেও কঠিন চিত শিশুসম স্নেহভীত
যার কাছে পড়ি গিয়া নুয়ে ;
সে কে ?—বিনা দোষে ক্ষমা চাই যার ; অপমান নাই
শতবার পাদুখানি ছুঁয়ে ;

সে কে ?—মধুর দাসত্ব যার, লীলাময় কারাগার ;
শৃঙ্খল নূপুর হয়ে বাজে ;
সে কে ?—হৃদয় খুঁজিতে গিয়া নিজে যাই হারাইয়া
যার হৃদি প্রহেলিকামাঝে !

ইহা কবিতা, এবং ভাল কবিতা—কিন্তু গান নহে। সুর সংযোগে গাহিলেও ইহাকে গান বলিতে পারি না। ইহাতে ভাব আছে এবং ভাবপ্রকাশের নৈপুণ্যও আছে কিন্তু ভাবের সেই স্বতউচ্ছ্বসিত সদ্যউৎসারিত আবেগ নাই যাহা পাঠকের হৃদয়ের মধ্যে প্রহত তন্ত্রীর ন্যায় একটা সঙ্গীতময় কম্পন উৎপাদন করিয়া তুলে।

ছিল বসি সে কুসুম কাননে।
আর অমল অরুণ উজল আভা
ভাসিতেছিল সে আননে।
ছিল এলায়ে সে কেশরাশি (ছায়াসম হে) ;
ছিল ললাটে দিব্য আলোক, শান্তি
অতুল গরিমারাশি।

সেথা ছিল না বিষাদভাষা (অশ্রুভরা গো) ;
সেথা বাঁধা ছিল শুধু সুখের স্মৃতি
হাসি, হরষ, আশা ;
সেথা ঘুমায়ে ছিল রে, পুণ্য, প্রীতি,
প্রাণভরা ভালবাসা।

তার সরল সুঠাম দেহ ; (প্রভাময় গো, প্রাণভরা গো) ;
যেন যা কিছু কোমল ললিত, তা' দিয়ে
রচিয়াছে তাহে কেহ ;

পরে স্বজিল সেথায় স্বপন, সংগীত,
সোহাগ সরম স্নেহ।

যেন পাইল রে উষা প্রাণ (আলোময়ী রে);
যেন জীবন্ত কুসুম, কনকভাতি
সুমিলিত, সমতান।
যেন সজীব সুরভি মধুর মলয়
কোকিলকূজিত গান।

শুধু চাহিল সে মোর পানে (একবার গো);
যেন বাজিল বীণা মুরজ মুরলী
অমনি অধীর প্রাণে;
সে গেল কি দিয়া, কি নিয়া, বাঁধি মোর হিয়া
কি মন্ত্রগুণে কে জানে।

এই কবিতাটির মধ্যে যে রস আছে তাহাকে আমরা গীতরস নাম দিতে পারি। অর্থাৎ, লেখক একটি সুখস্মৃতি এবং সৌন্দর্য্য-স্বপ্নে আমাদের মনকে যেরূপ ভাবে আবিষ্ট করিয়া তুলিতে চাহেন তাহা সঙ্গীত দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে এবং যখন কোন কবিতা বিশেষ মন্ত্রগুণে অনুরূপ ফল প্রদান করে তখন মনের মধ্যে যেন একটি অব্যক্ত গীতধ্বনি গুঞ্জরিত হইতে থাকে। যাঁহারা বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করিয়াছেন, অন্যান্য কবিতা হইতে গানের কবিতার স্বাতন্ত্র্য তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

আমরা সামান্য কথাবার্ত্তার মধ্যেও যখন সৌন্দর্য্যের অথবা অনুভাবের আবেগ প্রকাশ করিতে চাহি তখন স্বতই আমাদের কথার সঙ্গে সুরের ভঙ্গী মিলিয়া যায়। সেই জন্য কবিতায় যখন বিশুদ্ধ

সৌন্দর্য্যমোহ অথবা ভাবের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হয় তখন কথা তাহার চিরসঙ্গী সঙ্গীতের জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতে থাকে ;—

এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বস,
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি ;—

এই পদটিতে যে গভীর প্রীতি এবং একান্ত আত্মসমর্পণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা কি কথার দ্বারা হইয়াছে? না, আমরা মনের ভিতর হইতে একটা কল্পিত করুণ সুরসংযোগ করিয়া উহাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছি? ঐ দুটি ছত্রের মধ্যে যে কটি কথা আছে তাহার মত এমন সামান্য এমন সরল এমন পুরাতন কথা আর কি হইতে পারে! কিন্তু উহার ঐ অত্যন্ত সরলতাই শ্রোতাদের কল্পনার নিকট হইতে সুর ভিক্ষা করিয়া লইতেছে। এই জন্য, ঐ কবিতার সুর না থাকিলেও উহা গান। এই জন্যই

হরষে বরষ পরে যখন ফিরিবে ঘরে,
সে কেরে আমারি তরে আশা করে রহে বল ;
স্বজন সুহৃদ সবে উজল নয়ন যবে,
কার প্রিয় আঁখি দুটি সব চেয়ে সমুজল ;—

ইহা কানাড়ায় গীত হইলেও গান নহে, এবং

চাহি অতৃপ্ত নয়নে তোর মুখ পানে,
ফিরিতে চাহে না আঁখি ;
আমি আপনা হারাই, সব ভুলে যাই,
অবাক্ হইয়ে থাকি ;—

ইহাতে কোন রাগিণীর নির্দ্দেশ না থাকিলেও ইহা গান।

আমাদের এই সমালোচ্য গ্রন্থখানিতে কোন কোন গানে ইংরাজি প্রথার ভাষা আমাদের কানে খারাপ লাগিয়াছে। ইংরাজি ভাব গ্রহণ করিয়া আমাদের ভাষা ও সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিতে দোষ নাই কিন্তু এমন অনেকগুলি ভাব আছে যাহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই বিদেশী, সেগুলি বাঙ্গলায় বর্জ্জনীয়।

"চেয়ো না বিরাগে মাখি হিম আঁখি তুলি মোর পানে,"

ইংরাজিতে "cold" শব্দের সহিত যে একটি অপ্রিয় ভাবের যোগ আছে বাঙ্গলায় তাহা নাই এবং হইতেও পারে না। সেই জন্য *"হিম আঁখি" শব্দটা কানে বিজাতীয় বলিয়া ঠেকে।* ইংরা-

জিতে love এবং hate দুই বিপরীতার্থক শব্দ। স্থানভেদে hate শব্দের স্থলে বাঙ্গলায় ঘৃণা, বিদ্বেষ, বিরাগ প্রভৃতি নানাবিধ প্রতিশব্দ ব্যবহার হইতে পারে। আর্য্যগাথায় স্থানে স্থানে ঘৃণা শব্দের অপপ্রয়োগ হইয়াছে।

পাষাণে বাঁধিব প্রাণে, অশ্রুপথে দিব বাঁধ—
নীরবে হৃদয়ে পড়ি কাঁদুক্ মনের সাধ।
কাঁদিব না দীনাহীনা,—কঠোরা তাপসী ঘৃণা
দিব তিক্ত ঢালি তারে—ক্ষমো দেব অপরাধ!

শেষ দুটি ছত্রের অর্থ বুঝাই কঠিন। বোধ করি ইহার অর্থ এই রূপ—আমি দীনহীনার ন্যায় কাঁদিব না, কঠোরা তাপসীর ন্যায় হইয়া ঘৃণারূপ তিক্তপদার্থ তাহাকে ঢালিয়া দিব। বাঙ্গলা ভাষায় বীভৎসতা অথবা হীনতার প্রতিই ঘৃণা প্রয়োগ হইয়া থাকে—কিন্তু কবি এ স্থলে ঔদাসীন্য, উপেক্ষা অথবা বিরাগ অর্থে ঘৃণা ব্যবহার করিয়াছেন। "দিব তিক্ত ঢালি তারে" ইহাতে বাঙ্গালার প্রয়োগনীতি রক্ষিত হয় নাই।

কোন কোন গানের পদ এতই বিপর্য্যস্তভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে যে, তাহার অর্থগ্রহ চেষ্টাসাধ্য হইয়া পড়ে;—

কে পারে নিবারিতে হৃদয়ের বেদনা—
সে বিনে নিজকরে দিয়াছে যে তাহারে।
হৃদয়ে যে ঘোর আঁধারে ঘেরে,
কে বারে যে তা'রে গেছে এ প্রাণে ঘিরি সে বিনে।

গানের ভাষায় এরূপ অসরলতা দোষ মার্জ্জনীয় নহে।

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে কবি স্কচ্, ইংরাজি এবং আইরিশ্ গানের যে সকল অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ভাষা অনেক স্থলে অত্যন্ত অদ্ভুত হইয়াছে। সেগুলি এগ্রন্থে স্থান না পাইলে ক্ষতি ছিল না।

সর্ব্বশেষে আমরা আর্য্যগাথা হইতে একটি বাৎসল্য রসের গান উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইহাতে পাঠকগণ স্নেহের সহিত কৌতুকের সম্মিশ্রণ দেখিতে পাইবেন।

একি রে তার ছেলে-খেলা বকি তায় কি সাধে,—
যা দেখ্‌বে বল্‌বে "ওমা, এনে দে, ওমা দে!"

'নেবো নেবো' সদাই কি এ?—
পেলে পরে ফেলে দিয়ে
কাঁদতে গিয়ে হেসে ফেলে, হাস্‌তে গিয়ে কাঁদে।
এত খেলার জিনিষ ছেড়ে,
বলে কি না দিতে পেড়ে—
—অসম্ভব যা- তারায়, মেঘে, বিজলিরে, চাঁদে।
শুন্‌লো কারো হবে বিয়ে,
ধরল ধূয়ো অম্‌নি গিয়ে—
"ওমা আমি বিয়ে কর্‌ব"—কান্নার 'ওস্তাদ্‌ এ!
শোনে কারো হবে ফাঁসি,—
অম্‌নি আঁচল ধর্‌ল আসি—
"ওমা আমি ফাঁসি যাব"—বিনি অপরাধে। . .

গ্রন্থ সমালোচনা।

ভক্তচরিতামৃত। শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দশ আনা।

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত। শ্রীঅঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দুই আনা।

এই দুইখানি গ্রন্থে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্তপ্রবর শ্রীমৎ রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে।

সম্প্রতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় নব্যভারতে রূপ ও সনাতনের অকৃত্রিম সাধুতার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থে রূপ সনাতনের জীবনের প্রথমাবস্থার বিবরণ সুস্পষ্ট নহে। এমন কি, গৌড়েশ্বর হুসেন্‌ সাহা রূপকে পরস্বলুণ্ঠনকারী পলাতক দস্যু জ্ঞান করিতেন. ইহাতে তাহার উল্লেখ আছে, এবং সনাতন রাজকার্য্য হইতে অব্যা-

হতি পাইবার জন্য পীড়ার ভান করিয়া মিথ্যাচার অবলম্বন করিয়াছিলেন একথাও চরিতলেখক স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু তথাপি, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূজ্য ভক্ত সাধুচরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। তাহার অনেক কারণ আছে।

প্রথমতঃ মানুষের চরিত্র আদ্যোপান্ত সুসঙ্গত নহে। অনেক গুলি ছিদ্র সত্ত্বেও মোটের উপরে চরিত্রবিশেষকে মহৎ বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, কালবিশেষে ধর্ম্মনীতির আদর্শের কথঞ্চিৎ ইতর বিশেষ ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ, এক সময়ে ধর্ম্মনীতির যে অংশে সাধারণের শৈথিল্য ছিল এখন হয় ত সে অংশে নাই অপর কোন অংশে আছে। এক সময় ছিল, যখন সম্রাটের প্রাপ্য নবাব লুণ্ঠন করিত, নবাবের প্রাপ্য ডিহিদার লুণ্ঠন করিত এবং দস্যুতা রাজ্যতন্ত্রের মধ্যে আদ্যোপান্ত ধারাবাহিকভাবে বিরাজ করিত। সে দস্যুতা এক প্রকার প্রকাশ্য ছিল এবং সাধারণের নিকট তাহা লজ্জার কারণ না হইয়া সম্ভবতঃ শ্লাঘার বিষয় ছিল। সকলেই জানেন অল্পকাল পূর্ব্বেও উপ্‌রি পাওনা সম্বন্ধে প্রশ্ন ভদ্রসমাজের মধ্যেও শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত না। মিথ্যাচার, বিশেষতঃ সদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিথ্যাভান, যে, আমাদের দেশে অত্যন্ত নিন্দনীয় নহে একথা স্বীকার করিতে আমরা লজ্জিত হইতে পারি কিন্তু একথা সত্য। অতএব, স্বসাময়িক সাধারণ দুর্নীতিবশতঃ কোন কোন বিষয়ে সৎপথভ্রষ্ট হইলেও মহৎলোকের সাধুতার প্রতি সম্পূর্ণ সন্দিহান হইবার কারণ দেখি না।

তৃতীয়তঃ আমাদের সম্মুখে সমস্ত প্রমাণ বর্ত্তমান নাই। সামান্য দুই একটা আভাস মাত্র হইতে বিচার করা সঙ্গত হয় না।

চতুর্থতঃ, রূপ এবং সনাতন তাঁহাদের স্বসাময়িক প্রধান প্রধান লোকের নিকট সাধু বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের চরিত্রের মধ্যে এমন সকল গুণ ছিল যাহাতে নিকটবর্ত্তী লোকদিগকে তাঁহারা আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিয়াছিলেন—এবং আজ পর্য্যন্ত তাহারই স্মৃতি অক্ষুণ্নভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের মতে অন্য সমস্ত প্রমাণাভাবে ইহাই তাঁহাদের মহত্ত্বের যথেষ্ট প্রমাণ।

সমালোচ্য গ্রন্থে অঘোর বাবু ভক্তচরিত্র অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বসকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এজন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। ভক্তিতত্ত্ব ভক্তের জীবনীর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রকাশ করিলে পাঠকের নিকট উভয়ই সজীব হইয়া উঠে। শুষ্ক শাস্ত্রের মধ্যে তত্ত্ব পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু সেই তত্ত্বের গভীরতা, মাধুর্য্য —মানবজীবনের মধ্যে তাহার পরিণতি, অনুভব করিতে গেলে ভক্তচরিত্রের মধ্য হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া দেখিতে হয়। অতএব বৈষ্ণবধর্ম্মের সুগভীর তত্ত্বসকল যাঁহারা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অঘোর বাবুর এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন।

চরিত রত্নাবলী। প্রথম ভাগ। শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল প্রণীত। মূল্য চারি আনা।

ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী অনেক সাধু নরনারীর সংক্ষিপ্ত চরিত বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কেবল "করমেতি বাই" নামক প্রথম চরিতটি আমাদের ভাল লাগে নাই। মানবহিতৈষণার জন্য যাঁহারা সংসার বিসর্জ্জন করেন তাঁহাদের জীবনচরিত বর্ণনযোগ্য। কিন্তু আত্মসুখের আকর্ষণে যাঁহারা সুকঠিন সংসারকৃত্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন তাঁহাদের চরিত্রকে আদর্শ জ্ঞান করিতে পারি না। করমেতি বাই স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে "শ্যামল সুন্দর সিন্ধু তরঙ্গ মাঝারে" নিমগ্ন হইবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। সুখী হইয়া থাকেন ত তিনিই সুখী হইয়াছেন—আমাদের তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমরা তাঁহার হতভাগ্য স্বামীর জন্য দুঃখিত।

অর্থই অনর্থ। দারোগার দপ্তর। শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য তিন আনা।

ঠগী কাহিনী। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা।

রোমহর্ষণ গল্প অনেকের ভাল লাগে, তাঁহাদের জন্য উপরিলিখিত গ্রন্থদ্বয় রচিত হইয়াছে।

সাধনা

বিচারক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনেক অবস্থান্তরের পর অবশেষে গতযৌবনা ক্ষীরোদা যে পুরুষের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল সেও যখন তাহাকে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া গেল তখন অন্নমুষ্টির জন্য দ্বিতীয় আশ্রয় অন্বেষণের চেষ্টা করিতে তাহার অত্যন্ত ধিক্কার বোধ হইল।

যৌবনের শেষে শুভ্র শরৎকালের ন্যায় একটি গভীর প্রশান্ত প্রগাঢ় সুন্দর বয়স আসে যখন জীবনের ফল ফলিবার এবং শস্য পাকিবার সময়। তখন আর উদ্দাম যৌবনের বসন্তচঞ্চলতা শোভা পায় না। ততদিনে সংসারের মাঝখানে আমাদের ঘর-বাঁধা এক প্রকার সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে; অনেক ভাল মন্দ অনেক সুখ দুঃখ জীবনের মধ্যে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া অন্তরের মানুষটিকে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে; আমাদের আয়ত্তের অতীত কুহকিনী দুরাশার কল্পনালোক হইতে সমস্ত উদ্‌ভ্রান্ত বাসনাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আপন ক্ষুদ্রক্ষমতার গৃহপ্রাচীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি তখন নূতন প্রণয়ের মুগ্ধদৃষ্টি আর আকর্ষণ করা যায় না, কিন্তু পুরাতন লোকের কাছে মানুষ আরও প্রিয়তর হইয়া উঠে। তখন যৌবন-লাবণ্য অল্পে অল্পে বিশীর্ণ হইয়া আসিতে থাকে কিন্তু জরাবিহীন অন্তরপ্রকৃতি বহুকালের সহবাসক্রমে মুখে চক্ষে যেন স্ফুটতর-

রূপে অঙ্কিত হইয়া যায় ; হাসিটি দৃষ্টিপাতটি কণ্ঠস্বরটি ভিতরকার মানুষটির দ্বারা ওতপ্রোত হইয়া উঠে। যাহা কিছু পাই নাই তাহার আশা ছাড়িয়া, যাহারা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহাদের জন্য শোক সমাপ্ত করিয়া, যাহারা বঞ্চনা করিয়াছে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া, যাহারা কাছে আসিয়াছে ভালবাসিয়াছে, সংসারের সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা শোক-তাপ-বিচ্ছেদের মধ্যে যে কয়টি প্রাণী নিকটে অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহাদিগকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সুনিশ্চিত,সুপরীক্ষিত চিরপরিচিতগণের প্রীতিপরিবেষ্টনের মধ্যে নিরাপদ নীড় রচনা করিয়া তাহারই মধ্যে সমস্ত চেষ্টার অবসান এবং সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি লাভ করা যায়। যৌবনের সেই স্নিগ্ধ সায়াহ্নে জীবনের সেই শান্তিপর্ব্বেও যাহাকে নূতন সঞ্চয়, নূতন পরিচয়, নূতন বন্ধনের বৃথা আশ্বাসে নূতন চেষ্টায় ধাবিত হইতে হয়, তখনও, যাহার বিশ্রামের জন্য শয্যা রচিত হয় নাই, যাহার গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনের জন্য সন্ধ্যাদীপ প্রজ্বলিত হয় নাই সংসারে তাহার মত শোচনীয় আর কেহ নাই।

ক্ষীরোদা তাহার যৌবনের প্রান্তসীমায় যে দিন প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল তাহার প্রণয়ী পূর্ব্বরাত্রে তাহার সমস্ত অলঙ্কার ও অর্থ অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে,—বাড়িভাড়া দিবে এমন সঞ্চয় নাই, তিন বৎসরের শিশুপুত্রটিকে দুধ আনিয়া খাওয়াইবে এমন সঙ্গতি নাই—যখন সে ভাবিয়া দেখিল তাঁহার জীবনের আটত্রিশ বৎসরে সে একটি লোককেও আপনার করিতে পারে নাই, একটি ঘরের প্রান্তেও বাঁচিবার এবং মরিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই ;—যখন তাহার মনে পড়িল আবার আজ অশ্রুজল মুছিয়া দুই চক্ষে অঞ্জন পরিতে হইবে, অধরে ও কপোলে অলক্তরাগ চিত্রিত করিতে হইবে, জীর্ণ যৌবনকে বিচিত্র ছলনায় আচ্ছন্ন

করিয়া হাস্যমুখে অসীম ধৈর্য্য সহকারে নূতন হৃদয় হরণের জন্য নূতন মায়াপাশ বিস্তার করিতে হইবে—তখন সে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া বারম্বার কঠিন মেঝের উপর মাথা খুঁড়িতে লাগিল,—সমস্ত দিন অনাহারে মুমূর্ষুর মত পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল; দীপহীন গৃহকোণে অন্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল। দৈবক্রমে একজন পুরাতন প্রণয়ী আসিয়া "ক্ষীরো" "ক্ষীরো" শব্দে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। ক্ষীরোদা অকস্মাৎ দ্বার খুলিয়া ঝাঁটাহস্তে বাঘিনীর মত গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া আসিল,—রসপিপাসু যুবকটি অনতিবিলম্বে পলায়নের পথ অবলম্বন করিল।

ছেলেটা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া খাটের নীচে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সেই গোলেমালে জাগিয়া উঠিয়া অন্ধকারের মধ্য হইতে ভগ্নকাতর কণ্ঠে মা মা করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন ক্ষীরোদা সেই রুদ্যমান শিশুকে প্রাণপণে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া নিকটবর্ত্তী কূপের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

শব্দ শুনিয়া আলো হস্তে প্রতিবেশীগণ কূপের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষীরোদা এবং শিশুকে তুলিতে বিলম্ব হইল না। ক্ষীরোদা তখন অচেতন এবং শিশুটি মরিয়া গেছে।

হাঁসপাতালে গিয়া ক্ষীরোদা আরোগ্য লাভ করিল। হত্যা-অপরাধে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে সেশনে চালান করিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জজ্ মোহিতমোহন দত্ত। ষ্ট্যাট্যুটরি সিভিলিয়ান্। তাঁহার কঠিন বিচারে ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম হইল। হতভাগিনীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া উকীলগণ তাহাকে বাচাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। জজ তাহাকে তিলমাত্র দয়ার পাত্রী বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না।

না পারিবার কারণ আছে। একদিকে তিনি হিন্দু মহিলা-গণকে দেবী আখ্যা দিয়া থাকেন অপরদিকে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অবিশ্বাস। তাঁহার মত এই যে, রমণীগণ কুল-বন্ধন ছেদন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, শাসন তিলমাত্র শিথিল হইলেই সমাজপিঞ্জরে একটি কুলনারীও অবশিষ্ট থাকিবে না।

তাঁহার এরূপ বিশ্বাসেরও কারণ আছে। সে কারণ জানিতে গেলে মোহিতের যৌবন-ইতিহাসের কিয়দংশ আলোচনা করিতে হয়।

মোহিত যখন কালেজে সেকেণ্ড্-ইয়ারে পড়িতেন তখন আকারে এবং আচারে এখনকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের মানুষ ছিলেন। এখন মোহিতের সম্মুখে টাক, পশ্চাতে টিকি; মুণ্ডিত মুখে প্রতিদিন প্রাতঃকালে খরক্ষুরধারে গুম্ফশ্মশ্রুর অঙ্কুর উচ্ছেদ হইয়া থাকে; কিন্তু তখন তিনি সোনার চসমায়, গোঁফদাড়িতে এবং সাহেবীধরণের কেশবিন্যাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর নূতন সংস্করণ কার্ত্তিকটির মত ছিলেন। বেশভূষায় বিশেষ মনোযোগ ছিল, মদ্য-মাংসে অরুচি ছিল না এবং আনুষঙ্গিক আরও দুটো একটা উপসর্গ ছিল।

অদূরে এক ঘর গৃহস্থ বাস করিত। তাহাদের হেমশশি বলিয়া এক বিধবা কন্যা ছিল। তাহার বয়স অধিক হইবে না। চোদ্দ হইতে পনরয় পড়িবে।

সমুদ্র হইতে বনরাজিনীলা তটভূমি যেমন রমণীয় স্বপ্নবৎ চিত্রবৎ মনে হয় এমন তীরের উপরে উঠিয়া হয় না। বৈধব্যের বেষ্টন-অন্তরালে হেমশশি সংসার হইতে যেটুকু দূরে পড়িয়াছিল সেই দূরত্বের বিচ্ছেদবশতঃ সংসারটা তাহার কাছে পরপারবর্ত্তী

পরমরহস্যময় প্রমোদবনের মত ঠেকিত। সে জানিত না এই জগৎযন্ত্রটার কলকারখানা অত্যন্ত জটিল এবং লৌহকঠিন—সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে, সংশয়ে সঙ্কটে ও নৈরাশ্যে পরিতাপে বিমিশ্রিত। তাহার মনে হইত সংসারযাত্রা কলনাদিনী নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ জলপ্রবাহের মত সহজ, সম্মুখবর্ত্তী সুন্দর পৃথিবীর সকল পথগুলিই প্রশস্ত ও সরল, সুখ কেবল তাহার বাতায়নের বাহিরে এবং তৃপ্তিহীন আকাঙ্ক্ষা কেবল তাহার বক্ষপঞ্জরবর্ত্তী স্পন্দিত পরিতপ্ত কোমল হৃদয়টুকুর অভ্যন্তরে। বিশেষতঃ তখন তাহার অন্তরাকাশের দূর দিগন্ত হইতে একটা যৌবন-সমীরণ উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশ্বসংসারকে বিচিত্র বাসন্তী শ্রীতে বিভূষিত করিয়া দিয়াছিল; সমস্ত নীলাম্বর তাহারই হৃদয়হিল্লোলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং পৃথিবী যেন তাহারই সুগন্ধ মর্ম্মকোষের চতুর্দ্দিকে রক্তপদ্মের কোমল পাপ্‌ড়িগুলির মত স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া ছিল।

ঘরে তাহার বাপ মা এবং দুটি ছোট ভাই ছাড়া আর কেহ ছিল না। ভাই দুটি সকাল সকাল খাইয়া ইস্কুলে যাইত, আবার ইস্কুল হইতে আসিয়া আহারান্তে সন্ধ্যার পর পাড়ার নাইট্‌-স্কুলে পাঠ অভ্যাস করিতে গমন করিত। বাপ সামান্য বেতন পাইতেন, ঘরে মাষ্টার রাখিবার সামর্থ্য ছিল না।

কাজের অবসরে হেম তাহার নির্জ্জন ঘরের বাতায়নে আসিয়া বসিত। একদৃষ্টে রাজপথের লোক চলাচল দেখিত; ফেরিওয়ালা করুণ উচ্চস্বরে হাঁকিয়া যাইত তাহাই শুনিত; এবং মনে করিত পথিকেরা সুখী, ভিক্ষুকেরাও স্বাধীন, এবং ফেরিওয়ালারা, যে, জীবিকার জন্য সুকঠিন প্রয়াসে প্রবৃত্ত তাহা নহে, উহারা যেন এই লোকচলাচলের সুখরঙ্গভূমিতে অন্যতম অভিনেতামাত্র।

আর সকালে বিকালে সন্ধ্যাবেলায় পরিপাটিবেশধারী গর্ব্বোদ্ধত

স্ফীতবক্ষ মোহিতমোহনকে দেখিতে পাইত। দেখিয়া, তাহাকে সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পন্ন পুরুষশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রের মত মনে হইত। মনে হইত, ঐ উন্নতমস্তক সুবেশ সুন্দর যুবকটির সব আছে এবং উহাকে সব দেওয়া যাইতে পারে। বালিকা যেমন পুতুলকে সজীব মানুষ করিয়া খেলা করে, বিধবা তেমনি মোহিতকে মনে মনে সকল প্রকার মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তাহাকে দেবতা গড়িয়া খেলা করিত।

এক একদিন সন্ধ্যার সময় দেখিতে পাইত মোহিতের ঘর আলোকে উজ্জ্বল, নর্ত্তকীর নূপুরনিক্কণ এবং বামাকণ্ঠের সঙ্গীত-ধ্বনিতে মুখরিত। সেদিন সে ভিত্তিস্থিত চঞ্চল ছায়াগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিনিদ্র সতৃষ্ণ নেত্রে দীর্ঘরাত্রি জাগিয়া বসিয়া কাটাইত। তাহার ব্যথিত পীড়িত হৃৎপিণ্ড, পিঞ্জরের পক্ষীর মত, বক্ষপঞ্জরের উপর দুর্দ্দান্ত আবেগে আঘাত করিতে থাকিত।

সে কি তাহার কৃত্রিম দেবতাটিকে বিলাসমত্ততার জন্য মনে মনে ভর্ৎসনা করিত, নিন্দা করিত? তাহা নহে। অগ্নি যেমন পতঙ্গকে নক্ষত্রলোকের প্রলোভন দেখাইয়া আকর্ষণ করে, মোহি-তের সেই আলোকিত গীতবাদ্যবিক্ষুব্ধ, প্রমোদমদিরোচ্ছ্বসিত কক্ষটি হেমশশিকে সেইরূপ স্বর্গমরীচিকা দেখাইয়া আকর্ষণ করিত। সে গভীর রাত্রে একাকিনী জাগিয়া বসিয়া সেই অদূর বাতায়নের আলোক ও ছায়া ও সঙ্গীত এবং আপন মনের আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা লইয়া একটি মায়ারাজ্য গড়িয়া তুলিত, এবং আপন মানসপুত্ত-লিকাকে সেই মায়াপুরীর মাঝখানে বসাইয়া বিস্মিত বিমুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করিত এবং আপন জীবন যৌবন সুখ দুঃখ ইহকাল পরকাল সমস্তই বাসনার অঙ্গারে ধূপের মত পুড়াইয়া সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ মন্দিরে তাহার পূজা করিত। সে জানিত না তাহার

সম্মুখবর্ত্তী ঐ হর্ম্ম্যবাতায়নের অভ্যন্তরে ঐ তরঙ্গিত প্রমোদপ্রবাহের মধ্যে এক নিরতিশয় ক্লান্তি, গ্লানি, পঙ্কিলতা, বীভৎস ক্ষুধা এবং প্রাণক্ষয়কর দাহ আছে। ঐ বীতনিদ্র নিশাচর আলোকের মধ্যে যে এক হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার কুটিলহাস্য প্রলয়ক্রীড়া করিতে থাকে বিধবা দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইত না।

হেম আপন নির্জ্জন বাতায়নে বসিয়া তাহার এই মায়াস্বর্গ এবং কল্পিত দেবতাটিকে লইয়া চিরজীবন স্বপ্নাবেশে কাটাইয়া দিতে পারিত কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেবতা অনুগ্রহ করিলেন এবং স্বর্গ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। স্বর্গ যখন একেবারে পৃথিবীকে আসিয়া স্পর্শ করিল তখন স্বর্গও ভাঙ্গিয়া গেল এবং যে ব্যক্তি এতদিন একলা বসিয়া স্বর্গ গড়িয়াছিল সেও ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ হইল।

এই বাতায়নবাসিনী মুগ্ধ বালিকাটির প্রতি কখন মোহিতের লালায়িত দৃষ্টি পড়িল, কখন্ তাহাকে "বিনোদচন্দ্র" নামক মিথ্যা-স্বাক্ষরে বারম্বার পত্র লিখিয়া অবশেষে একখানি সশঙ্কিত, উৎকণ্ঠিত, অশুদ্ধ বানান ও উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগপূর্ণ উত্তর পাইল—এবং তাহার পর কিছুদিন ঘাতপ্রতিঘাতে, উল্লাসে সঙ্কোচে, সন্দেহে সম্ভ্রমে, আশায় আশঙ্কায় কেমন করিয়া ঝড় বহিতে লাগিল,—তাহার পরে প্রলয়সুখোন্মত্ততায় সমস্ত জগৎসংসার তাহার চারিদিকে কেমন করিয়া ঘুরিতে লাগিল, এবং ঘুরিতে ঘুরিতে ঘূর্ণনবেগে সমস্ত জগৎ অমূলক ছায়ার মত কেমন করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল,—এবং অবশেষে কখন্ একদিন অকস্মাৎ সেই ঘূর্ণ্যমান সংসারচক্র হইতে বেগে বিচ্ছিন্ন হইয়া রমণী অতি দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল সে সকল বিবরণ বিস্তারিত করিয়া বলিবার আবশ্যক দেখি না।

একদিন গভীর রাত্রে পিতা মাতা ভ্রাতা এবং গৃহ ছাড়িয়া হেম-

শশি "বিনোদচন্দ্র" ছদ্মনামধারী মোহিতের সহিত এক গাড়িতে উঠিয়া বসিল। দেবপ্রতিমা যখন তাহার সমস্ত মাটি এবং খড় এবং রাংতার গহনা লইয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন হইল তখন সে লজ্জায় এবং ধিক্কারে মাটিতে মিশাইয়া গেল। অবশেষে গাড়ি যখন ছাড়িয়া দিল, তখন সে কাঁদিয়া মোহিতের পায়ে ধরিল, বলিল, "ওগো, পায়ে পড়ি আমাকে আমার বাড়ি রেখে এস!" মোহিত শশব্যস্ত হইয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল—গাড়ি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।

জলনিমগ্ন মরণাপন্ন ব্যক্তির যেমন মহূর্ত্তের মধ্যে জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী স্পষ্ট মনে পড়ে তেমনি সেই দ্বাররুদ্ধ গাঁড়ির গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে হেমশশির মনে পড়িতে লাগিল, প্রতিদিন আহারের সময় তাহার বাপ তাহাকে সম্মুখে না লইয়া খাইতে বসিতেন না;—মনে পড়িল তাহার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভাইটি ইস্কুল হইতে আসিয়া তাহার দিদির হাতে খাইতে ভালবাসে; মনে পড়িল, সকালে সে তাহার মায়ের সহিত পান সাজিতে বসিত এবং বিকালে মা তাহার চুল বাঁধিয়া দিতেন। ঘরের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কোণ এবং দিনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কাজটি তাহার মনের সম্মুখে জাজ্জল্যমান হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন তাহার নিভৃত জীবন এবং ক্ষুদ্র সংসারটিকেই স্বর্গ বলিয়া মনে হইল। সেই পানসাজা, চুলবাঁধা, পিতার আহারস্থলে পাখা করা, ছুটির দিনে মধ্যাহ্ননিদ্রার সময় তাঁহার পাকাচুল তুলিয়া দেওয়া, ভাইদের দৌরাত্ম্য সহ্য করা,—এ সমস্তই তাহার কাছে পরম-শান্তিপূর্ণ দুর্লভ সুখের মত বোধ হইতে লাগিল,—বুঝিতে পারিল না এ সব থাকিতে সংসারে আর কোন্ সুখের আবশ্যক আছে!

মনে হইতে লাগিল, পৃথিবীতে ঘরে ঘরে সমস্ত কুলকন্যারা

এখন গভীর সুষুপ্তিতে নিমগ্ন। সেই আপনার ঘরে আপনার শয্যাটির মধ্যে নিস্তব্ধ রাত্রের নিশ্চিন্ত নিদ্রা যে কত সুখের তাহা ইতিপূর্ব্বে কেন সে বুঝিতে পারে নাই! ঘরের মেয়েরা কাল সকালবেলায় ঘরের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে, নিঃসঙ্কোচ নিত্যকর্ম্মের মধ্যে প্রবৃত্ত হইবে, আর গৃহচ্যুতা হেমশশির এই নিদ্রাহীন রাত্রি কোন্‌খানে গিয়া প্রভাত হইবে, এবং সেই নিরানন্দ প্রভাতে তাহাদের সেই গলির ধারের ছোটখাট ঘরকন্নাটির উপর যখন সকালবেলাকার চিরপরিচিত শান্তিময় হাস্যপূর্ণ রৌদ্রটি আসিয়া পতিত হইবে তখন সেখানে সহসা কি লজ্জা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, কি লাঞ্ছনা কি হাহাকার জাগ্রত হইয়া উঠিবে! হেম হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া মরিতে লাগিল;—সকরুণ অনুনয়সহকারে বলিতে লাগিল, "এখনো রাত আছে; আমার মা, আমার দুটি ভাই এখনো জাগে নাই, এখনো আমাকে ফিরাইয়া রাখিয়া আইস!" কিন্তু তাহার দেবতা কর্ণপাত করিল না; এক দ্বিতীয় শ্রেণীর চক্রশব্দমুখরিত রথে চড়াইয়া তাহাকে তাহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গলোকাভিমুখে লইয়া চলিল।

ইহার অনতিকাল পরেই দেবতা এবং স্বর্গ পুনশ্চ আর একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর জীর্ণরথে চড়িয়া আর এক পথে প্রস্থান করিলেন,—রমণী আকণ্ঠ পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মোহিতমোহনের পূর্ব্ব-ইতিহাস হইতে এই একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিলাম। রচনা পাছে "একঘেয়ে" হইয়া উঠে এই জন্য অন্যগুলি বলিলাম না।

এখন সে সকল পুরাতন কথা উত্থাপন করিবার আবশ্যকও

নাই। এখন সেই বিনোদচন্দ্র নাম স্মরণ করিয়া রাখে এমন কোন লোক জগতে আছে কি না সন্দেহ। এখন মোহিত শুদ্ধাচারী হইয়াছেন, তিনি আহ্নিক তর্পণ করেন এবং সর্ব্বদাই শাস্ত্রালোচনা করিয়া থাকেন। নিজের ছোট ছোট ছেলেদিগকেও যোগাভ্যাস করাইতেছেন এবং বাড়ির মেয়েদিগকে সূর্য্য চন্দ্র মরুদ্গণের দুষ্প্রবেশ্য অন্তঃপুরে প্রবল শাসনে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু এক-কালে তিনি একাধিক রমণীর প্রতি অপরাধ করিয়াছিলেন বলিয়া আজ রমণীর সর্ব্বপ্রকার সামাজিক অপরাধের কঠিনতম দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন।

ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম দেওয়ার দুই এক দিন পরে ভোজন-বিলাসী মোহিত জেলখানার বাগান হইতে মনোমত তরীতরকারী সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। ক্ষীরোদা তাহার পতিত জীবনের সমস্ত অপরাধ স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে কি না জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল হইল। বন্দিনীশালায় প্রবেশ করিলেন।

দূর হইতে খুব একটা কলহের ধ্বনি শুনিতে পাইতেছিলেন। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন ক্ষীরোদা প্রহরীর সহিত ভারি ঝগড়া বাধা-ইয়াছে। মোহিত মনে মনে হাসিলেন, ভাবিলেন, স্ত্রীলোকের স্বভাবই এমনি বটে! মৃত্যু সন্নিকট তবু ঝগড়া করিতে ছাড়িবে না। ইহারা বোধ করি যমালয়ে গিয়া যমদূতের সহিত কোন্দল করে।

মোহিত ভাবিলেন, যথোচিত ভর্ৎসনা ও উপদেশের দ্বারা এখনো ইহার অন্তরে অনুতাপের উদ্রেক করা উচিত। সেই সাধু উদ্দেশ্যে তিনি ক্ষীরোদার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র ক্ষীরোদা সকরুণ-স্বরে করযোড়ে কহিল—ওগো জজ্ বাবু, দোহাই তোমার! উহাকে বল আমার আংটি ফিরাইয়া দেয়!

প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, ক্ষীরোদার মাথার চুলের মধ্যে একটি

আংটি লুকানো ছিল—দৈবাৎ প্রহরীর চোখে পড়াতে সে সেটি কাড়িয়া লইয়াছে।

মোহিত আবার মনে মনে হাসিলেন। আজ বাদে কাল ফাঁসি-কাষ্ঠে আরোহণ করিবে তবু আংটির মায়া ছাড়িতে পারে না! গহনাই মেয়েদের সর্ব্বস্ব!

প্রহরীকে কহিলেন—কই, আংটি দেখি! প্রহরী তাঁহার হাতে আংটি দিল।

তিনি হঠাৎ যেন জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে লইলেন এমনি চমকিয়া উঠিলেন। আংটির একদিকে হাতির দাঁতের উপর তেলের রঙে আঁকা একটি গুম্ফশ্মশ্রুশোভিত যুবকের অতি ক্ষুদ্র ছবি বসানো আছে, এবং অপরদিকে সোনার গায়ে খোদা রহিয়াছে—বিনোদচন্দ্র।

তখন মোহিত আংটি হইতে মুখ তুলিয়া একবার ক্ষীরোদার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিলেন। চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার আর একটি অশ্রুসজল প্রীতিসুকোমল সলজ্জশঙ্কিত মুখ মনে পড়িল; সে মুখের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

মোহিত আর একবার সোনার আংটির দিকে চাহিলেন এবং তাহার পরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন তখন তাঁহার সম্মুখে কলঙ্কিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

আগ্রা। *

ভারতবর্ষের এই বিভাগটি অতীব বিচিত্র। আগ্রা হিন্দুদিগের আর একটি মহানগরী—ইহা বেনারস হইতে ১৭৫ মাইল দূর। এখান হইতে যেন আর একটি নূতন জগতের আরম্ভ হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ মুসলমানদিগের নগর ও ইংরাজদিগের নগর। বড় বড় হোটেল, সৌধ-শুভ্র বড় বড় বাগান-বাড়ি, তাহার চারিদিকে জাঁকাল বাগান, বিস্তৃত সুচ্ছায় তরু-পথসকল, সযত্ন-রক্ষিত বিস্তৃত কৃত্রিম উপবন বিরাজমান; সেখানে কায়দা-দুরস্ত ঘোড়-সোয়া-রেরা দুল্‌কি চালে ঘোড়া চালাইতেছে, "স্কচ্-গ্রে" পল্টন-ভুক্ত বীরপুরুষ সৈনিকেরা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, কল-কারখানার ধূম-নল আকাশে মস্তক উত্তোলন করিয়া ধূমরাশি উদ্গার করি-তেছে। কিন্তু এ সমস্ত ব্যাপার আমি কলিকাতা নগরেও দেখি-য়াছি। হিন্দুদিগের পাগ্‌লামি কাণ্ড দেখিবার পর, এই মহম্মদীয় সাদা-সিধা ধরণের মস্‌জিদগুলি দেখিয়া একটু যেন তৃপ্তি লাভ হয়। কিন্তু এই মস্‌জিদগুলির গঠন-উপাদান অতীব কদর্য্য—চুন বালির প্রলেপ সর্ব্বত্র বিদ্যমান। সুতরাং একবার দেখিলে আর দেখিতে ইচ্ছা হয় না।

এখানে যাহা কিছু সুন্দর, তাহা প্রকৃতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার প্রকৃতি দেবী সুখময়ী ও শান্তিময়ী—আর্দ্রভূমি দাক্ষিণাত্যের ন্যায় প্রগল্‌ভা ও অতিভূষিতা নহে। আকাশ ফিকে নীল, শীতল-প্রায় বায়ু লঘু নিঃশ্বাসে ঝুরুঝুরু বহি-তেছে; সেই চিরন্তন তালজাতীয় বৃহৎ বৃক্ষের পরিবর্ত্তে সূক্ষ্মদেহ

* Dans L' Inde নামক ফরাসী ভ্রমণ পুস্তক হইতে অনুবাদিত।

তরু সকল সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র পল্লব-রাশির মধ্য দিয়া সর্-সর্ শব্দ করিতেছে; নারাঙ্গী জাতীয় নেবু সকল ঝোপ্-ঝাড়ের মধ্যে স্বকীয় স্বর্ণকান্তি বিকাশ করিতেছে এবং আমাদের দেশের অপেক্ষা জম্‌কালো, সুকুমার গোলাপ-গুচ্ছ সুপরিচিত সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। এই গোলাপসকল দেখিলে, ইরাণীদিগের প্রকৃতি ও ফর্দ্দুসীর কবিতার ভাব মনে মনে কল্পনা করা যায়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের নিহত ব্যক্তিগণ এই গোরস্থানে চিরবিশ্রাম উপভোগ করিতেছে। এখানকার পুষ্পরাজি সমানভাবে প্রস্ফুটিত—ইহাদের সৌন্দর্য্য এখানেও সমানভাবে বিকশিত হইতেছে। 'রৈসিডেন্সি' গৃহ—যাহা সর্ হেন্‌রি লরেন্‌স্ মুষ্টিপ্রমাণ সৈন্য লইয়া রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা ভগ্নাবশেষ মাত্র—অগ্নিবর্ষণে কালিমা-গ্রস্ত—কামানের গোলায় ছিদ্রীকৃত—হরিদ্‌বর্ণ শাখা পল্লব সমাকীর্ণ লতাজালে বেষ্টিত হইয়া আছে এবং তাহা হইতে হরিদ্রাবর্ণ পুষ্পগুচ্ছসকল অগ্নিশিখার ন্যায় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

এই মাত্র লক্ষ্ণৌ অবরোধের বর্ণনা আমি পুনর্ব্বার পাঠ করিলাম। এই ইতিহাসের মধ্যে বিশেষরূপে বিস্ময় আকর্ষণ করে কি?—না, সেই হৃদয়ের উচ্চ ভাব যাহা বিপদের সময় আত্মরক্ষাদিগকে বল বিধান করিয়াছিল। সাহসিকতা, যশস্পৃহা, স্বদেশানুরাগ, এই সমস্ত ছাড়া তাহাদের মধ্যে আরও কিছু অধিক ছিল। প্রথমতঃ তাহাদের প্রকৃতির অন্তস্তলে একপ্রকার গভীর গর্ব্বভাব ও নছোড়বন্দা দৃঢ়তা এবং তা ছাড়া অতি গম্ভীর উচ্চধরণের ধর্ম্মভাব নিহিত ছিল।

যে সকল সেনানায়ক ও সৈনিকেরা দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল, উহারা প্রতিদিন প্রাতে বাইবেলের সাম-গান শ্রবণ করিত—

সেই সাম-গীতি যাহা উহাদের 'পিউরিটান' পূর্ব্বপুরুষেরা নির্যাতন-কালে আপনাদিগকে উৎসাহিত ও সবল রাখিবার জন্য এক-সময়ে গাহিয়াছিল। বাইবেলের এই মহান্ বাক্য সকল এই সৈনিক পুরুষদিগের হৃদয়ে নিস্তব্ধ গম্ভীর উৎসাহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়াছিল—সেই উৎসাহানল যাহা বিপৎকালে নির্ভীক-চিত্তে ও শান্তভাবে জীবন বিসর্জ্জন করিবার বল বিধান করিয়া থাকে। "যিনি স্বকীয় কর্ত্তব্য সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই হেন্‌রি লরেন্‌স্, এইখানে বিশ্রাম করিতেছেন, মহাপ্রভু যেন ইহাঁর আত্মার সদ্‌গতি করেন।"—এই কথাগুলিমাত্র একটি সুরভি-পূর্ণ ক্ষুদ্র গোরস্থানের একটি ক্ষুদ্র সমাধি-প্রস্তরে খোদিত আছে।

আজ কাণপুরে সেই প্রসিদ্ধ কূপ দেখিলাম, যাহার মধ্যে নানা সাহেব ইংরাজদিগের সদ্যতন মৃতদেহসকল নিঃক্ষেপ করিয়াছিল—সেই সকল স্ত্রী, পুরুষ ও শিশু যাহারা তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল। তাহার চতুর্দ্দিকে বৃহৎ উপবনের নিস্তব্ধতা ও পুষ্পরাজির কমনীয় প্রশান্তি বিরাজ করিতেছে। কূপের চারিধারে গথিক ধরণের প্রস্তর-গরাদিয়ার ঘের। কূপের ধারে একটি পাষাণময় এঞ্জেল-মূর্ত্তি পক্ষ বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান—নেত্রের অবনত *দৃষ্টির মধ্যে স্বর্গের শান্তি ও মাধুর্য্য দীপ্যমান*—মার্জ্জনা-ভঙ্গীর ইঙ্গিতে, যুক্ত কর-যুগল নিম্নদিকে বিলম্বিত।

.. ..

আমরা এক্ষণে ক্রমাগত, উত্তর পশ্চিমে, মুসলমানদিগের প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিতেছি। ভারতবর্ষের এই রেল-পথের বন্দোবস্ত আমার খুব ভাল লাগে। গাড়ির মধ্যে স্বতন্ত্র প্রসাধন-কক্ষ আছে—সেখানে স্নানাদি করা যায়। গাড়ির গায়ে, উপরদিকে, শয্যামঞ্চ আট্‌কান থাকে, হাত-পা ছড়াইতে ইচ্ছা করিলে, সেগুলা

নামাইয়া দেওয়া যায়। রাত্রিকালে, এই এক একটি শয্যা-মঞ্চে শুই-বার প্রত্যেক যাত্রীরই অধিকার আছে। যদি পথে কেহ আহার করিতে ইচ্ছা করে, তবে গাড়ি-রক্ষককে পূর্ব্ব হইতে জানাইয়া রাখিতে হয়; রক্ষক তার-যোগে আহার প্রস্তুত করিবার আদেশ প্রচার করে—গাড়ি থামিলেই ষ্টেসনে আহারের আয়োজন প্রস্তুত দেখা যায়। প্রাতঃকালে হাজ্‌রি, একটার সময় টিফিন, ছয়টার সময় খানা প্রস্তুত থাকে। এইরূপে, সহস্র সহস্র মাইল-ব্যাপী স্থান, বিনা শ্রান্তিভোগে, অক্লেশে অতিক্রম করা যায়; তখন, সেই সকল গরিব বেচারাদিগের কথা মনে করিয়া দুঃখ হয়, যাহারা রাত্রির গাড়িতে, পারী নগর হইতে উঠিয়া, অনিদ্রাতে একেবারে নিষ্পেশিত ও জ্বরভাবাপন্ন হইয়া, মাসেই কিম্বা ব্রেষ্ট নগরে আসিয়া পৌঁছে।

আমার সহযাত্রীরা সকলেই বিশ্রম্ভালাপকারী, সামাজিক ও খোষমেজাজী। রাজকর্ম্মচারী, খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক পাদ্রি, ব্যবসাদার—এই সকল সহযাত্রীদিগের সহিত ১৫ মিনিটের মধ্যেই আলাপ হইয়া যায়। ইহাঁদের কথাবার্ত্তা জেনটেলম্যানের ন্যায় ভদ্র ও সকল সময়েই প্রায় শিক্ষাপ্রদ। সার্ব্বজনিক বিষয়ে ইহাঁদের অনুরাগ আছে, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে—রুসের অগ্রসর হওয়া সম্বন্ধে, ইহাঁদের বিশেষ মতামত আছে। উহাঁদের মধ্যে একজন আমাকে বলিলেন, পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষে স্বকীয় পার্লেমেণ্ট স্থাপিত হইবে। ইনি একজন আত্মশাসনের পক্ষপাতী। ইনি আরও বলিলেন—"ভারতবর্ষকে শিক্ষিত করিয়া তোলাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।" কিন্তু, ইহাতে এসিয়া-খণ্ডের প্রাচীনা রাণীকে ইংরাজি বিবি করিয়া তোলা হইবে না কি? তিনি বলিলেন "এই শিক্ষার কাজ একবার শেষ হইয়া গেলে, এখান হইতে প্রস্থান

করা ছাড়া আমাদিগের আর কিছু করিবার থাকিবে না। তখনই ভারতবর্ষের প্রতি আমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।" তাঁহার কন্যারা এই কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল —কন্যা দুইটি মনোমোহিনী ইংরাজ বালিকা, একেবারে টাট্‌কা ও টুক্‌টুকে—সাদা ফ্ল্যানেলের সাদাসিধা পোষাক-পরা। উহাদের গম্ভীর ও প্রশান্ত মুখশ্রী সহসা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানকার এই ইংরাজ বাসিন্দারা লক্ষীছাড়া লোক নহে—ইহাঁরা সচ্চরিত্র উদ্যোগ-শীল গৃহস্থ ইহাঁরা আপনাদের ইংরাজী 'হোমে'র স্বচ্ছতা, শান্তি ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে বাস করিয়া থাকেন।

"ইংলণ্ড ভারতবর্ষের প্রতি স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতেছে"— ইংলণ্ড ভারতবর্ষে সভ্যতা বিস্তার করিতেছে। তাহার দৃষ্টান্ত, জাতিভেদের কুসংস্কার বিনষ্ট করিবার জন্য ইংরাজেরা বেশ একটি ফলদায়ী উপায় অবলম্বন করিয়াছে; উহারা হিন্দুদিগকে ভ্রমণে প্রবৃত্ত করাইতেছে। বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিয়া, রেল-গাড়ির মধ্যে বিচিত্র লোকের সংস্পর্শে আসিয়া, উহাদের শিক্ষা লাভ হইতেছে— উহাদের মন প্রসারিত হইতেছে। এই উদ্দেশে রেল-কোম্পানীরা, ভ্রমণ-খরচার হার, যতদূর সম্ভব, কমাইয়া দিয়াছে। আমার ভৃত্য যে টিকিটে, কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া দিল্লি ও বোম্বাই ভ্রমণ করিয়া, আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল, সেই টিকিটে সে প্রায় তিন হাজার মাইল ভ্রমণ করিল, অথচ টিকিটের মূল্য ৪৪ টাকা মাত্র। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িগুলি প্রায় দেশীয় লোকেই পূর্ণ হইয়া যায়। এই চিত্রবিচিত্র লোকে পরিপূর্ণ গাড়িগুলি *অপেক্ষা চিত্রবৎ মনোহর দৃশ্য আর দ্বিতীয় নাই।*

এই রেলওয়ে লাইনের নির্ম্মাণকর্ত্তা ও স্বত্বাধিকারী যদিও ইংরাজ কিন্তু ইহার কর্ম্মচারী প্রায় সমস্তই দেশীয় লোক। হিন্দু

মিস্ত্রি, হিন্দু চালক, হিন্দু ষ্টেসনমষ্টার। ইহাদের দ্বারা কিরূপ কাজ চলে তাহাও দেখা যায়। ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের ন্যায় সেরূপ যন্ত্রবৎ কার্য্যপ্রণালী, সেরূপ ঠিক্‌ঠাক্ বন্দোবস্ত, সেরূপ গাম্ভীর্য্য, সেরূপ মতের স্থিরতা—এ সমস্ত উহাদের মধ্যে কিছুই নাই। আমি একবার, আমার জিনিসপত্র বেনারস হইতে একেবারে বোম্বায়ে চালান করিয়া পাঠাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম। তাহাতে ষ্টেসনে হুলস্থুল পড়িয়া গেল; ষ্টেশনমাষ্টার, কেরাণী, গার্ড, আমার ভৃত্য—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ঘোর বাকবিতণ্ডা চলিতে লাগিল;—মহা কল্লরব—উত্তেজিত অঙ্গভঙ্গী—উত্তর প্রত্যুত্তরের অনন্ত প্রবাহ। ইহার দরুণ, আমাদের গাড়ি ছাড়িতে বিশ মিনিট বিলম্ব হইয়া গেল, আমার তোরঙ্গ প্রভৃতির উপর নামধামের টিকিট আমার নিজেরই লাগাইতে হইল। না, ভারতবর্ষ এখনও একেবারে ইংরাজ হয় নাই - না, উহার শিক্ষা এখনও সাঙ্গ হয় নাই।

ষ্টেসনে পৌঁছিলে, আমার ভৃত্য তাড়াতাড়ি গাড়ি হইতে নামিয়া আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে, আমি ফল খাইতে চাহি কি না। ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রম, ক্ষুদ্র, ছিপ্‌ছিপে্ পাৎলা দুর্ব্বল আদর্শ-বাঙ্গালী—আমার এই ভৃত্যটি বড়ই কাজের; -একাধারে পথপ্রদর্শক, গৃহ-ভৃত্য, দোভাষী, সহচর সকলই। কেবল টেবিলে সে খানা খাও-য়াইবার কোন কাজ করিবে না, আমার সহিত তাহার এইটুকু বোঝাপড়া আছে। একজন খৃষ্টানকে শূকরের মাংস আহার করিতে দেখিলে,- মাংসাদির গন্ধ আঘ্রাণ করিলে, যে মলিনতা সঞ্চিত হয়, তাহা কিছুতেই বিধৌত হইবার নহে। এই ব্যক্তি ইংরাজি বেশ জানে, এবং যে প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছে ইহারও হাটহদ্দ সে বিলক্ষণ অবগত আছে; তাই, সে মাসিক বেতন ৩০টাকা করিয়া আমার নিকটে চাহিয়াছে। এই ৩০ টাকাতেই তাহার ভরণ-

পোষণ চলিয়া যায়—তাহাও খুব কম খরচে সে নির্ব্বাহ করে। একটা তাঁবার হাঁড়িতে একটু চাউল সিদ্ধ করে—তাহাই ভূমির উপর উভু হইয়া বসিয়া আহার করে। আর, মুখ ধুইবার জন্য তাহার একটু জলের আবশ্যক। এ ছাড়া, তার আর কিছুই প্রয়োজন হয় না। আমার জিনিসপত্রের তালিকা করা, আমার বোচকা বুচকির হিসাব রাখা, প্রতিবার ঐ সকলের গুণ্‌তি করা, যাহাতে আমি জিনিসগুলা না হারাই তাহার ব্যবস্থা করা—ইহাই তাহার প্রকৃত কাজ। আমার একটা রুমাল এদিক-ওদিক করিবার যো নাই, অমনি, তিন মিনিটের মধ্যেই সে কথা তার গোচরে আইসে, আর, আমাকে সমস্ত পকেট খোঁজাইয়া তবে ছাড়ে। ধর্ম্ম ও জাতিতে হিন্দু, সম্প্রদায় শৈব,—মনে হয়, যেন বানর ও গরুদের প্রতিই উহার বিশেষ ভক্তি। এই বিষয় লইয়া আমি যখন উহাকে উপহাস করি, উহার মুখে একটু হাসি দেখা দেয় মাত্র—কিন্তু কোন কথা কহে না।

ছেদিলাল জাতিতে শূদ্র। এই শূদ্রজাতি ব্রহ্মার চরণ হইতে উৎপন্ন। মনু বলেন "দেহ ও মন পরিশুদ্ধ, উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের বিনীত দাস, কখন উদ্ধত নহে, ব্রাহ্মণের নিকটেই আশ্রয় যাচ্ঞা করে—ইহারাই প্রকৃত শূদ্র।" এই ব্যক্তি ফড়িঙ্গের ন্যায় বলবান—একটা কার্পেট ব্যাগের ভারেই ধরাশায়ী হইয়া পড়ে। তাই আমার সহিত এইরূপ বোঝাপড়া হইয়াছে, তাহাকে কোন দ্রব্য বহন করিতে হইবে না। কিন্তু ওদিকে, সে ছায়ার ন্যায় আমার অনুসরণ করে, বিশ্বাসী কুকুরের ন্যায় আমার দরজার সাম্‌নে সর্ব্বদা শুইয়া থাকে এবং ভিক্ষুকেরা আমাকে আক্রমণ করিলে সিংহবিক্রমে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করে। সংস্কৃত, ইংরাজি, বাঙ্গলা, হিন্দুস্থানী—এই সকল ভাষার কতিপয় শব্দ এবং রাজা, শা, খান্ প্রভৃতি বড়

বড় লোকের ইতিহাস ইহার কতকটা জানা আছে। তাছাড়া লণ্ঠ-নের আলোকে কি একটা রহস্যময় ভাষায় গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও, উহার হৃদয় অতীব বিনীত, প্রকৃত শূদ্রের ন্যায় ভীত ও বিশুদ্ধ-মনা।

উহার সহিত অনেকবার আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছে। কলি-কাতার প্রটেষ্টাণ্ট মিশনারিদিগের দ্বারা শিক্ষিত হইয়াও সে খৃষ্টান হয় নাই; ছেদি ইংরাজদিগকে খুব ভাল বাসে। "ইংরাজ জজ গরিব লোককে বলে—তোর কথাই ঠিক ও ধনী লোককে বলে -তোর কথা ঠিক্ না।" এই ছোট-খাটো কথাটি বারম্বার পুনরাবৃত্তি হওয়াতেই ভারতবর্ষে ইংরাজের রাজত্ব সুদৃঢ় হইয়াছে। ইংরাজের আমলে কৃষকেরা শান্তির মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। হিন্দু কিম্বা মুসলমান রাজকর্ম্মচারী উহাদিগকে আর উত্ত্যক্ত ও উৎপীড়িত করিতে পারে না। নিয়মিতরূপে সরকারকে উহারা অল্পস্বল্প একটা নির্দ্ধারিত কর দিয়া থাকে—তাহার পর, যাহা অব-শিষ্ট থাকে তৎসমস্তই তাহাদের নিজের। এক্ষণে উহারা নিরা-পদের ভাব মনে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে—এই ভাবটি হিন্দু কৃষকের নিকট একেবারেই নূতন।

কিন্তু অপর পক্ষে, ছেদিলাল ইংরাজ সৈনিকদিগকে ভাল বাসে না। উহারা অত্যন্ত গর্ব্বিত—"গরিব হিন্দুদিগকে উহাদের জিনিস-পত্র বহন করিতে হয়।" এই কথাটুকুই যথেষ্ট। ব্রিটেন-সৈনিক-দিগের গর্ব্বান্ধতা—উহাদের উদ্ধত নীরবতা সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়। নীচ-শ্রেণীয় ইংরাজদিগের যে সুখ-স্বপ্ন, 'টমি অ্যাট্‌কিন্‌স্' ভারত-বর্ষে আসিয়া তাহা বাস্তবে পরিণত দেখিতে পায়; সে আপনাকে জেন্‌টলম্যান বলিয়া মনে করে এবং জেন্‌টেল্‌ম্যানের উপযুক্ত সেবা অন্যের নিকট হইতে আদায় করে। কতবার আমি দেখিয়াছি,

ইংরাজ সৈনিক ট্রেণ হইতে নামিতেছে,—গর্ব্বিত, প্রশান্ত, উন্নত-মস্তক—কটা চুল পমেটমের দ্বারা পেটি পাড়ানো—কায়দা-দুরস্ত-ভাবে দস্তানা-পরা—ছড়ি হস্তে—পাদুকা-সংলগ্ন অঙ্কুশ-কণ্টকের ঝন্ ঝন্ শব্দ হইতেছে—ফুল্ল বক্ষ ও সুদীর্ঘ দেহের দ্বারা আতঙ্ক উৎপাদন করিয়া কুলীদিগের উপর প্রভুত্ব করিতেছে - কুলীরা তাহা-দিগের বোচকা-বুচকির ভারে একেবারে অবনত হইয়া পড়িতেছে।

আমরা এক্ষণে, ক্রমাগত উত্তর পশ্চিমাভিমুখে - মুসলমানদিগের দেশে ধাবমান হইতেছি। আহা! এই অঞ্চলটি কেমন সুন্দর! অনন্ত প্রসারিত সমভূমি—মরুদেশ। স্থানে স্থানে, শুভ্র, বড় বড় খাঁক্ড়া ঘাস যেন রজত ঢালিয়া দিয়াছে—এক সার, আর এক সারের গায়ের উপর চাপিয়া পড়িয়া এই খাঁক্ড়া ঘাসগুলা দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। উহাদের শুষ্ক ও সরল শিশ্‌গুলি ডাঁটা ছাড়াইয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে এবং তদুপরি ধূমবৎ-লঘু পুষ্পগুচ্ছ-সকল বিকম্পিত হইতেছে। কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়, হরিণেরা দুল্‌কি চালে ইতস্তত দৌড়িতেছে এবং দৌড়িতে দৌড়িতে সহসা থামিয়া, একটা পা উঠাইয়া, উদ্বিগ্নভাবে তাহাদের সংকীর্ণ মস্তক আমাদের দিকে ফিরাইয়া আছে। অতীব গম্ভীর, কতকগুলা সারস ও বক আমাদিগের গতি নিরীক্ষণ করিতেছে। বৃহৎ আকাশ আলোকপ্রভায় বাষ্পবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। সিধা ও ঝক্‌ঝকে রেলগুলা আমাদের সম্মুখ দিয়া হুহু করিয়া সরিয়া যাইতেছে—অদূরে এমন এক স্থলে গিয়া মিশিতেছে যেখানে আমাদের পৌঁছিবার আর কোন সম্ভাবনা নাই। রাত্রিকালে, এই শূন্য সমভূমির অন্ধকারময় নিস্তব্ধতা অতীব গম্ভীর। কখন কখন, বহুদূরে মহা নিস্তব্ধতার মধ্য হইতে একটা অস্ফুট ধ্বনি—শৃগালের উন্মত্ত চীৎকার,—কি এক রহস্যময় ভাবে হৃদয়ে আসিয়া আঘাত করে।

... ...

এই দেখো, আমরা সেই পূর্ব্বতন মোগলদিগের রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এখানে অনেক দেখিবার আছে; তন্মধ্যে ইমারৎ, প্রাসাদ, সমাধি-মন্দির বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য। এই মুসলমানেরা কালের বিরুদ্ধে, মৃত্যুর বিরুদ্ধে যুঝাযুঝি করিয়াছে; পৃথিবী হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইতে উহারা কিছুতেই সম্মত হয় নাই। এই মায়াময় জগতের পৃষ্ঠে, ক্ষণকালের জন্য যে সকল আত্মার উদয় হইয়াছিল, সেই শান্তিপ্রিয় স্বপ্নদর্শী হিন্দুরা আপনাদের কোন চিহ্ন না রাখিয়া, বিনাযুদ্ধে, পরমাত্মার মধ্যে পুনর্ব্বার বিলীন হইয়া গেল। পক্ষান্তরে, দুর্দ্দান্তপ্রবৃত্তি, ইচ্ছাবলে বলীয়ান্ মুসলমানেরা জীবিতকালে যেরূপ তলোয়ার ও অগ্নির দ্বারা আত্ম-সংস্থাপন করিয়াছিল, সেইরূপ মৃত্যুর পরেও মণিমাণিক্য ও মর্ম্মর-প্রস্তরের দ্বারা এখানে স্বকীয় অস্তিত্ব সমর্থন করিল।

উহাদের মধ্যে আকৃবর একজন। নীরব নিস্তব্ধ ভূখণ্ডের উপর প্রথম দিনের অভ্যুদয়ের ন্যায়, তাঁহার সমাধি-মন্দির অক্ষুণ্ণ ও অক্ষতভাবে উর্দ্ধে মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে। চারিদিকে চারিটা তোরণ-দ্বার চারিটা স্মৃতিসূচক বিজয়-খিলান— তাহার পার্শ্বে মিনার-স্তম্ভ—মিনার-স্তম্ভের মাথায় চূড়া-কিরীটি বিরাজিত। এই দ্বার দিয়া একটি বিজন উদ্যানে প্রবেশ করা যায়—সেখানে হরিৎ-রাশির মধ্যে কাঞ্চন-গুচ্ছ সকল দোদুল্যমান। উহার প্রত্যেক অংশ হইতে লাল পাথরের বাঁধানো রাস্তা প্রসারিত—এই সকল রাস্তা কেন্দ্রস্থ স্মৃতি-মন্দিরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই সমাধি-মন্দিরটি যুগপৎ চীন ও আরব ধরণের। একটু একটু পিছাইয়া পিছাইয়া, একটার উপর আর একটা,—এইরূপ কতকগুল ছাদ উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত এবং তাহাদের শিরোদেশে মোগল ধরণের

চূড়া-কক্ষ সকল বিরাজিত। এখানে শূন্য যেন পূর্ণকে ধারণ করিয়া আছে। সরু সরু স্তম্ভশ্রেণী, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মর্ম্মরফলক বহন করিতেছে। সেই সকল মর্ম্মর-ফলকের উপর, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিবিধ প্রস্তর, অতি পরিপাটীরূপে বসানো হইয়াছে, মর্ম্মরের শুভ্র গাত্রে উহারা যেন জ্বল জ্বল করিতেছে। এই ছাদগুলি চতুষ্কোণ—উহার কুট্টিম-ভূমির উপর প্রস্তর-খচিত 'মোজেয়িক' কারুকার্য্য। ছাদের চারি ধারে সরু সরু থাম উঠিয়া ছুঁচালো ধরণের খিলান-গুলিতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই মর্ম্মর-স্তম্ভের পশ্চাতে,ছাদের চারি ধার দিয়া, একটা বারাণ্ডা-পথ ঘুরিয়া গিয়াছে। অতি সূক্ষ্ম জালি-কাটা প্রস্তর-কবাট দ্বারা এই পথ বাহির দিক দিয়া রুদ্ধ। কবাটের শিল্প-কার্য্য এমন লঘু ও সুকুমার ধরণের যে, এখান-কার উজ্জ্বল তরুণ বায়ু উহার সর্ব্বাংশে প্রবেশ করিয়াও উহাকে ধ্বংশ করিতে পারিতেছে না। মন্দিরের অভ্যন্তরে, মধ্যস্থলে, সেই মধ্যবিন্দু যেখানে চতুষ্কোণের ব্যাস-রেখা গুলি আসিয়া মিলিত হইয়াছে সেইখানে আক্‌বরের সমাধি-ভূমি প্রসারিত ;—একটা লম্বা ধরণের চতুষ্কোণ মর্ম্মর-প্রস্তর—তাহার গায়ে, অর্দ্ধস্ফুট পদ্ম-সকল খুদিয়া বাহির করা ও সেই পদ্মের সুকুমার বৃন্তসকল অতি মধুর ভঙ্গী সহকারে চারিদিকে প্রসারিত হইয়াছে। তত্রস্থ তামসী ছায়ার মধ্যে, দুই শত বৎসর ধরিয়া, মোগল-সম্রাট নিদ্রা যাইতে-ছেন। বহির্ভাগে, আলোকের মধ্যে তাঁহার মহিমা ঘোষণ করি-বার উদ্দেশে, এই মর্ম্মরপ্রস্তরের স্তূপ—এই সকল রঙ্গীন প্রস্ত-রের উজ্জ্বলতা—এই সকল প্রস্তরখচিত কারুকার্য্যের প্রাচুর্য্য—এই সকল পরিপাটী সরল রেখা-বিন্যাস—মজুর প্রজাদিগের কষ্টের বিনিময়ে শিল্পনৈপুণ্যের এই পরাকাষ্ঠা সাধিত হইয়াছে। আর সকলই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে, কেবল এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর স্থপতি-

শিল্পটি এই শান্তিময় ক্ষেত্রের মধ্যে নীল আকাশের নীচে এখনও বিরাজমান।

'অ্যাকর্ডিয়ন'-বাদ্যযন্ত্রের স্বরলহরী বায়ুমধ্যে বিচরণ করিতেছে। কতকগুলি ইংরাজ সৈনিক, এই সমাধি-মন্দিরের ছাদে বেড়াইতে আসিয়াছে। উহারাই উহাদের দেশীয় সুর বাজাইতেছে ·· .·· ··· বারাণ্ডা-গরাদিয়ার উপর হাতের কুনুই রাখিয়া, তাহাদের মধ্যে চারিজন পাইপের ধূম পান করিতেছে। সেই ধূম-লহরী, চারিদিককার দৃশ্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সুধীর প্রশান্ত ভাবে ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইতেছে।

যে স্বপ্ন-দৃশ্য চিরকালের মত এখনি পলায়ন করিবে, তাহার বিবরণ তন্ন তন্ন করিয়া টুকিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়। আজ ৯ ডিসেম্বর, সাড়ে এগারটা বেলা; দেখ, এই আক্‌বরের সমাধি-মন্দিরের উপর হইতে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য আমি দেখিতে পাইতেছি। ঐ দিকে ঐ প্রস্তরময় কবাট ও শুভ্র চূড়া-কক্ষশ্রেণী ছাড়াইয়া, এক খণ্ড চতুষ্কোণ উদ্ভিজ্জ-গালিচা। স্তূপাকৃতি—অন্ধকারসমাচ্ছন্ন ও বিচিত্র কুসুম-শোভায় সমুজ্জ্বল—একটা বৃহৎ কৃত্রিম উপবন—তাহার চারিদিকে বুরুজ-বিশিষ্ট প্রাচার। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমে, স্মৃতিমন্দির হইতে সহস্রাধিক হস্ত দূরে, প্রকাণ্ড চারিটা তোরণ, লাল বেলে পাথরের চারিটা চতুষ্কোণ শিরোভূষণ গাঁথুনি—তাহাতে সাদা মর্ম্মরের চেক্‌নাই এবং তাহার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড চুঁচাগ্র-খিলানের ছিদ্র বিরাজমান। তাহা ছাড়াইয়া, চারিদিকে পাটখিলা রঙ্গের বিস্তৃত ক্ষেত্র। হল্‌দে শুষ্ক ঘাসের উপর, বৃক্ষগম্বুজ সকলের ঘোর সবুজ বর্ণ দাগ যেন স্থানে স্থানে অঙ্কিত। *পূর্ব্বদিকে, নাল জলের তরল ফিতাসকল গড়াইয়া গিয়াছে।* ইতস্তত ক্ষেত্রের নীরবতার মধ্যে কতকগুলি স্তম্ভ, তৃণপল্লবের

মধ্য হইতে কতকগুলি সৌধ-চূড়া মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে। এই সমস্ত একটি রাজধানীর ভগ্নাবশেষ। সে রাজধানীর আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। কেবল কতকগুলি অবিনশ্বর স্মৃতি-মন্দির বর্ত্তমান। এই সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কুজ্ঝটিকার ম্লান আলোকে, তাজ-মর্ম্মরের ম্লান দীপ্তি, দূরস্থ মেঘখণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে।

নূতন অবতার।

প্রথম অঙ্ক।

নন্দকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

(স্বগত) তুমি রুদ্দুর বক্‌শি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর পুষ্করিণীটি কেড়ে নিয়ে খিড়কির পুকুর করেছ! আচ্ছা দেখা যাবে তুমি ভোগ কর কেমন করে! ঐ পুকুরে দুবেলা ছত্রিশ জাতকে স্নান করাব তবে আমি ব্রাহ্মণের ছেলে! (সমাগত প্রতিবেশীবর্গের প্রতি) তা, তোমরা ত সব শুনেছ দেখচি! সে স্বপ্নের কথা মনে হলে এখনো গা শিউরে ওঠে। ভাই, উপ্‌রি উপ্‌রি তিন রাত্তির স্বপ্ন দেখ্‌লুম—মা গঙ্গা মকরের উপর চড়ে' আমার শিয়রের কাছে এসে বল্লেন, ওরে বেটা নন্দ, তোর কুবুদ্ধি ধরেছিল তাই তুই রুদ্দুর বক্‌শির সঙ্গে পুষ্করিণী নিয়ে মামলা করতে গিয়েছিলি! রুদ্দুর বক্‌শি কে তা জানিস্? সত্য যুগে যে ছিল ভগীরথ সেই আজ বক্‌শির ঘরে আবির্ভাব করেছে। হুগ্‌লি পুলের উপর দিয়ে যে দিন থেকে গাড়ি চলেছে সেই দিন থেকে আমিও তোদের

ঐ পুষ্করিণীতে এসে অধিষ্ঠান হয়েছি।—তখন আমার মনে হল, ওরে বাপ্‌রে! কি কাণ্ডই করেছি! যিনি স্বয়ং কলিযুগের ভগীরথ তাঁরই সঙ্গে কি না গঙ্গার দখল নিয়ে আদালতে মকদ্দমা! এমন পাপও করে! এখন বুঝ্‌তে পারচি মকদ্দমায় কেন হার হল এবং তোমরা পাড়ার সকলেই বা আদালতে হলফ্ নিয়ে কেন পরিষ্কার মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে এলে! এ সমস্তই দেবতার কাণ্ড! তোমাদের মুখ দিয়ে অনর্গল মিথ্যে কথা একেবারে যেন গোমুখী থেকে গঙ্গাস্রোতের মত বেরতে লাগ্‌ল—আমি নিতান্ত মূঢ়মতি, পাপিষ্ঠ বলে প্রকৃত তত্ত্ব তখনও বুঝ্‌তে পারলুম না—মায়াতে অন্ধ হয়ে রইলুম এবং টাকাগুলো কেবল উকীলে লুটে খেলে! (অশ্রুবিসর্জ্জন। এবং ভক্তিবিহ্বল নরনারীগণের হরিধ্বনি সহকারে কলিযুগের ভগীরথ দর্শনে গমন।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রুদ্রনারায়ণ বক্‌শী।

(স্বগত) তাই বটে!—ছেলেবেলা থেকে বরাবর অকারণে কেমন আমার একটা ধারণা ছিল, যে, আমি বড় কম লোক নই। এত দিনে তার কারণটা বোঝা যাচ্চে। আর এও দেখেছি ব্রাহ্মণের ঐ পুষ্করিণীটির প্রতি আমার অনেক দিন থেকে লোভ পড়েছিল—থেকে থেকে আমার কেবলই মনে হত ও পুকুরটা কোন মতে ঘিরে না নিতে পারলে মেয়েছেলেদের ভারি অসুবিধে হচ্চে! একেবারে সাফ মনেই ছিল না, যে, আমি ভগীরথ, আর মা গঙ্গা এখনো আমাকে ভুলতে পারেন নি! উঃ, সে জন্মে যে তপিস্যেটা করেছিলুম এ জন্মেকার মিথ্যে মকদ্দমা গুলো তার কাছে লাগে কোথায়!

(ভক্তমণ্ডলীর প্রতি ঈষৎ সহাস্যে) তা কি আর আমি জান্‌তেম না? কিন্তু তোমাদের কাছে কিছু ফাঁস করি নি—কি জানি পাছে বিশ্বাস না কর। কলিকালে দেবতা ব্রাহ্মণের প্রতি ত কারো ভক্তি নেই। তা ভয় নেই, আমি তোমাদের সব অপরাধ মাপ করলুম।—কে গো তুমি? পায়ের ধুলো? তা এই নাও! (পদ প্রসারণ) তুমি কি চাওগা? পদোদক? এস, এস! নিয়ে এস তোমার বাটি—এই নাও—খেয়ে ফেল! ভোর-বেলা থেকে পদোদক দিতে দিতে আমার সর্দ্দি হয়ে মাথা ভার হয়ে এল।—বাছা, তোমরা সব এস কিছু ভয় নেই! এতদিন আমাকে চিন্‌তে পার নি সে ত আর তোমাদের দোষ নয়! আমি মনে করেছিলুম কথাটা তোমাদের কাছে প্রকাশ করব না; যেমন চল্‌চে এম্‌নিই চল্‌বে—তোমরা আমাকে তোমাদের মাধব বক্‌শির ছেলে রুদ্দুর বক্‌শি বলেই জান্‌বে! (ঈষৎ হাস্য) কিন্তু মা গঙ্গা যখন স্বয়ং ফাঁস করে' দিলেন তখন আর লুকোতে পারলুম না। কথাটা সর্ব্বত্রই রাষ্ট্র হয়ে গেছে! ও আর কিছুতে ঢাকা রইল না। এই দেখ না হিন্দুপ্রকাশে কি লিখেছে। ওরে তিনকড়ে, চট্ করে' সেই কাগজখানা নিয়ে আয়ত! এই দেখ—"কলিযুগের ভগীরথ এবং ফজুগঞ্জের ভাগীরথী"—লোকটার রচনাশক্তি দিব্য আছে। আর সেই পর্শুদিনকার বঙ্গতোষিনীখানা আন্ দেখি তাতেও বড় বড় দুখানা চিঠি বেরিয়েছে। কি! খুঁজে পাচ্চিস্ নে? হারিয়েছিস্ বুঝি? হারায় যদি ত তোর দুখানা হাড় আস্ত রাখ্‌ব না তা জানিস্! সে দিন যে তোর হাতে দিয়ে বলে' দিলুম আল্‌মারীর ভিতর তুলে রেখে দিস্! পাজি বেটা নচ্ছার বেটা! হারামজাদা বেটা! কোথায় আমার কাগজ হারালি, বের করে' দে! দে বের করে'! যেখান থেকে পাস্ নিয়ে আয় নইলে

তোকে পুঁতে ফেল্‌ব বেটা!—ওঃ, তাই বটে, আমার ক্যাশ্‌-বাক্সের ভিতরে তুলে রেখেছিলুম। ওহে হরিভূষণ, পড়ে' শুনিয়ে দাও ত, আমার আবার বাঙ্গলা পড়াটা ভাল অভ্যেস নেই।—কে গা? মতি গয়লানী বুঝি? তা এস এস—আমি পায়ের ধুলো দিচ্চি—দুধের দাম নিতে এসেছ?—এখনো শোন নি বুঝি? নন্দ মুখুয্যেকে মা গঙ্গা কি স্বপন দিয়েচেন সে সব খবর রাখ না! বেটি, তুই আমার পুকুরের জল দুধের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে বিক্রি করেছিস্‌—সে জলের মাহাত্ম্য জানিস্‌? কেমন? সবার কাছে কথাটা শুন্‌লি ত? এখন হিসেবটা রেখে পায়ের ধুলো নিয়ে আমার খিড়কির ঘাটে চট্‌ করে' একটা ডুব দিয়ে আয়গে যা!—

এই এখনি যাচ্চি। বেলা হয়েছে সে কি আর জানিনে? ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেল? তা কি কর্ব্ব বল? লোক জন সব অনেক দূর থেকে একটু পায়ের ধূলোর প্রত্যাশায় এসেছে এরা কি সব নিরাশ হয়ে যাবে? আচ্ছা উঠি। ওরে তিনকড়ে, তুই এখানে হাজির থাকিস্‌—যারা আমাকে দেখ্‌তে আস্‌বে সব বসিয়ে রাখিস্‌ আমি এলুম বলে'। খবরদার দেখিস্‌ যেন কেউ দর্শন না পেয়ে ফিরে না যায়! বলিস্‌ ভগীরথ ঠাকুরের ভোগ হচ্চে। বুঝলি? আমি দুটো ভাত মুখে দিয়েই এলুম বলে'।

রেধো, তুই যে একেবারে সীধে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি? তোর কি মাথা নোয় না নাকি? তোর ত ভারি অহঙ্কার দেখ্‌চি! বেটা তোর ভক্তির লেশমাত্র নেই! পাজি বেটা তোকে জুতো মেরে বিদায় করে' দেব তা জানিস্‌! সবাই আমাকে ভক্তি করচে আর তুই বেটা এত বড় খৃষ্টান্‌ হয়েছিস্‌ যে, আমাকে দেখে প্রণাম করিস্‌ নে! তোর পরকালের ভয় নেই? বেরো আমার বাড়ি থেকে!

ছি বাবা উমেশ, তোমার এত বয়স হল, তবু কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয় শিখলে না? যে ভগীরথ মর্ত্ত্যে গঙ্গা এনেছিলেন তাঁর গল্প মহাভারতে পড়েছ ত? ভুল করচ—ঐরাবত নয়, সে ভগীরথ। আমাকে সেই ভগীরথ বলে' জেনো! বুঝেছ? মনে থাক্‌বে ত? ভগীরথ,—ঐরাবত নয়। সেই জায়গাটা মাষ্টা-রের কাছে পড়ে' নিয়ো! এসো বাবা, তোমার মাথায় পায়ের ধূলো দিয়ে দিই!

কই! ভাত কই! আমি আর সবুর করতে পারচিনে—দেশ-দেশান্তর থেকে সব লোক আস্‌চে! কি গো গিন্নি, এত রাগ কিসের? হয়েছে কি? খিড়কির পুকুরে লোকজনের ভিড় হয়েছে? নাওয়া, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, জলতোলা সমস্ত বন্ধ হয়েছে? কি করব বল! আমি স্বয়ং ভগীরথ হয়ে গঙ্গা থেকে ত কাউকে বঞ্চিত করতে পারিনে! তা হলে আমি এত তপিস্যে করে' এত কষ্ট করে' গঙ্গা আনলুম কেন? তোমাদের ময়লা কাপড় কাচবার জন্যে—বটে! যখন ব্রাহ্মণের সঙ্গে মকদ্দমা করছিলুম তখন তোমরা সেই আশায় বসেছিলে, আসল কথাটা কেবল আমি জানতুম আর মা গঙ্গাই জান্‌তেন!—কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা—তুই বিশ্বাস করিস্‌নে! জানিস্‌, তোকে বিয়ে করে' তোর চোদ্দ পুরুষকে আমি উদ্ধার করেছি! বাপের বাড়ি যাবে! যাওনা! মরবার সময় আমার এই গঙ্গায় আস্‌তে দেব না! সেটা মনে রেখো!—ভাত আর আছে ত? নেই? আমি যে তোমাকে বেশি করে' রাঁধতে বলে' দিয়েছিলুম! আমার প্রসাদ নিয়ে যাবে বলে' যে দেশ বিদেশ থেকে লোক এসেছে! যা রেঁধেছ, এর একটা একটা ভাত খুঁটে দিলেও যে কুলবে না! রান্নাঘরে যত ভাত আছে সব নিয়ে এস—তোমরা সব চিঁড়ে আন্‌তে দাও—

পুকুর থেকে গঙ্গাজল এনে ভিজিয়ে খেয়ো! কি করব বল! দূর থেকে নাম শুনে প্রসাদ নিতে এসেছে তাদের ফেরাতে পারব না! কি বল্লে? আমার হাতে পড়ে' তোমার হাড় জ্বালাতন হয়ে গেল? কি বল্‌ব, তুমি মূর্খু মেয়েমানুষ; ঐ কথাটা একবার দেশের ভাল ভাল পণ্ডিতদের কাছে বল দেখি! তারা তখনি মুখের উপর শুনিয়ে দেবে, ষাট হাজার সগরসন্তান জলে ভস্ম হয়ে গিয়েছিল সেই ভস্মে যিনি প্রাণ দিয়েছেন, তিনি যে তোমার হাড় জ্বালাবেন একথা কোন শাস্ত্রের সঙ্গেই মিল্‌চে না! তুমি গাল দাও, আমি আমার ভক্তদের কাছে চল্লুম! (বাহিরে আসিয়া) কিছু দেরি হয়ে গেল। বাড়ির মধ্যে এঁয়ারা সব আবার কিছুতেই ছাড়েন না, পায়ের ধূলো নিয়ে পূজো করে' বেলা করে' দিলেন। আমি বলি, থাক্ থাক্ আর কাজ নেই—তারা কি ছাড়ে!—এস, তোমরা একে একে এস—যার যার ধুলো নেবার আছে নিয়ে বাড়ি যাও!—কিহে বিপিন? আজ মকদ্দমার দিন? তা ত যেতে পারচিনে। দর্শন করতে সব লোকজন আস্‌চে। একতরফা ডিক্রি হবে? কি করব বল! আমি উপস্থিত না থাকলে এখানেও যে এক-তরফা হয়। বিপ্‌নে! তুই যাবার সময় প্রণাম করে গেলিনে? এম্‌নি করেই অধঃপাতে যাবে! আয়, এইখানে গড় কর্, এই নে, ধূলো নে! যা!

তৃতীয় অঙ্ক।

ওহে মুখুয্যে, মা গঙ্গা ঠিক আমার এই খিড়কির কাছটায় না এসে আর রসি দুয়েক তফাতে এলেই ভাল করতেন। তুমি ত দাদা স্বপ্ন দেখেই সারলে, আমাকে, যে, দিনরাত্তির অসহ্য ভোগ ভুগ্‌তে হচ্চে। এক ত, পুকুরের জল দুধে বাতাসায় ডাবে আর

পদ্মের পাতায় পচে' দুর্গন্ধ হয়ে উঠেছে—মাছগুলো মরে' মরে' ভেসে উঠ্‌চে—যেদিন দক্ষিণের বাতাস দেয় সে দিন মনে হয় যেন নরক-কুণ্ডুর দক্ষিণের জান্‌লা দরজাগুলো সব কে খুলে দিয়েছে—সাত-জন্মের পেটের ভাত উঠে আসবার যো হয়। ছেলেগুলো যে কটা দিন ছিল কেবল ব্যামোয় ভুগেছে; কলিযুগের ভগীরথ হয়ে ডাক্তা-রের ফি দিতে দিতেই সর্ব্বস্বান্ত হতে হল—তারা সব যমদূত, ভক্তির ধার ধারে না, স্বয়ং মা গঙ্গাকে দেখ্‌তে এলে পূরোভিজিট্‌ আদায় করে' ছাড়ে। সেও সহ্য হয়—কিন্তু খিড়কির ধারে ঐ যে দেশ-বিদেশের মড়া পুড়তে আরম্ভ হয়েছে ঐটেতে আমাকে কিছু কাবু করেছে। অহর্নিশি চিতা জ্বলছে—কাছাকাছি যে সমস্ত বসতি ছিল সে সমস্তই উঠে গেছে—রাত্তিরে যখন হরিবোল্‌ হরিবোল্‌ শব্দ ওঠে, এবং শেয়ালগুলো ডাক্‌তে থাকে তখন রক্ত শুকিয়ে যায়। স্ত্রী ত বাপের বাড়ি চলে' গেছেন। বাড়িতে চাকরদাসী টিঁক্‌তে পারে না। ভূতের ভয়ে দিনে দুপরে দাঁতকপাটি খেয়ে খেয়ে পড়ে। চারটি বেঁধে দেয় এমন লোক পাইনে। রাত্তিরে নিজের পায়ের শব্দ শুন্‌লে বুকের মধ্যে দুড়দুড় করতে থাকে—বাড়িতে জন-মানব নেই—গঙ্গাযাত্রীর ঘর থেকে কেবল থেকে থেকে তারক-ব্রহ্ম নাম শুনি, আর গা ছম্‌ছম্‌ করতে থাকে! আবার হয়েছে কি—ছেড়েও যেতে পারি নে। আমার ভগীরথ নাম চতুর্দ্দিকেই রাষ্ট্র হয়ে গেছে—সকলেরই দর্শন করতে ইচ্ছা হয়—সে দিন পশ্চিম থেকে দুজন এসেছিল তাদের কথাই বুঝ্‌তে পারিনে। বেটারা ভক্তি করলে বটে কিন্তু আমার থালাবাটিগুলো চুরিও করে গেছে! এখান থেকে উঠে গেলে হয় ত ঠিকানা না পেয়ে অনেকে ফিরে যেতে পারে। এ দিকে আবার বিষয় কর্ম্ম দেখ্‌তে সময় পাচ্চিনে—আমার পত্তনী তালুকটার খাজানা বাকী পড়েছে;

শুনেছি জমিদার অষ্টম করবে। শরীর ভয়ে, অনিয়মে এবং ব্যামোয় রোজ শুকিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তারে ভয় দেখাচ্চে এ জায়গা না ছাড়লে আমি আর বেশি দিন বাঁচ্‌ব না। কি করি বল ত দাদা! রুদ্দুর বক্‌শি ছিলুম, সুখে ছিলুম, কোন ল্যাঠাই ছিল না—ভগীরথ হয়ে কোন দিক্ সামলে উঠ্‌তে পারচিনে—আমার সোনার পুরী একেবারে শ্মশান হয়ে গেছে।—আবার কাগজগুলো আজকাল আমার সঙ্গে লেগেছে—তারা বলে সব মিথ্যে। তাদের নামে লাইবেল্ আনবার জন্য উকীলের পরামর্শ নিতে গিয়েছিলুম—উকীল বল্লে তুমিই যে ভগীরথ সেটা প্রমাণ করতে গেলে সত্য যুগ থেকে সাক্ষী তলব করতে হয়—স্বয়ং ব্যাসদেবের নামে শমন জারি করতে হয়। শুনে আমার ভরসা হল না। এখানকার লোকের মনেও ক্রমে সন্দেহ জন্মে' গেছে;—মতি গয়লানীর সঙ্গে একরকম ঠিক হয়েছিল আমি পদোদক দেব আর সে দুধ দেবে—আজ দুদিন থেকে সে মাগী আবার তার হিসেব নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে; ভাবে গতিকে স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারচি টাকার বদলে আমি তাকে পায়ের ধূলো দিতে গেলে সেও আমার উপরে পায়ের ধূলো ঝেড়ে যাবে, ভয়ে কিছু বল্‌তে পারচিনে। পুকুরটাত গেছেই, আমার স্ত্রী পুত্র কন্যারাও ছেড়ে গেছে, চাকর দাসীও পালিয়েছে, প্রতিবেশীরাও গ্রাম ছেড়ে নতুন বসতি করেছে, আমার ভগীরথ নামটাও টেঁকে কি না সন্দেহ, কেবল কি একা মা গঙ্গা আমাকে কিছুতেই ছাড়্‌বেন না? মা গঙ্গাকে নিয়ে কি আমার সংসার চল্‌বে? রাস্তায় বেরলে আজকাল ছেলেগুলো ঠাট্টা করতে আরম্ভ করেছে, যে, রুদ্দুর বক্‌শির গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছে।—এই ত বিপদে পড়া গেছে! দাদা, আবার একবার তোমাকে স্বপন দেখ্‌তে হচ্চে!

দোহাই তোমার, দোহাই মা গঙ্গার, হুগলির পুলের নীচে যদি তাঁর বাসের অসুবিধে হয়, দেশে বড় বড় ঝিল খাল দিঘি রয়েছে, স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে পারবেন। আমার ঐ পুকুরের জল যে রকম হয়ে এসেছে আর দুদিন বাদে তাঁর মকরটা তার শুঁড়সুদ্ধ মরে' ভেসে উঠ্‌বে; আমার মত ভগীরথ ঢের মিল্‌বে কিন্তু ব্রাহ্মণ কায়স্থের ঘরে অমন বাহন আর পাবেন না। এই নতুন গঙ্গার ধারে তাঁর স্নেহের ভগীরথও যে বেশি দিন টিঁক্‌বে কোন ডাক্তারেই এমন আশা দেয় না। সত্যযুগের নামটার জন্যে মায়া হয় বটে, কিন্তু আমি বেশ করে' ভেবে দেখেছি, দাদা, এই কলিযুগের প্রাণটার মায়াও ছাড়তে পারিনে। তাই স্থির করেছি পুষ্করিণীটি তোমাকেই ফিরিয়ে দেব কিন্তু গঙ্গা-মাতাকে এখান থেকে একটু দূরে বসৎ করতে হবে!

কৌতুকহাস্য।

(পাঞ্চভৌতিক সভা।)

শীতের সকালে রাস্তা দিয়া খেজুররস হাঁকিয়া যাইতেছে। ভোরের দিককার ঝাপ্‌সা কুয়াশাটা কাটিয়া গিয়া তরুণ রৌদ্রে দিনের আরম্ভ-বেলাটা একটু উপভোগযোগ্য আতপ্ত হইয়া আসিয়াছে। সমীরণ চা খাইতেছে, ক্ষিতি খবরের কাগজ পড়িতেছে এবং ব্যোম মাথার চারিদিকে একটা অত্যন্ত উজ্জ্বল নীলে সবুজে মিশ্রিত গলাবন্ধের পাক জড়াইয়া একটা অসঙ্গত মোটা লাঠি হস্তে সম্প্রতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

অদূরে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া স্রোতস্বিনী এবং দীপ্তি পর-

স্পরের কটিবেষ্টন করিয়া কি-একটা রহস্যপ্রসঙ্গে বারম্বার হাসিয়া অস্থির হইতেছিল। ক্ষিতি এবং সমীরণ মনে করিতেছিল এই উৎকট নীলহরিত পশমরাশিপরিবৃত সুখাসীন নিশ্চিন্তচিত্ত ব্যোমই ঐ হাস্যরসোচ্ছ্বাসের মূল কারণ।

এমন সময় অন্যমনস্ক ব্যোমের চিত্তও সেই হাস্যরবে আকৃষ্ট হইল। সে চৌকিটা আমাদের দিকে ঈষৎ ফিরাইয়া কহিল—দূর হইতে একজন পুরুষমানুষের হঠাৎ ভ্রম হইতে পারে যে, ঐ দুটি সখী বিশেষ কোন একটা কৌতুককথা অবলম্বন করিয়া হাসিতেছেন, কিন্তু সেটা মায়া। পুরুষজাতিকে পক্ষপাতী বিধাতা বিনা কৌতুকে হাসিবার ক্ষমতা দেন নাই কিন্তু মেয়েরা হাসে কি জন্য তাহা দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। চক্‌মকি পাথর স্বভাবত আলোকহীন;—উপযুক্ত সংঘর্ষ প্রাপ্ত হইলে সে অট্টশব্দে জ্যোতিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে, আর মাণিকের টুক্‌রা আপ্‌না আপ্‌নি আলোয় ঠিকরিয়া পড়িতে থাকে, কোন একটা সঙ্গত উপলক্ষ্যের অপেক্ষা রাখে না। মেয়েরা অল্প কারণে কাঁদিতে জানে এবং বিনা কারণে হাসিতে পারে; কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না, জগতের এই কড়া নিয়মটা কেবল পুরুষের পক্ষেই খাটে!

সমীরণ নিঃশেষিতপাত্রে দ্বিতীয়বার চা ঢালিয়া কহিল, কেবল মেয়েদের হাসি নয়, হাস্যরসটাই আমার কাছে কিছু অসঙ্গত ঠেকে। দুঃখে কাঁদি, সুখে হাসি এটুকু বুঝিতে বিলম্ব হয় না—কিন্তু কৌতুকে হাসি কেন? কৌতুক ত ঠিক সুখ নয়। মোটা মানুষ চৌকি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেলে আমাদের কোন সুখের কারণ ঘটে এ কথা বলিতে পারি না কিন্তু হাসির কারণ ঘটে ইহা পরীক্ষিত সত্য। ভাবিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে আশ্চর্য্যের বিষয় আছে।

ক্ষিতি কহিল—রক্ষা কর ভাই ! না ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইবার বিষয় জগতে যথেষ্ট আছে আগে সেইগুলো শেষ কর তার পরে ভাবিতে সুরু করিয়ো। একজন পাগল তাহার উঠানকে ধূলি-শূন্য করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ ঝাঁটা দিয়া আচ্ছা করিয়া ঝাঁটাইল, তাহাতেও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ফল না পাইয়া কোদাল দিয়া মাটি চাঁচিতে আরম্ভ করিল। সে মনে করিয়াছিল এই ধূলোমাটির পৃথিবীটাকে সে নিঃশেষে আকাশে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া অবশেষে দিব্য একটি পরিষ্কার উঠান পাইবে—বলা বাহুল্য বিস্তর অধ্যবসায়েও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ভ্রাতঃ সমীরণ, তুমি যদি আশ্চর্য্যের উপরিস্তর ঝাঁটাইয়া অবশেষে ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতে আরম্ভ কর তবে আমরা বন্ধুগণ বিদায় লই। কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ, কিন্তু সেই নিরবধি কাল আমাদের হাতে নাই।

সমীরণ হাসিয়া কহিল—ভাই ক্ষিতি, আমার অপেক্ষা ভাবনা তোমারই বেশি। অনেক ভাবিলে তোমাকেও সৃষ্টির একটা মহা-শ্চর্য্য ব্যাপার মনে হইতে পারিত কিন্তু আরো ঢের বেশি না ভাবিলে আমার সহিত তোমার সেই উঠানমার্জ্জনকারী আদর্শ-টির কল্পনা করিতে পারিতে না।

ক্ষিতি কহিল—মাপ কর ভাই ; তুমি আমার অনেক কালের বিশেষ পরিচিত বন্ধু, সেই জন্যই আমার মনে এতটা আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল। যাহা হউক, কথাটা এই যে, কৌতুকে আমরা হাসি কেন। ভারি আশ্চর্য্য ! কিন্তু তাহার পরের প্রশ্ন এই যে, যে কারণেই হউক্ হাসি কেন ? একটা কিছু ভাল লাগিবার বিষয় যেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল অমনি আমাদের গলার ভিতর দিয়া একটা অদ্ভুত প্রকারের শব্দ বাহির হইতে লাগিল এবং আমাদের মুখের সমস্ত মাংসপেশী বিকৃত হইয়া সম্মু-

খের দন্তপংক্তি বাহির হইয়া পড়িল—মানুষের মত ভদ্র জীবের পক্ষে এমন একটা অসংযত অসঙ্গত ব্যাপার কি সামান্য অদ্ভুত এবং অবমানজনক? য়ুরোপের ভদ্রলোক ভয়ের চিহ্ন দুঃখের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করেন—আমরা প্রাচ্যজাতীয়েরা সভ্যসমাজে কৌতুকের চিহ্ন প্রকাশ করাটাকে নিতান্ত অসংযমের পরিচয় জ্ঞান করি—

সমীরণ ক্ষিতিকে কথা শেষ করিতে না দিয়া কহিল,—তাহার কারণ, আমাদের মতে কৌতুকে আমোদ অনুভব করা নিতান্ত অযৌক্তিক। উহা ছেলেমানুষেরই উপযুক্ত। এই জন্য কৌতুক রসকে আমাদের প্রবীণ লোকমাত্রেই ছেব্‌লামী বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। একটা গানে শুনিয়াছিলাম, শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রাভঙ্গে প্রাতঃকালে হুঁকাহস্তে রাধিকার কুটীরে কিঞ্চিৎ অঙ্গারের প্রার্থনায় আগমন করিয়াছিলেন, শুনিয়া শ্রোতামাত্রের হাস্য উদ্রেক করিয়াছিল। কিন্তু হুঁকা-হস্তে শ্রীকৃষ্ণের কল্পনা সুন্দরও নহে কাহারও পক্ষে আনন্দজনকও নহে—তবুও, যে, আমাদের হাসি ও আমোদের উদয় হয় তাহা অদ্ভুত ও অমূলক নহে ত কি? এই জন্যই এরূপ চাপল্য আমাদের বিজ্ঞ সমাজের অনুমোদিত নহে। ইহা যেন অনেকটা পরিমাণে শারীরিক; কেবল স্নায়ুর উত্তেজনা মাত্র। ইহার সহিত আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ, ধর্ম্মবোধ, বুদ্ধিবৃত্তি, এমন কি স্বার্থবোধেরও যোগ নাই; অতএব অনর্থক সামান্য কারণে ক্ষণকালের জন্য বুদ্ধির এরূপ অনিবার্য্য পরাভব, স্থৈর্য্যের এরূপ সম্যক্ বিচ্যুতি, মনস্বী জীবের পক্ষে লজ্জাজনক সন্দেহ নাই।

ক্ষিতি একটু ভাবিয়া কহিল, সে কথা সত্য। কোন অখ্যাত-নামা কবি-বিরচিত এই কবিতাটি বোধ হয় জানা আছে—

তৃষার্ত্ত হইয়া চাহিলাম একঘটি জল।
তাড়াতাড়ি এনে দিলে আধখানা বেল॥

তৃষার্ত্ত ব্যক্তি যখন এক ঘটি জল চাহিতেছে তখন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করিয়া আধখানা বেল আনিয়া দিলে অপরাপর ব্যক্তির তাহাতে আমোদ অনুভব করিবার কোন ধর্ম্মসঙ্গত অথবা যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না। তৃষিত ব্যক্তির প্রার্থনামতে তাহাকে একঘটি জল আনিয়া দিলে সমবেদনা বৃত্তিপ্রভাবে আমরা সুখ পাই—কিন্তু তাহাকে হঠাৎ আধখানা বেল আনিয়া দিলে, জানি না কি বৃত্তিপ্রভাবে আমাদের প্রচুর কৌতুক বোধ হয়। এই সুখ এবং কৌতুকের মধ্যে যখন শ্রেণীগত প্রভেদ আছে তখন দুইয়ের ভিন্নবিধ প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রকৃতির গৃহিণীপনাই এইরূপ—কোথাও বা অনাবশ্যক অপব্যয়, কোথাও অত্যাবশ্যকের বেলায় টানাটানি! এক হাসির দ্বারা সুখ এবং কৌতুক দুটোকে সারিয়া দেওয়া উচিত হয় নাই।

ব্যোম কহিল—প্রকৃতির প্রতি অন্যায় অপবাদ আরোপ হইতেছে। সুখে আমরা স্মিতহাস্য হাসি, কৌতুকে আমরা উচ্চ-হাস্য হাসিয়া উঠি। ভৌতিক জগতে আলোক এবং বজ্র ইহার তুলনা। একটা আন্দোলনজনিত স্থায়ী, অপরটি সংঘর্ষজনিত আকস্মিক। আমি বোধ করি, যে কারণভেদে একই ঈথরে আলোক ও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তাহা আবিষ্কৃত হইলে তাহার তুলনায় আমাদের সুখহাস্য এবং কৌতুকহাস্যের কারণ বাহির হইয়া পড়িবে।

সমীরণ ব্যোমের আজগুবী কল্পনায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল, আমোদ এবং কৌতুক ঠিক সুখ নহে বরঞ্চ তাহা নিম্নমাত্রার দুঃখ। স্বল্প পরিমাণে দুঃখ ও পীড়ন আমাদের

চেতনার উপর যে আঘাত করে তাহাতে আমাদের সুখ হইতেও পারে। প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে বিনা কষ্টে আমরা পাচকের প্রস্তুত অন্ন খাইয়া থাকি তাহাকে আমরা আমোদ বলি না—কিন্তু যেদিন "চড়িভাতি" করা যায়, সেদিন নিয়মভঙ্গ করিয়া কষ্ট স্বীকার করিয়া অসময়ে সম্ভবতঃ অখাদ্য আহার করি, কিন্তু তাহাকে বলি আমোদ। আমোদের জন্য আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক যে পরিমাণে কষ্ট ও অশান্তি জাগ্রত করিয়া তুলি তাহাতে আমাদের চেতনশক্তিকে উত্তেজিত করিয়া দেয়। কৌতুকও সেই জাতীয় সুখাবহ দুঃখ। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমাদের চিরকাল যেরূপ ধারণা আছে তাঁহাকে হুঁকাহস্তে রাধিকার কুটীরে আনিয়া উপস্থিত করিলে হঠাৎ আমাদের সেই ধারণায় আঘাত করে। সেই আঘাত ঈষৎ পীড়াজনক; কিন্তু সেই পীড়ার পরিমাণ এমন নিয়মিত যে, তাহাতে আমাদিগকে যে পরিমাণে দুঃখ দেয়, আমাদের চেতনাকে অকস্মাৎ চঞ্চল করিয়া তুলিয়া তদপেক্ষা অধিক সুখী করে। এই সীমা ঈষৎ অতিক্রম করিলেই কৌতুক প্রকৃত পীড়ায় পরিণত হইয়া উঠে। যদি যথার্থ ভক্তির কীর্ত্তনের মাঝখানে কোন রসিকতা-বায়ুগ্রস্ত ছোকরা হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের ঐ তাম্রকূটধূম্রপিপাসুতার গান গাহিত তবে তাহাতে কৌতুক বোধ হইত না; কারণ, আঘাতটা এত গুরুতর হইত যে তৎক্ষণাৎ তাহা উদ্যত মুষ্টি আকার ধারণ করিয়া উক্ত রসিক ব্যক্তির পৃষ্ঠাভিমুখে প্রবল প্রতিঘাতস্বরূপে ধাবিত হইত। অতএব, আমার মতে কৌতুক—চেতনাকে পীড়ন; আমোদও তাই। এই জন্য প্রকৃত আনন্দের প্রকাশ স্মিতহাস্য এবং আমোদ ও কৌতুকের প্রকাশ উচ্চহাস্য;—সে হাস্য যেন হঠাৎ একটা দ্রুত আঘাতের পীড়নবেগে সশব্দে ঊর্দ্ধে উদ্গীর্ণ হইয়া উঠে।

ক্ষিতি কহিল, তোমরা যখন একটা মনের মত থিওরির সঙ্গে একটা মনের মত উপমা জুড়িয়া দিতে পার, তখন আনন্দে আর সত্যাসত্য জ্ঞান থাকে না। ইহা সকলেরই জানা আছে কৌতুকে যে কেবল আমরা উচ্চহাস্য হাসি তাহা নহে মৃদুহাস্যও হাসি, এমন কি, মনে মনেও হাসিয়া থাকি। কিন্তু ওটা একটা অবান্তর কথা। আসল কথা এই যে, কৌতুক আমাদের চিত্তের উত্তেজনার কারণ; এবং চিত্তের অনতিপ্রবল উত্তেজনা আমাদের পক্ষে সুখ-জনক। আমাদের অন্তরে বাহিরে একটি সুযুক্তিসঙ্গত নিয়ম-শৃঙ্খলার আধিপত্য; সমস্তই চিরাভ্যস্ত, চিরপ্রত্যাশিত; এই সুনিয়মিত যুক্তিরাজ্যের সমভূমিমধ্যে যখন আমাদের চিত্ত অবাধে প্রবাহিত হইতে থাকে তখন তাহাকে বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারি না - ইতিমধ্যে হঠাৎ সেই চারিদিকের যথাযোগ্যতা ও যথাপরিমিততার মধ্যে যদি একটা অসঙ্গত ব্যাপারের অবতারণা হয় তবে আমাদের চিত্তপ্রবাহ অকস্মাৎ বাধা পাইয়া দুর্নিবার হাস্য-তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। সেই বাধা সুখের নহে, সৌন্দর্য্যের নহে, সুবিধার নহে, তেমনি আবার অনতিদুঃখেরও নহে সেই জন্য কৌতুকের সেই বিশুদ্ধ অমিশ্র উত্তেজনায় আমাদের আমোদ বোধ হয়।

আমি কহিলাম, অনুভবক্রিয়ামাত্রই সুখের, যদি না তাহার সহিত কোন গুরুতর দুঃখভয় ও স্বার্থহানি মিশ্রিত থাকে। এমন কি, ভয় পাইতেও সুখ আছে যদি তাহার সহিত বাস্তবিক ভয়ের কোন কারণ জড়িত না থাকে। ছেলেরা ভূতের গল্প শুনিতে একটা বিষম আকর্ষণ অনুভব করে, কারণ, হৃৎকম্পের উত্তেজনায় আমাদের যে চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে তাহাতেও আনন্দ আছে। রামায়ণে সীতাবিয়োগে রামের দুঃখে আমরা দুঃখিত হই, ওথেলোর অমূলক

অসূয়া আমাদিগকে পীড়িত করে, দুহিতার কৃতঘ্নতাশরবিদ্ধ উন্মাদ লিয়রের মর্ম্মযাতনায় আমরা ব্যথা বোধ করি—কিন্তু সেই দুঃখ-পীড়া বেদনা উদ্রেক করিতে না পারিলে সে সকল কাব্য আমাদের নিকট তুচ্ছ হইত। বরঞ্চ দুঃখের কাব্যকে আমরা সুখের কাব্য অপেক্ষা অধিক সমাদর করি; কারণ, দুঃখানুভবে আমাদের চিত্তে অধিকতর আন্দোলন উপস্থিত করে। কৌতুক মনের মধ্যে হঠাৎ আঘাত করিয়া আমাদের সাধারণ অনুভবক্রিয়া জাগ্রত করিয়া দেয়। এই জন্য অনেক রসিক লোক হঠাৎ শরীরে একটা আঘাত করাকে পরিহাস জ্ঞান করেন; অনেকে গালিকে ঠাট্টার স্বরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন; বাসরঘরে কর্ণমর্দ্দন এবং অন্যান্য পীড়ন-নৈপুণ্যকে বঙ্গসীমন্তিনীগণ এক শ্রেণীর হাস্যরস বলিয়া স্থির করিয়াছেন;—হঠাৎ উৎকট বোমার আওয়াজ করা আমাদের দেশে উৎসবের অঙ্গ এবং কর্ণবধিরকর খোলকরতালের দ্বারা চিত্তকে ধূমপীড়িত মৌচাকের মৌমাছির মত একান্ত উদ্ভ্রান্ত করিয়া ভক্তিরসের অবতারণা করা হয়।

ক্ষিতি কহিল, বন্ধুগণ, ক্ষান্ত হও! কথাটা একপ্রকার শেষ হইয়াছে। যতটুকু পীড়নে সুখ বোধ হয় তাহা তোমরা অতিক্রম করিয়াছ, এক্ষণে দুঃখ ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। আমরা বেশ বুঝিয়াছি, যে, কমেডির হাস্য এবং ট্র্যাজেডির অশ্রুজল দুঃখের তারতম্যের উপর নির্ভর করে,—

ব্যোম কহিল—যেমন বরফের উপর প্রথম রৌদ্র পড়িলে তাহা ঝিক্‌ঝিক্ করিতে থাকে এবং রৌদ্রের তাপ বাড়িয়া উঠিলে তাহা গলিয়া পড়ে। তুমি কতকগুলি প্রহসন ও ট্র্যাজেডির নাম কর আমি তাহা হইতে প্রমাণ করিয়া দিতেছি—

এমন সময় দীপ্তি ও স্রোতস্বিনী হাসিতে হাসিতে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। দীপ্তি কহিলেন—তোমরা কি প্রমাণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে?

ক্ষিতি কহিল, আমরা প্রমাণ করিতেছিলাম যে, তোমরা এতক্ষণ বিনা কারণে হাসিতেছিলে।

শুনিয়া দীপ্তি স্রোতস্বিনীর মুখের দিকে চাহিলেন, স্রোতস্বিনী দীপ্তির মুখের দিকে চাহিলেন এবং উভয়ে পুনরায় কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন।

ব্যোম কহিল, আমি প্রমাণ করিতে যাইতেছিলাম, যে, কমেডিতে পরের অল্প পীড়া দেখিয়া আমরা হাসি এবং ট্র্যাজেডিতে পরের অধিক পীড়া দেখিয়া আমরা কাঁদি।

দীপ্তি ও স্রোতস্বিনীর সুমিষ্ট সম্মিলিত হাস্যরবে পুনশ্চ গৃহ কূজিত হইয়া উঠিল, এবং অনর্থক হাস্য উদ্রেকের জন্য উভয়ে উভয়কে দোষী করিয়া পরস্পরকে তর্জ্জন পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে সলজ্জভাবে দুই সখী গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

পুরুষ সভ্যগণ এই অকারণ হাস্যোচ্ছ্বাসদৃশ্যে স্মিতমুখে অবাক্ হইয়া রহিল। কেবল সমীরণ কহিল, ব্যোম, বেলা অনেক হইয়াছে, এখন তোমার ঐ বিচিত্রবর্ণের নাগপাশবন্ধনটা খুলিয়া ফেলিলে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা দেখি না।

ক্ষিতি ব্যোমের লাঠিগাছটি তুলিয়া অনেকক্ষণ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, ব্যোম, তোমার এই গদাখানি কি কমেড়ির বিষয়, না, ট্র্যাজেডির উপকরণ?

সঙ্গীতের গঠনরীতি

এবং আনুষঙ্গিক আলোচনা।

আমাদের দেশে সঙ্গীত চর্চ্চার অভাব আছে বলিয়া দুঃখ করিবার ততটা কারণ নাই। তবে পরিমাণে যথেষ্ট হইলেও, চর্চ্চাটা যে ভাবে হইয়া থাকে তাহাতে বিশেষ সন্তোষ লাভ করা যায় না। আমাদের দেশে সকল বিষয়ে যেমন, সঙ্গীত সম্বন্ধেও সেইরূপ একটি বিশ্বাস আছে যে যাহা আছে তাহাই শ্রেষ্ঠ ও চূড়ান্ত এবং তাহার উপর কোন কথাই চলিতে পারে না। যিনি যত বড় ওস্তাদ তিনি ততই এ মতের গোঁড়া, সুতরাং সঙ্গীতের বর্ত্তমান অবস্থা কি করিয়া ঘটিল, ইহা অপেক্ষা উন্নতি করিবার উপায় এবং আবশ্যকতা আছে কি না, কোন্ প্রণালী অনুসারে সঙ্গীতের ভাল মন্দ নির্ণয় করা কর্ত্তব্য এ সকল বিষয়ে উপযুক্ত লোকেরা কোন আলোচনাই করেন না।

ওস্তাদরা যে বর্ত্তমান অবস্থা লইয়া সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছেন তাহা নহে। তাঁহাদের দুঃখ এই যে তাঁহাদের গুণপনা বুঝিবার মত যথেষ্ট সমজদার লোক নাই। এ কথা সত্য, কিন্তু অপরাধ কাহার? দেখিতে পাওয়া যায় বটে, যে, মজলিসে কালোয়াতি গানবাজনার আয়োজন হইলে, অনেকেই পালাইবার চেষ্টা করেন, যাঁহারা ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকেন তাঁহারা শীঘ্রই হাই তুলিতে আরম্ভ করেন, এবং যেটুকু মাথা নাড়েন, সে কেবল গাইয়ের খাতিরে। কিন্তু সঙ্গীতের চির-বিখ্যাত মোহিনী শক্তির এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিল কি করিয়া?

মনোরঞ্জনই যে, সঙ্গীতের প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা ওস্তাদের

বিস্মৃত হওয়াই, বোধ হয়, ইহার মূল। ওস্তাদরা চাহেন নিজের কারদানী দেখাইতে—কে, কত দ্রুতবেগে, রাগিণীর বাদী বিবাদী সুর ঠিক রাখিয়া, সমে আসিয়া পৌঁছিতে পারেন, ইহাই প্রধান চেষ্টা; শুনিলে মনে হয় সমে আসিবার দরুণ ঘোড়দৌড় পড়িয়া গিয়াছে। এইরূপ কসরৎ প্রদর্শনে এক শ্রেণীর ক্ষমতা প্রকাশ পায় এবং শ্রোতারও কতকটা আমোদ বোধ হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু এ শ্রেণীর ক্ষমতা বাজিকর আরও উত্তমরূপে দেখাইতে পারে, সুতরাং ইহার জন্য লোকে ওস্তাদের নিকট আসে না। ওস্তাদের নিকট লোকে ইহা অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর আনন্দ প্রত্যাশা করে।

শ্রোতৃবর্গ তবে কি পাইলে সন্তুষ্ট হন? কোন শ্রোতা গান বা বাজনা শুনিয়া মুগ্ধ হইলে, আমরা বলি তাহার "ভাব লেগেছে", এবং যিনি কখনো এরূপ মুগ্ধ হইয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন যে, এ অবস্থায় মনের মধ্যে কত রকম ভাবপ্রবাহ খেলিতে থাকে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, আমরা ভাব চাহি, এবং সঙ্গীতের হৃদয়গ্রাহিতা উহার ভাব উদ্রেক করিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

ওস্তাদ হয়ত আপত্তি করিবেন যে, গাইয়েকে উপযুক্ত কথা দিলে, তিনি তাহার দ্বারা ভাব উদ্রেক করিতে পারেন, কিন্তু কেবলমাত্র গৎ-বাজনার দ্বারা ভাব ব্যক্ত হইবে কি করিয়া? বাজনার দ্বারা যে, নির্দ্দিষ্ট ভাববিশেষ প্রকাশ করা যায় না, সে বিষয়ে বড় সন্দেহ নাই। বাজিয়ে যদি কোন একটি ভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে, সম্ভবতঃ, সে ভাব কোনো শ্রোতার মনের ভাবের অনুরূপ না হইতেও পারে। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট ভাব প্রকাশের জন্য আমরা ভাষার আশ্রয় লইতে পারি, সে

উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের বাজনার আশ্রয় লইবার কোন প্রয়োজন নাই। এরূপ অনির্দ্দিষ্ট অথচ প্রোজ্জ্বল ভাব আর কোথাও পাওয়া যায় না বলিয়াই বাদ্যসঙ্গীতের এত আদর।

এই ভাব প্রকাশের দরুণ যে, কোন বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে, এমন নহে। বাদ্যসঙ্গীত গঠনের নিয়মের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিলেই উদ্দেশ্য আপনিই সিদ্ধ হইবে। সঙ্গীত এমন সূক্ষ্ম রকমের জিনিষ যে উহাকে ভাষার দ্বারা ধরা কিছু কঠিন, সুতরাং উপমার সাহায্য লইলে কিছু সুবিধা হইবে।

ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্ত পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, আগ্রার 'তাজমহল' দেখিয়া সকলেরই ভাব লাগিয়া থাকে, অথচ কলিকাতার প্রকাণ্ড ইঁটের স্তূপ দেখিয়া, কাহারো মনে কোন ভাব উদয় হয় না। ইহার কারণ বাহির করা কিছু শক্ত কথা নহে— চারিদিকের সহিত সামঞ্জস্য এবং গঠন-পারিপাট্যই তাজমহলের ভাব উদ্রেক করিবার ক্ষমতার মূল। শুধু স্থাপত্যে নহে, সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, গঠন-সৌন্দর্য্য মানুষের মনে নানা প্রকার ভাব উদ্রেক করিয়া থাকে।

গৎ-বাজনাতেও, ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে, গঠনপারিপাট্য চাই। এবং অট্টালিকা-গঠনের সহিত বাজনার গঠনের কতক সাদৃশ্যও দেখা যায়। ভিত্তির আকারে যেমন ভাবী অট্টালিকার আকার সূচনা করা হইয়া থাকে, বাজনায় তেমনি আস্থায়ীর গঠনের অনুরূপ বাকি সমস্তটা গড়িতে হইবে। এবং ভিত্তির উপরিস্থ মহলে যেমন উহা অপেক্ষা কারুকার্য্য অধিক থাকে, অন্তরা, খাদ প্রভৃতিতে তেমনি, আস্থায়ী অপেক্ষা, রাগরাগিণীর সুরগুলিকে সূক্ষ্মভাবে খেলান হইয়া থাকে। আবার ভিত্তির সহ্যশক্তি বুঝিয়া যেমন সমগ্র অট্টালিকার গুরুত্ব ঠিক করিতে হয়,

সেইরূপ সমগ্র সঙ্গীতটার আয়তন এমন হওয়া উচিৎ নহে যাহাতে আস্থায়ী ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য যে, সুন্দর অট্টালিকা অথবা একটা সুন্দর বাদ্যসঙ্গীত কোনটারই গঠনপ্রণালী নিয়ম-বদ্ধ করিয়া ফেলা যায় না, সে বিষয়ে কারিকর এবং ওস্তাদের প্রতিভার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হয়। কোন্ কোন্ বিষয়ে মনোযোগ না দিলেই নয়, তাহাই শুধু নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অট্টালিকার সহিত বাজনার গঠনের একটু প্রভেদও এ স্থলে উল্লেখ করা ভাল। অট্টালিকার সমস্ত দৃশ্যটা চক্ষের সম্মুখে স্থিরভাবে প্রসারিত থাকে, ইচ্ছামত উহার সৌন্দর্য্য-সকল বিশ্লেষণ করিয়া, পরস্পরের সহিত উহাদের যোগাযোগ ও সামঞ্জস্য অনুভব করিবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। বাজনার ঠিক বিপরীত। সেখানে প্রত্যেক অংশ, শ্রুত হইতে না হইতেই, লোপ পায়। কর্ণ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ বুঝিবার সময় পায় না, সুতরাং সমস্ত বাজনার ঐক্যবন্ধনটি ধরিতে পারে না। এই জন্য বাজনায় আবৃত্তি আবশ্যক। এই আবৃত্তি গঠন-সৌন্দ-র্য্যের বিশেষ সহায়তা করে, কারণ সুরটা একবার কানে বসিয়া গেলে পুনরাবৃত্তির সময়ে প্রত্যেক অংশকে আরো সূক্ষ্ম ও উত্তমরূপে ফলান যাইতে পারে এবং, সেই সঙ্গে, ভাবকেও, যেন ব্যাখ্যার দ্বারা, আরও সুস্পষ্ট করিয়া তুলা যাইতে পারে।

ভাল ওস্তাদ যে, বাজাইতে বসিয়া, এত ভাবিয়া, তবে একটি ভাল সঙ্গীত সৃষ্টি করেন, তাহা নহে। তিনি নিজ প্রতিভা-বলেই প্রত্যেক অংশকে তাহার উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়া থাকেন। উল্লিখিত নিয়মগুলির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, আজকালকার অধিকাংশ ওস্তাদরা এগুলি পালন না করাতে, তাঁহাদের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাদের বাজনা

ভাল হয় না। আমাদের দেশে যদি স্বরলিপি করিবার প্রথা থাকিত, এবং ভাল ওস্তাদরা যদি বাজনা তৈয়ারী করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে অনেক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা থাকিত—প্রত্যেক ওস্তাদ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ওস্তাদগণের দোষ-গুণ বিচার করিয়া বিস্তর শিক্ষালাভ করিতে পারিতেন, এবং অনেকে, নিজের রচনার ক্ষমতা না থাকিলেও, ভাল জিনিষ বাজান হইতে বঞ্চিত হইতেন না। এখন দাঁড়াইয়াছে এই যে, প্রত্যেক বাজিয়ে তাঁহার গতের টুকরা বা আলাপের মূল অংশ রচনা করিতে বাধ্য হয়। এ অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত নিয়মসকলের প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক—দেওয়া হয় না বলিয়া দেখা যায় যে বাজিয়ে কোন গতিকে একটা আস্থায়ী খাড়া করিয়া তুলিয়া সমে পৌঁছিতে পারিলে বাঁচেন, তাহার উপর, যেমন যেমন মনে আসে, ভাল মন্দ মাঝারি নানান টুকরা জুড়িতে থাকেন মাত্র—প্রত্যেকবার সমে ঠিক ফিরিতে পারিলে, মনে করেন যথেষ্ট বাহাদুরী হইল। রাগ, তাল প্রভৃতির সহিত এরূপ লঙ্কাকাণ্ডেই সাধারণ শ্রোতারা ভুলিয়া যান, মনে করেন বড়ই গুণপনা প্রকাশ পাইল—ইহা বুঝেন না যে, সহস্র বন্ধনের মধ্যে অবলীলাক্রমে সঞ্চরণ করাতেই অধিক ক্ষমতা প্রকাশ পায়। সে যাহা হৌক, রাগিণীর মূল অংশের উপর টুকরা জোড়াতে কোন দোষ নাই, তবে প্রত্যেক টুকরা সমস্ত গঠনকল্পনাটির (designএর) অঙ্গ-স্বরূপ হওয়া উচিত, তাহারা নিতান্ত প্রক্ষিপ্ত না হয়; নতুবা ভাবের একটা সমগ্র নিজত্ব (individuality) রক্ষা হইবে না। যে প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয় সুসঙ্গত যুক্তির দ্বারা সাব্যস্থ হইয়াছে, তাহাকে উপমা উদাহরণ প্রভৃতি অলঙ্কারের দ্বারা সজ্জিত করিলে সোনায় সোহাগা হয়, কিন্তু যে প্রবন্ধের মূলে যুক্তি নাই, তাহাতে

অলঙ্কারের ছড়াছড়ি থাকিলেও, প্রবন্ধহিসাবে তাহার বড় মূল্য নাই। সেইরূপ যে বাজনায় আস্থায়ী অন্তরা প্রভৃতি প্রধান অংশের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় নাই, তাহাতে মেলাই টুকরা জুড়িয়া কোন ফল নাই—একটা সুসংলগ্ন সঙ্গীত রচনার হিসাবে তাহার মূল্য থাকিবে না। বাজাইবার সময়েই যদি টুকরা তৈয়ারী করিতে হয় তাহা হইলে সাধারণ বাজিয়ের পক্ষে এত হিসাব করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। স্বরলিপির ব্যবহার চলিত হইলে এই দোষের নিবারণ হইতে পারে। স্বরলিপিতে ওস্তাদরা আপত্তি করিয়া থাকেন যে মূর্চ্ছনা গমক প্রভৃতি কতক রকম অলঙ্কার, চিহ্ন দ্বারা বুঝান যায় না। এ আপত্তি খাটে যদি স্বরলিপিকে সঙ্গীতশিক্ষার উপায় বলিয়া গণ্য করা যায়। কিন্তু তাহা হওয়া উচিত নহে। শিক্ষার সময়ে ওস্তাদের স্থান আর কিছুতে অধিকার করিতে পারে না। কিন্তু অলঙ্কারসকল কি করিয়া গলায় বা হাতে আনিতে হয় ইহা ওস্তাদের নিকট শিখিবার পর লিপিতে ইহাদের চিহ্ন দেখিয়া গাহিতে বা বাজাইতে কোন কষ্ট হইবার কথা নহে।

একটা গান অথবা বাজনার অংশসকলের মধ্যে একটা সংযোগ ও সামঞ্জস্য সাধনের বিশেষ সহায়তা করে বলিয়াই বোধ হয় রাগ রাগিণী জন্মিয়াছে। কোমল তীব্র প্রভৃতি যে ২২টি সুর লইয়া কারবার হইয়া থাকে, তাহার সব কয়টি ব্যবহার করিয়া কোন সুর রচনা করিলে ভাল শুনিতে হয় না, ইহা আদিম ওস্তাদরা, পরীক্ষার দ্বারা, জানিয়া থাকিবেন, সেই জন্য এই স্বরমালার মধ্য হইতে পরস্পরের সহিত বিরোধ নাই এমন ৭।৮টি করিয়া সুর বাছিয়া লইয়া, স্বতন্ত্র ভাগ করা আবশ্যক হইল—এই ভাগগুলির নাম ঠাট। ইহার পর, তাঁহারা আরও দেখিয়া থাকিবেন যে দুই

ভিন্ন ঠাট লইয়া কোন সুরের দুই অংশ রচনা করিলে তাহাতে অনেক সময়ে রসভঙ্গ হয়, অতএব তাঁহারা একই ঠাট বজায় রাখিতে আরম্ভ করিলেন, এবং এক এক ঠাটগঠিত সুরসকল এক এক রাগ বা রাগিণীর অন্তর্গত করা হইল। ইহাই বোধ হয় আদিম রাগ রাগিণী উৎপত্তির ইতিহাস। তাহার পর, এ নামকরণের প্রথা একবার চলিত হইলে, আবশ্যক অনাবশ্যক বিবেচনা না করিয়া ওস্তাদেরা নূতন নূতন রাগ রাগিণী প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন; তাহার ফল আজকাল অসংখ্য রাগরাগিণী গজাইয়া উঠিয়াছে। ওস্তাদমহলে আজকাল এইগুলিকে লইয়া বড়ই বাড়াবাড়ি করা হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে সাধনাসম্পাদকমহাশয়ের কোন এক বক্তৃতা হইতে নিম্নলিখিত ছত্র কয়টি উদ্ধৃত হইল।

"যে রাগরাগিণীর হস্তে ভাবটিকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সে রাগরাগিণী আজ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক ভাবটিকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসন দখল করিয়া বসিয়া আছেন। আজ গান শুনিলেই সকলে দেখিতে চান, জয়জয়ন্তি, বেহাগ বা কানাড়া বজায় আছে কি না; আরে মহাশয়! জয়জয়ন্তির কাছে আমরা এমন কি ঋণে বদ্ধ, যে, তাহার নিকট অমনতর অন্ধ দাস্যবৃত্তি করিতে হইবে? যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভাল শুনায়, আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে, তবে জয়জয়ন্তি বাঁচুন বা মরুণ, আমি পঞ্চমকেই বহল রাখিব না কেন? আমি জয়জয়ন্তির কাছে এমনি কি ঘুস্ খাইয়াছি যে, তাহার জন্য অত প্রাণপণ করিব?"

ওস্তাদরা (এবং তাঁহাদের দেখাদেখি ছাত্রেরা) ভুলিয়া যান যে, রাগরাগিণী তাঁহাদেরই মত মানুষের মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব, মনুষ্যরচিত অন্যান্য জিনিষের ন্যায়, উহাদের দোষও আছে গুণও আছে, এবং সেইগুলি বিচার করিয়া, তবে

গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কতকগুলি খুব সুন্দর এবং সম্পূর্ণ, সেগুলিতে সংস্করণ করিবার আর বড় পথ নাই। কতকগুলি এত একরকমের যে, সেগুলিকে ভিন্ন নাম দেওয়া বাহুল্য এবং ব্যবহারে স্বতন্ত্র রাখিবার চেষ্টা করা বৃথা পরিশ্রম – তাহাতে সঙ্গীতের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ করা হয় মাত্র। কতকগুলির (যে গুলিতে ৩।৪ সুর লইয়া কারবার) অস্তিত্বের কোন অর্থ পাওয়া যায় না। আবার এমন অনেক ঠাট আবিষ্কার করা যাইতে পারে যাহা অবলম্বন করিয়া সুর রচনা করিলে সে সুর, সকল হিসাবে ভাল হইলেও, কোন এক প্রচলিত রাগিণীর অন্তর্গত হইবে না। ওস্তাদরা এরূপ সুরকে অশুদ্ধ বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, কিন্তু এ হিসাবে দেখিতে গেলে কাফিকে অশুদ্ধ সিন্ধু, এবং রামকেলিকে খেলো ভৈরো বলা যায়।

তাই বলিয়া আমরা রাগরাগিণীকে একেবারে উঠাইয়া দিতে বলিতেছি না। অঙ্ক কসিবার কতকগুলি নিয়ম বাঁধা আছে—কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রে যাঁহাদের অধিকার বেশি তাঁহারা অনেক সময়ে উক্ত নিয়ম সকল লঙ্ঘন করিয়া, অঙ্ক আরও সহজে এবং সংক্ষেপে কসিয়া ফেলেন। এরূপ করিলে কেহ দোষ দেন না, গণনা ঠিক হইলেই হইল, প্রণালী যত সহজ হয় ততই ভাল। তাই বলিয়া নিয়ম কেহ উঠাইয়া দিতে চাহেন না - যাহাদের ক্ষমতা অল্প তাহাদের নিয়ম ব্যতীত চলে না। সঙ্গীত রচনা কালেও, যদি কোন প্রতিভাশালী লোক, রাগরাগিণীর বন্ধন লঙ্ঘন করিয়া, একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রচনা প্রস্তুত করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে, বন্ধন রক্ষা হয় নাই বলিয়া, সে রচনাকে উপেক্ষা করাতে মূর্খতা প্রকাশ পায় মাত্র। অপর পক্ষে, যাঁহাদের ক্ষমতা কম তাঁহারা, এ বন্ধন না থাকিলে, হয়ত দিশাহারা হইয়া পড়িতেন—তাঁহাদের জন্য রাগরাগিণীরূপ বন্ধন থাকা অত্যাবশ্যক। আসল কথা,

রাগরাগিণীগুলিকে শ্রেণীবন্ধনের উপায় বলিয়াই দেখা উচিত। ইচ্ছা করিলে, আজ একজন ওস্তাদ, একটা নূতন ঠাট ও বাদী সুর, এবং সেই সঙ্গে একটা জাঁকাল নাম জোগাড় করিতে পারিলেই, নূতন রাগ বা রাগিণী গড়িতে পারেন। কিন্তু তাহাতে ফল কি? আমরা নূতন রাগ চাহি না—আমরা চাহি নূতন সুর এবং সেইগুলির নামকরণের সুবিধার জন্য কতকগুলি আদর্শ (typical) রাগ থাকিলেই যথেষ্ট। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যদি মনুষ্যজাতিকে গৌরবর্ণ, শ্যামবর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ এই তিন ভাগে বিভক্ত করিতেন, তাহার পর ইংরাজদের ফ্যাটফেটে রং উক্ত কোন দলের মধ্যে না ফেলিতে পারিয়া উহাদের মনুষ্য নহে বলিয়া স্থির করিতাম, সে যে রকমের যুক্তি হইত, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সুরসকলকে কতকগুলো রাগিণীর অন্তর্গত করিয়াছেন বলিয়া সে রাগিণীর অন্তর্গত না হইলে যে কোন সুর ধর্ত্তব্য নহে, ইহাও সেই রকমের যুক্তি।

আমরা সঙ্গীতকে স্থাপত্যের সহিত তুলনা করিবার সময়ে বলিয়াছিলাম যে, চতুর্দ্দিকের সহিত সামঞ্জস্য তাজমহলের ভাবোদ্রেক করিবার ক্ষমতার এক কারণ। গান অথবা বাজনার ভাবের সহিত সেইরূপ গায়ক বা বাদকের মুখের ভাব এবং অঙ্গভঙ্গীর সামঞ্জস্য থাকা চাই। বাজনার ভাব অনির্দ্দিষ্ট, সুতরাং বাদকের কোন বিশেষ ভাব ধারণ করিবার আবশ্যক নাই। তবে ভাবের মাধুর্য্য রক্ষা করিতে হইলে ওস্তাদরা যে সকল কুৎসিৎ রকম ভঙ্গী করিয়া থাকেন, সেগুলো বর্জ্জন করা বিশেষ আবশ্যক।

"ওস্তাদবর্গ যখন ভীষণ মুখশ্রী বিকাশ করিয়া, গলদঘর্ম্ম কলেবরে গান করিতে (অথবা বাজাইতে), বসেন, তখন সর্ব্বপ্রথমেই ভাবের গলাটা এমন

করিয়া টিপিয়া ধরেন, ও ভাব বেচারীকে এমন করিয়া আর্ত্তনাদ ছাড়ান, যে, সহৃদয় শ্রোতামাত্রেরই বড় কষ্ট বোধ হয়।"

বাজনা অপেক্ষা গানে এ বিষয়ে বেশী মনোযোগ দেওয়া আবশ্যাক, কারণ গানে বিশেষ নির্দ্দিষ্ট ভাব লইয়া কারবার। তবে এখানে স্বীকার করিতে হয় যে, এ কথা ওস্তাদী গান সম্বন্ধে খাটে না। ওস্তাদরা, গলাকে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে, এবং গানের কথাগুলিকে গলার আওয়াজকে বৈচিত্র্য প্রদানের উপায় মাত্র বলিয়া, গণ্য করেন, নিদেন সে হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভাবব্যঞ্জক কথার ভাবকে পরিস্ফুটনার্থে তাহাতে উপযুক্ত সুর যোজনা করিলে, তবেই প্রকৃত পক্ষে গান হয়।

"সঙ্গীত আর কিছুই নহে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা। যেমন, মুখে যদি বলি যে, 'আমার আহ্লাদ হইতেছে,' তাহাতে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়, কিন্তু যখন হাস্য করিয়া উঠি, তখনই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়; যেমন মুখে যদি বলি 'আমার দুঃখ হইতেছে,' তাহাই যথেষ্ট হয় না, রোদন করিয়া উঠিলেই সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ হয় তেমনি কথা কহিয়া যে ভাব অসম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করি, রাগরাগিণীর সাহায্যে সেই ভাব সম্পূর্ণতর রূপে প্রকাশ করি।"

প্রচলিত কালোয়াতি গানে কথার বড় অর্থ থাকে না, থাকিলেও ওস্তাদী উচ্চারণপ্রণালীর দরুণ তাহা বোধগম্য হয় না; আর যদি বা অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় ত তাহার ভাবের সহিত সুরের কোন সম্পর্ক থাকে না। সুতরাং ওস্তাদী গানকে অগত্যা গলা-বাজনার দলে ফেলিতে হয় এবং বাজনা হিসাবেই উহার দোষ গুণ বিচার করিতে হয়। গলাকে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে দেখাকে দোষ দেওয়া যায় না—কার্য্যটা কিছু অসঙ্গত হয় না। কিন্তু সেই সঙ্গে গলার গান গাওয়া রূপ অন্য কর্ত্তব্যটা লোপ পাওয়াটা দোষের

বিষয়। ওস্তাদমণ্ডলীতে প্রকৃত গানের চর্চ্চাটা না থাকাতে, যে, একটা মস্ত অভাব প্রকাশ পায়, তাহার সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যক্রমে 'ওস্তাদী' ছাড়া অন্য প্রকার গান অনেক আছে এবং এই-গুলিকে বাস্তবিক গান বলা যাইতে পারে। কীর্ত্তন, বাউলের গান, রামপ্রসাদী গান, আধুনিক বাঙ্গলা গান (যাহার নমুনা সাধনায় মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইয়া থাকে) প্রভৃতি নানা জাতীয়, নানা ভাবের গান ইহার দৃষ্টান্ত। যাঁহারা এই গানগুলি গাহিয়া থাকেন, তাঁহারা ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিতে বড় ত্রুটি করেন না, সুতরাং শরীর ও মুখের ভঙ্গী সম্বন্ধে তাঁহাদের সাবধান করাইবার ততটা আবশ্যক নাই। তবে কতক বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় না। আমরা দেখিয়াছি যে, গান কবিতা পাঠ করিবারই এক উপায় সেই জন্য স্পষ্টই বুঝা যায় যে গলার স্বর কর্কশ না হয়, কথা গুলি স্পষ্ট উচ্চারিত হয়, হাত পা নিরর্থক ভাবে না নাড়া হয়, এ সকল বিষয় কবিতা পাঠকালে যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হইয়া থাকে গান গাহিবার সময়েও সেইরূপ মনোযোগ দেওয়া উচিত। আবার কবিতায় ছন্দ অত্যাবশ্যক হইলেও পাঠের সময়ে যেমন হাতে তালি দিলে অদ্ভুত দেখায় গানের সময়েও সেইরূপ তবলায় বা হাতে তাল রাখিলে রসভঙ্গ হয়। একটা করুণরসাত্মক গান গাহিতে গাহিতে হঠাৎ একটা কথার মাঝখানে থামিয়া, সঙ্গত-কারীর দিকে চাহিয়া, সমের স্থানে 'হা!' করিয়া উঠিলে লোকের যে হাসি পায় না, বা রাগ ধরে না, সে কেবল অভ্যাসের বশে। কিন্তু প্রকাশ্যে তাল দেওয়াতে দোষ আছে বলিয়া যে, গাহিবার সময় লয় না রাখিলেও চলে তাহা নহে। কবিতা ছন্দে না পড়িতে পারিলে যেরূপ দোষ হয় গানে লয় না রাখিতে পারিলে অনুরূপ দোষ হয়। কিন্তু লয় ঠিক রাখা যতটা আবশ্যক, তাল ঠিক

রাখাটা সেই পরিমাণে আবশ্যক কি না, সে বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে। যেমন সুর স্বাভাবিক কিন্তু রাগরাগিণী কৃত্রিম, সেইরূপ লয় * স্বাভাবিক কিন্তু তাল কৃত্রিম।

"ভাবপ্রকাশকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া সুর ও তালকে গৌণ উদ্দেশ্য করিলেই ভাল হয়। ভাবকে স্বাধীনতা দিতে হইলে সুর এবং তালকেও অনেকটা স্বাধীন করিয়া দেওয়া আবশ্যক, নহিলে তাহারা ভাবকে চারিদিক হইতে বাঁধিযা রাখে। এই সকল ভাবিয়া আমার মনে হয়, আমাদের সঙ্গীতে যে নিয়ম আছে যে, যেমন তেমন করিয়া ঠিক একই স্থানে সমে আসিয়া পড়িতেই হইবে, সেটা উঠাইয়া দিলে ভাল হয়। লয় ঠিক থাকিলেই যথেষ্ট, তাহার উপর আরও কড়াক্কড় করা ভাল বোধ হয় না; তাহাতে স্বাভাবিকতার অতিরিক্ত হানি করা হয়। মাথায় জলপূর্ণ কলস লইয়া নৃত্য করা যেরূপ—হাজার অঙ্গভঙ্গী করিলেও একবিন্দু জল পড়িবে না, ইহাও সেইরূপ একপ্রকার কষ্টসাধ্য ব্যায়াম। সহজ স্বাভাবিক নৃত্যের যে একটি শ্রী আছে ইহাতে তাহার ব্যাঘাত করে; ইহাতে কৌশল প্রকাশ পায় মাত্র। কিন্তু সঙ্গীত কৌশলপ্রকাশের স্থান নহে, ভাবপ্রকাশের স্থান, যতখানিতে ভাবপ্রকাশের সাহায্য করে, ততখানিই সঙ্গীতের অন্তর্গত, যাহা কিছু কৌশল প্রকাশ করে মাত্র তাহা সঙ্গীত নহে, তাহার অন্য নাম। এক প্রকার কবিতা আছে তাহা সোজা দিক হইতে পড়িলেও যাহা বুঝায় উল্টা দিক হইতে পড়িলেও তাহাই বুঝায়, সেরূপ কবিতা কৌশল প্রকাশের জন্য উপযোগী, আর কোন উদ্দেশ্য তাহাতে সাধন করা যায় না। সেইরূপ আমাদের সঙ্গীতে কৃত্রিম তালের প্রথা ভাবের হস্ত পদে একটা অনর্থক শৃঙ্খল বাঁধিয়া দেয়।"

তালকে কৃত্রিম বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তবলায় বা হাতে

* 'লয়' শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কবিতায় ছন্দ যে স্থান অধিকার করে, আমরা যাহাকে লয় বলিতেছি তাহা গানে সেই স্থান অধিকার করে। অর্থাৎ তালের সম ও ফাঁক অন্য মাত্রা হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান না করিলে যাহা দাঁড়ায় তাহাকেই আমরা এ প্রবন্ধে 'লয়' বলিতেছি।

বা নিদেন পক্ষে মনে তালের ঠোকাগুলো না দিতে থাকিলে, বেতালা হইল কি না ধরা যায় না। ঐ সকল কৃত্রিম উপায়ের সাহায্য না লইলে, গানে তাল না থাকিলেও, কোন অভাব রহিল বলিয়া মনে হয় না। সুর অথবা লয়ের কিছু গোল হইলে, এ বিষয়ে যাহার কিছুমাত্র বোধ আছে, তাহার কানে তখনি সেটা ধরা পড়ে এবং বিরক্তিজনক বলিয়া বোধ হয়। এ অবস্থায় তাল, অর্থাৎ আবৃত্তির সময়ে একই স্থান প্রত্যেক বার সমে আনিয়া ফেলিবার নিয়ম রাখিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। অবশ্য তাল ঠিক রাখিয়া একটা সুন্দর সুর রচনা করিতে পারিলে তাহাতে কোনই ক্ষতি নাই, কিন্তু তালের খাতিরে সুর খর্ব্ব করিলে একটা অল্পমূল্য জিনিষ পাইবার জন্য অধিক মূল্যের জিনিষ পরিত্যাগ করা হয়—এ কার্য্য কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

'ওস্তাদী' এবং 'প্রকৃত' গানের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া আমরা কিছু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। একটা কথা বিচার করিতে এখনো বাকি রহিয়াছে অর্থাৎ গানে কি পরিমাণে অলঙ্কার দেওয়া যাইতে পারে। ওস্তাদ খেয়াল বা টপ্পা গাহিতে বসিলে, ঘণ্টা তিনেক তান না দিয়া তৃপ্ত হন না। কিন্তু আমার বোধ হয় যে এরূপ করিলে গান মাটি হয়। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, বাজনায় অলঙ্কারের ভারে আদত জিনিষকে ভারাক্রান্ত করা উচিত নহে। গান সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। গানের মূল অংশকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়া, তাহার পরিমাণ বুঝিয়া, তাহার ভাবের ব্যাখ্যা হিসাবে গোটা কতক বাছা বাছা উপযুক্ত তান দেওয়া উচিত। মূল সুরের সহিত সামঞ্জস্য, এবং সুর হিসাবে বিশেষত্ব তানের এই দুইটা সমান আবশ্যক। দ্রুত বেগে সা-ঋ-গ-ম সাধন করিলেই যে তান হইল এ ভ্রম অনেকের থাকিতে দেখা যায়। এই ত গেল ওস্তাদী গানের (অর্থাৎ গলা-

বাজনার) কথা। প্রকৃত ভাবের গানে তান আরও সন্তর্পণে দেওয়া উচিত। "কহে মিঞা তানসেন" এ কথাগুলি গাহিবার সময়ে "কহে মি–" পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া "হা হা……" শব্দে একটা তান ছাড়িলে কোন ক্ষতি নাই, কারণ, মিঞা তানসেন আকবর সাহের কি প্রকারে স্তুতি করিতেছেন, তাহা শুনিতে কেহ উৎসুক থাকে না। কিন্তু একটা ভাবের গানে কথাগুলি এরূপ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিলে অর্থ বোধগম্য হইবে না। সুতরাং কথার ফাঁক বুঝিয়া তান ব্যবহার করা কর্ত্তব্য—যথা গানের দুই অংশের মাঝখানে অথবা দুই বার আবৃত্তির মাঝখানে। তাছাড়া এ সকল গানে শুধু "হা হা ··" শব্দে তান দেওয়া একটু অর্থহীন হয়, তাহা অপেক্ষা গানের কথার উপযুক্ত অংশ উচ্চারণ করিয়া তান দিলে বেশী সঙ্গত শুনাইবার কথা।

উপসংহারে আমরা ওস্তাদ নামের অধিকারী না হইয়াও যে এত কথা বলিলাম ইহার জন্য পাঠক সকলের এবং বিশেষরূপে ওস্তাদদিগের নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করি। তবে একটা কথা আছে যে, যাহারা কোন কার্য্যে লিপ্ত থাকে তাহাদের অপেক্ষা নিরপেক্ষ বাহিরের লোক অনেক সময়ে দোষগুণ বিচারে অধিক সমর্থ হয়, সেই ভরসায় আমরা উপরিউক্ত মন্তব্য সকল প্রকাশ করিলাম। যদি বাস্তবিক বর্ত্তমান সঙ্গীতচর্চ্চার কোন ত্রুটি ধরিতে পারিয়া থাকি তাহা হইলে ভরসা করি ভাবী ওস্তাদমণ্ডলী সেই-গুলির সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দিবেন এবং যদি আমাদের যুক্তির কোন দোষ থাকে তবে বর্ত্তমান ওস্তাদমণ্ডলী আমাদিগকে সংশোধন করিয়া দিতে বিমুখ হইবেন না।

মহারাষ্ট্রীয় ভাষা।

ভারতের প্রচলিত ভাষাসমূহের উৎপত্তি সম্বন্ধে এ দেশের প্রাচীন বৈয়াকরণগণের মত এই যে, 'সংস্কৃত' ভাষা সমুদায় ভাষার মাতৃস্থানীয়া। এই নিমিত্ত তাঁহারা সংস্কৃত ভাষাকে "দেবভাষা" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে কালক্রমে, মানবগণের জ্ঞান ও বুদ্ধির হ্রাসের সহিত সংস্কৃত ভাষা অপভ্রষ্ট হইয়া ক্রমে রূপান্তর প্রাপ্ত হইল। এই রূপান্তরিত অপ-ভ্রষ্ট ভাষাকে তাঁহারা "প্রাকৃত" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। প্রাকৃত ভাষার ১৬ প্রকার ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে মাহা রাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, শ্রবন্তী (পালি), পৈশাচী, ওড্রীয়া ও প্রাচ্যা প্রভৃতি ভাষাই বিশেষ উল্লেখযোগ্যা।

কাত্যায়ন প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ প্রাকৃত ভাষাসমূহের মধ্যে "মাহারাষ্ট্রী" ভাষাকেই বিশিষ্টতা প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহা-দিগের মতে,—"সর্ব্বাসু ভাষাসু ইহ হেতুভূতাম্ মহারাষ্ট্রভাযাম্ পুরস্তাৎ।" (প্রাকৃত কল্পতরু)। অর্থাৎ মহারাষ্ট্র ভাষাই (শৌর-সেনী, মাগধী, পৈশাচী প্রভৃতি) সকল ভাষার হেতুভূতা বা জননীস্বরূপা। তাঁহারা আরও বলেন,—"প্রাকৃতং মহারাষ্ট্র-দেশোদ্ভবং।" (সদ্ভাষা চন্দ্রিকা)। অর্থাৎ মহারাষ্ট্র দেশোদ্ভব ভাষা-কেই প্রাকৃত ভাষা বলে। পুনশ্চ,—"মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ। সাগরঃ শুক্তিরত্নানাং সেতুবন্ধাদি যন্ময়ং॥" (দণ্ডী)। অর্থাৎ যে প্রাকৃত ভাষা মহারাষ্ট্রদেশে ব্যবহৃত হয়, তাহাই অনেকের বিবেচনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট; যেহেতু এই মহারাষ্ট্র-ভাষা সেতুবন্ধাদি কাব্যরূপ শুক্তিমুক্তাপরিপূর্ণ সাগরসদৃশ। মহা-কবি কালিদাস মহারাষ্ট্রীয়ভাষায় সেতুবন্ধ নামক এক উৎকৃষ্ট

কাব্য রচনা করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ১৯ শত বৎসর পূর্ব্বে মাহারাষ্ট্রী ভাষায় "সপ্তশতী" নামক এক অতি উৎকৃষ্ট গাথাকোষ রচিত হয়। বাণভট্ট প্রভৃতির গ্রন্থে এই সপ্তশতী গ্রন্থের বহুল প্রশংসা দৃষ্ট হয়। অতএব উক্ত শ্লোকার্দ্ধের তাৎপর্য্য এই যে, সাগর যেরূপ মণিমুক্তাদি উৎকৃষ্ট রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ, সেইরূপ মহারাষ্ট্রী ভাষা সেতুবন্ধ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাব্য নিচয়ে পরিপূর্ণ। যাহা হউক, এই প্রাচীন মাহারাষ্ট্রী ভাষা ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান মহারাষ্ট্রীয় বা মারাঠী ভাষায় পরিণত হইয়াছে। (১)

এই গেল অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন বৈয়াকরণগণের মত। অধুনাতন কালের ভাষাতত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবিষয়ে অন্যবিধ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মত এই যে, অতি প্রাচীনকালে আর্য্যগণ যে ভাষায় কথোপকথন করিতেন, সেই ভাষাই উত্তরোত্তর পরিমার্জ্জিত হইয়া সার্থকভাবে সংস্কৃত নাম ধারণ করিয়াছে। বেদের মন্ত্রভাগ যে ভাষায় রচিত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ কথোপকথনের ভাষা হইলেও, উহা সেই অতি প্রাচীন সাধারণের কথোপকথনের ভাষা অপেক্ষা কথঞ্চিৎ পরিমার্জ্জিত বলিয়া বোধ হয়। মন্ত্রভাগ অপেক্ষা ব্রাহ্মণভাগের ভাষা সমধিক পরিমার্জ্জিত। কিন্তু এই পরিমার্জ্জিত ভাষায় কেবল ব্রাহ্মণাদি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণই কথোপকথন করিতেন। ধর্ম্মগ্রন্থ সকলও এই পরিমার্জ্জিত ভাষায় রচিত হইত। লিপিপ্রণালী প্রচলন ও ব্যাকরণসূত্র বন্ধনে ভাষাকে সংযত করিবার চেষ্টার পর হইতে আর্য্য ভাষা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দুই বিভিন্ন পথে ধাবিত হইল। একভাগ উত্তরোত্তর মার্জ্জিত হইয়া সার্থক ভাবে সংস্কৃত নাম ধারণ করিল। সাধা-

(১) সাহিত্য তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

রণ লোকে সেই প্রাচীন আর্য্যভাষাতেই কথোপকথন করিতে লাগিল।

এইঅতি প্রাচীন সাধারণ ভাষা আর্য্যগণের রাজ্যবিস্তৃতির সহিত ভিন্ন ভিন্ন দেশে নীত হইতে লাগিল। আর্য্যগণ অনার্য্য দেশসমূহ জয় করিয়া, তথায় আর্য্যভাষার প্রচার করিতে লাগিলেন। অনার্য্য জাতির আর্য্য ভাষা বিশুদ্ধ রূপ উচ্চারণে অক্ষমতা ও তাহাদের উচ্চারণগত বৈলক্ষণ্যবশতঃ, তাহারা আর্য্যভাষা কথঞ্চিৎ বিকৃতভাবে ব্যবহার করিতে লাগিল। সেইরূপ আবার অনার্য্য জাতির সংসর্গে, অনেক অনার্য্য শব্দ আর্য্যভাষায় প্রবেশ লাভ করিল। এইরূপে অনার্য্য জাতির সংসর্গে এক আর্য্য ভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাহ্যিক ভাবে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। ফলতঃ এক মূল আর্য্যভাষা হইতেই, মহারাষ্ট্রে মহারাষ্ট্রী, মগধে মাগধী, শূরসেনে শৌরসেনী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি হয়। সাধারণ প্রাচীন আর্য্যভাষার উত্তরোত্তর উন্নতিতে যেমন সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি, তেমনি উক্ত ভাষায় অনার্য্য সংসর্গজাত রূপান্তরে প্রাকৃত ভাষা সমুদায়ের উৎপত্তি (২)। প্রাচীন প্রাকৃত ভাষাসমূহে বহুদিবসাবধি নানা কারণে নানা প্রকারে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া প্রচলিত ভাষাসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ভাষাসমূহের মাতৃষসা।

এই মত সমধিক সমীচীন বোধ হয়। কাত্যায়ন প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ যে, মাহারাষ্ট্রীভাষাকে প্রাকৃত ভাষাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন, তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, উক্ত ভাষা সেই আদিম আর্য্যভাষার প্রধান শাখাস্বরূপা ছিল,—হয়ত, অপরাপর ভাষা অপেক্ষা প্রাচীন মাহারাষ্ট্রী ভাষায় আদিম আর্য্যভাষা

(২) সাহিত্য তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অধিক পরিমাণে অবিকৃত ছিল; এবং হয়ত সেই জন্যই প্রাচীনেরা মাহারাষ্ট্রী ভাষাকে এত সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। আদিম আর্য্য-ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার এখন উপায় নাই। প্রাচীন মাহারাষ্ট্রী ভাষাও আমরা সবিশেষ অবগত নহি। সুতরাং এ সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত করা সুসঙ্গত মনে করি না।

প্রাচীন আর্য্যভাষা পরিমার্জ্জিত হইয়া সার্থকভাবে সংস্কৃত নাম ধারণ করিলে ও উহা আর্য্যদেশে ব্যাপ্ত হইলে, ঋষিগণ সানন্দ-চিত্তে ঈশ্বরস্তোত্র ও ধর্ম্মগ্রন্থ প্রভৃতি এই মার্জ্জিত ভাষায় রচনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই ভাষা তৎকালের লোকের অতীব হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। (৩) তৎপরে এই ভাষার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সর্ব্বত্র বহুল প্রচলিত হইলে, প্রাকৃত ভাষাসমূহে নূতন সংস্কৃত শব্দগুলি ক্রমে ক্রমে প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল। সংস্কৃত শব্দসমূহের সংক্ষেপে সম্পূর্ণ ভাবপ্রকাশন শক্তিও তাহাদের প্রাকৃত ভাষায় সাদরে স্থানপ্রাপ্তির অন্যতম কারণ। বোধ হয়, এই সকল কারণেই ভারতের প্রচলিত ভাষাসমূহের প্রায় সকল-গুলিতেই বহুসংখ্যক অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সংস্কৃত শব্দগুলি প্রচলিত ভাষায় যেরূপেই প্রবেশ লাভ করিয়া থাকুক্, সকল ভাষায় তাহাদের অর্থ একরূপ নহে;—বরং অনেক স্থলে এক সংস্কৃত শব্দ দুই ভাষায় দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কেন এরূপ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু প্রচলিত বাঙ্গালা ও আধুনিক মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় এরূপ কতি-পয় উদাহরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত করিলে, পাঠকগণ আমাদের উক্তির মর্ম্ম সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

---

(৩) ঐতিহাসিক রহস্য তৃতীয় ভাগ পাণিনী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সংস্কৃতে যাহাকে কহে বর্ত্তমান (ক), মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় তাহার প্রচলিত অর্থ সংবাদ। ব্যঙ্গ—দোষ, ন্যূনতা। অভিধান শব্দ কেবল নাম অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিচারণ—জিজ্ঞাসা-করণ। সংবাদ,—কথোপকথন। সন্দর্ভ,—সুসঙ্গতি; সম্বন্ধ। মূলব্যাধি,—অর্শরোগ। বিলক্ষণ,—অদ্ভুত, অসাধারণ। বাচক,—পাঠক; (অন্যশব্দের সহিত যুক্ত হইলে) বোধক। কৢপ্তি,—ফন্দী, কৌশল। বিবেচন,—আলোচনা, বিচার। মূল পীঠিকা—আদি বিবরণ। প্রয়োজন (ক),—ভোজ; উৎসব। প্রান্ত (ক),—প্রদেশ। অঙ্কিত (ক)—অধীন, বশীভূত। ছল (ক),—যন্ত্রণা প্রদান। কোটি (ক)—যুক্তি Reasoning। লগ্ন (ক),—বিবাহ। ভাবিক,—ঈশ্বর-প্রেমিক। অনুভব,—পরীক্ষা। অনুভূয়মান,—পরীক্ষাধীন। কুটুম্ব,—স্ত্রী, পরিবার (family)। অনুবাদ,—কীর্ত্তন, অপরের বাক্যের অবিকল পুনরুক্তি। টীকা (ক),—সমালোচনা। সমারম্ভ,—সমারোহ, উপকরণ। সমাধান (ক),—মনোদুঃখ অপনোদন। শোধ (ক),—গবেষণা। শ্রমী (ক),—দুঃখিত, ক্লান্ত। মিতি,—তারিখ। পতঙ্গ (ক),—ঘুড়ি। উপরোধ—বাধা দেওয়া। নাটকশালা,—(ক), উপপত্নী। পুরস্কর্ত্তা,—প্রবর্ত্তক, নেতা, পৃষ্ঠপোষক। তিরস্কার,—ঘৃণা। অপেক্ষা (ক),—আবশ্যক। অনপেক্ষিত,—ইচ্ছাবিরুদ্ধ। মেষপাত্র,—ক্ষীণ প্রকৃতি, দুর্ব্বল। প্রয়োগ (ক),—অভিনয় করা। আর্জ্জব,—তোষামোদ, বিনয়। ব্যক্তি,—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ; সর্ব্বাপেক্ষা অধম ও অপদার্থ ব্যক্তি। সত্তা (ক),—অধিকার, শাসন। অনুরোধ,—অনুসার। সবন্ধ,—সমগ্র, অখণ্ডিত। লোকগ্রহ,—সাধারণের সংস্কার বা ধারণা। সংস্থান,—দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট গ্রাম বা নগর। অঘোর—লোমহর্ষণ,ভয়ঙ্কর। মুহূর্ত্ত,—শুভক্ষণ। লেখ,—প্রবন্ধ, লিখিত বিষয়। উপনেত্র,—চশমা। উপন্যাস,—যুক্তি, তর্ক

উত্থাপন, ভূমিকা। বেধ,—চিন্তা। চেষ্টা,—Mischievous tricks, তাণ্ডব নৃত্য, ঠাট্টা করা। পরচক্র,—An invading army। ব্যতীপাত (ক),—সর্ব্বনেশে ছেলে। সরণী (ক), –তর্কপ্রণালী। নাদ (ক)—আসক্তি। ছন্দ (ক),—আসক্তি। সম্প্রদায় (ক)–রীতিনীতি। সাহিত্য,–উপকরণ। বন্ধু,–ভাই (cousin)। অর্থাৎ,—সুতরাং, প্রত্যুত।

এইরূপ আরও বহুতর শব্দ উদ্ধৃত হইতে পারে। (৪)

একই ভাব দুই ভিন্ন দেশে দুই ভিন্ন সংস্কৃত শব্দ দ্বারা কিরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে, নিম্নলিখিত উদাহরণে তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

প্রথমে বাঙ্গলার প্রচলিত শব্দ এবং তৎপার্শ্বে মহারাষ্ট্রীতে প্রচলিত শব্দ সন্নিবিষ্ট হইল।

বর্ত্তমান,—বিদ্যমান। উপযোগিতা,—উপযোগ। ব্যতীত,—ব্যতিরিক্ত। বৈরাগ্যশীল,–বিরক্ত। আধুনিক,—অর্ব্বাচীন। মনোমালিন্য, শত্রুতা—বৈমনস্য। অভিধান,—কোষ। জীবনী-লেখক,—চরিত্রকার। দুর্ভিক্ষ,—দুষ্কাল। প্রবন্ধ,—নিবন্ধ। কথোপকথন,—সম্ভাষণ। বিবেচনা,—বিচার। অচিন্তিতপূর্ব্ব,—অকল্পিত। ভদ্রলোক—প্রতিষ্ঠিত মনুষ্য, সভ্য। প্রতিদ্বন্দ্বী,—প্রতিস্পর্দ্ধী। অনুবাদ,—ভাষান্তর। উপদেশগর্ভ,—উপদেশপর। চিন্তাকরণ,—মনন। অনেক,—পুষ্কল। কার্য্য,—কৃত্য। অগ্রহায়ণ,—মার্গশীর্ষ। বহুবচন,—অনেক বচন। চেষ্টা—প্রযত্ন, যত্ন। পথচলা,—মার্গ ক্রমণ। দুরাচার,—দুরাচারী। আত্মীয়,—আপ্ত।

---

(৪)—(ক)চিহ্নিত শব্দগুলি বাঙ্গালা ভাষায় সচরাচর যে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, মহারাষ্ট্রীয় ভাষাতেও কখন কখন সেই সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই তালিকায় দেখান হইল যে, যে ভাবপ্রকাশের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ সংস্কৃত শব্দ সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেই ভাব প্রকাশের জন্য মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় তৎপর্য্যায়ভুক্ত অপর শব্দসমূহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'ভদ্রলোক' 'প্রতিদ্বন্দ্বী,' 'কথোপকথন,' 'ব্যতীত' প্রভৃতি শব্দ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কখনও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। অনুবাদ, অভিধান, প্রবন্ধ, চেষ্টা, বিবেচনা প্রভৃতি শব্দের পরিবর্ত্তে ভাষান্তর, কোষ, নিবন্ধ, প্রযত্ন, বিচার প্রভৃতি শব্দই সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। এইরূপ আরও অনেক শব্দ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

প্রচলিত ভাষাসমূহে যে সকল সংস্কৃত শব্দ প্রবিষ্ট হইয়াছিল, কালক্রমে সেগুলির অধিকাংশ উচ্চারণাদি-দোষে বিকৃত হইয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। সকল প্রচলিত ভাষাতেই এইরূপ রূপান্তরিত অপভ্রষ্ট শব্দ বহুল দৃষ্ট হয়। দেশকাল ও পাত্রভেদে একই সংস্কৃত শব্দ বিভিন্নরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় ও বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বদা ব্যবহার্য্যশব্দগুলির কেমন রূপান্তর হইয়াছে, নিম্নে তাহা দেখান গেল। এই সকল শব্দের মধ্যে হয়ত কতকগুলি সেই মূল আর্য্য ভাষার অন্তর্গত ছিল; পরে পরিমার্জ্জিত হইয়া "সংস্কৃত" রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রথমে সংস্কৃত, তৎপার্শ্বে মহারাষ্ট্রীয় ও তৎপার্শ্বে বাঙ্গালা দেওয়া গেল।

তুণ্ড, তোঁড্, টুঁড়। তণ্ডুল, তাঁদুল, চাউল। দাড়িম্ব, ডালিম্ব, ডালিম্ দাড়িম। যোগ্য, যোগা, যোগ্য। কুম্ভকার, কুম্ভার, কুমার। গ্রাম, গাঁও, গাঁ। হরিদ্রা, হলদ, হলুদ। স্তম্ভ, খম্ভ (খাম্ব;) থাম্। চর্ম্মকার, চাম্হার, চামার। স্থান, ঠাঁয়, ঠাঁই। গাভী, গায়, গাই। কার্পাস, কাপ্পাস (কাপুস), কাপাস। দধি, দহীঁ, দই।

গঠন, ঘড়ণ, গড়ন। বন্ধ্যা, বাঁঝ, বাঁঝা। সন্ধ্যা, সাঁজ, সাঁঝ। স্কন্ধ, খাঁদা. কাঁধ। লক্তা, লাৎ (লাথ), লাথি। অশ্রু, আসু, অশ্রু। গর্দ্দভ, গাঢ়ব, গাধা। জলৌকা, জলুঁ, জোঁক। গোধূম, গহুঁ, গম। উচ্চ উঞ্চ, উঁচু। বহিঃ, বাহের, বাহির। ইত্যাদি।

আর কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ কেবল মহারাষ্ট্রীয় ভাষাতেই কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত উদাহরণে ইহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

প্রথমে সংস্কৃত শব্দ, তৎপার্শ্বে মহারাষ্ট্রীয় অপভ্রংশ।

করোটী, করণ্টী। অত্তিকা (পিসী), আত্। বিভ্রাট, বোভাট্। মন্থা, মান। লাক্ষা, লাখ। চিঞ্চা, চিঞ্চ। বদরী, বোধ। বল্লী, বেল। বিতস্তি, বীৎ। পনস্, ফণস্। স্নুষা, স্থন। ইত্যাদি।

মন, দাত, নখ, জিভ্, নাক, কাণ, গাল, গলা, হাড়, মাংস, নখ, কপাল, হাত, কাঁথ, খুর, তেল, সকাল, ঘর, ভরম, খোঁচা, গাড়ী, ভুশি, পায়জামা (পায়জমা), লবঙ্গ, মশলা (মশালা), মুলো (মুলা), বাঘ, সিংহ, হরিণ, ফুল, ফল, যব, দাড়ি (দাঢ়ী), ঘাম, মলা (মল), ঘোড়া, খাট, বাটি, কলসী, ভাত, রুমাল, দোকান (দুকান), টুপী (টোপী), দুধ, বাজার প্রভৃতি বহুবিধ শব্দ বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অভিন্ন। যে সকল শব্দের উচ্চারণের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে, সেগুলির মহারাষ্ট্রীয় উচ্চারণ বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত শব্দসমূহের মধ্যে যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আছে, তাহাও অবধানযোগ্য।

প্রথমে বাঙ্গালা, তৎপার্শ্বে মহারাষ্ট্রীয়।

দিদী, জিজী। মেসো, মাওসা। ভাই, ভাউ। বোন্, বহিণ। কড়ে আঙ্গুল, করঙ্গুলি। মা, আঈ। নাতি, নাতু। চোকের পাতা,

পাপনী। পাকস্থলী, কোঠা। পায়ের তলা, তলওয়া। হাতের চেটো, তলহাত। পিঠ, পাঠ। বুক, উর। মণিবন্ধ, মণগট্। পা, পায়। মেদ মগজ, মেহ্। কোমর, কম্বর। ওষ্ঠ, ওঁঠ। লোম, লঁও। পোট, পোট। স্বজনী, সাজনী। দেওর, দীর। ভাজ, ভাউজয়। যা, জাউ। ননদ, নণঁদ। জামাই, জাওঁই। বেহাই, ব্যাহী। বেহান, বিহিণ। আমি, মীঁ। তুমি, তুহ্মীঁ। তুই, তূঁ। আঁব, আঁবা। পেয়ারা, পেরু। লেবু, লিম্বু। নিম, লিম্ব। আলাই বালাই, অলাঙ্গ বলাঙ্গ। চুট্‌কীগল্প, চুট্‌কা। ছুতার, সুতার। যেথায়, জেথেঁ। হেথায়, এথেঁ। তথায়, তেথেঁ। কোথা, কোঠেঁ। ছোঁও, ছিও (শিও)। ছাড়; সোড়। ছাল, সাল। বাজাও, বাজীউ। রহিল, রাহিলেঁ। ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপসংহারে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। প্রচলিত ভাষাসমূহে সংস্কৃত শব্দ যেরূপে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, ঠিক সেরূপে না হউক, অন্য প্রকারে অনেক বৈদেশিক শব্দ ভারতের প্রায় সকল ভাষাতেই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। অনার্য্য জাতির সংসর্গে প্রাচীন আর্য্য ভাষায় যেরূপ বহুল অনার্য্য শব্দ প্রবেশ করে, মুসলমানগণের সংসর্গে সেইরূপ বহুল আরবী ও পারসী শব্দ সকল প্রচলিত ভাষাতেই প্রবেশ করিয়াছে। বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রী ভাষার তুলনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, বাঙ্গালা ভাষা অপেক্ষা মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় আরবী ও পারসী শব্দের পরিমাণ অধিক।

স্বদেশভক্ত মহাত্মা শিবাজী স্বদেশের দুঃখমোচনের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, মাতৃভাষার উন্নতিবিধানের জন্যও তিনি সেইরূপ যত্নবান্ হইয়াছিলেন। মুসলমানগণের সহিত অনবরত যুদ্ধবিগ্রহহেতু দেশমধ্যে যখন সর্ব্বত্র অশান্তি বিরাজ

করিতেছিল, সেই সময়ও শিবাজী মাতৃভাষার পুষ্টিসাধনে বিশেষ-রূপে সহায়তা করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ভাষার সংস্কারের উদ্দেশে তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণকে অর্থ প্রদান করিয়া তৎকালপ্রচলিত যাবনিক শব্দসমূহের সংস্কৃত প্রতিশব্দ সংকলিত করাইয়াছিলেন। এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষা হইতে যাবনিক শব্দসমূহ দূরীকৃত হইয়া তৎস্থলে নবগঠিত সংস্কৃত প্রতিশব্দ সকল যাহাতে ভাষায় প্রচলিত হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় যাবনিক ভাষার এক কোষ রচিত হইয়াছিল। আমরা এস্থলে কতিপয় যাবনিক শব্দ ও মহাত্মা শিবাজীর অনুমত্যনুসারে নির্ম্মিত তাহাদের সংস্কৃত প্রতিশব্দ উল্লিখিত কোষ হইতে সংগ্রহ করিয়া নিম্নে প্রদান করিলাম।

প্রথমে যাবনিক শব্দ, তৎপার্শ্বে সংস্কৃত প্রতিশব্দ।

সাহেব, স্বামী। মজুমদার,—দেশলেখক, অমাত্য। নাজীর, উপদ্রষ্টা। মুতালিক, উপমন্ত্রী। চৌকী, (বেত্রাসন) আসন্দিকা। ফতিলসোজ্ (ফিলসোজ). স্তম্ভদীপক। কারখানা, সম্ভারগৃহ, কার্য্যস্থান। পোদ্দার, দ্রব্যপরীক্ষক। বেসর, নাসাপুষ্প। চাদর, প্রাবরণী। কুর্ত্তি, কর্পূরকঞ্চুক। ফতুয়-পাম্বকঞ্চুক। তম্বু, ঘাস্থুল। চোয়া, অগুরুসার। আতর, পুষ্পসার। গোলাপ, মকরন্দ। আরক, বস্তুসার। শিকারখানা, পক্ষিশালা। ডেরা, দুষ্যা (পটমণ্ডপ। সর্খেল, কার্য্যস্থানাধিকারী; ধ্বজবৃন্দাধি-কারী। মখমল, ইন্দ্রগোপ। হওয়ালদার (হাবিলদার), শস্ত্রাধি-কারী; কোষপাল, ব্যয়াধিকারী, রত্নাধিকারী; বসনাগা-রাধিকারী, আস্তরণাধিকারী; পত্তিপাল; মুদ্রাধিকারী; ধান্যাধি-কারী। বর্চ্চি, শক্তি। বরকন্দাজ, নালীক। ফীলখানা, গজশালা। হাওদা, গজাসন। লগাম, খলীনক। রেকাব, আরোহিণী। নাগারা,

আনক। ঢোল, ভেরী। উজীর, সামন্ত। জুম্লেদার, শতাধিপ, পরিস্তোমী। পঞ্চহাজারী, চমূপাল। ফৌজ, ব্যূহ। বারগীর, অশ্ববহ। সিপাহী, যোধ। পেয়াদা, পত্তি। স্থভেদার, পদাতিগণের অধ্যক্ষ; দেশাধিকারী। গোঠ, শিবির। কুচ, প্রস্থান। মোকাম, অবস্থান। কিল্লা, দুর্গ। গড়, গিরিদুর্গ। কোঠ, প্রাকার। বুরুজ, কোটগুল্মক। খন্দক; পরিখা। মোর্চ্চা, উপসর্পণ। দফ্তর, লেখশালা। দফ্তরদার, লেখক। কলমদান, লেখনপাত্র। ফর্ম্মান, রাজপত্রক। বাজে খরচ, অবাস্তর ব্যয়। হিসাব, ব্যয় লেখন। জাবতা, দোষনির্ণয়পত্রক। সেলাম, নমস্কার। কলম, লেখনী; প্রসঙ্গ। রুমাল, বেষ্টনবস্ত্র। মৌজা, গ্রাম। পরগণা, গ্রামগণ। বন্দর, বেলা-নগর। কোতয়াল, গ্রামরক্ষক। সাল মজকুর, বর্ত্তমানবর্ষ। হাশিল, সমস্ত আদায়। সের, কুড়ব। পোওয়া, পল। মণ, দ্রোণ। বাজার, পণ্যবীথিকা। ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহাত্মা শিবাজীর আদেশে সহস্রাধিক এইরূপ শব্দ ও বহুসংখ্যক গ্রাম্য অপশব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ সংকলিত হইয়াছিল। এই সকল শব্দ সংকলিত হওয়ার ৪। ৫ বৎসর পরেই মহাত্মা শিবাজী ইহলোক পরিত্যাগ করায় তাঁহার সংকল্প সুসিদ্ধ হইল না। শিবাজীর পর তদীয় পুত্র কুলাঙ্গার সাম্ভাজী মহারাষ্ট্র রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। অকর্ম্মণ্য সাম্ভাজীর দ্বারা মাতৃভাষার সংস্কার ও উন্নতি হওয়া যে অসম্ভব ছিল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। শিবাজীর সময়ের স্বদেশভক্ত ও মাতৃভাষাভিমানী রাজকর্ম্মচারিগণও নিষ্ঠুর ও যথেচ্ছাচারী সাম্ভাজীর হস্তে নিহত হইলেন। সম্ভাজীর পর রাজারাম। রাজারামের সংক্ষিপ্ত রাজত্বকাল, পলায়ন, পশ্চাদ্ধাবন, যুদ্ধবিগ্রহ ও নানাপ্রকার অশান্তিতে যাপিত হওয়ায় তিনিও ভাষা সংস্কারে মনোযোগী হইতে পারেন নাই। শাহুর সুদীর্ঘ

রাজত্বকালে মহারাষ্ট্র রাজ্যের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, ভাষার সেইরূপ উন্নতি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু শাহু বাল্যকালাবধি মোগল সরকারে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হওয়ায়, যাবনিক শব্দ ও চালচলন তাঁহার নিকট সমধিক প্রিয় বোধ হইত। এই কারণে তাঁহার শাসনকালে, ভাষার সংস্কার ও পরিপুষ্টির পরিবর্ত্তে অধিক পরিমাণে যাবনিক শব্দ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় প্রবেশ লাভ করিল। এতদ্ব্যতীত শাহুর রাজত্ব কালে ও .তৎপরবর্ত্তী কালে, মোগল-শাসিত প্রদেশ সমূহের অধিকাংশ মহারাষ্ট্রীয়গণের অধিকারভুক্ত হওয়ায়, যবনসংসর্গে মহারাষ্ট্রীয় ভাষাতে ক্রমেই অধিক পরিমাণে যাবনিক শব্দ প্রবেশ করিতে লাগিল। সুতরাং মহাত্মা শিবাজীর মূল সংকল্প তাঁহার বংশধরগণের দ্বারা সুসিদ্ধ হইল না। এই কারণে, শিবাজীর বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় যাবনিক শব্দের এত বাহুল্য দৃষ্ট হয়।

সঞ্জীবচন্দ্র।

(পালামৌ)

কোন কোন ক্ষমতাশালী লেখকের প্রতিভায় কি একটি গ্রহ-দোষে অসম্পূর্ণতার অভিশাপ থাকিয়া যায়; তাঁহারা অনেক লিখিলেও মনে হয় তাঁহাদের সব লেখা শেষ হয় নাই। তাঁহাদের প্রতিভাকে আমরা সুসংলগ্ন আকারবদ্ধভাবে পাই না; বুঝিতে পারি তাহার মধ্যে বৃহত্ত্বের মহত্ত্বের অনেক উপাদান ছিল, কেবল সেই সংযোজনা ছিল না যাহার প্রভাবে সে আপনাকে সর্ব্ব সাধা-রণের নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে প্রকাশ ও প্রমাণ করিতে পারে।

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর। তাঁহার রচনা হইতে অনুভব করা যায় তাঁহার প্রতিভার অভাব ছিল না, কিন্তু সেই প্রতিভাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার হাতের কাজ দেখিলে মনে হয়, তিনি যতটা কাজে দেখাইয়াছেন তাঁহার সাধ্য তদপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। তাঁহার মধ্যে যে পরিমাণে ক্ষমতা ছিল সে পরিমাণে উদ্যম ছিল না।

তাঁহার প্রতিভার ঐশ্বর্য্য ছিল কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না। ভাল গৃহিণীপনায় স্বল্পকেও যথেষ্ট করিয়া তুলিতে পারে; যতটুকু আছে তাহার যথাযোগ্য বিধান করিতে পারিলে তাহার দ্বারা প্রচুর ফল পাওয়া গিয়া থাকে। কিন্তু অনেক থাকিলেও উপযুক্ত গৃহিণীপনার অভাবে সে ঐশ্বর্য্য ব্যর্থ হইয়া যায়; সেস্থলে অনেক জিনিষ ফেলাছড়া যায় অথচ অল্প জিনিষই কাজে আসে। তাঁহার অপেক্ষা অল্প ক্ষমতা লইয়া অনেকে যে পরিমাণে সাহিত্যের অভাব মোচন করিয়াছেন তিনি প্রচুর ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহা পারেন নাই; তাহার কারণ, সঞ্জীবের প্রতিভা ধনী কিন্তু গৃহিণী নহে।

একটা উদাহরণ দিলেই পাঠকগণ আমার কথাটা বুঝিতে পারিবেন। "জাল প্রতাপচাঁদ" নামক গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্র, যে ঘটনা-সংস্থান, প্রমাণবিচার, এবং লিপিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, বিচিত্র জটিলতা ভেদ করিয়া যে একটি কৌতূহলজনক আনুপূর্ব্বিক গল্পের ধারা কাটিয়া আনিয়াছেন তাহাতে তাঁহার অসামান্য ক্ষমতার প্রতি কাহারও সন্দেহ থাকে না—কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও মনে হয় ইহা ক্ষমতার অপব্যয় মাত্র। এই ক্ষমতা যদি তিনি কোন প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যাপারে প্রয়োগ করিতেন তবে তাহা আমাদের ক্ষণিক কৌতূহল চরিতার্থ না করিয়া স্থায়ী আনন্দের বিষয় হইত। যে কারুকার্য্য প্রস্তরের উপর খোদিত করা উচিত

তাহা বালুকার উপরে অঙ্কিত করিলে কেবল .আক্ষেপের উদয় হয়।

"পালামৌ" সঞ্জীবের রচিত একটি রমণীয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত। ইহাতে সৌন্দর্য্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু পড়িতে পড়িতে প্রতিপদে মনে হয় লেখক যথোচিত যত্ন-সহকারে লেখেন নাই। ইহার রচনার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে আলস্য ও অবহেলা জড়িত আছে, এবং তাহা রচয়িতারও অগোচর ছিল না। বঙ্কিম বাবুর রচনায় যেখানেই দুর্ব্বলতার লক্ষণ আছে সেই খানেই তিনি পাঠকগণকে চোখ রাঙাইয়া দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন—সঞ্জীব বাবু অনুরূপ স্থলে অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু সেটা কেবল পাঠকদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য—তাহার মধ্যে অনুতাপ নাই এবং ভবিষ্যতে যে সতর্ক হইবেন কথার ভাবে তাহাও মনে হয় না। তিনি যেন পাঠকদিগকে বলিয়া রাখিয়াছেন, দেখ বাপু, আমি আপন ইচ্ছায় যাহা দিতেছি তাহাই গ্রহণ কর, বেশি মাত্রায় কিছু প্রত্যাশা করিয়ো না।

"পালামৌ" ভ্রমণ বৃত্তান্ত তিনি যে ছাঁদে লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে আশপাশের নানা কথা আসিতে পারে—কিন্তু তবু তাহার মধ্যেও নির্ব্বাচন এবং পরিমাণসামঞ্জস্যের আবশ্যকতা আছে। যে সকল কথা আসিবে তাহারা আপনি আসিয়া পড়িবে অথচ কথার স্রোতকে বাধা দিবে না। ঝরনা যখন চলে তখন যে পাথরগুলাকে স্রোতের মুখে ঠেলিয়া লইতে পারে তাহাকেই বহন করিয়া লয়, যাহাকে অবাধে লঙ্ঘন করিতে পারে তাহাকে নিমগ্ন করিয়া চলে, আর যে পাথরটা বহন বা লঙ্ঘনযোগ্য নহে তাহাকে অনায়াসে পাশ কাটাইয়া যায়;—সঞ্জীব বাবুর এই ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে এমন অনেক বক্তৃতা আসিয়া পড়িয়াছে যাহা

পাশ কাটাইবার যোগ্য - যাহাতে রসের ব্যাঘাত করিয়াছে এবং লেখকও অবশেষে বলিয়াছেন "এখন এ সকল কচ্‌কচি যাক্।" কিন্তু এই সকল কচ্‌কচিগুলিকে সযত্নে বর্জ্জন করিবার উপযোগী সতর্ক উদ্যম তাঁহার স্বভাবতই ছিল না। যে কথা যেখানে আসিয়া পড়িয়াছে অনাবশ্যক হইলেও সে কথা সেইখানেই রহিয়া গিয়াছে।

যে জন্য সঞ্জীবের প্রতিভা সাধারণের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই আমরা উপরে তাহার কারণ ও উদাহরণ দেখাইতেছিলাম, আবার যে জন্য সঞ্জীবের প্রতিভা ভাবুকের নিকট সমাদরের যোগ্য তাহার কারণও যথেষ্ট আছে।

পালামৌ ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে সৌন্দর্য্যের প্রতি সঞ্জীবচন্দ্রের যে একটি অকৃত্রিম সজীব অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে এমন সচরাচর বাঙ্গলা লেখকদের মধ্যে দেখা যায় না। সাধারণতঃ আমাদের জাতির মধ্যে একটি বিজ্ঞবার্দ্ধক্যের লক্ষণ আছে—আমাদের চক্ষে সমস্ত জগৎ যেন জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সৌন্দর্য্যের মায়া-আবরণ যেন বিস্রস্ত হইয়াছে—এবং বিশ্বসংসারের অনাদি প্রাচীনতা পৃথিবীর মধ্যে কেবল আমাদের নিকটই ধরা পড়িয়াছে। সেই জন্য অশন বসন ছন্দ ভাষা আচার ব্যবহাব বাসস্থান সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্যের প্রতি আমাদের এমন সুগভীর অবহেলা। কিন্তু সঞ্জীবের অন্তরে সেই জরার রাজত্ব ছিল না। তিনি যেন একটি নূতনসৃষ্ট জগতের মধ্যে এক যোড়া নূতন চক্ষু লইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। "পালামৌ"তে সঞ্জীবচন্দ্র যে, বিশেষ কোন কৌতূহলজনক নূতন কিছু দেখিয়াছেন, অথবা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কিছু বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু সর্ব্বত্রই ভালবাসিবার ও ভাল লাগিবার একটা ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। "পালামৌ" দেশটা সুসংলগ্ন সুস্পষ্ট জাজ্বল্যমান চিত্রের মত প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু যে

সহৃদয়তা ও রসবোধ থাকিলে জগতের সর্ব্বত্রই অক্ষয় সৌন্দর্য্যের সুধাভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায় সেই দুর্লভ জিনিষটি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার হৃদয়ের সেই অনুরাগপূর্ণ মমত্ব-বৃত্তির কল্যাণকিরণ যাহাকেই স্পর্শ করিয়াছে—কৃষ্ণবর্ণ কোল-রমণীই হৌক্, বনসমাকীর্ণ পর্ব্বতভূমিই হৌক্, জড় হৌক্, চেতন হৌক্, ছোট হৌক্ বড় হৌক্ সকলকেই একটি সুকোমল সৌন্দর্য্য এবং গৌরব অর্পণ করিয়াছে।

লেখক যখন যাত্রা আরম্ভকালে গাড়ি করিয়া বরাকর নদী পার হইতেছেন এমন সময় কুলিদের বালকবালিকারা, তাঁহার গাড়ি ঘিরিয়া "সাহেব একটি পয়সা" "সাহেব একটি পয়সা" করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। লেখক বলিতেছেন "এই সময় একটি দুই বৎসর বয়স্ক শিশু আসিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। কেন হাত পাতিল তাহা সে জানে না;—সকলে হাত পাতিয়াছে দেখিয়া সেও হাত পাতিল। আমি তাহার হস্তে একটি পয়সা দিলাম, শিশু তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার হাত পাতিল; অন্য বালক সে পয়সা কুড়াইয়া লইলে শিশুর ভগিনীর সহিত তাহার তুমুল কলহ বাধিল।"

সামান্য শিশুর এই শিশুত্বটুকু, তাহার উদ্দেশ্যবোধহীন অনু-করণবৃত্তির এই ক্ষুদ্র উদাহরণটুকুর উপর সঞ্জীবের যে একটি সকৌতুক স্নেহহাস্য নিপতিত রহিয়াছে সেইটি পাঠকের নিকট রমণীয়;—সেই একটি উল্টা-হাতপাতা ঊর্দ্ধমুখ অজ্ঞান লোভহীন শিশু ভিক্ষুকের চিত্রটি সমস্ত শিশুজাতির প্রতি আমাদের মনের একটি মধুররস আকর্ষণ করিয়া আনে।

দৃশ্যটি নূতন এবং অসামান্য বলিয়া নহে পরন্তু পুরাতন এবং সামান্য বলিয়াই আমাদের হৃদয়কে এরূপ বিচলিত করে। শিশু-

দের মধ্যে আমরা মাঝে মাঝে ইহারই অনুরূপ অনেক ঘটনা দেখিয়া আসিয়াছি, সেইগুলি বিস্মৃতভাবে আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চিত ছিল;—সঞ্জীবের রচিত চিত্রটি আমাদের সম্মুখে খাড়া হইবামাত্র সেই সকল অপরিস্ফুট স্মৃতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল এবং তৎসহকারে শিশুদের প্রতি আমাদের স্নেহরাশি ঘনীভূত হইয়া আনন্দরসে পরিণত হইল।

চন্দ্রনাথ বাবু বলেন সচরাচর লোকে যাহা দেখে না সঞ্জীব বাবু তাহাই দেখিতেন—ইহা তাঁহার একটি বিশেষত্ব। আমরা বলি সঞ্জীব বাবুর সেই বিশেষত্ব থাকিতে পারে কিন্তু সাহিত্যে সে বিশেষত্বের কোন আবশ্যকতা নাই। আমরা পূর্ব্বে যে ঘটনাটি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা নূতন লক্ষ্যগোচর বিষয় নহে, তাহার মধ্যে কোন নূতন চিন্তা, বা পর্য্যবেক্ষণ করিবার কোন নূতন প্রণালী নাই কিন্তু তথাপি উহা প্রকৃত সাহিত্যের অঙ্গ। গ্রন্থ হইতে আর এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। লেখক বলিতেছেন একদিন পাহাড়ের মূলদেশে দাঁড়াইয়া চীৎকার শব্দে একটা পোষা কুকুরকে ডাকিবামাত্র "পশ্চাতে সেই চীৎকার আশ্চর্য্যরূপে প্রতিধ্বনিত হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া পাহাড়ের প্রতি চাহিয়া আবার চীৎকার করিলাম, প্রতিধ্বনি আবার পূর্ব্বমত হ্রস্বদীর্ঘ হইতে হইতে পাহাড়ের অপর প্রান্তে চলিয়া গেল। আবার চীৎকার করিলাম শব্দ পূর্ব্ববৎ পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া উচ্চনীচ হইতে লাগিল। এইবার বুঝিলাম শব্দ কোন একটি বিশেষ স্তর অবলম্বন করিয়া যায়; সেই স্তর যেখানে উঠিয়াছে বা নামিয়াছে শব্দও সেইখানে উঠিতে নামিতে থাকে। * * ঠিক যেন সেই স্তরটি শব্দ-কন্‌ডক্‌টর।"

ইহা বিজ্ঞান, এবং সম্ভবতঃ ভ্রান্ত বিজ্ঞান। ইহা নূতন হইতে পারে কিন্তু ইহাতে কোন রসের অবতারণা করে না—আমাদের

হৃদয়ের মধ্যে যে একটি সাহিত্য-কন্‌ডক্টর আছে সে স্তরে ইহা প্রতিধ্বনিত হয় না। ইহার পূর্ব্বোদ্ধৃত ঘটনাটি অবিসম্বাদিত ও পুরাতন, কিন্তু তাহার বর্ণনা আমাদের হৃদয়ের সাহিত্যস্তরে কম্পিত হইতে থাকে।

চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার মতের স্বপক্ষে একটি উদাহরণ প্রয়োগ করিয়াছেন। সেটি আমরা মূল গ্রন্থ হইতে আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি।

"নিত্য অপরাহ্ণে আমি লাতেহার পাহাড়ের ক্রোড়ে গিয়া বসিতাম, তাঁবুতে শত কার্য্য থাকিলেও আমি তাহা ফেলিয়া যাইতাম। চারিটা বাজিলে আমি অস্থির হইতাম; কেন তাহা কখন ভাবিতাম না; পাহাড়ে কিছুই নূতন নাই; কাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কোন গল্প হইবে না, তথাপি কেন আমার সেখানে যাইতে হইত জানি না। এখন দেখি এ বেগ আমার একার নহে। যে সময় উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সে সময় কুলবধূর মন মাতিয়া উঠে জল আনিতে যাইবে; জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যাইবে;—জলে যে যাইতে পারিল না সে অভাগিনী; সে গৃহে বসিয়া দেখে উঠানে ছায়া পড়িতেছে, আকাশে ছায়া পড়িতেছে পৃথিবীর রং ফিরিতেছে, বাহির হইয়া সে তাহা দেখিতে পাইল না, তাহার কত দুঃখ। বোধ হয় আমিও পৃথিবীর রং-ফেরা দেখিতে যাইতাম।"

চন্দ্রনাথ বাবু বলেন "জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যায়' আমাদের মেয়েদের জল আনা এমন করিয়া কয় জন লক্ষ্য করে?" আমাদের বিবেচনায় সমালোচকের এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। হয় ত, অনেকেই লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকিবে, হয় ত নাও দেখিতে পারে। কুলবধূরা জল ফেলি-

য়াও জল আনিতে যায় · সাধারণের স্থূলদৃষ্টির অগোচর এই নবাবিষ্কৃত তথ্যটির জন্য আমরা উপরি-উদ্ধৃত বর্ণনাটির প্রশংসা করি না। বাঙ্গলা দেশে অপরাহ্নে মেয়েদের জল আনিতে যাওয়া নামক সর্ব্বসাধারণের সুগোচর একটি অত্যন্ত পুরাতন ব্যাপারকে সঞ্জীব নিজের কল্পনার সৌন্দর্য্যকিরণ দ্বারা মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন বলিয়া উক্ত বর্ণনা আমাদের নিকট আদরের সামগ্রী। যাহা সুগোচর তাহা সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে ইহা আমাদের পরম লাভ। সম্ভবতঃ, সত্যের হিসাব হইতে দেখিতে গেলে অনেক মেয়ে ঘাটে সখীমণ্ডলীর নিকট গল্প শুনিতে বা কুৎসা রটনা করিতে যায়, হয় ত সমস্ত দিন গৃহকার্য্যের পর ঘরের বাহিরে জল আনিতে যাওয়াতে তাহারা একটা পরিবর্ত্তন অনুভব করিয়া সুখ পায়, অনেকেই হয়ত নিতান্তই কেবল একটা অভ্যাসপালন করিবার জন্য ব্যগ্র হয় মাত্র, কিন্তু সেই সকল মনস্তত্ত্বের মীমাংসাকে আমরা এস্থলে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করি। অপরাহ্নে জল আনিতে যাইবার যতগুলি কারণ সম্ভব হইতে পারে তন্মধ্যে সবচেয়ে যেটি সুন্দর সঞ্জীব সেইটি আরোপ করিবামাত্র অপরাহ্নের ছায়ালোকের সহিত মিশ্রিত হইয়া কুলবধূর জল আনার দৃশ্যটি বড়ই মনোহর হইয়া উঠে; এবং যে মেয়েটি জল আনিতে যাইতে পারিল না বলিয়া একা বসিয়া শূন্য মনে দেখিতে থাকে উঠানের ছায়া দীর্ঘতর এবং আকাশের ছায়া নিবিড়তর হইয়া আসিতেছে তাহার বিষণ্ণ মুখের উপর সায়াহ্নের ম্লান স্বর্ণচ্ছায়া পতিত হইয়া গৃহ প্রাঙ্গণতলে একটি অপরূপ সুন্দর মূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়া তোলে। এই মেয়েটিকে যে সঞ্জীব লক্ষ্য করিয়াছেন এবং আমরা লক্ষ্য করি নাই তাহা নহে, তিনি ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ইহাকে সম্ভবপররূপে স্থায়ী করিয়া তুলিয়াছেন।

আমরা জিজ্ঞাসা করিতেও চাহি না এইরূপ মেয়ের অস্তিত্ব বাঙ্গলা দেশে সাধারণত সত্য কি না এবং সেই সত্যটি সঞ্জীবের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না। আমরা কেবল অনুভব করি ছবিটি সুন্দর বটে এবং অসম্ভবও নহে।

সঞ্জীব বাবু একস্থলে লিখিয়াছেন "বাল্যকালে আমার মনে হইত যে, ভূত প্রেত যে প্রকার নিজে দেহহীন, অন্যের দেহ আবির্ভাবে বিকাশ পায়, রূপও সেই প্রকার অন্য দেহ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়; কিন্তু প্রভেদ এই যে, ভূতের আশ্রয় কেবল মনুষ্য, বিশেষতঃ মানবী, কিন্তু বৃক্ষপল্লব নদ ও নদী প্রভৃতি সকলেই রূপ আশ্রয় করে। * * * সুতরাং রূপ এক, তবে পাত্রভেদ।"

সঞ্জীব বাবুর এই মতটি অবলম্বন করিয়া চন্দ্রনাথ বাবু বলিয়াছেন—"সঞ্জীব বাবুর সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ভাল করিয়া না বুঝিলে তাঁহার লেখাও ভাল করিয়া বুঝা যায় না—ভাল করিয়া সম্ভোগ করা যায় না।"

সমালোচকের এ কথায় আমরা কিছুতেই সায় দিতে পারি না। কোন একটি বিশেষ সৌন্দর্য্যতত্ত্ব অবলম্বন না করিলে সঞ্জীবের রচনার সৌন্দর্য্য বুঝা যায় না এ কথা যদি সত্য হইত তবে তাঁহার রচনা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য হইত না। নদ নদীতেও সৌন্দর্য্য আছে, পুষ্পে নক্ষত্রেও সৌন্দর্য্য আছে মনুষ্যে পশু পক্ষীতেও সৌন্দর্য্য আছে এ কথা প্লেটো না পড়িয়াও আমরা জানিতাম—সেই সৌন্দর্য্য ভূতের মত বাহির হইতে আসিয়া বস্তুবিশেষে আবির্ভূত হয় অথবা তাহা বস্তুর এবং আমাদের প্রকৃতির বিশেষ ধর্ম্মবশতঃ আমাদের মনের মধ্যে উদিত হয় সে সমস্ত তত্ত্বের সহিত সৌন্দর্য্যসম্ভোগের কিছুমাত্র যোগ নাই।

এক জন নিরক্ষর ব্যক্তিও যখন তাহার প্রিয়মুখকে চাঁদমুখ বলে তখন সে কোন বিশেষ তত্ত্ব না পড়িয়াও স্বীকার করে যে, যদিচ চাঁদ এবং তাহার প্রিয়জন বস্তুতঃ সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ তথাপি চাঁদের দর্শন হইতে সে যে জাতীয় সুখ অনুভব করে তাহার প্রিয়মুখ হইতেও ঠিক সেই জাতীয় সুখের আস্বাদ প্রাপ্ত হয়।

চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত আমাদের মতভেদ কিছু বিস্তারিত করিয়া বলিলাম; তাহার কারণ এই, যে, এই উপায়ে পাঠকগণ অতি সহজে বুঝিতে পারিবেন আমরা সাহিত্যকে কি নজরে দেখিয়া থাকি। এবং ইহাও বুঝিবেন, যাহা প্রকৃত পক্ষে সহজ এবং সর্ব্বজনগম্য আজকালকার সমালোচন-প্রণালীতে তাহাকে জটিল করিয়া তুলিয়া পুরাতনকে একটা নূতন ঘরগড়া আকার দিয়া পাঠকের নিকট ধরিবার চেষ্টা করা হয়। ভাল কাব্যের সমালোচনায় পাঠকের হৃদয়ে সৌন্দর্য্য সঞ্চার করিবার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া নূতন এবং কঠিন কথায় পাঠককে চমৎকৃত করিয়া দিবার প্রয়াস আজকাল দেখা যায়; তাহাতে সমালোচনা সত্য হয় না, সহজ হয় না, সুন্দর হয় না অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক হইয়া উঠে।

গ্রন্থকার কোল যুবতীদের নৃত্যের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করি;—"এই সময় দলে দলে গ্রামস্থ যুবতীরা আসিয়া জমিতে লাগিল; তাহারা আসিয়াই যুবাদিগের প্রতি উপহাস আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বড় হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। উপহাস আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; কেবল অনুভবে স্থির করিলাম যে, যুবারা ঠকিয়া গেল। ঠকিবার কথা, যুবা দশ বারটি, কিন্তু যুবতীরা প্রায় চল্লিশজন, সেই চল্লিশ জনে হাসিলে হাইলণ্ডের পল্টন ঠকে। হাস্য উপহাস্য শেষ হইলে, নৃত্যের উদ্যোগ আরম্ভ

হইল। যুবতী সকলে হাত ধরাধরি করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা বিন্যাস করিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে বড় চমৎকার হইল। সকল গুলিই সম উচ্চ, সকলগুলিই পাথুরে কাল; সকলেরই অনাবৃত দেহ; সকলেরই সেই অনাবৃত বক্ষে আরসির ধৃক্‌ধুকি চন্দ্রকিরণে এক একবার জ্বলিয়া উঠিতেছে। আবার সকলের মাথায় বনপুষ্প, কর্ণে বনপুষ্প, ওষ্ঠে হাসি। সকলেই আহ্লাদে পরিপূর্ণ, আহ্লাদে চঞ্চল, যেন তেজঃপুঞ্জ অশ্বের ন্যায় সকলেই দেহবেগ সংযম করিতেছে।

"সম্মুখে যুবারা দাঁড়াইয়া, যুবাদের পশ্চাতে মৃণ্ময়মঞ্চোপরি বৃদ্ধেরা এবং তৎসঙ্গে এই নরাধম। বৃদ্ধেরা ইঙ্গিত করিলে যুবাদের দলে মাদল বাজিল, অমনি যুবতীদের দেহ যেন শিহরিয়া উঠিল। যদি দেহের কোলাহল থাকে তবে যুবতীদের দেহে কোলাহল পড়িয়া গেল, পরেই তাহারা নৃত্য আরম্ভ করিল।"

এই বর্ণনাটি অতি সুন্দর ইহা ছাড়া আর কি বলিবার আছে! এবং ইহা অপেক্ষা প্রশংসার বিষয়ই বা কি হইতে পারে! নৃত্যের পূর্ব্বে আহ্লাদে চঞ্চল যুবতীগণ তেজঃপুঞ্জ অশ্বের ন্যায় দেহবেগ সংযত করিয়া আছে, এ কথায় যে চিত্র আমাদের মনে উদয় হয় সে আমাদের কল্পনাশক্তি-প্রভাবে হয়, কোন বিশেষ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা হয় না। "যুবতীদের দেহে কোলাহল পড়িয়া গেল" এ কথা বলিলে ত্বরিৎ আমাদের মনে একটা ভাবের উদয় হয়; যে কথাটা সহজে বর্ণনা করা দুরূহ তাহা ঐ উপমা দ্বারা এক পলকে আমাদের হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া যায়। নৃত্যের বাদ্য বাজিবামাত্র চিরাভ্যাসক্রমে কোলরমণীদের সর্ব্বাঙ্গে একটা উদ্দাম উৎসাহচাঞ্চল্য তরঙ্গিত হইয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে যেন একটা জানাজানি কানাকানি, একটা সচকিত উদ্যম,

একটা উৎসবের আয়োজন পড়িয়া গেল—যদি আমাদের দিব্যকর্ণ থাকিত তবে যেন আমরা তাহাদের নৃত্যবেগে উল্লসিত দেহের কল-কোলাহল শুনিতে পাইতাম। নৃত্যবাদ্যের প্রথম আঘাতমাত্রেই যৌবনসন্নদ্ধ কোলাঙ্গনাগণের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে বিভঙ্গিত এই যে একটা হিল্লোল ইহা এমন সূক্ষ্ম, ইহার এতটা কেবল আমাদের অনুমান-বোধ্য এবং ভাবগম্য, যে, তাহা বর্ণনায় পরিস্ফুট করিতে হইলে "কোলাহলে"র উপমা অবলম্বন করিতে হয়, এতদ্ব্যতীত ইহার মধ্যে আর কোনও গূঢ়তত্ত্ব নাই। যদি এই উপমা দ্বারা লেখ-কের মনোগত ভাব পরিস্ফুট না হইয়া থাকে, তবে ইহার অন্য কোন সার্থকতা নাই, তবে ইহা প্রলাপোক্তি মাত্র।

বসন্তপুষ্পাভরণা গৌরী যখন পদ্মবীজমালা হস্তে মহাদেবের তপোবনে প্রবেশ করিতেছেন তখন কালিদাস তাঁহাকে "সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব" বলিয়াছেন; সঙ্গিনীপরিবৃতা সুন্দরী রাধিকা যখন দৃষ্টিপথে প্রবেশ করিলেন তখন গোবিন্দদাস তাঁহাকে মোহিনী পঞ্চম রাগিণীর সহিত তুলনা করিয়াছেন; তাঁহাদের কোন বিশেষ সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ছিল কি না জানি না, কিন্তু এরূপ বিসদৃশ উপমা-প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, দক্ষিণ বায়ুতে বসন্তকালের পল্লবে-ভরা লতার আন্দোলন আমরা অনেকবার দেখিয়াছি; তাহার সেই সৌন্দর্য্যভঙ্গী আমাদের নিকট সুপরিচিত; সেই উপমাটি প্রয়োগ করিবামাত্র আমাদের বহুকালের সঞ্চিত পরিচিত একটি সৌন্দর্য্যভাবে ভূষিত হইয়া এক কথায় গৌরী আমাদের হৃদয়ে জাজ্জল্যমান হইয়া উঠেন;—আমরা জানি রাগিণী আমাদের মনে কি একটি বর্ণনাতীত সৌন্দর্য্যের ব্যাকুলতা সঞ্চার করে, এই জন্য পঞ্চম রাগিণীর সহিত রাধিকার তুলনা করিবামাত্র আমাদের মনে যে একটি অনির্দ্দেশ্য অথচ চিরপরিচিত মধুরভাবের

উদ্রেক হয় তাহা কোন বর্ণনাবাহুল্যের দ্বারা হইত না ; অতএব দেখা যাইতেছে, অন্য সৌন্দর্য্যরাজ্যে সঞ্জীব বাবু তাঁহার নিজের রচিত একটা নূতন গলি কাটেন নাই, সমুদয় ভাবুক ও কবি-বর্গের পুরাতন রাজপথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন এবং সেই তাঁহার গৌরব।

সঞ্জীব একটি যুবতীর বর্ণনার মধ্যে বলিয়াছেন "তাহার যুগ্ম ভ্রূ দেখিয়া আমার মনে হইল যেন অতি উর্দ্ধে নীল আকাশে কোন বৃহৎ পক্ষী পক্ষ বিস্তার করিয়া ভাসিতেছে।" এই উপ-মাটি পড়িবামাত্র মনে বড় একটি আনন্দের উদয় হয় ; কেবল মাত্র উপমাসাদৃশ্য তাহার কারণ নহে, কিন্তু সেই সাদৃশ্যটুকুকে উপ-লক্ষ্য মাত্র করিয়া একটা সৌন্দর্য্যের সহিত আর কতকগুলি সৌন্দর্য্য জড়িত হইয়া যায় ;—সে একটা ইন্দ্রজালের মত ;—ঠিক করিয়া বলা শক্ত যে, অপরাহ্নের অতি দূর নির্ম্মল নীলাকাশে ভাসমান স্থিরপক্ষ স্থকিতগতি পাখীটিকে দেখিতেছি, না, যুবতীর শুভ্রসুন্দর ললাটতলে অঙ্কিত একটি যোড়া ভুরু আমাদের চক্ষে পড়িতেছে!—জানি না, কেমন করিয়া কি মন্ত্রবলে একটি ক্ষুদ্র ললাটের উপর সহসা আলোকধৌত নীলাম্বরের অনন্ত বিস্তার আসিয়া পড়ে এবং মনে হয় যেন রমণীমুখের সেই ভ্রূ-যুগল দেখিতে স্থিরদৃষ্টিকে বহু উচ্চে বহুদূরে প্রসারিত করিয়া দিতে হয়। এই উপমায় হঠাৎ এইরূপ একটা বিভ্রম উৎপন্ন করে - কিন্তু সেই ভ্রমের কুহকেই সৌন্দর্য্য ঘনীভূত হইয়া উঠে।

অবশেষে গ্রন্থ হইতে একটি সরল বর্ণনার উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি। গ্রন্থকার একটি নিদ্রিত বাঘের বর্ণনা করিতেছেন—"প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে ব্যাঘ্র নিরীহ ভালমানুষের ন্যায় চোখ বুজিয়া আছে ; মুখের নিকট সুন্দর নখরসংযুক্ত একটি

থাবা দর্পণের ন্যায় ধরিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বোধ হয় নিদ্রার পূর্ব্বে থাবাটি একবার চাটিয়াছিল।”

আহারপরিতৃপ্ত সুপ্তশান্ত ব্যাঘ্রটি ঐ যে মুখের সামনে একটা থাবা উল্‌টাইয়া ধরিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে এই এক কথায় ঘুমন্ত বাঘের ছবিটি যেমন সুস্পষ্ট সত্য হইয়া উঠিয়াছে এমন আর কিছুতে হইতে পারিত না। সজীব বালকের ন্যায় সকল জিনিষ সজীব কৌতূহলের সহিত দেখিতেন এবং প্রবীণ চিত্রকরের ন্যায় তাহার প্রধান অংশগুলি নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া তাঁহার চিত্রকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেন এবং ভাবুকের ন্যায় সকলের মধ্যেই তাঁহার নিজের একটি হৃদয়াংশ যোগ করিয়া দিতেন।

দিবা রাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি।

(প্রাচীন হিন্দু মত)

দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধির সম্বন্ধে ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে কিরূপ ধারণা ছিল জানিতে স্বতঃ কৌতূহল জন্মে। পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্ত ঠিক্ রবিমার্গের সহিত এক সমতলে অবস্থিত নাই; পৃথিবী যে অক্ষরেখা বা ধ্রুবরেখার চারিদিকে ঘুরিতেছে, সেই রেখা ঠিক্ পৃথিবীর বার্ষিক ভ্রমণপথের উপর লম্বভাবে দাঁড়াইয়া নাই। পৃথিবীকে যদি একটি লাটিমের মত ভাবা যায়, এবং তাহার ভ্রমণপথ যদি টেবিলের পৃষ্ঠ ধরা যায়, তাহা হইলে যেন লাটিমের শলাকাটি ঠিক লম্বভাবে টেবিলের উপর না দাঁড়াইয়া এক পার্শ্বে ঈষৎ হেলিয়া আছে। বড় ঈষৎ নহে, এই অবনতির পরিমাণ প্রায় ২৩॥০ ডিগ্রি, প্রাচীন শাস্ত্রা-

নুসারে ২৪ ডিগ্রি। এই অবনতি না থাকিলে বারমাসই দিনরাত্রি সমান থাকিত, হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিত না। এই অবনতির জন্য সূর্য্য ছয়-মাস ধরিয়া নিরক্ষবৃত্তের উত্তরে ও অপর ছয়মাস ধরিয়া নিরক্ষ-বৃত্তের দক্ষিণে থাকে। ১০ই চৈত্র তারিখে নিরক্ষবৃত্ত পার হইয়া ক্রমশ উত্তরবর্ত্তী হইতে হইতে তিনমাসে ২৩॥০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তর-বর্ত্তী হয়, ও ১০ই আষাঢ় হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণ মুখে চলিতে চলিতে আর তিনমাসে অর্থাৎ ১০ই আশ্বিন তারিখে আবার নিরক্ষবৃত্ত পার হয়। ঠিক্ সেইরূপে আবার ১০ই আশ্বিন হইতে ১০ই চৈত্র পর্য্যন্ত ছয়মাস নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণে থাকে।

সূর্য্যের এই ছয়মাস উত্তরায়ণ ও ছয়মাস দক্ষিণায়ণের ফলে আমাদের দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি ও ঋতুপরিবর্ত্তন ঘটে। এইটুকু মনে রাখিলে সূর্য্য নিরক্ষবৃত্ত হইতে কতদূরে থাকিলে পৃথিবীর কোন্খানে দিন কতবড় আর রাত্রি কতবড় হইবে, স্থির করিতে আর প্রয়াস পাইতে হয় না। কেবল একটা জ্যামিতির হিসাব আসিয়া পড়ে।

আজকাল অবশ্য স্কুলের বালকমাত্রেই জানে নিরক্ষবৃত্তে বার-মাসই দিবারাত্রি সমান থাকে সেখানে হ্রাস বৃদ্ধি নাই। আর উভয় মেরুতে ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি। এ সম্বন্ধে প্রাচীন-দিগের কিরূপ ধারণা ছিল দেখাইবার জন্য ভাস্করাচার্য্যের উক্তি গোলাধ্যায় হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

"যাবৎকাল সূর্য্য নিরক্ষবৃত্তের উত্তরভাগে থাকে, তাবৎকাল উত্তরদেশে সূর্য্যোদয় নিরক্ষবৃত্তে উদয়ের একটু পূর্ব্বে ঘটে; ও সূর্য্যাস্ত নিরক্ষবৃত্তে অস্তের একটু পরে ঘটে।" (নিরক্ষবৃত্তে চির-কালই ৬টার সময় উদয় ও ৬টার সময় অস্ত হয়। সুতরাং নিরক্ষ-বৃত্তের উত্তরে দিন বার ঘণ্টার অধিক হয়।)

"সূর্য্য যখন নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণভাগে অবস্থিতি করে, তখন ঠিক্ ইহার বিপরীত ঘটে।"

"নিরক্ষবৃত্তের উপরে দিবারাত্রি সর্ব্বদাই সমান।"

"যে সকল স্থানের কুমেরু ও সুমেরু হইতে দূরত্ব ২৪ অংশের কম, সেই সকল স্থানে বড়ই বিস্ময়জনক ব্যাপার ঘটে।"

"মনে কর কোন স্থান সুমেরু হইতে ১০ অংশ অন্তরে। নিরক্ষ-বৃত্ত হইতে সূর্য্য যতদিন ১০ অংশ অপেক্ষা অধিক উত্তরে থাকিবে, ততদিন ধরিয়া সেই স্থানে সূর্য্যের অস্ত ঘটিবে না; ততদিন সেখানে রাত্রি ঘটিবে না। মেরুস্থলে এই নিমিত্ত ছয়মাস ক্রমাগত দিন ও ছয়মাস ক্রমাগত রাত্রি।"

"দেবগণ সুমেরুতে বাস করেন, ও কুমেরুতে দৈত্যগণের অধি-ষ্ঠান। নিরক্ষবৃত্তই তাঁহাদের উভয়ের চক্রবাল রেখা।"

(১০ই চিত্র হইতে ১ ই আশ্বিন পর্য্যন্ত) ছয় মাস সূর্য্য নিরক্ষ-বৃত্তের উত্তরে, অর্থাৎ দেবগণের চক্রবাল রেখার উর্দ্ধে রহে। (চক্র-বালের নীচে যায় না, সুতরাং অস্তগত হয় না।) আবার (১০ই আশ্বিন হইতে ১০ চৈত্র পর্য্যন্ত) ছয়মাস সূর্য্য নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণে অর্থাৎ দৈত্যগণের চক্রবালের উর্দ্ধে রহে; (ও দেবগণের চক্রবালের নিম্নে রহে।")

সূর্য্য যখন দেখা যায়. তখন দিন, আর যখন দেখা যায় না তখন রাত্রি।" (অর্থাৎ চৈত্র হইতে আশ্বিন ছয়মাস সুমেরুস্থিত দেবগণের দিন আর কুমেরুস্থ দৈত্যগণের রাত্রি, এবং আশ্বিন হইতে চৈত্র ছয় মাস দেবগণের রাত্রি ও দৈত্যগণের দিন।)

বালকগণের পাঠ্য ইংরাজি পুস্তকে, অথবা তাহার তর্জ্জমা বাঙ্গলা পুস্তকে, দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধির এবং মেরুপ্রদেশে দিবারাত্রির অর্দ্ধ বৎসর ব্যাপ্তির কারণ যেরূপে সচরাচর বুঝান থাকে, ভাস্করা-

চার্য্যের প্রণালী তাহার অপেক্ষা কৌশলময় ও সরল। আমার বিবেচনায় শিক্ষক এই প্রণালী অবলম্বন করিলে সহজে বালকগণের হৃদ্গত করাইতে পারিবেন।

বৎসরের মধ্যে ছয়মাস (দক্ষিণায়ণ) ব্যাপিয়া দেবগণ নিদ্রিত থাকেন, ও ছয়মাস (উত্তরায়ণ) ব্যাপিয়া জাগ্রত থাকেন এইরূপ শাস্ত্রে লেখে। ইহার জ্যোতিষিক তাৎপর্য্য এইবার পাঠক বুঝিতে পারিবেন। আমাদের এক বৎসরে দেবগণের এক অহোরাত্র, ইহারও মর্ম্ম সরল হইবে।

জ্যোতিষের মতে আশ্বিন হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত সুমেরুতে দেবগণের রাত্রি; আর আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রাদির মতে দেবগণের রাত্রি আষাঢ় হইতে পৌষ। বলা বাহুল্য, জ্যোতিষের মতই অর্থযুক্ত ও যুক্তিযুক্ত। ভাস্করাচার্য্য জ্যোতিষের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রের এই বিভেদটুকুর উল্লেখ করিয়াছেন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের প্রতি একটু তীব্র-কটাক্ষ করিতেও ছাড়েন নাই।

ভাস্করাচার্য্য মেরুপ্রদেশের সন্নিহিত স্থলে দিবারাত্রি পরিমাণ বাহির করিবার একটি সুন্দর হিসাব দিয়াছেন। সূর্য্যের বিষুবসংক্রমণের দিন (আজকাল যাহা ১০ই চৈত্র তারিখে ঘটে) সুমেরুতে প্রথম সূর্য্যোদয় ঘটে। তার পর এক মাসে সূর্য্য নিরক্ষবৃত্তের উত্তরে ১১ অংশ ৪৫ কলা পর্য্যন্ত যায়; তার পর দ্বিতীয় মাসে ২০ অংশ ৪০ কলা পর্য্যন্ত যায়; তার পর তৃতীয় মাসে ২৪ অংশ (প্রকৃতপক্ষে ২৩ অংশ ২৮ কলা) পর্য্যন্ত যায়, তার পর আর উত্তরে যায় না; ক্রমে দক্ষিণবর্ত্তী হয়। দক্ষিণমুখে ফিরিবার সময় চতুর্থমাসে ২৪ অংশ হইতে ২০ অংশ ৪০ কলায়; পঞ্চম মাসে ১১ অংশ ৪৫ কলায়, ও ষষ্ঠ মাসে নিরক্ষবৃত্তে পুনরায় হাজির হয়। তখন সুমেরুতে সূর্য্যাস্ত ঘটে। সুতরাং

সুমেরু বিন্দুতে ছয় মাসই দিন; সুমেরু হইতে ১১ অংশ ৪৫ কলা দূরস্থ প্রদেশ পর্য্যন্ত (মানচিত্র অনুসারে গ্রীনলণ্ডের উত্তর ভাগ, স্পিট্‌জ্‌বর্জ্জন দ্বীপের অধিকাংশ প্রভৃতি স্থলে) ক্রমাগত চারিমাস ও ততোধিক কাল ধরিয়া দিন (আজ কাল ১০ই বৈশাখ হইতে ১০ই ভাদ্র পর্য্যন্ত); সুমেরু হইতে ২০ অংশ ৪০ কলা পর্য্যন্ত দূরস্থ প্রদেশে (গ্রীনলণ্ডের মধ্যভাগ, নবজেম্লা দ্বীপ ও সাইবিরিয়ার উত্তর উপকূল) দুই মাসের অধিক কাল ধরিয়া দিন (১০ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১০ই শ্রাবণ পর্য্যন্ত)। ফলতঃ সুমেরু হইতে দূরত্ব জানিলেই সেই স্থানের দিবাভাগের পরিমাণ অনায়াসে এই হিসাবে নির্ণীত হইতে পারে।

বলা বাহুল্য এই হিসাবটুকু বাহির করিতে গোলমিতির (Spherical Trigonometry) সাহায্য আবশ্যক। ভাস্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে গোলতত্ত্বে সম্যক্ অভিজ্ঞতার অভাবে এই হিসাব দিতে গিয়া বড়ই ভ্রমে পড়িয়াছেন, এবং তাঁহারা ভাস্করের তীব্র বাক্যজ্বালাময় আক্রমণ হইতে নিস্তার পান নাই। ভাস্কর বলেন, যে জ্যোতিষী গণিতশাস্ত্রে, বিশেষতঃ গোলশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা অবিদ্যমানে অপরকে শাস্ত্র দেখাইতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল বিড়ম্বনা মাত্র। ভরসা করি ভাস্করের এই বাক্যে পাঠকগণের মধ্যে কেহ ক্ষুণ্ণ হইবেন না।

দেবোত্তর বিষয়।

মাদ্রাজের ছয়জন কৃতবিদ্য ব্যক্তি একত্রিত হইয়া দেবোত্তর সম্পত্তির সদ্ব্যবহার নিমিত্ত এক আইন বিধিবদ্ধ করিবার মন্ত্রণা করেন। তাঁহাদের প্রস্তাবানুসারে মাদ্রাজের গবর্ণর বাহাদুর

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে উক্ত বিষয়ে এক আইন প্রস্তত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

এই প্রস্তাবকারীদিগের অভিপ্রায় এই যে, দেবোত্তর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ জন্য ১৮৬৩ সালের যে ২০ আইন প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা সমুচিত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব এমন এক আইন হউক, যাহাতে গবর্ণমেণ্ট নিজে কর্ত্তাস্বরূপ হইয়া জেলার জজ প্রভৃতি কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা দেবমন্দির ও তৎসম্পর্কীয় সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন।

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার যথাযোগ্য বিচার করিয়া, প্রত্যুত্তরে শেষোক্ত গবর্ণমেণ্ট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

সকৌন্সিল গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের উক্তি এই ;—পাশ্চাত্য বিদ্যায় দীক্ষিত কতকগুলি ব্যক্তি এই আইনের প্রার্থনা করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ হিন্দুগণ উহার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন। ১৮৬৩ অব্দের ২০ আইনের সম্বন্ধে এইরূপ বিচার করিয়া ১৮৮৮ অব্দে, গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডফরিণের সময়, ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, উক্ত আইনে যে ব্যবস্থা আছে, দেবোত্তর সম্পত্তির পক্ষে সেই ব্যবস্থাই যথেষ্ট। সেই আইনমতে কর্ম্ম নির্ব্বাহ পক্ষে যে কিছু ত্রুটি থাকে, তাহা পরিহার করা যাইতে পারে। সিভিল প্রসিডিওর কোড নামক দেওয়ানি কার্য্যবিধির ৫৩৯ ধারা সেই উদ্দেশে প্রণোদিত হইয়াছে। যেখানে দেব-সম্পত্তির সমুচিত সদ্ব্যবহার না হয়, সেখানে যদি কেহ সে বিষয়ের প্রতিকার ইচ্ছা করেন, তিনি উক্ত ধারা-মতে দেওয়ানি আদালতে তজ্জন্য নালিশ করিতে পারেন।

উক্ত মন্তব্য দ্বারা ভারতগবর্ণমেণ্ট ইহা বিদিত করিয়াছেন যে, দেবোত্তর সম্পত্তির নিমিত্ত যে সকল আইন এক্ষণে প্রচলিত আছে,

দেশের লোক সমাজের হিতের নিমিত্ত কার্য্য করিতে সমুদ্যত হইলে ঐ সকল বিধি ব্যবস্থা দ্বারা অবশ্যই অভিপ্রেত সাধন করিতে পারিবেন।

ভারতগবর্ণমেণ্ট এই উপলক্ষে দেবোত্তরঘটিত তাবৎ ব্যাপারের অবস্থা বিলোকন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট দেখিয়াছেন যে, দেওয়ানী কার্য্যবিধি অনুসারে এক একটী নষ্ট সম্পত্তি উদ্ধার করিতে হইলে সম্পত্তির পরিমাণানুসারে তাহার ফি দিতে হয়। তাহাতে অনেক টাকা লাগে। যাঁহারা স্বয়ং কোন সম্পত্তির ফলভোগী হইবেন, তাঁহারা ঐ টাকা দিয়া মোকদ্দমা চালাইতে এবং তাহার আনুষঙ্গিক বহু খরচা দিয়া সম্পত্তি উদ্ধার করিতে সমুদ্যত হইবেন। কিন্তু দেবতার সেবা বা তাদৃশ ধর্ম্মোদ্দেশে যে সম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অপচয় নিবারণ বা উদ্ধার সাধন করিতে লোক টাকা দিবে কেন? কেহ নিঃস্বার্থ হইয়া গ্রামস্থিত বা দেশস্থিত কোন দেবমন্দিরের বা মঠের অধিপতিদিগের অবিহিতাচার নিবারণ করিতে উদ্যত হইতে পারেন; কিন্তু নিজ কোষ হইতে প্রচুর অর্থ দিয়া আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করা সকলের সাধ্যায়ত্ত হইবে না। বস্তুতঃ এই জন্যই উপরোক্ত আইন সকল সত্ত্বেও দেবোত্তর সম্পত্তির নানাবিধ অপব্যবহার নিবারিত হইতেছে না।

সহৃদয় গবর্ণমেণ্ট সমীচীন বিবেচনা সহকারে এই তথ্য অবধারণ করিয়া বলিয়াছেন যে, অতঃপর যদি ভারতবাসীরা যুক্তিযুক্তরূপে দাবী করেন, তাহা হইলে উল্লিখিত প্রকার মোকদ্দমার ব্যয় সংক্ষেপ করণার্থ যৎকিঞ্চিন্মাত্র ফি নির্দ্দিষ্ট করিতে পারা যাইবে।

গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টই বলিয়াছেন যে দেবোত্তর সম্পত্তির সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে। ১৮৬৩ সালের ২০ আইন কোন অংশে পরিবর্ত্তিত বা রহিত করা হইবে না।

ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্ম্মবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না, এই যে অঙ্গীকার আছে, এই অঙ্গীকার পালন পক্ষে তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও দৃঢ়তা রহিয়াছে। বর্ত্তমান প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্ট যে সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন, এবং প্রজাপুঞ্জের প্রতি যে সহৃদয়তা দেখাইয়াছেন, তাহা এই সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের যোগ্যই হইয়াছে।

এখন এই দেবোদ্দিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে কর্ত্তব্য তাহা তিনি করিয়াছেন, আমাদের যে কর্ত্তব্য তাহা আমরা সম্পাদন করিলেই সম্যক্ ফলোপধায়ক হয়। গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে আমাদের যথার্থ মনুষ্যোচিত কর্ম্ম চাহেন। আমরা যুক্তিযুক্ত মতে দাবী করিলে তবে তিনি দেবোত্তরঘটিত মোকদ্দমার ফি খর্ব্ব করিবেন। আমরা যথার্থ সামাজিকতা এবং লোকহিতৈষিতা প্রদর্শন করিয়া মহন্তদিগের কৃত বা সেবাইতগণ কৃত দেবোত্তর সম্পত্তির অপব্যবহার নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলে, গবর্ণমেণ্ট প্রচলিত আইন রক্ষা করিয়া আমাদের সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবেন। কিন্তু আমরা করিব কি?

যে কার্য্যে আমরা পটু—যাহা আমাদের অভ্যস্ত, তাহা তো করা হইয়াছে। তাহার ফলও যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। আমাদের "আবেদন ও নিবেদন থালা" একপ্রকার ফিরিয়াই আসিয়াছে বলিতে হইবে। এখনকার কর্ত্তব্য কি? আবেদনের পর অভিমানের পালা, এই কি আমাদের অদৃষ্টের লিখন? সত্য সত্যই দেখি, তাহাই যেন প্রতিপন্ন হয়।

প্রত্যাহত আবেদনকারীদিগের এখন অভিমানের পালা পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যে এত কথা বলিলেন, এত আশা ও ভরসা দিলেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি নাই। বালকের ন্যায় রোদন ও আবদার,—যাহা বলিয়াছি, তাহাই চাই; একটী আইন করিয়া দিতেই হইবে। এখনই দিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্টের দোষ দেখান হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট যে বলিয়াছেন যে, ১৮৬৩ সালের আইন দ্বারা কার্য্য সাধন হইতে পারে, তাহা ভ্রমাত্মক। এই ভ্রমাত্মকতা প্রতিপাদন উদ্দেশে তৎসংক্রান্ত নানা চিঠিপত্র দেখান হইতেছে। আবার এই পুনরালোচনা দেখিয়া কেহ কেহ বিরক্ত বা শঙ্কাযুক্ত হইয়া বলিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট যাহা করিয়াছেন, উত্তম হইয়াছে। বাবুরা পুনরায় গোলযোগ করেন কেন? এইরূপ সর্ব্ববিষয়িণী "কথার বাধুনী কাঁদুনীর পালা" আর তো শ্রুতি-যোগ্য হয় না। কেবল বাদানুবাদও শ্রেয়স্কর বোধ হয় না।

কথায় কথায় যে গীতটী স্মরণ হইল, তাহাতে আছে—"চোখে নাই কারো নীর।" কবির এই কথাটী সম্পূর্ণ সত্য বোধ হইতেছে না। এই লেখকের মত অধম লোকও যখন অশ্রুবারি সম্বরণ করিতে পারিল না, তখন অবশ্যই অনেকে কাঁদেন। কাঁদিবেন বৈ কি? ভারতের যে দুর্দ্দশা চতুর্দ্দিকে দৃশ্যমান,—ধরাধরি করিতে করিতে যে দুর্গতি গভীরতর খাতের দিকে চলিল, তাহা উপলব্ধি করিলে কাহার চিত্ত উদ্বেল হইয়া না উঠে। তজ্জন্য এই অশ্রুনীর একপ্রকার আবশ্যক বটে। সীতার নিমিত্ত রামচন্দ্র প্রথমতঃ বহুল শোকাশ্রু বর্ষণ করিয়াই সাগর বন্ধনের সামর্থ্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু রোদন মাত্র সম্বল হওয়া উচিত নহে।

প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্প্রতি যাঁহারা নিশ্চেষ্টতার পক্ষপাতী, তাঁহারা বোধ করি, উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন না যে, দেবোত্তর সম্পত্তির অপচয় হইতে কত অমঙ্গল ঘটিতেছে ও ঘটিতে পারে।

এ দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমার্থপরায়ণ সাধু পুরুষদিগের শরীরধারণোপযোগী বৃত্তিবিধান জন্যই দেবোত্তর সম্পত্তি সকল প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহারা "ঠাকুর-ভোগ" বা দেবপ্রসাদ ভিন্ন অন্ন গ্রহণ

করিবেন না, এই জন্য দেবোদ্দেশে অন্ন নিবেদিত হয়। বিপুল সম্পত্তি বা রাশি রাশি অন্ন ব্যঞ্জন দেবতার ক্ষুধা নিবারণ জন্য নহে; পরন্তু ভক্তের শরীর পোষণ নিমিত্ত। এই বিধানে সাধু তপস্বী-দিগের উঞ্ছবৃত্তি বা ভিক্ষাপ্রবৃত্তির কতক নিবৃত্তি করা হইয়াছে। আর এই প্রকরণে গৃহস্থের পক্ষে সাধুদর্শন, সৎসঙ্গ ও তজ্জনিত জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভের পথ কতক সুগম করা হইয়াছে। ইহার ব্যাঘাত ভারতের পক্ষে মর্ম্মাঘাত বা বজ্রাঘাত তুল্য। অতএব সর্ব্ব-প্রযত্নে ও প্রাণপণে এই মহাধনের রক্ষা ও তাহার সার্থকতা সাধন করা উচিত। এ বিষয়ে কেহ দুটা কথা কহিলেও শ্রেয় জ্ঞান হয়। নিস্তব্ধতায় ও নিশ্চেষ্টতায় এই সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে, আরো ঘটিবে। অতএব ভূয়োভূয়ঃ এই কথাই বলিতে হয়,—ইহাই ভাবিতে হয়, আমরা কি প্রণালীতে কার্য্য করিব?

১৮১০ সালের ১৯ আইন, ১৮৬৩ সালের ২০ আইন, ১৮১৭ সালের মাদ্রাজ সংক্রান্ত ৭ আইন, প্রায় সকলেরই এক আশয় যে আমরা আপনা হইতে কিছু করিব। এখনকার গবর্ণমেণ্টও তাহাই চাহেন। যাঁহারা নূতন আইনের প্রার্থনা করিয়াছেন, তাঁহাদেরও আশয় এই যে আমাদের ডিষ্ট্রিকট বোর্ড বা তদনুরূপ কোন সভা দ্বারা গবর্ণমেণ্ট কার্য্য করাইয়া লইবেন। প্রতিবাদকারীরা বলেন, আমাদিগের ডিষ্ট্রিকট বোর্ড বা অন্য সভা দ্বারা এতাদৃশ গুরুতর ব্যাপার সুসম্পন্ন হইতে পারিবে না।

তাহা হইলে কি করা উচিত? প্রতিবাদকারীরা বলেন, চুপ করিয়া বসিয়া থাক। যাহা হইবার, আপনা হইতে হইবে। কোন দেশে কোন কালে কোন স্থায়ী মহৎ কর্ম্ম "আপনা হইতে" নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহা গত কালের ইতিহাসে নাই। ভবিষ্যৎকালে যে এই অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিবে—অর্থাৎ আমরা নিদ্রার আরাম সুখ

উপভোগ করিতে করিতে মহৎ পদবীতে উন্নীত হইব, তাহার সম্ভাবনা অল্পই দেখা যাইতেছে। অতএব কর্ম্মই নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ হয়। চেষ্টা চাই, যত্ন চাই, সাধনা চাই। এই কালের প্রধান কথা সাধনা।

জল চলিতে থাকিলে তাহার মলা দূর হইয়া যায়। বদ্ধ জল দূষিত হইবেই হইবে। আমরা কর্ম্ম করিতে থাকিলে আমাদের সভা, সমিতি,—অনেকে এবং প্রত্যেকে, কালে সকল দোষ পরিহার করিয়া উঠিবে।

আরভেতৈন কর্ম্মাণি শ্রান্তঃ শ্রান্তঃ পুনঃ পুনঃ।
কর্ম্মাণ্যারভমাণং হি পুরুষং শ্রীর্নিষেবতে॥

মনু ৯।৩০০

এই তো আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতি। কর্ম্ম করিয়া পুনঃ পুনঃ শ্রান্ত হইলেও পুনরায় কর্ম্ম আরম্ভ করিবে। যে ব্যক্তি নিত্য কর্ম্মারম্ভশালী তাহাকেই শ্রী সেবা করে।

এই মহাবাক্য অবলম্বন করিয়া আমরা কার্য্য করি। পূর্ব্বতন ঋষিগণ যেরূপে তপস্যা করিতেন, আমাদের সাধনা তদনুগামিনী হউক। ঈশ্বর ফলদাতা। কেবল এই প্রস্তাবিত বিষয়ে কেন, ভারতের সকল অনিষ্ট নিবারণ ও ইষ্ট লাভ পক্ষে সাধনাই আমাদের কার্য্য। ধর্ম্মরাজ ঈশ্বর তাহার সিদ্ধিদাতা।

আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য এই যে ইংরাজী ভাষায় রাজদরবারের আবেদনাদি কার্য্য একটু স্থগিত করিয়া মাতৃভাষায় সর্ব্বসাধারণের সহিত এই বিষয়ে আলাপ করি।

(১) দেবোত্তর সম্পত্তির অপব্যবহারে আমাদের কি কি অনিষ্ট হইতেছে; (২) তাহার প্রতিকার জন্য আমাদের কতখানি সময় ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করা উচিত; (৩) গবর্ণমেণ্ট যে নিরপেক্ষতার মূলে কার্য্য করিতেছেন, সে মূল ধরিয়া তাঁহার আর আমাদিগকে কতদূর

সাহায্য করা আবশ্যক; (৪) আমরা আত্মচেষ্টায় কি কি প্রতিকার সাধন করিতে পারি; (৫) আমরা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য কি কি প্রকারে পাইতে পারি;—এই সকল বিষয়ে আলোচনা করা, দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে দেবোত্তরধারী ব্যক্তিদিগের অবস্থা ও কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা, তাঁহাদের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করা এবং তৎ-প্রতি সাধারণ লোকের স্বপক্ষ হইতে যাহা কর্ত্তব্য তাহা সম্পাদন করা প্রথম আবশ্যক। বোধ হয় তাহা হইলেই সর্ব্বার্থসাধনপটু ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আমাদের যে যোগ্যতা চাহেন, সে যোগ্যতা—সে শক্তি আমরা লাভ করিতে পারিব।

ইহা সত্য বটে যে, দেবোত্তর সম্পত্তি যত অধিক হউক, তাহা নিষ্কামভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার সহিত বিবেচ্য বিষয় আরো অনেক আছে। এই সম্পত্তির প্রকৃতি বিশেষরূপে আলোচনা করিলে সর্ব্বসাধারণের প্রতীতি হইবে যে, ইহা ঐরূপ নিষ্কামী জনের পোষ-ণের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন উহা ব্যর্থ। তাহা তাদৃশ মহৎ লোকের শরীর রক্ষার উপযোগী হইবে এবং সেই সাধুগণ শরীরমাত্র ধারণ করিয়া নিষ্কামধর্ম্মেরই বৃদ্ধি করিতে থাকিবেন। ইহাই উহার সার্থকতা।

সেই নিষ্কাম-দান-সমষ্টি এইরূপ নির্ম্মল-ভাব-প্রসূত হইলেও যখন তাহা অর্থে পরিণত হইয়াছে, এবং পরমার্থ-লক্ষণ হইতে একটু ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহাকে অবশ্যই পার্থিব অর্থযোগ্য শাসন প্রাপ্ত হইতে হইবে। অর্থই অনর্থ, ইহা প্রসিদ্ধ কথা। কোন প্রকরণে ইহা অন্যথাভূত হয় না। এই কামনাহীন দানের অর্থও সেই জন্য বিবিধ অনর্থের হেতু হইয়া পড়িতেছে। অতএব তাহাকেও অন্যান্য অর্থের ন্যায় নিয়মের ও শাসনের অধীন হইতে হইবে। তাহাতে প্রতিবাদ করা সুবিবেচনার কার্য্য নহে।

কোন বিষয়ে আন্দোলন করিয়া কিরূপে বিফলপ্রযত্ন হইতে হয় এবং কি প্রকারেই বা তাহার সিদ্ধি লাভ করা যায়, তাহার উদাহরণ, সপক্ষ ও বিপক্ষের ঘাত প্রতিঘাতে বারম্বার দেখা গেল। তাহা স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান কালের সমুদ্যত কৃতী পুরুষেরা কি করিতে পারিবেন, তজ্জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হউন। বৃথা বাক্যের আর সময় নাই।

সমালোচনা।

উপনিষদঃ অর্থাৎ ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই ছয়খানি উপনিষৎ। শ্রীসীতানাথ দত্ত কৃত 'শঙ্কর-কৃপা' নাম্নী টীকা ও 'প্রবোধক' নামক বঙ্গানুবাদ সহিত। সুপ্রসিদ্ধ বেদাচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী কর্ত্তৃক সংশোধিত। মূল্য একটাকা।

আমরা সম্পাদকোচিত সর্ব্বজ্ঞতার ভাণ করিতে পারি না। আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, গ্রন্থকারকৃত উপনিষদের টীকা ও বঙ্গানুবাদে কোন প্রকার ভ্রম অথবা ত্রুটি আছে কি না তাহা নির্ণয় করিতে আমরা সম্পূর্ণ অশক্ত। তবে যখন সামশ্রমী মহাশয় কর্ত্তৃক সংশোধিত তখন আমরা বিশ্বাস পূর্ব্বক এই টীকা এবং অনুবাদ গ্রহণ করিতে পারি। এই উপনিষৎগুলি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া সীতানাথ বাবু যে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার টীকা ও অনুবাদের সাহায্যে জগতের এই প্রাচীনতম তত্ত্বজ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশলাভ করিয়া আমরা চরিতার্থ হইয়াছি।

প্রবেশ লাভ করিয়াছি এ কথা বলা ঠিক হয় না। কারণ, এই প্রাচীন উপনিষৎগুলিতে ব্রহ্মতত্ত্ব আদ্যোপান্ত সংশ্লিষ্টভাবে প্রকা-

শিত হয় নাই। পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, শ্লোকগুলি যেন কঠিন তপস্যার সংঘর্ষজনিত এক একটি তেজ-স্ফুলিঙ্গের মত ঋষিদের হৃদয় হইতে বর্ষিত হইতেছে—যে স্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শে পরবর্ত্তীকালে ভারতীয় দর্শন ষড়শিখা হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

এই সকল উপনিষৎকথিত শ্লোকগুলি সর্ব্বত্র সুগম নহে এবং বহুকালের পরবর্ত্তী কোন ভাষ্যকার, ঋষিদের গূঢ় অভিপ্রায় যে, সর্ব্বত্র ভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছেন অথবা সক্ষম হইতে পারেন এরূপ আমাদের বিশ্বাস নহে; কারণ, অনেকস্থলেই শ্লোকগুলি পড়িলে, আর কিছুই ভাল বুঝা যায় না, কেবল এইটুকু বুঝা যায়, যে, সেগুলি নিগূঢ় এবং সংক্ষিপ্ত সংকেত মাত্র। সেই সংকেতের প্রকৃত অর্থ তপোবনবাসী সাধক এবং তাঁহার শিষ্যদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল, এবং সেই ভাবার্থ ক্রমশঃ শিষ্যানুশিষ্যপরম্পরাক্রমে এবং কালভেদে মতের বিচিত্র পরিণতি অনুসারে বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইবার কথা। তাঁহারা যে শব্দ যে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেন এখন আমরা আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের অবস্থা অনুসারে সম্ভবতঃ তাহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। এই জন্য সর্ব্বত্র আমরা ভাবের সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারি না। অথচ অনেকগুলি উজ্জ্বল সত্যের আভাস আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠে। কিন্তু সেইগুলিকে যখন আপন মনে স্পষ্টীকৃত করিতে চেষ্টা করি তখনই সংশয় হয়, ইহার কতখানি বাস্তবিক সেই ঋষির কল্পিত এবং কতখানি আমার কল্পনা। একটি উদাহরণ দিলে পাঠকগণ আমার কথা বুঝিতে পারিবেন।

অথর্ব্ববেদের প্রশ্নোপনিষদে আছে;—প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া তপস্যা করিলেন এবং তপস্যা করিয়া রয়ি (অর্থাৎ আদি-

ভূত) এবং প্রাণ (অর্থাৎ চৈতন্য) এই মিথুন উৎপাদন করিলেন। আদিত্যই প্রাণ, চন্দ্রমাই রয়ি; মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত (সংশ্লিষ্ট) যাহা কিছু এই সমস্তই রয়ি; (তন্মধ্যগত) মূর্ত্ত বস্তু ত রয়ি বটেই।

বন্ধনী চিহ্নবর্ত্তী শব্দগুলি মূলের নহে। অতএব, পিপ্পলাদ ঋষি রয়ি এবং প্রাণ শব্দ ঠিক কি অর্থে ব্যবহার করিতেন তাহা বলা কঠিন। ভাষ্যকারকৃত অর্থের অনুবর্ত্তী হইয়াও যে, সর্ব্বত্র সমস্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠে তাহাও বলিতে পারি না; কারণ, আদিত্য-কেই বা কেন চৈতন্য এবং চন্দ্রমাকেই বা কেন আদিভূত বলা হইল তাহার কোন তাৎপর্য্য দেখা যায় না। অথচ আভাসের মত এই তত্ত্ব মনে উদয় হয়, যে,—দুই বিরোধী শক্তির মিলনে এই সৃষ্টি-প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে, ভাল ও মন্দ, চেতনা ও জড়তা, জীবন ও মৃত্যু, আলোক ও অন্ধকার—রয়ি এবং প্রাণশব্দে স্পষ্ট ভাবে হৌক্ অস্পষ্টভাবে হৌক এই মিথুন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রশ্নো-পনিষদের স্থানান্তরে রহিয়াছে শুক্লপক্ষ প্রাণ এবং কৃষ্ণপক্ষ রয়ি; দিন প্রাণ এবং রাত্রি রয়ি। কর্ম্ম দ্বারা আমরা রয়িকে প্রাপ্ত হই, ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও জ্ঞান দ্বারা আমরা প্রাণকে প্রাপ্ত হই।

যাহাই হৌক, এই শ্লোকগুলি হইতে আমাদের মনে যে তত্ত্বটি প্রতিভাত হইতেছে তাহা এই উপনিষদের অভিপ্রেত কি না আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না—আর কাহারও মনে অন্য কোন রূপ অর্থেরও উদয় হইতে পারে।

অর্থ স্পষ্ট হৌক্ বা না হৌক এই উপনিষৎগুলির মধ্যে যে একটি সরল উদারতা, গভীরতা, প্রশান্তি এবং আনন্দ আছে তাহা বাঙ্গলা অনুবাদেও প্রকাশ পাইতেছে। ইহার সর্ব্বত্রই অনি-র্ব্বচনীয়কে বচনে প্রকাশ করিবার যে অসীম ব্যাকুলতা বিদ্যমান আছে তাহা এত সুগভীর যে, তাহাতে চাঞ্চল্য নাই। ইহাতে

ঋষিরা জ্ঞানের এবং বাক্যের পরপারে ব্রহ্মকে যতদূর পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছেন এমন আর কোন ধর্ম্মে করে নাই, অথচ তাঁহাকে যত নিকটতম অন্তরতম আত্মীয়তম করিয়া অনুভব করিয়াছেন এমন দৃষ্টান্তও বোধ করি অন্যত্র দুর্লভ। তাঁহারা একদিকে জ্ঞানের উচ্চতা অন্যদিকে আনন্দের গভীরতা উভয়ই সমানভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। আমাদের বাঙ্গলাদেশে শাক্ত বৈষ্ণবেরা ঈশ্বরের নৈকট্য অনুভবকালে তাঁহার দূরত্বকে একেবারে লোপ করিয়া দেয়, ভক্তিকে অন্ধভাবে উন্মুক্ত করিয়া দিবার কালে জ্ঞানকে অবমানিত করে; -কিন্তু উপনিষদে এই উভয়ের অটল সামঞ্জস্য থাকাতে তাহার মহাসমুদ্রের ন্যায় এমন অগাধ গাম্ভীর্য্য। এই জন্যই উপনিষদে সাধকের আত্মা কলনাদিনী কূলপ্লাবিনী প্রমত্ততায় উচ্ছ্বসিত না হইয়া নিজেকে আত্মসমাহিত ভূমানন্দে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে।*

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা। প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় সংখ্যা। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য তিন টাকা।

* এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে আমরা কেনোপনিষৎ হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি।

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি।

ইহার তাৎপর্য্য এই—মন কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া পতিত হয়, অর্থাৎ নিজ বিষয়ের উপরে উপনীত হয়। প্রাণ কাহার দ্বারা প্রৈতি প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ নিজ বিষয়ের অভিমুখে গতিলাভ করিয়াছে। কাহার দ্বারা প্রেরিত এই বাক্য লোকে উচ্চারণ করে এবং কোন্ দেবতাই বা চক্ষু শ্রোত্রকে স্ববিষয়ে যোজনা করেন।

"প্রৈতি" শব্দটির প্রতি আমরা পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। বাঙ্গলা ভাষায় এই শব্দটির অভাব আছে। যেখানে বেগপ্রাপ্তি বুঝাইতে ইংরাজীতে impulse শব্দের ব্যবহার হয় আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গলায় সেই স্থলে "প্রৈতি" শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে।

সাহিত্য পরিষদ সভা হইতে এই ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। এই পত্রিকায় আমরা এমন সকল প্রবন্ধের প্রত্যাশা করি যাহাতে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস এবং বঙ্গভাষার পুরাবৃত্ত, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব ও অভিধান রচনার সহায়তা করে। আমাদের দেশের প্রাচীন পুঁথির পাঠোদ্ধার এবং অপ্রচলিত পুরাতন শব্দের অর্থ বিচারও ইহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং বাঙ্গলা রূপকথা (Folk lore), প্রবচন (Proverb) হরুঠাকুর রামবসু প্রভৃতি লোক-প্রসিদ্ধ কবিওয়ালাদিগের গান, ছড়া (nursery-rhyme) প্রভৃতি সংগ্রহের প্রতিও ইহার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানসংখ্যক পত্রিকাটি দেখিয়া আমরা কিয়ৎপরিমাণে আশান্বিত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত কৃত্তিবাস এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা পরিষদ-পত্রিকার সম্পূর্ণ উপযোগী এবং সাধারণের সমাদরের যোগ্য হইয়াছে। কিন্তু আমরা দুঃখের সহিত বলিতেছি সম্পাদকলিখিত ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধটির মধ্যে কেবল যে সকল ছত্র ভূদেব বাবুর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত সেই অংশগুলিই পাঠ্য এবং অবশিষ্ট সমস্তই অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক বাগাড়ম্বরে পরিপূর্ণ। আমরা লেখক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্রবন্ধের একটি অংশ উদ্ধৃত করি।

"মিল্টন যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন ভয়াবহ বিপ্লবে সমগ্র ইংলণ্ড আন্দোলিত হইয়াছিল। তখন স্বাধীনতার সহিত যথেচ্ছাচারের ভীষণ সংগ্রাম ঘটিয়াছিল। এই সংগ্রাম একদিনে পর্য্যবসিত হয় নাই; একস্থানে এই সংগ্রামস্রোতে অবরুদ্ধ হইয়া থাকে নাই, এক সম্প্রদায় এই সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করে নাই। এই সংগ্রামে ইংরেজ জাতির যেরূপ স্বাধীনতা লাভ হয়, সেইরূপ আমেরিকার আরণ্যপ্রদেশ সুদৃশ্য নগরাবলীতে শোভিত হইতে

থাকে। অন্যদিকে গ্রীস দুইহাজার বৎসরের অধীনতাশৃঙ্খল ভগ্ন করিতে উদ্যত হইয়া উঠে। এই দীর্ঘকালব্যাপী সময়ে ইউরোপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এরূপ প্রচণ্ড বহ্নিস্তূপের আবির্ভাব হয় যে, উহার জ্বালাময়ী শিখা প্রত্যেক নিপীড়িত ও নিগৃহীত ব্যক্তির হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়া তাহাদিগকে দীর্ঘকালের নিপীড়ন ও নিগ্রহের গতিরোধে শক্তিসম্পন্ন করে।"

পাঠকেরা মনে করিতে পারেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় য়ুরোপের এই এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তব্যাপী জ্বালাময়ীশিখার কিয়দংশ কোন উপায়ে আহরণ করিয়া এই বাঙ্গালী লেখকের ভাষায় ও কল্পনায় বর্ত্তমান অগ্নিদাহ উপস্থিত করিয়াছেন; কিন্তু লেখক বলিতেছেন—তাহা নহে। "ভূদেবের সময় হিন্দুসমাজে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা মিল্টনের সময়ের বিপ্লবের ন্যায় সর্ব্বত্র ভীষণ ভাবের বিকাশ করে নাই; উহাতে নরশোণিতস্রোত প্রবাহিত হয় নাই; প্রজালোকের সমক্ষে দেশাধিপতির শিরশ্ছেদন ঘটে নাই বা জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য উত্তেজিত হইয়া ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনে আত্মোৎসর্গ করে নাই।"

বিস্তারিত ভাবে এমন হাস্যকর তুলনার অবতারণ এবং অবশেষে একে একে তাহার আদ্যন্ত খণ্ডন কোন দেশের কোন প্রহসনেও এপর্য্যন্ত স্থান পায় নাই। গ্রন্থকার কুরুক্ষেত্রের সমস্ত যুদ্ধবর্ণনা মহাভারত হইতে আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিয়া সর্ব্বশেষে লিখিতে পারিতেন যে, ভূদেবের সময় যদিচ "নবীন ভাবের বাহ্যবিভ্রমে পুরাতন ভাবের স্থিতিশীলতা কিয়ৎপরিমাণে বিচলিত" হইয়াছিল, যদিচ "তখন ইংরেজী ভাবের প্রচার ও ইংরেজী শিক্ষা বদ্ধমূল হইয়াছিল" এবং "বিজ্ঞানের কৌশলে ভারতবর্ষ যেন ইংলণ্ডের দ্বারস্থ হইয়া উঠিয়াছিল" কিন্তু ঘটোৎকচবধ হয় নাই।

সাধনা।

নিশীথে।

"ডাক্তার! ডাক্তার!"

জ্বালাতন করিল! এই অর্দ্ধেক রাত্রে—

চোখ মেলিয়া দেখি আমাদের জমিদার দক্ষিণাচরণ বাবু। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পিঠভাঙ্গা চৌকিটা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলাম এবং উদ্বিগ্নভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। ঘড়িতে দেখি তখন রাত্রি আড়াইটা।

দক্ষিণাচরণ বাবু বিবর্ণমুখে বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন, আজ রাত্রে আবার সেইরূপ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে—তোমার ঔষধ কোন কাজে লাগিল না।

আমি কিঞ্চিৎ সসঙ্কোচে বলিলাম, আপনি বোধ করি মদের মাত্রা আবার বাড়াইয়াছেন।

দক্ষিণাবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন—ওটা তোমার ভারি ভ্রম। মদ নহে;—আদ্যোপান্ত বিবরণ না শুনিলে তুমি আসল কারণটা অনুমান করিতে পারিবে না।

কুলুঙ্গির মধ্যে ক্ষুদ্র টিনের ডিবায় ম্লানভাবে কেরোসিন্ জ্বলিতেছিল, আমি তাহা উস্কাইয়া দিলাম; একটুখানি আলো জাগিয়া উঠিল এবং অনেকখানি ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল। কোঁচাখানা গায়ের উপর টানিয়া একখানা খবরের কাগজ-পাতা প্যাক্ বাক্সের উপর বসিলাম। দক্ষিণাবাবু বলিতে লাগিলেন—

আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মত এমন গৃহিণী অতি দুর্লভ ছিল। কিন্তু আমার তখন বয়স বেশি ছিল না; সহজেই রসাধিক্য ছিল তাহার উপর আবার কাব্যশাস্ত্রটা ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম তাই অবিমিশ্র গৃহিণীপনায় মন উঠিত না। কালিদাসের সেই শ্লোকটা প্রায় মনে উদয় হইত,—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

কিন্তু আমার গৃহিণীর কাছে ললিত কলাবিধির কোন উপদেশ খাটিত না এবং সখীভাবে প্রণয় সম্ভাষণ করিতে গেলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। গঙ্গার স্রোতে যেমন ইন্দ্রের ঐরাবত নাকাল হইয়াছিল তেমনি তাঁহার হাসির মুখে বড় বড় কাব্যের টুক্‌রা এবং ভাল ভাল আদরের সম্ভাষণ মুহূর্ত্তের মধ্যে অপদস্থ হইয়া ভাসিয়া যাইত। তাঁহার হাসিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল।

তাহার পর, আজ বছর চারেক হইল আমাকে সাংঘাতিক রোগে ধরিল। ওষ্ঠব্রণ হইয়া জ্বরবিকার হইয়া মরিবার দাখিল হইলাম। বাঁচিবার আশা ছিল না। একদিন এমন হইল যে ডাক্তারে জবাব দিয়া গেল। এমন সময় আমার এক আত্মীয় কোথা হইতে এক ব্রহ্মচারী আনিয়া উপস্থিত করিল;—সে গব্যঘৃতের সহিত একটা শিকড় বাঁটিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দিল। ঔষধের গুণেই হোক বা অদৃষ্টক্রমেই হোক্ সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম।

রোগের সময় আমার স্ত্রী অহর্নিশি এক মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম করেন নাই। সেই ক'টা দিন একটি অবলা স্ত্রীলোক, মানুষের সামান্যশক্তি লইয়া, প্রাণপণ ব্যাকুলতার সহিত, দ্বারে সমাগত যমদূতগুলার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত

প্রেম, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত যত্ন দিয়া আমার এই অযোগ্য প্রাণটাকে যেন বক্ষের শিশুর মত দুই হস্তে ঝাঁপিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। আহার ছিল না, নিদ্রা ছিল না, জগতের আর কোন-কিছুর প্রতিই দৃষ্টি ছিল না।

যম তখন পরাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় আমাকে তাঁহার কবল হইতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন কিন্তু যাইবার সময় আমার স্ত্রীকে একটা প্রবল থাবা মারিয়া গেলেন।

আমার স্ত্রী তখন গর্ভবতী ছিলেন, অনতিকাল পরে এক মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার নানাপ্রকার জটিল ব্যামোর সূত্রপাত হইল। তখন আমি তাঁহার সেবা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তাহাতে তিনি বিব্রত হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন—আঃ, কর কি! লোকে বলিবে কি! অমন করিয়া দিন রাত্রি তুমি আমার ঘরে যাতায়াত করিয়ো না!

যেন নিজে পাখা খাইতেছি এইরূপ ভাণ করিয়া রাত্রে যদি তাঁহাকে তাঁহার জ্বরের সময় পাখা করিতে যাইতাম, ত ভারি একটা কাড়াকাড়ি ব্যাপার পড়িয়া যাইত; কোন দিন যদি তাঁহার শুশ্রূষা উপলক্ষ্যে আমার আহারের নিয়মিত সময় দশ মিনিট উত্তীর্ণ হইয়া যাইত তবে সেও নানা প্রকার অনুনয় অনুরোধ অনুযোগের কারণ হইয়া দাঁড়াইত। স্বল্পমাত্র সেবা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিত। তিনি বলিতেন পুরুষ মানুষের অতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

আমাদের সেই বরানগরের বাড়িটি বোধ করি তুমি দেখিয়াছ। বাড়ির সাম্‌নেই বাগান এবং বাগানের সম্মুখেই গঙ্গা বহিতেছে। আমাদের শোবার ঘরের নীচেই দক্ষিণের দিকে খানিকটা জমি মেহেদির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া আমার স্ত্রী নিজের মনের মত এক-

টুক্‌রা বাগান বানাইয়াছিলেন। সমস্ত বাগানটির মধ্যে সেই খণ্ডটিই অত্যন্ত সাদাসিধা এবং নিতান্ত দিশী। অর্থাৎ তাহার মধ্যে গন্ধের অপেক্ষা বর্ণের বাহার, ফুলের অপেক্ষা পাতার বৈচিত্র্য ছিল না—এবং টবের মধ্যে অকিঞ্চিৎকর উদ্ভিজ্জের পার্শ্বে কাঠি অবলম্বন করিয়া কাগজে নির্ম্মিত লাটিন নামের জয়ধ্বজা উড়িত না। বেল জুঁই গোলাপ গন্ধরাজ করবী এবং রজনীগন্ধারই প্রাদুর্ভাব কিছু বেশি। প্রকাণ্ড একটা বকুল গাছের তলা শাদা মার্ব্বল পাথর দিয়া বাঁধানো ছিল। সুস্থ অবস্থায় তিনি নিজে দাঁড়াইয়া দুইবেলা তাহা ধুইয়া সাফ করাইয়া রাখিতেন। গ্রীষ্ম-কালে কাজের অবকাশে সন্ধ্যার সময় সেই তাঁহার বসিবার স্থান ছিল। সেখান হইতে গঙ্গা দেখা যাইত কিন্তু গঙ্গা হইতে কুঠির পান্সীর বাবুরা তাঁহাকে দেখিতে পাইত না।

অনেকদিন শয্যাগত থাকিয়া একদিন চৈত্রের শুক্লপক্ষ সন্ধ্যায় তিনি কহিলেন, ঘরে বদ্ধ থাকিয়া আমার প্রাণ কেমন করি-তেছে; আজ একবার আমার সেই বাগানে গিয়া বসিব।

আমি তাঁহাকে বহুযত্নে ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই বকুলতলের প্রস্তর-বেদিকায় লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিলাম। আমারই জানুর পরে তাঁহার মাথাটি তুলিয়া রাখিতে পারিতাম কিন্তু জানি সেটাকে তিনি অদ্ভুত আচরণ বলিয়া গণ্য করিবেন। তাই একটি বালিশ আনিয়া তাঁহার মাথার তলায় রাখিলাম।

দুটি একটি করিয়া প্রস্ফুট বকুল ফুল ঝরিতে লাগিল এবং শাখান্তরাল হইতে ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্না তাঁহার শীর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল। চারিদিক শান্ত নিস্তব্ধ; সেই ঘনগন্ধপূর্ণ ছায়ান্ধ-কারে এক পার্শ্বে নীরবে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার চোখে জল আসিল।

আমি ধীরে ধীরে কাছের গোড়ায় আসিয়া দুই হস্তে তাঁহার একটি উত্তপ্ত শীর্ণ হাত তুলিয়া লইলাম। তিনি তাহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। কিছুক্ষণ এইরূপ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আমার হৃদয় কেমন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল আমি বলিয়া উঠিলাম—তোমার ভালবাসা আমি কোন কালে ভুলিব না!

তখনি বুঝিলাম, কথাটা বলিবার কোন আবশ্যক ছিল না। আমার স্ত্রী হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসিতে লজ্জা ছিল, সুখ ছিল এবং কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস ছিল—এবং উহার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে পরিহাসের তীব্রতাও ছিল। প্রতিবাদস্বরূপে একটি কথামাত্র না বলিয়া কেবল তাঁহার সেই হাসির দ্বারা জানাইলেন, কোন কালে ভুলিবে না ইহা কখনও সম্ভব নহে, এবং আমি তাহা প্রত্যাশাও করি না।

ঐ সুমিষ্ট সুতীক্ষ্ণ হাসির ভয়েই আমি কখন আমার স্ত্রীর সঙ্গে রীতিমত প্রেমালাপ করিতে সাহস করি নাই। অসাক্ষাতে যে সকল কথা মনে উদয় হইত তাঁহার সম্মুখে গেলেই সেগুলাকে নিতান্ত বাজে কথা বলিয়া বোধ হইত। ছাপার অক্ষরে যে সব কথা পড়িলে দুই চক্ষু বাহিয়া দর দর ধারায় জল পড়িতে থাকে সেইগুলা মুখে বলিতে গেলে কেন যে হাস্যের উদ্রেক করে এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না।

বাদ প্রতিবাদ কথায় চলে কিন্তু হাসির উপরে তর্ক চলে না, কাজেই চুপ করিয়া যাইতে হইল। জ্যোৎস্না উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, একটা কোকিল ক্রমাগতই কুহু কুহু ডাকিয়া অস্থির হইয়া গেল। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম এমন জ্যোৎস্নারাত্রেও কি পিকবধূ বধির হইয়া আছে?

বহু চিকিৎসায় আমার স্ত্রীর রোগ উপশমের কোন লক্ষণ দেখা

গেল না। ডাক্তার বলিল একবার বায়ু পরিবর্ত্তন করিয়া দেখিলে ভাল হয়। আমি স্ত্রীকে লইয়া এলাহাবাদে গেলাম।

এইখানে দক্ষিণাবাবু হঠাৎ থমকিয়া চুপ করিলেন। সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমিও চুপ করিয়া রহিলাম। কুলুঙ্গিতে কেরোসিন্ মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল এবং নিস্তব্ধ ঘরে মশার ভন্‌ভন্ শব্দ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। হঠাৎ মৌন ভঙ্গ করিয়া দক্ষিণাবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সেখানে হারাণ ডাক্তার আমার স্ত্রীকে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে অনেককাল একভাবে কাটাইয়া ডাক্তারও বলিলেন, আমিও বুঝিলাম এবং আমার স্ত্রীও বুঝিলেন, যে, তাঁহার ব্যামো সারিবার নহে। তাঁহাকে চিররুগ্ন হইয়াই কাটাইতে হইবে।

তখন, একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বলিলেন,—যখন ব্যামোও সারিবে না এবং শীঘ্র আমার মরিবার আশাও নাই তখন আর কতদিন এই জীবন্মৃতকে লইয়া কাটাইবে? তুমি আর একটা বিবাহ কর।

এটা যেন কেবলমাত্র একটা সুযুক্তি এবং সদ্বিবেচনার কথা—ইহার মধ্যে, যে, ভারি একটা মহত্ত্ব বীরত্ব বা অসামান্য কিছু আছে এমন ভাব তাঁহার লেশমাত্র ছিল না।

এইবার আমার হাসিবার পালা ছিল। কিন্তু আমার কি তেমন করিয়া হাসিবার ক্ষমতা আছে? আমি উপন্যাসের প্রধান নায়কের ন্যায় গম্ভীর সমুচ্চ ভাবে বলিতে লাগিলাম—যতদিন এই দেহে জীবন আছে—

তিনি বাধা দিয়া কহিলেন—নাও! নাও! আর বলিতে হইবে না! তোমার কথা শুনিয়া আমি আর বাঁচি না!

আমি পরাজয় স্বীকার না করিয়া বলিলাম—এ জীবনে আর কাহাকেও ভাল বাসিতে পারিব না!

শুনিয়া আমার স্ত্রী ভারি হাসিয়া উঠিলেন। তখন আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইল।

জানি না, তখন নিজের কাছেও কখনও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছি কি না, কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছি এই আরোগ্যআশাহীন সেবাকার্য্যে আমি মনে মনে পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলাম। এ কার্য্যে যে ভঙ্গ দিব এমন কল্পনাও আমার মনে ছিল না অথচ চিরজীবন এই চিররুগ্নকে লইয়া যাপন করিতে হইবে এ কল্পনাও আমার নিকট পীড়াজনক হইয়াছিল। হায়, প্রথম যৌবনকালে যখন সম্মুখে তাকাইয়াছিলাম তখন প্রেমের কুহকে, সুখের আশ্বাসে, সৌন্দর্য্যের মরীচিকায় সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। আজ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবলি আশাহীন সুদীর্ঘ সতৃষ্ণ মরুভূমি।

আমার সেবার মধ্যে সেই আন্তরিক শ্রান্তি নিশ্চয় তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন! তখন জানিতাম না কিন্তু এখন সন্দেহমাত্র নাই, যে, তিনি আমাকে যুক্তঅক্ষরহীন প্রথমভাগ শিশুশিক্ষার মত অতি সহজে বুঝিতেন। সেই জন্য, যখন উপন্যাসের নায়ক সাজিয়া গম্ভীরভাবে তাঁহার নিকট কবিত্ব ফলাইতে যাইতাম তিনি এমন সুগভীর স্নেহ অথচ অনিবার্য্য কৌতুকের সহিত হাসিয়া উঠিতেন। আমার নিজের অগোচর অন্তরের কথাও অন্তর্যামীর ন্যায় তিনি সমস্তই জানিতেন এ কথা মনে করিলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

হারাণ ডাক্তার আমাদের স্বজাতীয়। তাঁহার বাড়িতে আমার প্রায়ই নিমন্ত্রণ থাকিত। কিছুদিন যাতায়াতের পর ডাক্তার তাঁহার মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। মেয়েটি অবিবাহিত—তাহার বয়স পনেরো হইবে। ডাক্তার বলেন তিনি মনের মত পাত্র পান নাই বলিয়া বিবাহ দেন নাই। কিন্তু বাহিরের লোকের কাছে গুজব শুনিতাম মেয়েটির কুলের দোষ ছিল।

কিন্তু আর কোন দোষ ছিল না। যেমন সুরূপ তেমনি সুশিক্ষা। সেই জন্য মাঝে মাঝে এক একদিন তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে আমার বাড়ি ফিরিতে রাত হইত, আমার স্ত্রীকে ঔষধ খাওয়াইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। তিনি জানিতেন আমি হারাণ ডাক্তারের বাড়ি গিয়াছি কিন্তু বিলম্বের কারণ একদিনও আমাকে জিজ্ঞাসাও করেন নাই।

মরুভূমির মধ্যে আর একবার মরীচিকা দেখিতে লাগিলাম। তৃষ্ণা যখন বুক পর্য্যন্ত, তখন চোখের সামনে কূল-পরিপূর্ণ স্বচ্ছ জল ছলছল ঢলঢল করিতে লাগিল। তখন মনকে প্রাণপণে টানিয়া আর ফিরাইতে পারিলাম না।

রোগীর ঘর আমার কাছে দ্বিগুণ নিরানন্দ হইয়া উঠিল। এখন প্রায়ই শুশ্রূষা করিবার এবং ঔষধ খাওয়াইবার নিয়মভঙ্গ হইতে লাগিল।

হারাণ ডাক্তার আমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বলিতেন, যাহাদের রোগ আরোগ্য হইবার কোন সম্ভাবনা নাই তাহাদের পক্ষে মৃত্যুই ভাল। কারণ, বাঁচিয়া তাহাদের নিজেরও সুখ নাই, অন্যেরও অসুখ। কথাটা সাধারণভাবে বলিতে দোষ নাই, তথাপি আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করা তাঁহার উচিত হয়

নাই। কিন্তু মানুষের জীবনমৃত্যু সম্বন্ধে ডাক্তারদের মন এমন অসাড় যে, তাহারা ঠিক আমাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারে না।

হঠাৎ একদিন পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইলাম, আমার স্ত্রী হারাণ বাবুকে বলিতেছেন,—ডাক্তার, কতকগুলা মিথ্যা ওষুধ গিলাইয়া ডাক্তারখানার দেনা বাড়াইতেছ কেন? আমার প্রাণটাই যখন একটা ব্যামো, তখন এমন একটা ওষুধ দাও যাহাতে শীঘ্র এই প্রাণটা যায়।

ডাক্তার বলিলেন, ছি, এমন কথা বলিবেন না।

কথাটা শুনিয়া হঠাৎ আমার বক্ষে বড় আঘাত লাগিল। ডাক্তার চলিয়া গেলে আমার স্ত্রীর ঘরে গিয়া তাঁহার শয্যাপ্রান্তে বসিলাম, তাঁহার কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম। তিনি কহিলেন, এ ঘর বড় গরম—তুমি বাহিরে যাও। তোমার বেড়াইতে যাইবার সময় হইয়াছে। খানিকটা না বেড়াইয়া আসিলে আবার রাত্রে তোমার ক্ষুধা হইবে না।

বেড়াইতে যাওয়ার অর্থ ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া। আমিই তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলাম, ক্ষুধাসঞ্চারের পক্ষে খানিকটা বেড়াইয়া আসা বিশেষ আবশ্যক। এখন নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি প্রতিদিনই আমার এই ছলনাটুকু বুঝিতেন। আমি নির্ব্বোধ, মনে করিতাম তিনি নির্ব্বোধ।

এই বলিয়া দক্ষিণা বাবু অনেকক্ষণ করতলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, আমাকে একগ্লাস জল আনিয়া দাও। জল খাইয়া বলিতে লাগিলেন;—

একদিন ডাক্তার বাবুর কন্যা মনোরমা আমার স্ত্রীকে দেখিতে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জানি না, কি কারণে তাঁহার

সে প্রস্তাব আমার ভাল লাগিল না। কিন্তু প্রতিবাদ করিবার কোন হেতু ছিল না। তিনি একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সে দিন আমার স্ত্রীর বেদনা অন্যদিনের অপেক্ষা কিছু বাড়িয়া উঠিয়াছিল। যেদিন তাঁহার ব্যথা বাড়ে সে দিন তিনি অত্যন্ত স্থির নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন; কেবল মাঝে মাঝে মুষ্টিবদ্ধ হইতে থাকে এবং মুখ নীল হইয়া আসে তাহাতেই তাঁহার যন্ত্রণা বুঝা যায়। ঘরে কোন সাড়া ছিল না, আমি শয্যাপ্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম;—সে দিন আমাকে বেড়াইতে যাইতে অনুরোধ করেন এমন সামর্থ্য তাঁহার ছিল না, কিম্বা হয়ত বড় কষ্টের সময় আমি কাছে থাকি এমন ইচ্ছা তাঁহার মনে মনে ছিল। চোখে লাগিবে বলিয়া কেরোসিনের আলোটা দ্বারের পার্শ্বে ছিল। ঘর অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ। কেবল এক একবার যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশমে আমার স্ত্রীর গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনা যাইতেছিল।

এমন সময়ে মনোরমা ঘরের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়াইলেন। বিপরীত দিক্ হইতে কেরোসিনের আলো আসিয়া তাঁহার মুখের উপর পড়িল। আলো-আঁধারে লাগিয়া তিনি কিছুক্ষণ ঘরের কিছুই দেখিতে না পাইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

আমার স্ত্রী চমকিয়া আমার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ও কে?—তাঁহার সেই দুর্ব্বল অবস্থায় হঠাৎ অচেনা লোক দেখিয়া ভয় পাইয়া আমাকে দুই তিনবার অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করিলেন, ও কে? ও কে গো? আমার কেমন দুর্ব্বুদ্ধি হইল আমি প্রথমেই বলিয়া ফেলিলাম, আমি চিনি না! বলিবামাত্রই কে যেন আমাকে কষাঘাত করিল। পরের মুহূর্ত্তেই বলিলাম—ওঃ, আমাদের

ডাক্তার বাবুর কন্যা! স্ত্রী একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন;—আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই তিনি ক্ষীণস্বরে অভ্যাগতকে বলিলেন, আপনি আসুন।—আমাকে বলিলেন, আলোটা ধর!

মনোরমা ঘরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার সহিত রোগিণীর অল্পস্বল্প আলাপ চলিতে লাগিল। এমন সময় ডাক্তারবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার ডাক্তারখানা হইতে দুই শিশি ওষুধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই দুটি শিশি বাহির করিয়া আমার স্ত্রীকে বলিলেন—এই নীল শিশিটা মালিশ করিবার, আর এইটি খাইবার। দেখিবেন, দুইটাতে মিলাইবেন না; এ ওষুধটা ভারি বিষ।-আমাকেও একবার সতর্ক করিয়া দিয়া ঔষধ দুটি শয্যাপার্শ্ববর্ত্তী টেবিলে রাখিয়া দিলেন। বিদায় লইবার সময় ডাক্তার তাঁহার কন্যাকে ডাকিলেন। মনোরমা কহিলেন—বাবা, আমি থাকি না কেন। সঙ্গে স্ত্রীলোক কেহ নাই, ইহাঁকে সেবা করিবে কে?

আমার স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, না, না, আপনি কষ্ট করিবেন না। পুরাণো ঝি আছে সে আমাকে মায়ের মত যত্ন করে।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—উনি মালক্ষ্মী, চিরকাল পরের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, অন্যের সেবা সহিতে পারেন না।

কন্যাকে লইয়া ডাক্তার গমনের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় আমার স্ত্রী বলিলেন, ডাক্তার বাবু, ইনি এই বদ্ধঘরে অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন, ইহাঁকে একবার বাহিরে বেড়াইয়া লইয়া আসিতে পারেন?

ডাক্তার বাবু আমাকে কহিলেন, আসুন না, আপনাকে নদীর

ধার হইয়া একবার বেড়াইয়া আসি।—আমি ঈষৎ আপত্তি দেখাইয়া অনতিবিলম্বে সম্মত হইলাম। ডাক্তার বাবু যাইবার সময় দুই শিশি ঔষধ সম্বন্ধে আবার আমার স্ত্রীকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

সে দিন ডাক্তারের বাড়িতেই আহার করিলাম। ফিরিয়া আসিতে রাত হইল। আসিয়া দেখি, আমার স্ত্রী ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তোমার কি ব্যথা বাড়িয়াছে?—তিনি উত্তর করিতে পারিলেন না, নীরবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তখন তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইয়াছে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রেই ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিলাম। ডাক্তার প্রথমটা আসিয়া অনেকক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই ব্যথাটা কি বাড়িয়া উঠিয়াছে? ঔষধটা একবার মালিশ করিলে হয় না?

বলিয়া শিশিটা টেবিল হইতে লইয়া দেখিলেন সেটা খালি।

আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি ভুল করিয়া এই ওষুধটা খাইয়াছেন?—আমার স্ত্রী ঘাড় নাড়িয়া নীরবে জানাইলেন—হাঁ।

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ গাড়ি করিয়া তাঁহার বাড়ি হইতে পাম্প আনিতে ছুটিলেন। আমি অর্দ্ধমূর্চ্ছিতের ন্যায় আমার স্ত্রীর বিছানার উপর গিয়া পড়িলাম। তখন, মাতা তাহার পীড়িত শিশুকে যেমন করিয়া সান্ত্বনা করে তেমনি করিয়া তিনি আমার মাথা তাঁহার বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া দুই হস্তের স্পর্শে আমাকে তাঁহার মনের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কেবল তাঁহার সেই করুণ স্পর্শের দ্বারাই আমাকে বারম্বার করিয়া বলিতে লাগিলেন—শোক করিয়োনা, ভালই হইয়াছে—তুমি সুখী হইবে, এবং সেই মনে করিয়া আমি সুখে মরিলাম।

ডাক্তার যখন ফিরিলেন, তখন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে।

—দক্ষিণাচরণ আর একবার জল খাইয়া বলিলেন, উঃ বড় গরম! বলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া বারকয়েক বারান্দায় পায়চারি করিয়া আসিয়া বসিলেন। বেশ বোঝা গেল তিনি বলিতে চাহেন না কিন্তু আমি যেন যাদু করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কথা কাড়িয়া লইতেছি। আবার আরম্ভ করিলেন—

মনোরমাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিলাম।

মনোরমা তাহার পিতার সম্মতিক্রমে আমাকে বিবাহ করিল। কিন্তু আমি যখন তাহাকে আদরের কথা বলিতাম, প্রেমালাপ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিবার চেষ্টা করিতাম সে হাসিত না, গম্ভীর হইয়া থাকিত। তাহার মনের কোথায় কোনখানে কি খট্‌কা লাগিয়া গিয়াছিল আমি কেমন করিয়া বুঝিব?

এই সময় আমার মদ খাইবার নেশা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।

একদিন প্রথম শরতের সন্ধ্যায় মনোরমাকে লইয়া আমাদের বরানগরের বাগানে বেড়াইতেছি। ছম্‌ছমে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পাখীদের বাসায় ডানা ঝাড়িবার শব্দটুকুও নাই। কেবল বেড়াইবার পথের দুইধারে ঘন ছায়াবৃত ঝাউগাছ বাতাসে সশব্দে কাঁপিতেছিল।

শ্রান্তি বোধ করিতেই মনোরমা সেই বকুলতলার শুভ্র পাথরের বেদীর উপর আসিয়া নিজের দুই বাহুর উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। আমিও কাছে আসিয়া বসিলাম। সেখানে অন্ধকার আরও ঘনীভূত,—যতটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে একেবারে

তারায় আচ্ছন্ন; তরুতলের ঝিল্লিধ্বনি যেন অনন্তগগনবক্ষচ্যুত নিঃশব্দতার নিম্নপ্রান্তে একটি শব্দের সরু পাড় বুনিয়া দিতেছে।

সেদিনও বৈকালে আমি কিছু মদ খাইয়াছিলাম, মনটা বেশ একটু তরলাবস্থায় ছিল। অন্ধকার যখন চোখে সহিয়া আসিল তখন বনচ্ছায়াতলে পাণ্ডুরবর্ণে অঙ্কিত সেই শিথিলঅঞ্চল শ্রান্তকায় রমণীর আবছায়া মূর্ত্তিটি আমার মনে এক অনিবার্য্য আবেগের সঞ্চার করিল। মনে হইল, ও যেন একটি ছায়া, ওকে যেন কিছুতেই দুই বাহু দিয়া ধরিতে পারিব না।

এমন সময় অন্ধকার ঝাউগাছের শিখরদেশে যেন আগুন ধরিয়া উঠিল; তাহার পরে কৃষ্ণপক্ষের জীর্ণপ্রান্ত হলুদবর্ণ চাঁদ ধীরে ধীরে গাছের মাথার উপরকার আকাশে. আরোহণ করিল; – শাদা পাথরের উপর শাদা সাড়িপরা সেই শ্রান্তশয়ান রমণীর মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাছে আসিয়া দুই হাতে তাহার হাতটি তুলিয়া ধরিয়া কহিলাম, মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালবাসি তোমাকে আমি কোনকালে ভুলিতে পারিব না।

কথাটা বলিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম; মনে পড়িল ঠিক এই কথাটা আর এক দিন আর কাহাকেও বলিয়াছি! এবং সেই মুহূর্ত্তেই বকুল গাছের শাখার উপর দিয়া, ঝাউগাছের মাথার উপর দিয়া. কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙ্গা চাঁদের নীচে দিয়া গঙ্গার পূর্ব্বপার হইতে গঙ্গার সুদূর পশ্চিম পার পর্য্যন্ত হাহা—হাহা—হাহা—করিয়া অতি দ্রুতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল! সেটা মর্ম্মভেদী হাসি, কি অভ্রভেদী হাহাকার, বলিতে পারি না। আমি তদ্দণ্ডেই পাথরের বেদীর উপর হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেলাম।

মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিলাম আমার ঘরে বিছানায় শুইয়া আছি।

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার হঠাৎ এমন হইল কেন?—আমি কাঁপিয়া উঠিয়া বলিলাম, শুনিতে পাও নাই সমস্ত আকাশ ভরিয়া হাহা করিয়া একটা হাসি বহিয়া গেল?

স্ত্রী হাসিয়া কহিলেন—সে বুঝি হাসি? সার বাঁধিয়া দীর্ঘ এক ঝাঁক পাখী উড়িয়া গেল তাহাদেরই পাখার শব্দ শুনিয়াছিলাম। তুমি এত অল্পেই ভয় পাও?—

দিনের বেলায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, পাখীর ঝাঁক উড়িবার শব্দই বটে, এই সময়ে উত্তর দেশ হইতে হংসশ্রেণী নদীর চরে চরিবার জন্য আসিতেছে। কিন্তু সন্ধ্যা হইলে সে বিশ্বাস রাখিতে পারিতাম না। তখন মনে হইত চারিদিকে সমস্ত অন্ধকার ভরিয়া ঘন হাসি জমা হইয়া রহিয়াছে, সামান্য একটা উপলক্ষ্যে হঠাৎ আকাশ ভরিয়া অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। অবশেষে এমন হইল, সন্ধ্যার পর মনোরমার সহিত একটা কথা বলিতে আমার সাহস হইত না।

তখন আমাদের বরানগরের বাড়ি ছাড়িয়া মনোরমাকে লইয়া বোটে করিয়া বাহির হইলাম। অগ্রহায়ণ মাসে নদীর বাতাসে সমস্ত ভয় চলিয়া গেল। কয়দিন বড় সুখে ছিলাম। চারিদিকের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া মনোরমাও যেন তাহার হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার অনেক দিন পরে ধীরে ধীরে আমার নিকট খুলিতে লাগিল।

গঙ্গা ছাড়াইয়া, খড়ে' ছাড়াইয়া, অবশেষে পদ্মায় আসিয়া পৌঁছিলাম। ভয়ঙ্করী পদ্মা তখন হেমন্তের বিবরলীন ভুজঙ্গিনীর মত কৃশ নির্জ্জীবভাবে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় নিবিষ্ট ছিল। উত্তর পারে জনশূন্য তৃণশূন্য চিহ্নশূন্য দিগন্তপ্রসারিত বালির চর ধূধূ করিতেছে—এবং দক্ষিণের উচ্চ পাড়ের উপর গ্রামের আমবাগানগুলি এই

রাক্ষসীনদীর নিতান্ত মুখের কাছে যোড়হস্তে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে;—পদ্মা ঘুমের ঘোরে এক একবার পাশ ফিরিতেছে এবং বিদীর্ণ তটভূমি ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করিয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

এইখানে বেড়াইবার সুবিধা দেখিয়া বোট বাঁধিলাম।

একদিন আমরা দুইজনে বেড়াইতে বেড়াইতে বহুদূরে চলিয়া গেলাম। সূর্য্যাস্তের স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইয়া যাইতেই শুক্লপক্ষের নির্ম্মল চন্দ্রালোক দেখিতে দেখিতে ফুটিয়া উঠিল। সেই অন্তহীন শুভ্র বালির চরের উপর যখন অজস্র অবারিত উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্না একেবারে আকাশের সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া গেল—তখন মনে হইল যেন জনশূন্য চন্দ্রলোকের অসীম স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে কেবল আমরা দুইজনে ভ্রমণ করিতেছি। একটি লাল শাল মনোরমার মাথার উপর হইতে নামিয়া তাহার মুখখানি বেষ্টন করিয়া তাহার শরীরটি আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। নিস্তব্ধতা যখন নিবিড় হইয়া আসিল, কেবল একটি সীমাহীন দিশাহীন শুভ্রতা এবং শূন্যতা ছাড়া যখন আর কিছুই রহিল না, তখন মনোরমা ধীরে ধীরে হাতটি বাহির করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল; অত্যন্ত কাছে আসিয়া সে যেন তাহার সমস্ত শরীর মন, জীবন যৌবন আমার উপর বিন্যস্ত করিয়া নিতান্ত নির্ভর করিয়া দাঁড়াইল। পুলকিত উদ্বেলিত হৃদয়ে মনে করিলাম, ঘরের মধ্যে কি যথেষ্ট ভালবাসা যায়? এইরূপ অনাবৃত অবারিত অনন্ত আকাশ নহিলে কি দুটি মানুষকে কোথাও ধরে? তখন মনে হইল, আমাদের ঘর নাই, দ্বার নাই, কোথাও ফিরিবার নাই, এমনি করিয়া হাতে হাতে ধরিয়া গম্যহীন পথে, উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে চন্দ্রালোকিত শূন্যতার উপর দিয়া অবারিতভাবে চলিয়া যাইব।

এইরূপে চলিতে চলিতে একজায়গায় আসিয়া দেখিলাম সেই

বালুকারাশির মাঝখানে অদূরে একটি জলাশয়ের মত হইয়াছে— পদ্মা সরিয়া যাওয়ার পর সেইখানে জল বাধিয়া আছে।

সেই মরুবালুকাবেষ্টিত নিস্তরঙ্গ নিসুপ্ত নিশ্চল জলটুকুর উপরে একটি সুদীর্ঘ জ্যোৎস্নার রেখা মূর্চ্ছিতভাবে পড়িয়া আছে। সেই জায়গাটাতে আসিয়া আমরা দুইজনে দাঁড়াইলাম—মনোরমা কি ভাবিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল; তাহার মাথার উপর হইতে শালটা হঠাৎ খসিয়া পড়িল। আমি তাহার সেই জ্যোৎস্নাবিকাশিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলাম।

এমন সময় সেই জনমানবশূন্য নিঃশব্দ মরুভূমির মধ্যে গম্ভীরস্বরে কে তিনবার বলিয়া উঠিল – ও কে? ও কে? ও কে?

আমি চমকিয়া উঠিলাম আমার স্ত্রীও কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা দুইজনেই বুঝিলাম, এই শব্দ মানুষিক নহে, অমানুষিকও নহে – চর-বিহারী জলচর পাখীর ডাক। হঠাৎ এত-রাত্রে তাহাদের নিরাপদ নিভৃত নিবাসের কাছে লোকসমাগম দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেই ভয়ের চমক খাইয়া আমরা দুইজনেই তাড়াতাড়ি বোটে ফিরিলাম। রাত্রে বিছানায় আসিয়া শুইলাম; শ্রান্তশরীরে মনোরমা অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন অন্ধকারে কে একজন আমার মশারির কাছে দাঁড়াইয়া সুষুপ্ত মনোরমার দিকে একটি মাত্র দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যেন আমার কানে কানে অত্যন্ত চুপি চুপি অস্ফুটকণ্ঠে কেবলি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল – ও কে? ও কে? ও কে গো?—

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশালাই জ্বালাইয়া বাতি ধরাইলাম। সেই মুহূর্ত্তেই ছায়ামূর্ত্তি মিলাইয়া গিয়া, আমার মশারি কাঁপাইয়া, বোট দুলাইয়া, আমার সমস্ত ঘর্ম্মাক্ত শরীরের রক্ত হিম করিয়া দিয়া

হাহা—হাহা—হাহা করিয়া একটা হাসি অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। পদ্মা পার হইল, পদ্মার চর পার হইল, তাহার পরবর্ত্তী সমস্ত সুপ্ত দেশ গ্রাম নগর পার হইয়া গেল—যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর লোকলোকান্তর পার হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ, ক্ষীণতর, ক্ষীণতম হইয়া অসীম সুদূরে চলিয়া যাইতেছে,—ক্রমে যেন তাহা জন্মমৃত্যুর দেশ ছাড়াইয়া গেল—ক্রমে তাহা যেন সূচির অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল—এত ক্ষীণ শব্দ কখন শুনি নাই, কল্পনা করি নাই—আমার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে এবং সেই শব্দ যতই দূরে যাইতেছে কিছুতেই আমার মস্তিষ্কের সীমা ছাড়াইতে পারিতেছে না,—অবশেষে যখন একান্ত অসহ্য হইয়া আসিল, তখন ভাবিলাম আলো নিবাইয়া না দিলে ঘুমাইতে পারিব না। যেমন আলো নিবাইয়া শুইলাম অমনি আমার মশারির পাশে, আমার কানের কাছে অন্ধকারে আবার সেই অবরুদ্ধ স্বর বলিয়া উঠিল—ও কে, ও কে, ও কে গো। আমার বুকের রক্তের ঠিক সমান তালে ক্রমাগতই ধ্বনিত হইতে লাগিল—ওকে, ওকে, ও কে গো! ও কে, ও কে, ও কেগো! সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘড়িটাও সজীব হইয়া উঠিয়া তাহার ঘণ্টার কাঁটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেল্‌ফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল, ও কে, ও কে, ও কে গো! ও কে, ও কে, ও কে গো!

বলিতে বলিতে দক্ষিণাবাবু পাংশুবর্ণ হইয়া আসিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলাম একটু জল খান। এমন সময় হঠাৎ আমার কেরোসিনের

শিখাটা দপ্‌দপ্ করিতে করিতে নিবিয়া গেল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, বাহিরে আলো হইয়াছে। কাক ডাকিয়া উঠিল। দোয়েল শিশ্ দিতে লাগিল। আমার বাড়ির সম্মুখবর্ত্তী পথে একটা মহিষের গাড়ির ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ জাগিয়া উঠিল। তখন দক্ষিণাবাবুর মুখের ভাব একেবারে বদল হইয়া গেল। ভয়ের কিছুমাত্র চিহ্ন রহিল না। রাত্রির কুহকে, কাল্পনিক শঙ্কার মত্ততায় আমার কাছে যে এত কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন সে জন্য যেন অত্যন্ত লজ্জিত এবং আমার উপর আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শিষ্ট-সম্ভাষণমাত্র না করিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেই দিনই অর্দ্ধরাত্রে আবার আমার দ্বারে আসিয়া ঘা পড়িল—ডাক্তার! ডাক্তার!

সন্ধ্যা।

ক্ষান্ত হও, ধীরে কও কথা! ওরে মন,
নত কর শির! দিবা হল সমাপন,
সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী। তিমিরের তীরে
অসংখ্য-প্রদীপ-জ্বালা' এ বিশ্বমন্দিরে
এল আরতির বেলা। ওই শুন বাজে
নিঃশব্দ গম্ভীর মন্ত্রে অনন্তের মাঝে
শঙ্খঘণ্টাধ্বনি। ধীরে নামাইয়া আন'
বিদ্রোহের উচ্চ কণ্ঠ পূরবীর ম্লান-
মন্দ স্বরে! রাখ রাখ অভিযোগ তব,—
মৌন কর বাসনার নিত্য নব নব
নিষ্ফল বিলাপ! হের, মৌন নভস্তল,
ছায়াচ্ছন্ন মৌন বন, মৌন জলস্থল

স্তম্ভিত বিষাদে নম্র! নির্ব্বাক্ নীরব
দাঁড়াইয়া সন্ধ্যাসতী,—নয়ন পল্লব
নত হয়ে ঢাকে তার নয়ন যুগল,—
অনন্ত আকাশপূর্ণ অশ্রু ছলছল
করিয়া গোপন। বিষাদের মহাশান্তি
ক্লান্ত ভুবনের ভালে করিছে একান্তে
সান্ত্বনা পরশ। আজি এই শুভক্ষণে,
শান্ত মনে, সন্ধি কর অনন্তের সনে
সন্ধ্যার আলোকে! বিন্দু দুই অশ্রুজলে
দাও উপহার—অসীমের পদতলে
জীবনের স্মৃতি! অন্তরের যত কথা
শান্ত হয়ে গিয়ে—মর্ম্মান্তিক নীরবতা
করুক্ বিস্তার!

হের ক্ষুদ্র নদীতীরে
সুপ্তপ্রায় গ্রাম। পক্ষীরা গিয়েছে নীড়ে,
শিশুরা খেলে না; শূন্য মাঠ জনহীন;
ঘরে-ফেরা শ্রান্ত গাভী গুটি দুই তিন
কুটীর-অঙ্গনে বাঁধা, ছবির মতন
স্তব্ধপ্রায়। গৃহকার্য্য হল সমাপন,—
কে ওই গ্রামের বধূ ধরি বেড়াখানি
সম্মুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কি জানি
ধূসর সন্ধ্যায়!

অমনি নিস্তব্ধপ্রাণে
বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম্ম অবসানে,

দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া, আছে চাহি
দিগন্তের পানে ; ধীরে যেতেছে প্রবাহি
সম্মুখে আলোকস্রোত অনন্ত অম্বরে
নিঃশব্দ চরণে ; আকাশের দূরান্তরে
একে একে অন্ধকারে হতেছে বাহির
একেকটি দীপ্ত তারা, সুদূর পল্লীর
প্রদীপের মত ! ধীরে যেন উঠে ভেসে
ম্লানচ্ছবি ধরণীর নয়ন-নিমেষে
কত যুগযুগান্তের অতীত আভাস,
কত জীব-জীবনের জীর্ণ ইতিহাস !
যেন মনে পড়ে সেই বাল্য নীহারিকা,
তার পরে প্রজ্জ্বলন্ত যৌবনের শিখা,
তার পরে স্নিগ্ধশ্যাম অন্নপূর্ণালয়ে
জীবধাত্রী জননীর কাজ, - বক্ষে লয়ে
লক্ষ কোটি জীব—কত দুঃখ, কত ক্লেশ,
কত যুদ্ধ, কত মৃত্যু, নাহি তার শেষ !

ক্রমে ঘনতর হয়ে নামে অন্ধকার,
গাঢ়তর নীরবতা,—বিশ্ব-পরিবার
সুপ্ত নিশ্চেতন। নিঃসঙ্গিনী ধরণীর
বিশাল অন্তর হতে উঠে সুগম্ভীর
একটি ব্যথিত প্রশ্ন—ক্লিষ্ট ক্লান্ত সুর
শূন্যপানে—“আরো কোথা ?” “আরো কত দূর ?”

৯ ফাল্গুন,
১৩০০।

জ্যোতিষ্কগণের দূরত্ব নির্দ্ধারণ।

(প্রাচীন মত)

জ্যোতিষ্কগণের দূরত্ব নির্দ্ধারণ জ্যোতির্বিদ্যার একটি প্রধান সমস্যা। এই দূরত্ব যে সূক্ষ্মভাবে নির্দ্ধারিত হইতে পারে, তাহা বোধ করি সাধারণ মানুষের কল্পনায় আসে না। অমুক গ্রহ এত-দূরে রহিয়াছে বলিলে বোধ করি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গাঁজাখুরি, তামাসা, অথবা কবিত্ব বলিয়া উড়াইয়া দিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। তবে যাঁহারা শাস্ত্রের ও বড়লোকের উক্তি বিনাবাক্যব্যয়ে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা সংখ্যার অল্পতা বা আধিক্য উভয়ই সমানভাবে জীর্ণ করিতে সমর্থ; তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তির হজমি শক্তির সীমা নাই; তাঁহাদের অগ্নিমান্দ্যের কোন সম্ভাবনা নাই। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গহন অরণ্য ভেদ করিয়া, অথবা অকূল পাথারে হাবুডুবু খাইয়া, কোন তথ্য আবিষ্কার করিয়া একটু স্পর্দ্ধা বা অহঙ্কারের সহিত ইঁহাদের সম্মুখে হয় ত উপস্থিত হইলেন; খুসী হইলে ইঁহারা এত অকাতরে ও দ্বিধাহীন, অসন্দি-হান চিত্তে সেই আয়াসলব্ধ তথ্যটাকে এমন চিরপরিচিতের ন্যায় গ্রহণ করিয়া থাকেন, যে, বৈজ্ঞানিক মহাশয়ের স্পর্দ্ধা একবার চূর্ণীকৃত হইয়া যায়। সৃষ্টিকর্ত্তা ইঁহাদিগকে প্রভূত পরিমাণে বিনয়-সম্পন্ন করিয়াছেন সন্দেহ নাই; তবে বৈজ্ঞানিক গুরু সর্ব্বদা এরূপ বিনীত শিষ্যে প্রণয়বান্ হইতে চাহেন না।

জ্যোতিষ্কগণের দূরত্ব নিরূপণের কথা। জ্যোতিষ্কের মধ্যে চন্দ্র সব চেয়ে নিকটে। দূরে একটা গাছ থাকিলে যেরূপে তাহার দূরত্ব বাহির হয়, ঠিক্ সেই প্রণালীতে চন্দ্রের দূরত্ব বাহির হইতে

পারে। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে কলিকাতার লোকে চন্দ্রকে কোন্‌-খানে দেখে ঠিক্ কর, ঠিক্ সেই সময়ে মক্কার লোকে চন্দ্রকে কোথায় দেখে ঠিক্ কর। কলিকাতা ও মক্কা এই দুই জায়গার দূরত্ব জানা থাকিলেই চন্দ্রের দূরত্ব বাহির হইবে। কলিকাতা ও মক্কা এই উভয় স্থান হইতে অবস্থিতি নির্দ্ধারণ করিয়া যে অবস্থিতির প্রভেদটুকু পাওয়া যায়, তাহার ইংরাজি নাম Parallax, দেশী সংস্কৃত নাম 'লম্বন'। এই লম্বন নির্দ্ধারণ ব্যতীত দূরত্ব অব-ধারণের অন্য উপায় পাওয়া যায় না। সেকালেও এইরূপে চন্দ্রের উদয়কালে লম্বন নির্দ্ধারণ করিয়া দূরত্বের পরিমাণ হইয়া-ছিল।

কতকটা এইরূপে বুঝান যাইতে পারে। পৃথিবীর ব্যাস যদি চন্দ্রের দূরত্বের সহিত তুলনায় নগণ্য হইত, তাহা হইলে, চন্দ্রোদয়ের সময়, অর্থাৎ চন্দ্র যখন চক্রবালের উপরে রহে, তখন চন্দ্র আকাশের ঊর্দ্ধ বিন্দু (ইংরাজি zenith, সংস্কৃত স্বস্তিক) হইতে ঠিক্ ৯০ অংশ দূরে থাকিত। কিন্তু পৃথিবীর ব্যাস চন্দ্রের দূরত্বের তুলনায় নগণ্য নহে, সুতরাং চন্দ্র প্রকৃত চক্রবাল ছাড়িয়া একটু না উঠিলে আমরা উদয় বুঝিতে পারি না। উদয়কালে স্বস্তিক হইতে দূরত্ব ৯০ অংশের কিছু কমই হয়। এই তফাৎটুকু চন্দ্রের তাৎকালিক লম্বন; তার পর পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধের পরিমাণ জানা থাকিলেই চন্দ্রের দূরত্ব আপনা হইতে আসে। এই উপায়ে চন্দ্রের দূরত্ব সে কালে নির্ণীত হইয়াছিল।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে চন্দ্রের উদয়কালীন লম্বন প্রায় ৫৩ কলা; এবং পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ ৮০০ আট শত যোজন; এই হিসাবে চন্দ্রের ভ্রমণ পথ ৩২৪০০০ তিন লক্ষ চব্বিশ হাজার যোজন, ও চন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ৫১৫৭০ যোজন। আধুনিক কালে গৃহীত চন্দ্রের

দূরত্বের সহিত মিলাইতে হইলে এই যোজনের সহিত মাইলের সম্বন্ধ জানা আবশ্যক। কিন্তু এই সূর্য্যসিদ্ধান্তের যোজন কয় মাইলের সমান, তাহা স্থির জানিবার কোন উপায় আছে কি না বলিতে পারি না। এই যোজন চারিক্রোশের সমান নহে তাহা নিশ্চিত; আর্য্যভট্ট যে যোজনের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা চারিক্রোশ পরিমিত, প্রথম প্রবন্ধে সেই যোজনের পরিমাণে পৃথিবীর পরিধি কত তাহা উল্লেখ করিয়াছি।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধের আট শত ভাগের এক ভাগের নাম এক যোজন। এইরূপে যোজন পরিমাণ নির্দ্দেশ কিছু রহস্যজনক বলিতে হইবে। এক শত বৎসর পূর্ব্বে ফরাসীরা এইরূপে তাহাদের metre স্থির করিয়াছিল। ফরাসীদের মীটার পৃথিবীর পরিধির চতুর্থাংশের (অর্থাৎ নিরক্ষবৃত্ত হইতে মেরু পর্য্যন্ত দূরত্বের) এক কোটি ভাগের এক ভাগ। যাহাই হউক, সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ ৮০০ যোজন, ও পরিধি ৫০৫৯ যোজন। প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি আর্য্যভট্টের মতে পৃথিবীর পরিধি ইংরাজি মাইলের ২৫০৮০ মাইল। হইতে পারে আর্য্যভট্ট পৃথিবীর পরিধির যে পরিমাণ ধরিতেন, সূর্য্যসিদ্ধান্তকার তাহা হইতে একটু ভিন্ন ধরিতেন। এমন কি ভাস্করাচার্য্যের নির্ণীত ভূপরিধির পরিমাণ সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত পরিমাণের অপেক্ষা কিছু কম। সেকালে প্রাচীন শাস্ত্রের লেখা অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়ার প্রথা ছিল না। প্রাচীন উক্তির সংশোধনে সেকালের লোকে সাহসী হইতেন। যাহাই হউক মোটামুটি ৫০৫৯ যোজন ২৫০৮০ মাইলের সমান ধরিয়া লইলে চন্দ্রের দূরত্ব ৫১৫৭০ যোজন প্রায় ২৫৫০০০ দুই লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার মাইলের সমান দাঁড়ায়। ইংরাজি মতে চন্দ্রের দূরত্ব ২৮৩০০০ মাইল। পাঠকগণ উভয় অঙ্কের তুলনা

করিবেন, ও সেই সঙ্গে অনুগ্রহপূর্ব্বক সেকালের সহিত একালের একবার তুলনা করিতেও ভুলিবেন না।

চন্দ্রের দূরত্ব বাহির হইলে চন্দ্র কত বড় আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। চন্দ্র এত দূরে আছে, যে, উহার মণ্ডল আকাশের কেবল ৩২ কলা মাত্র স্থান (প্রায় সূর্য্যমণ্ডলের সমান) ব্যাপিয়া আছে। চন্দ্রের ভ্রমণ পথ, যাহা ৩৬০ ডিগ্রি ব্যাপিয়া আছে, তাহার পরিমাণ ৩২৪০০০ যোজন, সুতরাং চন্দ্রের ব্যাস ৪৮০ যোজন মাত্র, ত্রৈরাশিক অঙ্কে আসিয়া পড়ে। পূর্ব্বের মত হিসাবে ৪৮০ যোজন প্রায় ২৩৮০ মাইলের সমান; আধুনিক মতে চন্দ্রের ব্যাস ২১৬০ মাইল।

লম্বন অথবা parallax হইতে চন্দ্রের দূরত্ব ও আয়তন নিরূপিত হয়, পূর্ব্বে বলিয়াছি। সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে চন্দ্রের উদয়কালীন লম্বন প্রায় ৫৩ কলা; আজ কাল স্থির দেখা গিয়াছে, চন্দ্রের লম্বন প্রায় ৫৭ কলা। এই ৪কলা পরিমাণের বিভেদের হেতু আধুনিক গণনার সহিত সেকালের গণনার যা কিছু প্রভেদ। অবশ্য সেকালের প্রাচীনত্ব ও যন্ত্রাদির অভাব বিবেচনা করিলে এই প্রভেদটুকু ধরিবার মত নহে।

চন্দ্রের সম্বন্ধে আর একটা কথা বলা আবশ্যক। আমরা জানি চন্দ্রের কেবল একটামাত্র পৃষ্ঠ সর্ব্বদা পৃথিবীর অভিমুখে থাকে। পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে এক চক্র ঘুরিয়া আসিতে আসিতে নিজের ধ্রুবরেখা বা মেরুদণ্ডের উপর তিন শত সওয়া ছষট্টি পাক আবর্ত্তন করে, চন্দ্রের পক্ষে তেমন নয়। চন্দ্র যে সময়ে পৃথিবীর চারিদিকে এক চক্র ঘুরে নিজের ধ্রুব রেখার চারিদিকেও ঠিক্ সেই সময়ে এক পাক আবর্ত্তন করে। গোলাধ্যায়ে এ সম্বন্ধে একটি উক্তি দেখা যায়। চন্দ্রের অপর পৃষ্ঠে, অর্থাৎ যে পৃষ্ঠ আমরা কখন দেখিতে পাই না, সেই পৃষ্ঠে পিতৃগণের বসতি। আমাদের অমা-

বস্যার দিনে পিতৃগণের মধ্যাহ্নকাল, সূর্য্য তাঁহাদের মস্তকোপরি, আমাদের পূর্ণিমার দিনে তাঁহাদের মধ্যরাত্রি; এক চান্দ্রমাসে তাঁহাদের এক অহোরাত্র। তাঁহাদের এক পক্ষ দিন, এক পক্ষ রাত্রি। বস্তুতঃই তাহাই।

সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সন্তোষ।

দীপ্তি এবং স্রোতস্বিনী উপস্থিত ছিলেন না,—কেবল আমরা চারি জন ছিলাম।

সমীরণ বলিল, দেখ সেদিনকার সেই কৌতুকহাস্যের প্রসঙ্গে আমার একটা কথা মনে উদয় হইয়াছে। অধিকাংশ কৌতুক আমাদের মনে একটা কিছু অদ্ভুত ছবি আনয়ন করে এবং তাহাতেই আমাদের হাসি পায়। কিন্তু যাহারা স্বভাবতই ছবি দেখিতে পায় না, যাহাদের বুদ্ধি অ্যাব্‌ষ্ট্র্যাক্ট্‌ বিষয়ের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে কৌতুক তাঁহাদিগকে সহসা বিচলিত করিতে পারে না।

ক্ষিতি কহিল, প্রথমতঃ তোমার কথাটা স্পষ্ট বুঝা গেল না, দ্বিতীয়তঃ অ্যাব্‌ষ্ট্র্যাক্ট্‌ শব্দটা ইংরাজি।

সমীরণ কহিল, প্রথম অপরাধটা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিতেছি কিন্তু দ্বিতীয় অপরাধ হইতে নিষ্কৃতির উপায় দেখি না, অতএব সুধীগণকে ওটা নিজগুণে মার্জ্জনা করিতে হইবে। আমি বলিতেছিলাম, যাহারা দ্রব্যটাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া তাহার গুণটাকে অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে তাহারা স্বভাবত হাস্যরসরসিক হয় না।

ক্ষিতি মাথা নাড়িয়া কহিল, উহুঁ, এখনো পরিষ্কার হইল না।

সমীরণ কহিল, একটা উদাহরণ দিই। প্রথমতঃ দেখ, আমাদের সাহিত্যে কোন সুন্দরীর বর্ণনাকালে ব্যক্তিবিশেষের ছবি আঁকিবার দিকে লক্ষ্য নাই; সুমেরু দাড়িম্ব কদম্ব বিম্ব প্রভৃতি হইতে কতকগুলি গুণ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাহারই তালিকা দেওয়া হয় এবং সুন্দরীমাত্রেরই প্রতি তাহার আরোপ হইয়া থাকে। আমরা ছবির মত স্পষ্ট করিয়া কিছু দেখি না এবং ছবি আঁকি না—সেই জন্য কৌতুকের একটি প্রধান অঙ্গ হইতে আমরা বঞ্চিত। আমাদের প্রাচীন কাব্যে প্রশংসাচ্ছলে গজেন্দ্রগমনের সহিত সুন্দরীর মন্দগতির তুলনা হইয়া থাকে। এ তুলনাটি অন্যদেশীয় সাহিত্যে নিশ্চয়ই হাস্যকর বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু এমন একটা অদ্ভুত তুলনা আমাদের দেশে উদ্ভূত এবং সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইল কেন? তাহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের লোকেরা দ্রব্য হইতে তাহার গুণটা অনায়াসে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইতে পারে। ইচ্ছামত হাতি হইতে হাতির সমস্তটাই লোপ করিয়া দিয়া কেবলমাত্র তাহার মন্দগমনটুকু বাহির করিতে পারে, এই জন্য ষোড়শী সুন্দরীর প্রতি যখন গজেন্দ্র গমন আরোপ করে তখন সেই বৃহদাকার জন্তুটাকে একেবারেই দেখিতে পায় না। যখন একটা সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা কবির উদ্দেশ্য হয় তখন সুন্দর উপমা নির্ব্বাচন করা আবশ্যক; কারণ, উপমার কেবল সাদৃশ্য অংশ নহে অন্যান্য অংশও আমাদের মনে উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না। "জ্যোৎস্নায় যেন ফুল ফুটিয়াছে" এমন কথা নিরক্ষর লোকের মুখেও শুনিয়াছি কিন্তু যদি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাকে লক্ষ্য করিয়া বলা যাইত যেন ভাতের হাঁড়ি হইতে ফেন গলিয়া পড়িতেছে তবে সাদৃশ্য হিসাবে নিতান্ত মন্দ হইত না; অন্ততঃ শীতের হিম ও ধূমে আচ্ছন্ন পূর্ণিমাকাশকে বিশ্বকর্ম্মারচিত

একটা বড় গোছের দেব-রন্ধনশালা মনে করা যাইতে পারে, কিন্তু তবু এ তুলনাটা গম্ভীরভাবে এবং সুন্দরভাবে কাব্যে ব্যবহার করিবার যোগ্য নহে, কারণ, এ তুলনায় সাদৃশ্য ব্যতীতও আরও এতগুলো ছবি মনে জাগিয়া উঠে যাহাতে সৌন্দর্য্যরসের ব্যাঘাত করে, এমন কি, হাস্যরসের উদ্রেক করিতে পারে। পূর্ব্বোক্ত কারণেই হাতির শুঁড়ের সহিত স্ত্রীলোকের হাত পায়ের বর্ণনা করা সামান্য দুঃসাহসিকতা নহে। কিন্তু আমাদের দেশের পাঠক এ তুলনায় হাসিল না বিরক্ত হইল না; তাহার কারণ, হাতির শুঁড় হইতে কেবল তাহার গোলত্বটুকু লইয়া আর সমস্তই আমরা বাদ দিতে পারি, আমাদের সেই আশ্চর্য্য ক্ষমতাটি আছে। গৃধিনীর সহিত কানের কি সাদৃশ্য আছে বলিতে পারি না, আমার তদুপযুক্ত কল্পনাশক্তি নাই; কিন্তু সুন্দর মুখের দুই পাশে দুই গৃধিনী ঝুলিতেছে মনে করিয়া হাসি পায় না কল্পনাশক্তির এত অসাড়তাও আমার নাই। বোধ করি ইংরাজি পড়িয়া আমাদের না হাসিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা বিকৃত হইয়া যাওয়াতেই এরূপ দুর্ঘটনা ঘটে।

ক্ষিতি কহিল,—আমাদের দেশের কাব্যে নারীদেহের বর্ণনায় যেখানে উচ্চতা বা গোলতা বুঝাইবার আবশ্যক হইয়াছে সেখানে কবিরা অনায়াসে গম্ভীর মুখে সুমেরু এবং মেদিনীর অবতারণা করিয়াছেন, তাহার কারণ, অ্যাব্‌ষ্ট্র্যাক্টের দেশে পরিমাণবিচারের আবশ্যকতা নাই; গোরুর পিঠের কুঁজও উচ্চ, কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরও উচ্চ অতএব অ্যাব্‌ষ্ট্র্যাক্ট্ উচ্চতাটুকুমাত্র ধরিতে গেলে গোরুর পিঠের কুঁজের সহিত কাঞ্চনজঙ্ঘার তুলনা করা যাইতে পারে; কিন্তু যে হতভাগ্য কাঞ্চনজঙ্ঘার উপমা শুনিবামাত্র কল্পনাপটে হিমালয়ের শিখর চিত্রিত দেখিতে পায়, যে বেচারা গিরিচূড়া হইতে আলগোছে কেবল তাহার উচ্চতাটুকু লইয়া

বাকি আর সমস্তই আড়াল করিতে পারে না, তাহার পক্ষে বড়ই মুস্কিল। ভাই সমীরণ, তোমার আজিকার এই কথাটা ঠিক মনে লাগিতেছে—প্রতিবাদ না করিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত আছি!

ব্যোম কহিল, কিছু প্রতিবাদ করিবার নাই তাহা বলিতে পারি না। সমীরণের মতটা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে বলা আবশ্যক। আসল কথাটা এই—আমরা অন্তর্জ্জগৎবিহারী। বাহিরের জগৎ আমাদের নিকট প্রবল নহে। আমরা যাহা মনের মধ্যে গড়িয়া তুলি বাহিরের জগৎ তাহার প্রতিবাদ করিলে সে প্রতিবাদ গ্রাহ্যই করি না। যেমন ধূমকেতুর লঘু পুচ্ছটা কোন গ্রহের পথে আসিয়া পড়িলে তাহার পুচ্ছেরই ক্ষতি হইতে পারে কিন্তু গ্রহ অপ্রতিহতভাবে অনায়াসে চলিয়া যায়, তেমনি বহির্জ্জগতের সহিত আমাদের অন্তর্জ্জগতের রীতিমত সংঘাত কোন কালে হয় না; হইলে বহির্জ্জগৎটাই হঠিয়া যায়। যাহাদের কাছে হাতিটা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ প্রবল সত্য, তাহারা গজেন্দ্রগমনের উপমায় গজেন্দ্রটাকে বেমালুম বাদ দিয়া কেবল গমনটুকুকে রাখিতে পারে না,—গজেন্দ্র বিপুল দেহ বিস্তার পূর্ব্বক অটলভাবে কাব্যের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের কাছে গজ বল' গজেন্দ্র বল' কিছুই কিছু নয়। সে আমাদের কাছে এত অধিক জাজ্বল্যমান নহে, যে, তাহার গমনটুকু রাখিতে হইলে তাহাকে সুদ্ধ পুষিতে হইবে।

ক্ষিতি কহিল, আমরা অন্তরের বাঁশের কেল্লা বাঁধিয়া তীতুমীরের মত বহিঃপ্রকৃতির সমস্ত "গোলা খা ডালা"—সেই জন্য গজেন্দ্র বল সুমেরু বল, মেদিনী বল কিছুতেই আমাদিগকে হঠাইতে পারে না। কাব্যে কেন, জ্ঞানরাজ্যেও আমরা বহির্জ্জগৎকে খাতিরমাত্র করি না। একটা সহজ উদাহরণ মনে পড়িতেছে।

আমাদের সাত সুর ভিন্ন ভিন্ন পশুপক্ষীর কণ্ঠস্বর হইতে প্রাপ্ত, ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে এই প্রবাদ বহুকাল চলিয়া আসিতেছে—এ পর্য্যন্ত আমাদের ওস্তাদদের মনে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহমাত্র উদয় হয় নাই, অথচ বহির্জ্জগৎ হইতে প্রতিদিনই তাহার প্রতিবাদ আমাদের কানে আসিতেছে। স্বরমালার প্রথম সুরটা যে গাধার সুর হইতে চুরি এরূপ পরমাশ্চর্য্য ডিটেক্‌টিভ্‌ কল্পনা কেমন করিয়া যে কোন সুরজ্ঞ ব্যক্তির মনে উদয় হইল তাহা আমাদের পক্ষে কল্পনা করা দুরূহ।

ব্যোম কহিল, গ্রীকদিগের নিকট বহির্জ্জগৎ বাষ্পবৎ মরীচিকাবৎ ছিল না, তাহা প্রত্যক্ষ জাজ্বল্যমান ছিল, এই জন্য অত্যন্ত যত্ন-সহকারে তাঁহাদিগকে মনের সৃষ্টির সহিত বাহিরের সৃষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইত। কোন বিষয়ে পরিমাণ লঙ্ঘন হইলে বাহিরের জগৎ আপন মাপকাঠি লইয়া তাঁহাদিগকে লজ্জা দিত। সেই জন্য তাঁহারা আপন দেবদেবীর মূর্ত্তি সুন্দর এবং স্বাভাবিক করিয়া গড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন—নতুবা জাগতিক সৃষ্টির সহিত তাঁহাদের মনের সৃষ্টির একটা প্রবল সংঘাত বাধিয়া তাঁহাদের ভক্তির ও আনন্দের ব্যাঘাত করিত। আমাদের সে ভাবনা নাই। আমরা আমাদের দেবতাকে যে মূর্ত্তিই দিই না কেন আমাদের কল্পনার সহিত বা বহির্জ্জগতের সহিত তাহার কোন বিরোধ ঘটে না। মূষিকবাহন চতুর্ভুজ একদন্ত লম্বোদর গজানন মূর্ত্তি আমাদের নিকট হাস্যজনক নহে, কারণ, আমরা সেই মূর্ত্তিকে আমাদের মনের ভাবের মধ্যে দেখি, বাহিরের জগতের সহিত, চারিদিকের সত্যের সহিত তাহার তুলনা করি না। কারণ, বাহিরের জগৎ আমাদের নিকট তেমন প্রবল নহে, প্রত্যক্ষ সত্য আমাদের নিকট তেমন সুদৃঢ় নহে, আমরা যে-কোন একটা উপলক্ষ্য

অবলম্বন করিয়া নিজের মনের ভাবটাকে জাগ্রত করিয়া রাখিতে পারি।

সমীরণ কহিল,—যেটাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমরা প্রেম বা ভক্তির উপভোগ অথবা সাধনা করিয়া থাকি, সেই উপলক্ষ্যটাকে সম্পূর্ণতা বা সৌন্দর্য্য বা স্বাভাবিকতায় ভূষিত করিয়া তোলা আমরা অনাবশ্যক মনে করি। আমরা সম্মুখে একটা কুগঠিত মূর্ত্তি দেখিয়াও মনে তাহাকে সুন্দর বলিয়া অনুভব করিতে পারি। মানুষের ঘননীলবর্ণ আমাদের নিকট স্বভাবত সুন্দর মনে না হইতে পারে, অথচ ঘননীলবর্ণে চিত্রিত কৃষ্ণের মূর্ত্তিকে সুন্দর বলিয়া ধারণা করিতে আমাদিগকে কিছুমাত্র প্রয়াস পাইতে হয় না। বহির্জগতের আদর্শকে যাহারা নিজের স্বেচ্ছামতে লোপ করিতে জানে না, তাহারা মনের সৌন্দর্য্যভাবকে মূর্ত্তি দিতে গেলে কখনই কোন অস্বাভাবিকতা বা অসৌন্দর্য্যের সমাবেশ করিতে পারে না। গ্রীকদের চক্ষে এই নীলবর্ণ অত্যন্ত অধিক পাড়া উৎপাদন করিত।

ব্যোম কহিল, আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির এই বিশেষত্বটি উচ্চঅঙ্গের কলাবিস্থার ব্যাঘাত সাধন করিতে পারে কিন্তু ইহার একটু সুবিধাও আছে। ভক্তি স্নেহ প্রেম, এমন কি, সৌন্দর্য্য-ভোগের জন্য আমাদিগকে বাহিরের দাসত্ব করিতে হয় না, সুবিধা সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। আমাদের দেশের স্ত্রী স্বামীকে দেবতা বলিয়া পূজা করে—কিন্তু সেই ভক্তি-ভাব উদ্রেক করিবার জন্য স্বামীর দেবত্ব বা মহত্ত্ব থাকিবার কোন আবশ্যক করে না; এমন কি, ঘোরতর পশুত্ব থাকিলেও পূজার ব্যাঘাত হয় না। তাহারা একদিকে স্বামীকে মানুষভাবে লাঞ্ছনা গঞ্জনা করিতে পারে আবার অন্যদিকে দেবতাভাবে পূজাও করিয়া

থাকে। একটাতে অন্যটা অভিভূত হয় না। কারণ, আমাদের মনোজগতের সহিত বাহ্যজগতের সংঘাত তেমন প্রবল নহে।

সমীরণ কহিল, কেবল স্বামীদেবতা কেন, পৌরাণিক দেবতাদের সম্বন্ধেও আমাদের মনের এইরূপ দুই বিরোধী ভাব আছে অথচ তাহারা পরস্পর পরস্পরকে দূরীকৃত করিতে পারে না। আমাদের দেবতাদের সম্বন্ধে যে সকল শাস্ত্র কাহিনী ও জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে তাহা আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধির উচ্চ আদর্শ সঙ্গত নহে, এমন কি, আমাদের সাহিত্যে, আমাদের সঙ্গীতে, সেই সকল দেবকুৎসার উল্লেখ করিয়া বিস্তর তিরস্কার ও পরিহাসও আছে—কিন্তু ব্যঙ্গ ও ভর্ৎসনা করি বলিয়া যে ভক্তি করি না তাহা নহে। গাভীকে জন্তু বলিয়া জানি, তাহার বুদ্ধিবিবেচনার প্রতিও কটাক্ষপাত করিয়া থাকি, ক্ষেতের মধ্যে প্রবেশ করিলে লাঠিহাতে তাহাকে তাড়াও করি, গোয়ালঘরে তাহাকে এক হাঁটু গোময় পঙ্কের মধ্যে দাঁড় করাইয়া রাখি কিন্তু ভগবতী বলিয়া ভক্তি করিবার সময় সে সব কথা মনেও উদয় হয় না।

ক্ষিতি কহিল, আবার দেখ, আমরা চিরকাল বেসুরো লোককে গাধার সহিত তুলনা করিয়া আসিতেছি অথচ বলিতেছি গাধাই আমাদিগকে প্রথম সুর ধরাইয়া দিয়াছে। যখন এটা বলি তখন ওটা মনে আনি না, যখন ওটা বলি তখন এটা মনে আনি না। ইহা আমাদের একটা বিশেষ ক্ষমতা, সন্দেহ নাই, কিন্তু এই বিশেষ ক্ষমতাবশতঃ ব্যোম যে সুবিধার উল্লেখ করিতেছেন আমি তাহাকে সুবিধা মনে করি না। বাহিরের সৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া আমরা মনের সৃষ্টি বিস্তার করিতে পারি বলিয়া অর্থলাভ, জ্ঞানলাভ এবং সৌন্দর্য্য ভোগ সম্বন্ধে আমাদের একটা ঔদাসীন্যজড়িত সন্তোষের ভাব আছে। আমাদের বিশেষ কিছু আবশ্যক নাই। য়ুরোপীয়েরা

তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক অনুমানকে কঠিন প্রমাণের দ্বারা সহস্রবার করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন তথাপি তাঁহাদের সন্দেহ মিটিতে চায় না—আমরা মনের মধ্যে যদি বেশ একটা সুসঙ্গত এবং সুগঠিত মত খাড়া করিতে পারি তবে তাহার সুসঙ্গতি এবং সুষমাই আমাদের নিকট সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়, তাহাকে বহির্জগতে পরীক্ষা করিয়া দেখা বাহুল্য বোধ করি। জ্ঞানবৃত্তি সম্বন্ধে যেমন, হৃদয়বৃত্তি সম্বন্ধে সেইরূপ। আমরা সৌন্দর্য্যরসের চর্চ্চা করিতে চাই, কিন্তু সে জন্য অতি যত্নসহকারে মনের আদর্শকে বাহিরে মূর্ত্তিমান করিয়া তোলা আবশ্যক বোধ করি না—যেমন-তেমন একটা কিছু হইলেই সন্তুষ্ট থাকি,—এমন কি, আলঙ্কারিক অত্যুক্তির অনুসরণ করিয়া একটা বিকৃত মূর্ত্তি খাড়া করিয়া তুলি এবং সেই অসঙ্গত বিরূপ বিসদৃশ ব্যাপারকে মনে মনে আপন ইচ্ছামত ভাবে পরিণত করিয়া তাহাতেই পরিতৃপ্ত হই; আপন দেবতাকে, আপন সৌন্দর্য্যের আদর্শকে প্রকৃতরূপে সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করি না। ভক্তিরসের চর্চ্চা করিতে চাই, কিন্তু যথার্থ ভক্তির পাত্র অন্বেষণ করিবার কোন আবশ্যক বোধ করি না—অপাত্রে ভক্তি করিয়াও আমরা সন্তোষে থাকি। সেইজন্য আমরা বলি গুরুদেব আমাদের পূজনীয়, একথা বলি না যে যিনি পূজনীয় তিনিই আমাদের গুরু। হয়ত গুরু আমার কানে যে মন্ত্র দিয়াছেন তাহার অর্থ তিনি কিছুই বুঝেন না, হয়ত আমার গুরুঠাকুর আমার মিথ্যা মকদ্দমার প্রধান মিথ্যা সাক্ষী তথাপি তাঁহার পদধূলি আমার শিরোধার্য্য এরূপ মত গ্রহণ করিলে ভক্তির জন্য ভক্তিভাজনকে খুঁজিতে হয় না, দিব্য আরামে ভক্তি করা যায়।

সমীরণ কহিল—ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র তাহার একটি উদাহরণ।

বঙ্কিম কৃষ্ণকে পূজা করিবার এবং কৃষ্ণ পূজা প্রচার করিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণকে নির্ম্মল এবং সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমন কি, কৃষ্ণের চরিত্রে অনৈসর্গিক যাহা কিছু ছিল তাহাও তিনি বর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণকে তাঁহার নিজের উচ্চতম আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এ কথা বলেন নাই যে, দেবতার কোন কিছুতেই দোষ নাই, তেজীয়ানের পক্ষে সমস্ত মার্জ্জনীয়। তিনি এক নূতন অসন্তোষের সূত্রপাত করিয়াছেন ;– তিনি পূজা বিতরণের পূর্ব্বে প্রাণপণ চেষ্টায় দেবতাকে অন্বেষণ করিয়াছেন ও হাতের কাছে যাহাকে পাইয়াছেন তাহাকেই নমোনমঃ করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই।

ক্ষিতি কহিল—এই অসন্তোষটি না থাকাতে বহুকাল হইতে আমাদের সমাজে দেবতাকে দেবতা হইবার, পূজ্যকে উন্নত হইবার, মূর্ত্তিকে ভাবের অনুরূপ হইবার আবশ্যক হয় নাই। ব্রাহ্মণকে দেবতা বলিয়া জানি, সেই জন্য বিনা চেষ্টায় তিনি পূজা প্রাপ্ত হন, এবং আমাদেরও ভক্তিবৃত্তি অতি অনায়াসে চরিতার্থ হয়। স্বামীকে দেবতা বলিলে স্ত্রীর ভক্তি পাইবার জন্য স্বামীর কিছুমাত্র যোগ্যতালাভের আবশ্যক হয় না, এবং স্ত্রীকেও যথার্থ ভক্তির যোগ্য স্বামী অভাবে অসন্তোষ অনুভব করিতে হয় না। সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার জন্য সুন্দর জিনিষের আবশ্যকতা নাই, ভক্তি বিতরণ করিবার জন্য ভক্তিভাজনের প্রয়োজন নাই এরূপ পরমসন্তোষের অবস্থাকে আমি সুবিধা মনে করি না। ইহাতে কেবল সমাজের দীনতা, শ্রীহীনতা এবং অবনতি ঘটিতে থাকে। বহির্জ্জগৎটাকে উত্তরোত্তর বিলুপ্ত করিয়া দিয়া মনোজ্জগৎকেই সর্ব্বপ্রাধান্য দিতে গেলে যে ডালে বসিয়া আছি সেই ডালকেই কুঠারাঘাত করা হয়।

আবদারের আইন।

ভারত গবর্ণমেণ্ট সুদীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশের পর গৃহে আসিয়াই এক উৎকট কর সংস্থাপনের উদ্দেশে একটী অভিনব আইনের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। সুপ্রিম কাউন্সিলের কলিকাতা অধিবেশনে এবারকার সর্ব্বপ্রথম কার্য্য, সূতা ও কাপড়ের উপর কর সংস্থাপন আইনের পাণ্ডুলিপি। ইহা প্রবাসেই প্রস্তুত হইয়াছিল; গবর্ণমেণ্ট পকেটে করিয়াই ইহা আনিয়াছিলেন; রাজধানীতে পদার্পণ করিয়াই রাজ্যমধ্যে এই পাণ্ডুলিপি প্রচার করেন। কয়েক দিন মধ্যেই পাণ্ডুলিপি পুরা আইনে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

ইহার,—এই কাপড় ও সূতার শুল্ক-আইনের এক অংশে পুরাতনের ও পরিবর্জ্জিতের পুনঃপ্রচার; অপর অংশ সম্পূর্ণ অভিনব, তাহা একটী স্বতন্ত্র ও সাংঘাতিক আইন। শেষোক্ত প্রথমেরই অবশ্যম্ভাবী ফল;—উভয়ের একটীও কিন্তু অযাচিত নয়, আকস্মিকও নয়। অনেক সময়ে আকাশ হইতে আইন আসিয়া অকস্মাৎ আমাদের মাথার উপর পড়ে। আইনের আবশ্যকতা ও লোকের ইষ্টানিষ্টের প্রতি অপরিসীম উপেক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্ট দেশীয় সংবাদপত্র ও সভাসমিতির অজ্ঞাতে ও অনভিমতে নূতন নূতন আইন কানুন করিয়া থাকেন। বলা অনাবশ্যক ইহা অন্যায়, যথেচ্ছাচার, যার পর নাই দূষণীয়। কিন্তু উপস্থিত আইনের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে এ দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। যে কারণেই হৌক, গবর্ণমেণ্ট আত্ম-ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া অযাচিত ভাবে ও অকস্মাৎ এ আইনের অবতারণা করেন নাই। প্রত্যুত এ দেশে যাহা ও যাঁহারা সাধারণ অভিমতের অধিনেতা বলিয়া অভিহিত ও আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন,

তাহার ও তাঁহাদের তুমুল আন্দোলনে ও অস্বাভাবিক আবেদনে গবর্ণমেণ্ট এই আইন উপস্থিত করিবার অবসর পাইয়াছেন, উপস্থিত করিতে অগত্যা বাধ্য হইয়াছেন। নহিলে এ আইন সম্ভবতঃ হইত না; সহজে হইবার সুদূর সম্ভাবনা মাত্র ছিল না। গবর্ণমেণ্ট এ দেশীয় লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া যে এ আইন করিতেন না, তাহা নহে; এ দেশীয় বস্ত্র-শিল্প অচিরাৎ উৎসন্নে যাইবে বা কাপড়-সূতার কল শৈশবেই স্বর্গারোহণ করিবে বলিয়া যে গবর্ণমেণ্ট কিছুমাত্র শঙ্কিত হইতেন তাহাও নহে; পরন্তু এ দেশীয়দিগের পরিধেয়ের জন্যও যে পরম উৎকণ্ঠিত হইয়া গবর্ণমেণ্ট এই আইন করিতেন না, এমনও বলি না। এ দেশের লোক অনাহার অর্দ্ধাহারে মরুক আর উলঙ্গ অবস্থায় থাকুক বা প্রদেশীয় শিল্প-বাণিজ্য পঞ্চভূতে বিলীন হউক, তাহাতে এই গুরুগম্ভীর গবর্ণমেণ্টের অবিচলিত ঔদাসীন্যের এক বিন্দুও উদ্বেগ উপস্থিত হইবার আদৌ কারণাভাব। কিন্তু, তথাচ এই আইন হইত না। হইত না সম্পূর্ণ অন্য কারণে। সে কারণ, সকলেই জানেন, মাঞ্চিষ্টারেব মহিয়সী শক্তি, লাঙ্কাশায়রের বাণিজ্য-স্বার্থ। কিন্তু, শুনিতে পাই, মাঞ্চিষ্টার, লাঙ্কাশায়র আমাদের শত্রু। স্বীকারই করি উহারা আমাদের পরম শত্রু। শত্রুর স্বার্থ সর্ব্বথা হননীয় শুক্রাদির নীতি অনুসারে ইহাও আসুন, স্বীকার করি। কিন্তু, এই শত্রুদিগের স্বার্থের অনুরোধে এ দেশীয় গরিব দুঃখীরা একটু সুলভ বস্ত্র পরিধান করিতে পাইত; পরন্তু, সেই স্বার্থেরই অনুরোধে, এ দেশের আধুনিক অনুষ্ঠান কলের কাপড় সুতার উপর এত দিন কোনও শুল্ক সংস্থাপিত হয় নাই, ইহাও অগত্যা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। এক কথায়, শত্রুর স্বার্থে সাধারণতঃ এ দেশেরই সুবিধা ছিল, সরল ও সত্য কথা

বলিতে হইলে, অপেক্ষাকৃত সস্তা বস্ত্রে সুখও কিছু না হইয়াছিল এমন নয়। কিন্তু, তথাচ শত্রু শত্রু ভিন্ন মিত্র নহে। স্বদেশ-হিতৈষী সম্প্রদায়ের শত্রুহনন-স্পৃহা সমূহ বলবতী; তবে সে শক্তির অত্যন্ত অভাব বটে। কিন্তু, এ সম্বন্ধে শত্রুহননের এক মহা শুভক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল। কি-জানি-কোন এক অজ্ঞাত অভিসন্ধি-সূত্রে এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান বণিকসম্প্রদায় মাঞ্চিষ্টারের স্বার্থের বিরুদ্ধে বন্দুকে সঙ্গীণ চড়াইয়া, বারুদবাহকের কার্য্য করিবার জন্য নেটিব পেট্রিয়টদিগকে ডাকিয়াছিলেন। সাহেবী ডাক; সামান্য নয়, অসুমার সম্ভ্রমেরই কথা। ডাক পড়িবা মাত্র পেট্রিয়টেরা, পূর্ব্বাপর না ভাবিয়া, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, স্বদেশের প্রকৃত, অতি প্রত্যক্ষ, ও অব্যবহিত, অস্থিমজ্জাময় শরীরী স্বার্থ আদৌ উপেক্ষা করিয়া, তাহার একটা মরীচিকা-কঙ্কালের কল্পনায়, সাহেবদের পদ-প্রান্তে দলে দলে যাইয়া হাজির হন; বিদেশীয় ও বিলাতি আমদানি বস্ত্র এবং সূত্রের উপর শুল্ক সংস্থাপনের জন্য, সজোরে ও সমস্বরে হল্লা করিতে আরম্ভ করেন। এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ানের বিলাতি বন্দুকে নেটিব পেট্রিয়টের বাক্য-বারুদ বিক্ষিপ্ত হইয়া একটা বিষম বিসদৃশ রাজনৈতিক আওয়াজ উৎপন্ন ও উৎসারিত করে। তাহারই ফল আমাদের অদ্যকার আলোচ্য এই আইন। ইতর কথায়, ইহাকেই বলে 'আপন নাসিকা কর্ত্তন করিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ'। শত্রুর শুভ যাত্রা ভঙ্গ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য হইতে পারে; কিন্তু, নিজের নাসিকাটিও ত নেহাত নিষ্কর্ম্মা দ্রব্য নহে। নাসিকাটীর কি একেবারেই কোন মূল্য নাই যে, নির্ম্মম হইয়া তাহাকে নির্মূল করিবে? কিন্তু, পরিতাপ এ দেশীয় পেট্রিয়টেরা, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই করিয়াছেন, অথচ পূর্ণমাত্রায় তাহা কাহারও যাত্রা ভঙ্গের প্রতিবন্ধক হয় নাই। বিদেশীয় বস্ত্র-

শিল্পের শুভ যাত্রা সম্যক রূপে ভঙ্গ হইবে না; আদৌ এক বিন্দু ভঙ্গ হইবে কি না সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহ; কিন্তু স্বদেশীয় সূত্র-শিল্পের ও সুলভ বস্ত্রের নাসিকাটী নিশ্চিন্তপুরে পলয়ন করিয়াছে। নাসিকা-ছেদনজনিত যন্ত্রণায় এখন রোদন করা বৃথা। যাতনার তীব্রতার সঙ্গে এক রত্তি তামাসাও আছে। নাসা না থাকা নিজেই এক তামাসা বটে; কিন্তু, এ ব্যাপারে তদতিরিক্ত আর একটু তামাসা আছে। নাসিকাটী কোথা হইতে কতখানি স্থান পর্য্যন্ত কর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার সহিত অন্য কোন্ অঙ্গের হানি হইয়াছে কি না, আমাদের পরিচালক ও পেট্রিয়টবৃন্দ, তাহা এখনও নাকে হাত দিয়া দেখেন নাই। সেই সামগ্রীটী "গিয়াছে গিয়াছে," বলিয়াই কেবল রোদন ও রোষ প্রকাশ করিতেছেন। কেন গেল, কাহার দোষে গেল, কত দূর লইয়া গিয়াছে, নাসিকা পুনঃপ্রাপ্তির কোনও সম্ভাবনা নাই, তবুও ত এ সকল কথা এখন অনায়াসে নিশ্চিন্তভাবে ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে। অনর্থক চাৎকারে ও চাঞ্চল্য প্রকাশেই কি পুরুষার্থ?

গত বৎসর ফেব্রুয়ারির শেষে লর্ড এলগিনের রাজত্ব আরম্ভ। তাঁহার অভিষেকের অব্যবহিত পরেই প্রাথমিক ব্যবস্থাপক বৈঠকে বজেটের আলোচনা। অর্থের অনটন; অর্থাগমের অন্যতম উপায় উদ্ভাবন, ট্যারিফ টেক্সের পুনঃ সংস্থাপন। ক'মাসেরই বা কথা; সকলেরই ইহা স্মরণ আছে এবং সে স্মৃতি এখনও খুব টাট্কা আছে। বিদেশ ও বিলাত হইতে আমদানি বহু দ্রব্যের উপর কর বসিল; কেরসিন তৈলের টেক্স বাড়িল। পেট্রিয়টগণ পুলকিত হইলেন। ইন্‌কম টেক্স বাড়িল না বলিয়া কেহ, নূতন টেক্স হইল না বলিয়া কেহ, বিলাতি দ্রব্যের স্পর্শে মহাপাতকগ্রস্ত হইতে ও নরক গমন করিতে হইবে না বলিয়া কেহ, পরন্তু স্বদেশীয় শিল্পী ও

শ্রমজীবীদিগের সুবিধার স্বপ্ন কল্পনা করিয়া কেহ; নানা জনে নানা অনুমানে আনন্দিত হইলেন। কিন্তু এই অস্বাভাবিক আনন্দের প্রকৃত কোনও কারণ ছিল না; রক্তমাংসময় পৃথিবীর সহিতও উহার সবিশেষ কোনও সম্বন্ধ ছিল না। দেশের অনিবার্য্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের উপর আমদানি-শুল্ক সংস্থাপনে সজীব জাতির যেরূপ আনন্দ উৎপন্ন হয়, তাহা আমেরিকার ইতিবৃত্তেই জ্ঞাতব্য। আনন্দই বটে! সে আনন্দে অস্ত্রনির্ঘোষ, রাষ্ট্র-বিপ্লব ও শোণিতস্রোতেরই সম্ভাবনা। কিন্তু অঙ্গহীন অসাড় জাতির সবই উল্টা। পক্ষাঘাতে পাঁচটী ইন্দ্রিয়ই বিকল, কাযেই হর্ষ বিষাদের কারণ অনুভবে অক্ষম। বুদ্ধিবৃত্তিও তদনুরূপ সূক্ষ্ম; সংসারের সংবাদ রাখেন তেমনি সবিশেষ; সুতরাং আমদানিশুল্কে উপরোক্ত আমোদ অনুভূত হইয়াছিল। সে আমোদের যদি একান্তই কোনও কারণ নির্দ্দেশ করিতে হয়—তাহার একটা কারণ হুজুগ; আর একটা কারণ "হবি" বাতিকের অশ্ব আরোহণ করিয়া অহরহ ইন্দ্রলোকে গমনের চেষ্টা। ইহাই "হবি"। সংসারে হবিওয়ালা লোকের অভাব নাই, হুজুগওয়ালা ত অসংখ্য। সুতরাং সেই জাতীয় লোকের মধ্যেই ঐ আমদানি-শুল্কে আনন্দের উদ্রেক হইয়াছিল। নহিলে যাঁহারা সংসারের সবিশেষ সংবাদ রাখেন, বাজারের বৃত্তান্ত বুঝিয়া অপক্ষপাতে বিচার করিতে পারেন এবং দেশের অস্থি মজ্জা মেধ, দরিদ্র রায়ত ও কৃষকের সুখ দুঃখের একটা অস্তিত্ব অনুভব করেন, তাঁহাদের কেহই এই আমদানিশুল্কে সন্তুষ্ট হন নাই। উহাতে দেশের অন্তর্ভেদী একটী অসন্তোষই উৎপন্ন হইয়াছে। দেশের লোক অদৃষ্টবাদী বল-ও বাক-শক্তি-বিরহিত তজ্জন্যই এ অসন্তোষ অস্ফুট ও অব্যক্ত; সংবাদপত্রে উঠে নাই, বাগ্মীর বক্তৃতায় ফুটে নাই, বলে বণিকের পণ্য-পাট লুষ্ঠিত হয় নাই। লোকের বাক-

শক্তি ও বল থাকিলে ফল অন্যরূপ হইত। এই অন্তর্ভেদী অব্যক্ত অসন্তোষের কারণ অতীব স্পষ্ট। পেট্রিয়টিজিমের প্রিয় "হবি" যাহাই হউক, ইহা পরিষ্কার ও প্রতিদৈনিক প্রত্যক্ষ ঘটনা যে, স্বদেশীয় বা বিলাতি বিদেশীয়ও হউক, যে দ্রব্য জনসমাজে অনিবার্য্য-ভাবে চলিয়া গিয়াছে, যাহা জীবনধারণোপকরণের একটা অংশ অথবা জীবনধারণের সহিত এবং স্বাভাবিক ও সামাজিক সম্ভ্রমরক্ষণের সহিত যে সামগ্রীর অলঙ্ঘনীয় সম্বন্ধ তাহার উপর শুল্ক বসিয়া সে দ্রব্য দুর্ম্মূল্য বা মহার্ঘ হইলে মনুষ্য মাত্রেরই মর্ম্মান্তিক বাজে; বিশেষতঃ এই দরিদ্র দেশের দুঃখী লোকদের হৃদয়ে তাহা অধিকতর দারুণভাবে অনুভূত হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দুই একটা দ্রব্যই গ্রহণ করুণ। প্রথম ধরুণ লবণ; লবণের সের ছয় পয়সা মাত্র। তুমি আমি হয় ত মনে করিতে পারি লবণ খুব শস্তা। কিন্তু শতকরা অন্ততঃ ৭০জন লোকের মধ্যে এ দেশে এখন লবণ শস্তা নয়; মহা মহার্ঘ। লবণ-শুল্ক অর্থাৎ উক্ত দ্রব্য সরকার বাহাদুরের একচাটিয়া হওয়ার পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে উহা শস্তা ছিল; তাহাদের অনেকে লবণ প্রস্তুত করিয়া খাইত, গবাদি গৃহপালিত পশুকে খাওয়াইতে পারিত। কিন্তু এখন আর তাহা পারে না। ছয় পয়সা সেরের লবণ কিনিয়া খাইতেও তাহাদের কষ্ট হয়। গবাদিকে লবণ খাওয়ানর ত কথাই নাই; নিজেদের অন্ন জুটিলে অনেক সময়েই তাহাতে লবণ জুটে না। বিনা লবণে ভাত খায় ও আপন আপন অদৃষ্টকে অভিসম্পাৎ করে। ইহা কি খুব একটা সন্তোষের কারণ? স্বদেশীয় সম্পাদক মহাশয়দিগের প্রতিই প্রশ্নটী করিলাম। কেহ কেহ হয়ত লুকাইয়া এক আধ বিন্দু লবণ তৈয়ারি করিতে যায়; কিন্তু সে পাপের কি প্রচণ্ড শাস্তি তাহা প্রতিদিনের পুলিশ রিটার্ণ ও ফৌজদারী রিপোর্টেই

প্রকাশ। পুনঃ জিজ্ঞাসা করি, ইহাও কি মহাশয় স্বদেশীয় ইতর সাধারণের একটা সন্তোষের কারণ? পরন্তু ধরুন কেরসিন তৈল। কেরসিন তৈল ক্রমে এখন এ দেশের প্রায় আপাদমস্তক প্রচলিত হইয়াছে; কারণ তাহা অন্যান্য তৈল অপেক্ষা শস্তা। তেলী নিজে সর্ষপাদির তৈল প্রস্তুত করে, তথাচ কেরসিন তৈল কিনিয়া পোড়ায়; কারণ তাহা শস্তা। দরিদ্রের দেশে শস্তা দ্রব্যেরই আদর; শস্তা দ্রব্যেরই আবশ্যক; তা দেশীই হউক আর বিলাতিই হউক; শস্তাতেই লোকের সুখ শান্তি সুবিধা। সুতরাং শস্তাগণ্ডাই গরিব লোকে দেখে; দেশী বিলাতি বুঝে না। ইহা স্বভাবের নিয়ম ও মনুষ্যপ্রকৃতি। তোমার পক্ষপঞ্জরবিহীন ও পুচ্ছহীন পেট্রিয়টিজম দ্বারা মনুষ্যপ্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে যে চাহ সে কেবল পাগলামি। নেহাত নির্ব্বোধ ব্যতীত আর কেহই নৈসর্গিক নিয়মে হস্তক্ষেপ করিতে যাইয়া হাস্যাস্পদ হয় না। যদি প্রকৃত প্রস্তাবেই পেট্রিয়ট হও, দেশী দ্রব্য ও স্বদেশীয় শিল্পে যথার্থই আন্তরিক অনুরাগ থাকে, তবে তাহার উন্নতিকল্পে অগ্রে চেষ্টা কর; প্রাণপণ প্রতিযোগিতা করিয়া দেশী দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যত্ব ঘুচাও; নহিলে তাহা কখনই গরিব লোকের ব্যবহার্য্য হইবে না; যে নিজে তাহা স্বহস্তে তৈয়ার করে, সেও তাহা ব্যবহার করিবে না। কিন্তু যাউক সে কথা। গত মার্চ মাসে টেরিফ-টেক্সের পুনরাবির্ভাবে কেরসিন তৈলের মাশুল বৃদ্ধি হইয়া তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা মহার্ঘ হইয়াছে। মাশুলের পরিমাণে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে কি না ঠিক বলিতে পারি না; অত হিসাব করিয়া দেখি নাই। কিন্তু মূল্য বিলক্ষণই বৃদ্ধি হইয়াছে। ঐ তৈলের যে টিন ছিল ১৸৴০ তাহা হইয়াছে এখন ১৷৶০; টিন প্রতি অল্লাধিক ।০ বৃদ্ধি। মধ্যবৃত্ত গৃহস্থেরই যখন ইহা মর্ম্মান্তিক বাজিয়াছে,

তখন গরিব ইতর সাধারণের আর কথা কি! যাহারা এক পয়সার তৈল কিনিয়া তিন রাত্রি পোড়াইত, তাহাদের সে তৈলে এখন পুরা দুই রাত্রিও চলে না। অতএব পুনঃ জিজ্ঞাসা করি, কেরসিন তৈলের এই "পোত" টা কি পরম সন্তোষেরই বিষয় হইয়াছে? এখন কেরসিন তৈলের দৃষ্টান্ত কাপড়ের উপর প্রয়োগ করুন; ফল সেই একই হইবে। দেশী তাঁতের কাপড় অপেক্ষা বিলাতি বা বোম্বাই কলের কাপড় শস্তা। সঙ্গতিহীনে শস্তাই পরে। তাঁতি নিজহস্তে তাঁত বুনে; দেশী বস্ত্র তৈয়ার করে; কিন্তু পরে কি? পরে কি শিমলার কালাপেড়ে? না শান্তিপুরের কল্কাপেড়ে? কিম্বা ফরাসডাঙ্গার কাশীপেড়ে? সম্পাদক শিরোমণিরা নিজে এসব বরং পরিয়া বাহার দিতে পারেন। কিন্তু তন্তুবায় তাহা পারে না। তাহার প্রাণে পেট্রিয়টিজিম থাকিলেও হাতে পয়সা নাই। সুতরাং সে স্বহস্তে কল্কাপেড়ে প্রস্তুত করিয়াও পরিয়া থাকে বিলাতি কলের থানফাড়া ধুতি; কাপড় সূতায় শুল্ক বসিল, সে ধুতির উপর চাদর জুটা ভার হইবে। অনেকের ধুতিও জুটিবে না; লঙ্গটীতে লজ্জা নিবারিত যদি হইবার হন তবেই হইবেন; নহিলে লজ্জা নিজেই লজ্জা পাইয়া পলাইবেন। পরন্তু দেশীয় তাঁতির তাঁতের সম্বল বিলাতি সূতা; ইহাও বারেক স্মরণীয়। বিলাতি সূত্র-শুল্কে দেশী কাপড়ের উন্নতিকল্পনা আকাশকুসুমেরই অন্তর্গত।

বিগত মার্চের ট্যারিফটেক্সে অনেকানেক দ্রব্যের উপরেই আমদানিমাশুল বসিয়াছে। কিন্তু এখনও কতক দ্রব্য আছে, যাহাদের উপর হয় ত মাশুল বসে নাই; অথচ মূল্য তাহাদের বাড়িয়াছে। বাজারে যে দ্রব্যই দর কর সবই মহার্ঘ; বাণিয়া বলে "মহাশয় মাশুল বসিয়াছে; কাজেই মহার্ঘ"। ইহা বাণিয়ার

চাতুরী অথবা ট্যারিফ তহশীলদারদের বাহাদুরী ঠিক বলা যায় না। তবে ট্যারিফের নিয়ম গঠনেও যে গলদ্ আছে ইহাও নিশ্চয়। আইনের উপস্থিত সংশোধনে সে দোষ দূরীভূত হইলেও হইতে পারে। কিন্তু কেবল করদ দ্রব্যের দুর্ব্বোধ্য ও অনির্দ্দিষ্ট শ্রেণী বাঁধিয়া দিলেই চলিবে না। পরন্তু কেবল ইণ্ডিয়া গেজেটে ট্যারিফের নিয়মাবলী প্রকাশিত করিয়া তাহা বড় বড় বন্দরে প্রেরণ করা প্রচুর নহে। কোন্ কোন্ দ্রব্যের উপর আমদানি মাশুল বসিল তাহা নির্দ্দিষ্ট ও পরিষ্কার ভাবে দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিয়া সর্ব্বসাধারণের বিদিতার্থে বাজারে বাজারে প্রচার করা উচিত। নহিলে বিক্রেতা ক্রেতা উভয়েরই সঙ্কট। এ বিষয়ে যে কেবল বড় বড় সওদাগরেরাই সংশ্লিষ্ট তাহা নহে। ক্ষুদ্র দোকানী পসারী ও দ্রব্যের খরচকারী ক্রেতা মাত্রেই ইহার সহিত জড়িত। অতএব অর্থসচিব শ্রীযুক্ত ওয়েষ্টল্যাণ্ড বাহাদুর যে কেবল ইণ্ডিয়া গেজেটের উপরেই নির্ভর করিতেছেন, * ইহা ঠিক নহে।

গত মার্চ মাসে অনেকানেক আমদানি দ্রব্যের উপরেই মাশুল বসিয়াছিল; —বসে নাই কেবল কাপড় ও সূতার উপরে। মাঞ্চেষ্টারের মাহাত্ম্যেই হউক কিম্বা অন্য যে কারণেই হউক, সম্ভবতঃ মাঞ্চেষ্টারের মহিমাতেই, সেক্রেটারী-অব্-ষ্টেট কাপড় সূতার মাশুল অনুমোদন করেন নাই। নহিলে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের তাহাতে সবিশেষ ইচ্ছা না ছিল এমন নহে। ষ্টেট-সেক্রেটারী মিঃ ফাউলার সাহেবকে তাঁহার উক্ত অনভিমতের জন্য অনেক নিন্দা তিরস্কার ও লাঞ্ছনার ভাগী হইতে হইয়াছিল। কাউন্সিলের প্রায় সকল

---

* মিঃ ওয়েষ্টল্যাণ্ডের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের বক্তৃতা; ১৭ই ডিসেম্বর ১৮৯৪।

মেম্বরই তাঁহার প্রতি কুটিল কটাক্ষ করিয়াছিলেন। সরকারী সদস্যেরা সাফই বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা হুকুমের চাকর সুতরাং কাপড় সূতার কর বসাইতে পারিলেন না। পরন্তু সাহেব সওদাগরেরা সাংঘাতিক রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন; একটা অস্বাভাবিক আন্দোলন উঠাইয়াছিলেন। নেটিব পেট্রিয়টেরা যাইয়া সে আন্দোলনে যেরূপে যোগ দেন অগ্রে উল্লেখ করিয়াছি। কাপড় সূতার করের অভিলাষে আন্দোলন ভয়ানক ফাঁপিয়া উঠে। দেশীয় স্বদেশহিতৈষী ও সম্পাদকবর্গ একবাক্যে বলিয়া উঠেন;—"ইহা ইংরাজের একান্ত অন্যায়, অপরিসীম অবিচার, পৈশাচিক অত্যাচার; সূতা ও কাপড়ের কর অবিলম্বে চাই, এখনি চাই; নহিলে দেশ এই দণ্ডেই উৎসন্নে যাইবে।"

আশ্চর্য্য! আমরা এরূপ আশ্চর্য্য আন্দোলন ও অভিমত খুব কমই দেখিয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী লোক, সর্ব্ববিষয়ে স্বতন্ত্র পথানুসারী সংবাদপত্র, এ সম্বন্ধে সকলেরই এক রায়;— "কাপড় সূতার কর না বসিলে ভারতভূমি অচিরাৎ অধঃপাতে যাইবে।" ঘোরতর কঙ্গ্রেস-বাদী "বেঙ্গলী" হইতে কঙ্গ্রেসের বিকট বিদ্বেষী "বঙ্গবাসী" পর্য্যন্ত উভয় শ্রেণীর স্বদেশভক্তই এ ক্ষেত্রে একাসনে উপবিষ্ট! তৈলে জলে দুগ্ধ শর্করবৎ সংমিশ্রণ! অর্থনৈতিক সমস্যায় এরূপ অস্বাভাবিক একাকার আমরা আর কখনও দেখি নাই। এরূপ প্রকাণ্ড প্রমাদও আর কখনও দেখি নাই।

আন্দোলনের তুফান উঠিল। কয়েক মাস ধরিয়া আরজী ও আবেদনের ফুটকড়াই ছুটিল। সহস্র সহস্র স্বাক্ষরপূর্ণ সুদীর্ঘ আবেদন বিলাতে প্রেরিত হইল। স্বাক্ষর গ্রহণের সীমা ছিল না; দিগ্বিদিগ বিচার ছিল না; অজ্ঞানে সজ্ঞানে যেমনেই হউক দস্তখত

হইলেই হইল। দস্তখত সংগ্রহের জন্য দস্তরমত কমিসন কবুল করিয়া লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। শুনিয়াছি কোনও পেট্রিয়ট তাঁহার আপিসের পবিত্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া এই সৎকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন!

বৃটিশ সিংহ আন্দোলন গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্যই করুন, একান্ত উপেক্ষা করেন না; দৃশ্যত উপেক্ষার ভাব দেখাইলেও তাহাতে করিয়া অন্তরে অন্তরে তিনি একটু উত্তেজিত হইয়া থাকেন; ঈষৎ মাত্রায় আশঙ্কিতও না হইয়া থাকেন এমন নহে। মৌলিক হউক বা মেকিই হউক "পাবলিক ওপিনিয়ন" নামক পদার্থমাত্রই অবিকৃত বিলাতি ধাতুতে 'সূচিকাভরণ' স্বরূপ। এ লক্ষণ সাধারণতঃ সুলক্ষণ তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে কোনও কোনও সময়ে যে তদ্দ্বারা সুবিধার পরিবর্ত্তে অসুবিধাও হইতে পারে, সে স্বতন্ত্র কথা। সেটা 'পাবলিক ওপিনিয়ন' প্রস্তুতকারীদের উক্ত পদার্থ প্রস্তুতকরণের পাপনিবন্ধনই ঘটে। উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছে। বৃটিশ সিংহ বাহিরের কোলাহলে বিচলিত হইবার পাত্র নহেন; এ কথা লর্ড এলগিন, সিংহশক্তির সামঞ্জস্য ও তৎকৃত কার্য্যমাত্রের মাহাত্ম্য বা প্রমাদরাহিত্য প্রতিপাদনার্থে অবশ্যই বলিতে পারেন; - আলোচ্য আইন বিধিবদ্ধ করিবার দিন ইহা বিশিষ্টভাবে বুঝাইবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। * কিন্তু তাই

---

* লর্ড এলগিন ইঙ্গিতে বোধ হয় মাজিষ্টারের ইষ্ট সিদ্ধির আরোপিত পক্ষপাতকে আক্রমণ করিয়া বলিয়াছিলেন; It is alleged in certain quarters ·· ··· that in consenting to introduce this Bill in its present form the Government has made a cowardly surrender to a pressure which if not unconscious is at any rate unusual and oppressive. I wish to take exception to any such statement. ইত্যাদি।

বলিয়া কথাটা অখণ্ডভাবে অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না। কাপড়ের কর আন্দোলন ব্যতীত আদৌ জন্মিত না; পূর্ব্বাপর ঘটনা-তেই ইহা প্রমাণ হইয়াছে।

ঐ কর সংস্থাপন কামনায় সাহেব সওদাগরদিগের সংগ্রামের সহিত দেশীয় স্বদেশহিতৈষীদিগের সংযোগে ভারত গবর্ণমেণ্ট না হউন বৃটিশ রাজনৈতিকেরা বিলক্ষণ বিচলিত হইয়াছিলেন। পার্লা-মেণ্টে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠিয়াছিল। এবং অচিরাৎ বিলাতি আমদানি কাপড় সূতার উপর কর না বসিলে অসন্তোষের উগ্র অনলে ভারত রাজ্য দগ্ধ হইবে, বিলাতে ও ভারতে এই অমূলক অলীক কথাও অপ্রকাশ ছিল না। তৎকালে ঐ অসন্তোষ আস্ফা-লিত করিবার এক হাস্যকর অতি বৃহৎ সুযোগও উপস্থিত হইয়া-ছিল। ট্যারিফ আন্দোলনের সময় উত্তরবিহারের আমবাগানে এক আমোদ উপস্থিত হয়। সকলেরই স্মরণ আছে সে আমোদ কি ;– বৃক্ষে বৃক্ষে কর্দ্দমাক্ত কেশ শোণিত সংপৃক্ত। কোন্ গ্রাম্য বালকেরা ঐ বালসুলভ ক্রীড়া করিত, অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ত্রিহুতিয়েরা উহাকে বলিয়াছিল "হনুমানজীউর তিলক"। হনুমানজীউর হউক, আর যাহারই হউক, এই তথাকথিত তিলক একটা রাজনৈতিক তুফান উপস্থিত করিয়াছিল। এঙ্গলো ইণ্ডি-য়ানেরা উহাতে একটা অজ্ঞাত আসন্ন ও অতি বিরাট বিভ্রাট কল্পনা করিয়াছিলেন, তিলকাঙ্কে প্রকৃত প্রস্তাবেই সেই ত্রেতাযুগ-প্রসিদ্ধ বীরের লঙ্কাদগ্ধকারী মার্ত্তণ্ড মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া আতঙ্কে অতি চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজার জাতি যাহাতে জুজু দেখেন, তাহাই রাজনীতির অন্তর্গত ; অন্যের তুচ্ছাদপি তুচ্ছ হই-লেও তাহা রাজনীতির চক্ষে ভীষণ বিভীষিকা ; সুতরাং ত্রিহুতের তিলক চালাচালি সিপাই মিউটিনীর সময়ের চাপাটী চালাচালির

অনুরূপ বলিয়াই উক্ত হইয়াছিল। অন্যান্য অনেক অদ্ভুত কারণের মধ্যে এই তিলকের একটা প্রকাণ্ড কারণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল এই যে, কাপড় সূতার উপর কর না বসাতেই লোকে অসন্তোষে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে; অচিরাৎ একটা মিউটিনী করিয়া এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ানদিগকে এণ্ডাবাচ্ছাসহ সটান অক্ষয় স্বর্গধামে পাঠাইবে। বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী আসন্ন। সেই বিপ্লবের পূর্ব্বলক্ষণ আম্রবৃক্ষে তিলকাকারে অঙ্কিত!!

মোটের উপর অবস্থা হইয়াছিল এই। অতএব উপরোক্ত আন্দোলন অস্বাভাবিক ও মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে উত্থিত হইলেও নিষ্ফল হইবে কেন? মাঞ্চিষ্টারের স্বার্থ ও ষ্টেট-সেক্রেটারীর সদিচ্ছা সত্ত্বেও বিলাতি আমদানি কাপড় সূতার করের অঙ্কুর তখনি হইয়াছিল। সে অঙ্কুর এখন এক বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। বিলাতি আমদানি কাপড় ও সূতার উপর শুল্ক বসিয়াছে এবং সেই সঙ্গে ও সেই অনুপাতে এ দেশীয় কলের সূতার উপরেও কর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হইবারই কথা। স্বাধীন বাণিজ্যের মূল সূত্র এবং ততোধিক, বাণিজ্যপরায়ণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের লাঙ্কেসায়েরী স্বার্থ, উহা অগত্যাই করিতে বাধ্য। বিলাতি আমদানি কাপড় সূতার উপর কর বসিলে এ দেশীয় কলের কাপড় সূতার উপর অবশ্যই কর বসিবে, এ কথা গবর্ণমেণ্ট তখনি স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আন্দোলনকারীদের কতক লোকে হয় ত তাহা বুঝেন নাই; কতক লোকে তাহা বুঝিয়া সজ্ঞানে ও সুস্পষ্ট ভাষায় সে করও বহনে সম্মত হইয়াছিলেন। নহিলে পরের যাত্রা-ভঙ্গার্থে আপন নাসিকার সম্পূর্ণ ছেদনকার্য্য সম্পাদন হইবে কেন? অতএব যাঁহারা বিলাতি আমদানি বস্ত্রের মাশুলের আকাঙ্ক্ষায় এ দেশীয় কলের কাপড়ের উপর কর দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, অন্ততঃ

তাঁহাদের পক্ষে এখন উক্ত কর বসিয়াছে বলিয়া ক্রন্দন করা কেবল অন্যায় ও অসঙ্গত নহে, উন্মাদ রোগের লক্ষণ। বিলাতি আমদানি কাপড়ের উপর কর বসিলে দেশী কাপড়েও কর লাগিবে ইহা সকলেই জানিত; গবর্ণমেণ্ট নিজে এ কথা বলিয়াছিলেন; ষ্টেট সেক্রেটারী সেই সর্ত্তে আমদানি কর মঞ্জুর করিয়াছিলেন; কাউন্সিলগৃহে স্বদেশহিতৈষী পক্ষ সে কর স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। † তবে এখন আবার কথা কেন, গবর্ণমেণ্টকে গালাগালি কেন আর এত গণ্ডগোলই বা কেন? "আপন নাসিকা আপনারাই কাটিয়াছ তাহাতে পরের দোষ কি? আবদার করিয়াছিলে আইন হইয়াছে আবার কি?

সাহেব সওদাগরেরা বিলাতি কাপড়ের জন্য কেন অত আন্দোলন করিয়াছিলেন আমরা অদ্যাপি ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। তাঁহাদের সাধুতার অন্তরালে আসল অভিপ্রায় যাহা তাহা অত্যল্প পরিমাণে অনুমান করিতে পারিলেও আমরা এস্থলে বলিতে চাই না। পরন্তু স্বদেশভক্ত সম্প্রদায় সে করের জন্য কেন অত "উতলা" হইয়াছিলেন তাহাও বুঝা কঠিন। তাঁহাদের অধৈর্য্যের একটা কারণ আমরা উপরেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। তাহা হুজুক্ "হবি" ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বিলাতি কাপড়ে মাশুল হইলে, কাপড়ের দেশী কলওয়ালাদিগের

† সুপ্রিম কাউন্সিলের বেসরকারী সদস্য মাননীয় শ্রীযুক্ত ফাজুলভাই বিশরাম বলিয়াছিলেন;—I, for one, speaking as a mill owner, would be willing to support the levying of an excise duty on cotton goods manufactured in India, assuming of course that such an impost can be practically levied without injustice and serious trouble.

সুবিধা হইবে, দেশের শিল্পোন্নতি হইবে এই অনুমানেই স্বদেশ-হিতৈষীরা আমদানি করের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথা কার্য্যতঃ কোনও কথাই নয়। কেন না আমদানি কর হইলে "এক্সাইস" করও হইবে ইহা উভয় পক্ষে অঙ্গীকারই করা হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে সুপ্রিম কাউন্সিলের সম্মাননীয় সদস্য মিঃ ফাজুলভাই বিসরামের ইংরাজী উক্তি আমরা ফুটনোটে উদ্ধৃত করিয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন "আমি নিজে কাপড়ের কলের সত্বাধিকারী তথাচ বিলাতি কাপড় সূতার উপর আমদানি করের আকাঙ্ক্ষায় এ দেশীয় কাপড় সূতায় শুল্ক সংস্থাপনে সম্মত হইতেছি।"

পরন্তু আমদানি করে হস্তনির্ম্মিত দেশীয় বস্ত্রশিল্পের উন্নতি-কল্পনা কেবল বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এরূপ বিড়ম্বনাময়ী বিচিত্র কল্পনা কেবল মরীচিকাপ্রলুব্ধ পেট্রিয়টী মস্তিষ্কেই উদ্ভুত হওয়া সম্ভবে। ক্ষুদ্র লোকের এমনি বৃহৎ কল্পনা করা সাধ্য নহে। তাঁতি রাজা মান্ধাতার আমলের আর্য্য তাঁতে বিশুদ্ধ বস্ত্র বয়ন করে; সে বস্ত্র মাঞ্চিষ্টারের ম্লেচ্ছভাবাপন্ন নহে; অতি উত্তম কথা। পরন্তু সেই বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া পূতাত্মা আর্য্যসন্তানদিগের সন্ধ্যাহ্নিক আওড়াইবার অতিরিক্ত সুবিধা হইতে পারে। ইহা আরও উত্তম। কিন্তু এই যে আর্য্য তাঁতের বিশুদ্ধ বস্ত্র ইহাতে সূত্র কাহার? সূতা কোথা হইতে আসে সে সংবাদ কি সত্য সত্যই আপনারা কেহ রাখেন না? চিক্কন চটক্দার কালাপেড়ে পরিয়া তাহার উপর অভ্র ইস্তিরির অতি সূক্ষ্ম উড়ানী উড়াইয়া তুমি যে দেশী বস্ত্রের বাহার দেখাও সূতা কিন্তু তাহার বিলাতি। বিলাতি সূতা ব্যতীত, তোমার দেশী বস্ত্রের বাবুগিরি গলিয়া যায়; দেশী তাঁতির তাঁত শিকায় উঠে। বোম্বা-

য়ের কলে জোর ২৪ নম্বরের সূত্র অবধি জন্মে, তাহার অধিক সূক্ষ্ম সূত্র জন্মে না ; কিন্তু তোমার বাবুয়ানার উপকরণ ও গৃহিণীর লজ্জানিবারণের (!) জন্য বস্ত্রটা ৮০ নম্বরেরও অতিরিক্ত সূক্ষ্ম সূত্রে প্রস্তুত হইলে ভাল হয় ; কিন্তু, সে সব সূত্র বিলাত হইতেই আসিয়া থাকে। দেশী তাঁতি বিলাতি সূত্রের দ্বারাই বস্ত্র বোনে। অতএব বিলাতি সূত্রে শুল্ক বসিয়া দেশীয় বস্ত্রের শিল্পোন্নতি কোন্ ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রবলে হইবে তাহা আমরা আদৌ বুঝিতে অক্ষম। ট্যারিফ শুল্কে বিলাতি বস্ত্রের মূল্যাধিক্যের অনুপাতে দেশী বস্ত্রের মূল্যও দারুণ বৃদ্ধি হইবে ; কেন না বিলাতি সূত্রে দেশী বস্ত্র নির্ম্মিত ; সূত্রের মূল্য বৃদ্ধি হইলেই বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি হয়। অতএব এরূপ স্থলে লোকে বিলাতি কাপড় (তাহার মূল্য আমদানি শুল্কে এখনকার অপেক্ষা বাড়িলেও) ছাড়িয়া তদপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক মূল্যের দেশী বস্ত্র কিনিতে চাহিবে কেন ? আর পেট্রিয়টিজিমের অনুরোধে তাহা চাহিলেও তত পয়সা পাইবে কোথায় ? পেট্রিয়টিক স্পিরিটে ত আর উলঙ্গ হইয়া থাকা চলে না। বলিবে "বোম্বাই কলের কাপড় পরিবে। বঙ্গদেশেও কাপড়ের কল হইতেছে।" বঙ্গীয় কলের বস্ত্র আজও বাহির হয় নাই ; হইলেও তাহা এবং বোম্বাই কলের বস্ত্র, বিলাতি বস্ত্রের অপেক্ষা এক কাক্রিও শস্তা হইবে না ; বরং এক আনা বেশীই হইবে। কারণ আকাঙ্ক্ষিত আমদানি করের অনুকম্পায় সে কাপড়ের সূতার উপরেও এক্সাইস শুল্ক বসিয়াছে। এক্সাইস শুল্ক না বসিলেও সম্ভবতঃ তাহা বিলাতি কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইত না। পরন্তু দেশী কলে কাপড় অপেক্ষাকৃত অতি অল্পই জন্মে ; আর সে কাপড় এত অধিক মোটা যে এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাহা সর্ব্বদা ব্যবহারেরও যোগ্য নহে। আমরা প্রত্যক্ষ ঘটনা ও সংসারের

প্রতিদৈনিক সম্ভাবনাকেই সম্মুখে রাখিয়া এই কথাগুলি বলিতেছি। উদ্ভট "অঘটন পটিয়স" পেট্রিয়টিজেমের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র বটে। সে কথায় বড় বড় বক্তৃতা ও লম্বা চওড়া প্রবন্ধ প্রস্তুতই হইতে পারে; সংসারের আর কোন কার্য্যই তদ্দ্বারা হয় না; বিশেষতঃ উদরের অন্ন ও অঙ্গের আবরণের সহিত তাহার আকাশ পাতাল অপেক্ষাও সুদূর সম্বন্ধ। তবেই এখন দেখা যাইতেছে যে আমাদানিকারীদের অনর্থক আবদারে বস্ত্রাদির উপর আমদানি কর বসিয়া আমাদের ইতঃভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হইয়াছে। বিলাতি বস্ত্র মহার্ঘ হইল, বোম্বাই কলের কাপড়ের মূল্য বাড়িল; পরন্তু দেশী কাপড়ও অগ্নিমূল্য হইল। অতএব এই আমদানি শুল্কে দেশটা রাতারাতি উন্নতির উর্দ্ধমার্গে দশ যোজন ঠেলিয়া উঠিয়াছে, পাপমুখে একথা কিরূপে বলিব?

বলিবে আর যত কিছু না হউক মাঞ্চিষ্টার বস্ত্রবণিকের ত অনিষ্ট হইল। তা বটে! কিন্তু প্রথম জিজ্ঞাস্য মাঞ্চিষ্টারের অনিষ্ট চেষ্টা করা পুরাতন নীতিশাস্ত্রানুসারে অন্যায়; কিন্তু ইষ্ট না থাকা সত্ত্বেও পরের অনিষ্ট করাকে কি বলিবে? দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য মাঞ্চিষ্টারের সবিশেষ অনিষ্টই বা হইবে কেন? তাহার দশযোড়া কাপড় যেখানে বিক্রয় হইত, সেখানে না হয় এখন ছয়যোড়া বিক্রয় হইবে; ইহার অধিক ত আর কিছু নয়! কিন্তু তাহার অবশিষ্ট ও অবিক্রুত সেই চারি যোড়া কাপড় যাহারা কিনিয়া এত দিন পরিতে পারিত, তাহারা অতঃপর যে একেবারেই কাপড় পরিতে পারিবে না; এই মাঘের শীতে "জানু ভানু কৃষানু" ব্যতীত অনন্যোপায় হইবে, সে অনিষ্ট কাহার? মাঞ্চিষ্টারের অথবা তুমি, যে দেশের ভক্ত বলিয়া ভড়ং দেখাইয়া থাক, সেই দেশেরই? তৃতীয় প্রশ্ন, প্রকৃত প্রস্তাবে মাঞ্চিষ্টারের অপরাধই বা কি যে, তাহার

পশ্চাতে লাগিয়াছিলে ? স্বদেশের প্রাচীন সভ্যতা আমাদের স্বতঃ শিরোধার্য্য, কিন্তু, তাহার অযথার্থত মহিমা কীর্ত্তন করাকে আমরা তাহার প্রকৃত মর্য্যদাটীকে মাটী করাই মনে করি। তুমি বড়ায়ের বোকামি করিয়া আর্য্যামির যতই অতিরিক্ত আস্পর্দ্ধা কর না কেন, ইহা সকলেই জানে যে, সে কালের চরকার আমলে দেশের অদরিদ্রদের মধ্যেও অতি অল্প লোকে দুইখানা বস্ত্র একত্রে ব্যবহার করিতে পাইত। দরিদ্র শ্রেণীর বস্ত্র পরিধান বিলাসের কথা এখানে না বলাই ভাল। ব্রাহ্মণ-ঠাকুরাণীরাও তখন চরকা কাটিতেন। অন্যূন চারিমাস চরকা না ঘুরাইলে একখানা কাপড়ের উপযুক্ত সুতার সংস্থান হইত না। ইহাতেই বুঝিতে হইবে বস্ত্রের সুবিধাটী তখন কেমন ছিল। তোমার সাত গাঁটের বস্ত্র সওদাগরি ও ঢাকাই মসলিন মশলন্দের কথা শুনিবা মাত্রই আমরা মোহিত হইয়া “মরি মরি” বলিলেও বলিতে পারি। কিন্তু সে ‘মরি মরিতে’ আসল ঘটনা মারা যাইবে না। তখন সমগ্র দেশমধ্যেই বস্ত্রের অভাব বিলক্ষণই ছিল। মাঞ্চিষ্টারের অপরাধ এই যে, সে এদেশে বহু পরিমাণে বস্ত্র আমদানি করিয়াছিল এবং করিতেছে। সুলভ বস্ত্র আনিয়া দেশের ইতর ভদ্র সর্ব্বসাধারণকে বস্ত্র পরাইয়াছে। সে, সূক্ষ্ম সূত্র পাঠাইয়া তোমার বাবুগিরি বজায় রাখিয়াছে; বরং বিলক্ষণ বৃদ্ধিই করিয়াছে। পরন্তু, তাহারই জন্য দেশীয় তাঁতির তাঁত আজও চলিয়াছে। মাঞ্চিষ্টারের অপরাধ এই। এই অপরাধে এত রাগ? তুমি আরও রাগিয়া বলিবে “অপরাধ অবশ্যই অপরিসীম অপরাধ। তাহারই জন্য ত এদেশীয় তাঁতিকুল উৎসন্নে গিয়াছে।” এইরূপ উক্তির ধূয়াটা কিছুকাল হইতে খুব অতিরিক্ত মাত্রায় উঠিয়াছে বটে; কিন্তু, প্রিয় মহাশয় আপনার এ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কেন

স্বীকার করা যায় না তাহা বুঝাইবার স্থান এখানে নাই; কিছু সবুর করিলে বুঝাইতে পারি। কিন্তু, তাহা স্বীকার করিলেই বা কি? স্বীকারই না হয় করিলাম মাঞ্চিষ্টারের সুলভ বস্ত্রের দৌরাত্ম্যে দেশের তাঁতিদের তাঁতবোনার ব্যাঘাত হইয়াছে, তাহাদের অন্ন মারা গিয়াছে; তাহারা উৎসন্ন হইতেছে। কিন্তু মাঞ্চিষ্টারের এই অনিষ্টে, অনিষ্টই যদি ইহা হয়,—আমাদের তাঁতিরা কি উৎসন্নের পথ হইতে ফিরিতে পারিবে? আমরা উপরেই দেখাইয়াছি, মহাশয়রা অনর্থক আন্দোলনে যাহা করিলেন, তাহাতে আমাদের তাঁতিদের তাঁতিকুল ও বৈষ্ণবকুল দুই কুলই বরং গেল। তার পর কেবল এক তাঁতিকুলের সুবিধা সচ্ছলতার জন্য, সমগ্র দেশের লোক দুঃখ সহ্য করিবে, সুলভ বস্ত্র ব্যবহারে বঞ্চিত হইবে, সভ্যতার কথা ছাড়িয়া দিয়া, ইহাই কি স্বভাবের নিয়ম? অথবা সুযুক্তির কথা? এখন সর্ব্বশেষে আর একটী প্রশ্ন আছে। এই যে আমদানি মাশুল বসিল, এ মাশুল ফলিতার্থে দিবে কে? দিবে বিক্রেতা কিম্বা ক্রেতা? ক্রেতারই ত এ মাশুল দিতে হইবে। মাঞ্চিষ্টার ত এ মাশুল দিবে না মহাশয়; দিতে হইবে যে আমাদেরই। এ কথাটী কি আপনারা একটী বারও ভাবিয়াছিলেন? হায়! ভাবিবার অবসর পান নাই; ভাবা অনাবশ্যক মনে করিয়াছিলেন।

অতীব অভাগ্যের বিষয় যে, আবদারকারীরা চিন্তাশীলতার অতি গুরুত্বে বস্ত্রক্রেতা বলিয়া যে একটা জীবও জগতে আছে তাহা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন; অথবা তাহাদের অস্তিত্ব আদৌ বিবেচনাধীনে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা হয়,ত মনে করিয়াছিলেন এ মাশুল মাঞ্চিষ্টারই দিবে। ভারতবাসীর দিতে হইবে না। কিন্তু ষ্টেট-সেক্রেটারী আপন কর্ত্তব্য ভুলেন

নাই। তিনি যথাসময়েই স্মরণ করিয়া দিয়াছিলেন যে আমদানি কর মাঞ্চিষ্টারের স্কন্ধে পড়িবে না; প্রকৃত প্রস্তাবে পড়িবে তাহা ভারতেরই স্কন্ধে। পরন্তু তাহাতে করিয়া দরিদ্র রায়তের বস্ত্র ব্যবহারে সবিশেষ বিভ্রাটই ঘটিবে। * কিন্তু সে কথা শুনে কে? সেক্রেটারীর সমীচীন উক্তি তৎপ্রতি পলিসি আরোপেরই কারণ হইয়াছিল। কিন্তু উচিত কথা বলিতে হইলে সেক্রেটারী-অব্-ষ্টেট এ সম্বন্ধে অবশ্যই ধন্যবাদের পাত্র। তবে তিনি সকল দিক রাখিতে গিয়া কোনও দিকই রক্ষা করিতে পারেন নাই; এ কথাও সত্য। তিনি এ দেশীয় আন্দোলকদিগের সন্তোষার্থে বিলাতি বস্ত্রের আমদানি কর এবং মাঞ্চিষ্টারের মন রাখিবার জন্য এ দেশে এক্সাইজ কর বসাইয়াছেন;—ফল হইয়াছে উভয় পক্ষেরই অসন্তোষ। পরন্তু বস্ত্রক্রেতা দরিদ্র প্রজা-সাধারণেরও তিনি সন্তোষভাজন হইতে পারেন নাই। কারণ কাপড়ের কর তাহাদিগেরই দিতে হইবে।

এস্থলে কথা উঠিতে পারে যে গবর্ণমেণ্টের অর্থের অনটন। বজেটে আয় অপেক্ষা ব্যয়ের অঙ্ক বিষম বেশী। ব্যয়ের অঙ্কের সহিত আয়ের অঙ্ক যে রূপেই হউক সমান করিতে হইত। তজ্জন্য

---

* I should like to ask who is going to pay the taxes on the goods imported? The people of India, the consumers of India. * * Whether import duties are right or wrong, whatever duty you levy on cotton goods must inevitably be paid by the people who wear these cotton goods in India. The tax, would therefore be a tax upon the people of India and not upon the Lancashire manufacture. সেক্রেটরী অব ষ্টেট মিঃ ফাউলারের বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত।

গরিব রায়তের শরীরের শিরা কাটিয়া শোণিত বাহির করিতে হইলেও গবর্ণমেণ্ট ছাড়িতেন না। অতএব ট্যারিফটেক্স হইয়া বরং ঠেকাইয়াছে। নহিলে নিশ্চয়ই আর একটা নেহাত সাংঘাতিক শুল্ক সংস্থাপিত হইয়া দেশমধ্যে মহা অনর্থ ঘটাইত।

আমরা এরূপ যুক্তি আপাদমস্তক অনুমোদন করিতে পারি না। বজেটের দুই দিকে একই অঙ্ক সন্নিবেশের জন্য গবর্ণমেণ্ট গর্হিত উপায়ে আয়ের অঙ্ক না বাড়াইয়া উচিত উপায়ে ব্যয়ের অঙ্ক কমাইয়া আয়ের অঙ্কের অনুপাতে আনিতে পারিতেন। তজ্জন্য আন্দোলন হইতেছিল। সেই আন্দোলন অধিকতর ব্যাপ্ত ও বলশালী করা উচিত ছিল। নাশানাল কঙ্গ্রেস গবর্ণমেণ্টের অন্যায্য ও অতিরিক্ত ব্যয় কমাইবার জন্য বহুকাল আন্দোলন করিতেছেন। সে আন্দোলন একেবারেই যে নিস্ফল হইয়াছে ও হইবে এমনও নয়! এ সম্বন্ধে অন্ততঃ একটা কমিসনেরও আদেশ হইয়াছে। সে কমিসনের কার্য্য আরম্ভ ও শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টকে এই উৎকট কর বসাইবার অবসর দেওয়া ও অনুরোধ করা প্রজানীতির উচিত হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের উপর আমদানি টেক্স বসাইয়াছিলেন। তাহারই প্রাণপণ প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক ছিল; গবর্ণমেণ্ট যে দ্রব্যের উপর টেক্স বসাইতে উৎসুক ছিলেন না, অস্বাভাবিক আন্দোলন দ্বারা তাহাতে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করা প্রকৃত প্রজানীতির অনুরূপ কার্য্য হয় নাই। পরন্তু, এই কাপড়ের কর আর কোনও কুৎসিত কর অপেক্ষা কিছুতেই কম কষ্টকর ও ঘৃণিত নহে। গবর্ণমেণ্ট নেহাত যথেচ্ছাচারী হইয়া আর কোনও একটা কুৎসিত কর সংস্থাপন করিলে এবং প্রজাপক্ষ হইতে অধ্যবসায়ের সহিত তাহাতে আপত্তি হইলে, সে কর নিশ্চয়ই চিরকাল টিঁকিত

না। ফলতঃ আবদার করিয়া একটা এত বড় করভার গ্রহণ করা নেহাত নির্ব্বোধের কাজ—নিজের নাসিকা ছেদনের মতই হইয়াছে। কর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষই হউক কর ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরোক্ষ হওয়াতে করের প্রচণ্ডতা কিছুই কমে না; তাহাতে করিয়া কেবল তাহার কপটতা ও প্রবঞ্চনাই সূচিত হয়।

এ দেশে ইংরাজের আমলে বস্ত্রকর বহুকালই ছিল না। খৃঃ ১৮২৯ সালে এই কর প্রবর্ত্তিত হয়। আমদানি কাপড় ও সুতার উপর শত করা পাঁচ টাকা হারে শুল্ক বসে। এবং সেই হিসাবে ঐ শুল্ক পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত চলে। ১৮৬৪ সালের ২৩ আইনে উহা পাঁচ টাকা হইতে শত করা সাড়ে সাত টাকায় উঠে।১০।১১ বৎসর পরে ১৮৭৫ সালের ১৬ আইনে উহা পুনঃ পাঁচ টাকায় পরিণত হয়। ১৮৮২ সালে এই শুল্ক একেবারেই উঠিয়া যায়। ১৮৮২ সালের ১১ আইনে ট্যারিফ টেক্স সম্পূর্ণ রূপে রহিত হইয়াছিল এবং অনেকানেক রপ্তানি দ্রব্যের মাশুলও উঠিয়া গিয়াছিল।

আজ আবার বার বৎসর পরে পুনঃ বস্ত্রকর আসিয়া উপস্থিত। বস্ত্র যখন নিষ্কর ছিল তখনি সব লোকে বস্ত্রের ব্যয় কুলাইয়া উঠিতে পারিত না। দেশ এতই দরিদ্র যে মাঞ্চিষ্টারের মহা সুলভ বস্ত্রও সকলে কিনিতে পারে নাই। এই প্রবন্ধের লেখক দেশমধ্যে এমন অনেক পল্লী ও পরগণা দেখিয়াছে যেখানে বার আনা রকম লোক নির্বস্ত্র। কৃষাণ ও মজুর শ্রেণীর পরিধেয় কেবল অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত একটী লঙ্গটী মাত্র। "শতগ্রন্থি বস্ত্র" প্রবাদবাক্য; কিন্তু সহস্রাধিক গ্রন্থিযুক্ত জীর্ণ বস্ত্রে ললনা-অঙ্গের লজ্জা আবৃত বা অনাবৃত হইতেও অনেক স্থলে দেখিয়াছি। বস্ত্রের নিষ্কর সময়েও অনেকস্থলে অবস্থা এই; অতএব বস্ত্রের উপর কর বসিয়া তাহার মূল্য কিঞ্চিৎমাত্র বাড়িলেও ঐ অবস্থা কিরূপ হইবে

তাহা কেবল অনুভবনীয়। অন্ন এবং বস্ত্র এই দুইটী দ্রব্য মনুষ্য জীবনে এবং মনুষ্যসমাজে একান্ত অপরিহার্য্য আবশ্যকীয়; এই দুই সামগ্রী যত সুলভ ও সুপ্রাপ্য হওয়া সম্ভাবিত হইতে পারে, তাহা করা রাজ-নীতি ও প্রজানীতি উভয়েরই কর্ত্তব্য। মনুষ্য-অস্তিত্বের সর্ব্বপ্রধান উপাদান অন্ন বস্ত্রের উপর কোনও কর বসাই উচিত নয়; বিশেষতঃ উহা অতিরিক্ত করের বিষয়ীভূত হওয়া ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ অন্যায়; রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উহা প্রাজ্ঞতারও অনুমোদিত নহে।

এবারকার আইনটী যেরূপ হইল অল্পের মধ্যেই বলা যাই-তেছে। বিদেশী ও বিলাতি আমদানি কাপড় ও সুতার শতকরা পাঁচ টাকা কর নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহা সাবেক সি কাসটাম টেরিফ আইনেরই অন্তর্গত। কিন্তু ইহা ব্যতীত স্বতন্ত্র একটী আইন হইয়াছে, তাহার নাম ১৮৯৪ সালের "কটন ডিউটিস্ এক্ট"। এই আইন আমদানি বস্ত্র শুল্ক আইনেরই অনিবার্য্য ফল, অগ্রেই বলিয়াছি। কেননা বিদেশী বা বিলাতি বস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবসা করিয়া, গবর্ণমেণ্ট, স্বাধীন বাণিজ্যের সূত্রানুসারে, এ দেশীয় কল-শিল্প-জাত বস্ত্রপণ্যের বিক্রয় সংরক্ষণ করিতে সমর্থ নহেন। সুত-রাং এ দেশীয় কলের কাপড়ের উপর কর বসাইতে বাধ্য। সেই কর বসাইবার জন্যই এই "কটন ডিউটিস্ এক্ট।" বিলাতি বস্ত্রে শুল্ক না বসিলে এ এক্ট বা আইন নিশ্চয়ই হইত না। এই আইন অনুসারে দেশী কলের সুতার উপর কর বসিল। সূতার শুল্কের অর্থই বস্ত্রের কর; কারণ যে সূতার বস্ত্রে বয়ন হইবে সে সূতারও শুল্ক লাগিবে; সুতরাং বোনা বস্ত্রের উপর কর না বসিয়া অবোনা সূতার উপরেই শুল্ক হইয়াছে। অর্থ একই। করের হার আম-দানি করেরই সমান অর্থাৎ শতকরা পাঁচ টাকা করিয়াই হইয়াছে।

তবে ইহার মধ্যে একটু কথা এই যে, দেশী কলে হয় মোটা স্থতা, বিলাতি কলে জন্মে সরু স্থতা। বোম্বে অঞ্চলের কল, বিলাতি কলের সরু স্থতার সহিত বড় বেশী প্রতিযোগিতা করে না। যে পরিমাণে প্রতিযোগিতা সেই পরিমাণেই কর বা আইন প্রয়োজন। অতএব দেশী কলে যে পরিমাণে অপেক্ষাকৃত ও অত্যল্প সরু স্থতা উৎপন্ন হয়; তাহারই উপর কর বসিয়াছে। অর্থাৎ দেশী কলে ২০ নম্বরের স্থতার ও তন্নিম্ন শ্রেণীর স্থতার কর লাগিবে না; ২১ নম্বর হইতে তদূর্দ্ধ নম্বরের সরু স্থতারই শুল্ক লাগিবে। গবর্ণমেণ্ট যদি কখনও ইচ্ছা করেন অর্থাৎ ইহার পর অতিরিক্ত তথ্য সংগৃহীত হইয়া প্রতিপন্ন হয় যে এ দেশীয় কলে ২০ নম্বরের স্থতা অপেক্ষা সূক্ষ্ম স্থতা প্রস্তুত হয় না; তাহা হইলে আইন একটু সংশোধিত করিবেন; ২০ নং ২৪ নম্বরে পরিণত হইবে। অর্থাৎ ২৪ নম্বর পর্য্যন্ত স্থতার শুল্ক লাগিবে না, তদূর্দ্ধ হইলেই তাহা লাগিবে। পরন্তু, এ দেশীয় কল হইতে যে সকল স্থতা অন্য দেশে রপ্তানি হইবে, তাহার শুল্ক লাগিবে না; দেশমধ্যে যে সকল স্থতা বিক্রয় হইবে এবং দেশমধ্যে বিক্রেয় বস্ত্র যে সকল স্থতায় প্রস্তুত হইবে তাহারই কেবল শুল্ক লাগিবে। দেশের লোকের সুখ সুবিধার প্রতি ইহা যৎপরোনাস্তি শুভ দৃষ্টি বটে!! কটন ডিউটিস্ *এক্ট সমগ্র বৃটিশ ভারতে সমান বর্ত্তিবে এবং আইন হওয়ার পর* হইতেই, আজ কয়েক দিন হইল উহা আমলে আসিয়াছে। দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যও বাদ পড়ে নাই। তাহা বিদেশ ও বিলাতের মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে। তথাকার কল হইতে যে সকল কাপড় স্থতা বৃটিশ ভারতে আসিবে তাহারও শুল্ক চাই। অতএব দেশীয় রাজার রাজ্যে গিয়াও যে কাপড় স্থতার কল পাতিয়া আইনের হস্ত এড়াইবে, সে উপায়ও নাই। মাননীয় মিঃ ওয়েষ্টল্যাণ্ডের

এ সম্বন্ধে আমাদের উপকারে উক্তি অতি চমৎকার উপাদেয়। তাহাতে হাস্য করুণ এই উভয়বিধ বিরোধী রসেরই একত্রে উদ্রেক হয়।

কয়েক দিন ধরিয়া সুপ্রিম কাউন্সিলে এই আইনের অল্পাধিক আলোচনা হইয়াছিল। এবং তাহাতে অল্পাধিক পরিমাণে অর্থ-নৈতিক কথাও নিহিত ছিল। কিন্তু তাহা সমালোচনা করার স্থান নাই। তবে এক কথায় ইহা বলা যাইতে পারে যে, এ দেশের পক্ষ হইতে বেসরকারী সদস্যেরা যে সকল তর্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা রাজনৈতিক ও আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক হিসাবে এত দুর্ব্বল যে তাহা দাঁড়াইতে পারে নাই বলিয়া আমরা আশ্চর্য্য নহি।

কটন ডিউটী আইনে অন্যান্য অনিষ্ট ব্যতীত স্বদেশীয় শিল্প ও শ্রমের বিপুল অনিষ্ট সাধন করিবে। এ আইন যতই সাবধানে অনুষ্ঠিত হউক এখন হইতে এ দেশীয় কাপড় সূতার কলগুলিকে সরকারী পাহারার প্রচণ্ড দৃষ্টির উপর সর্ব্বদাই থাকিতে হইবে। বিন্দুমাত্রও পদস্খলন হইলে নিস্তার থাকিবে না। কলের কার্য্য ও সমস্ত কাগজপত্র যদৃচ্ছা সরকারী পরীক্ষা ও পরিদর্শনের অধীন হইবে। হিসাবের একটুকুও এদিক-ওদিক হইলে দ্রব্যের দেয় মাশুলের তিনগুণ মাশুল আদায় হইবে। সরকারি তফিখাতে কোনও রকমের তঞ্চক প্রবঞ্চনাদি প্রমাণ হইলে হাজারও টাকা জরিমানা হইবে; পেনালকোড আমলে আসিবে; কলওয়ালা-দিগের কারাবাসও হইতে পারিবে। কলের কাপড় সূতার স্বদেশীয় শিল্প তাহার এই শৈশবাবস্থায় আইনের এত অগ্নিপরীক্ষা পার হইয়া উঠিতে পারিবে কি না সন্দেহ। সুতরাং কলের সত্বাধিকারীরা স্বভাবতই মহা উৎকণ্ঠিত ও আতঙ্কিত হইয়াছেন। আইনে আপত্ত করিতেছেন। কিন্তু এখন আপত্তি করা অনর্থক।

"ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন"। আক্ষেপ এই যে, স্বদেশ-হিতৈষীরা তাঁহাদিগকে ভাবিবার অবসর দেন নাই। আবদার করিয়াই এই উৎকট আইন করাইয়াছেন। আইনের উদ্দেশ্যে স্পষ্টই লিখিত আছে ;—

The finer classes of cotton manufactured in India enter into direct competition with the cotton manufactures imported from England. As it is intended to weight these last with an inport duty, it is considered necessary to levy at the sametime a countervailing duty upon the competitive classes of Indian manufactures.

অতএব আপত্তি করা এখন বৃথা। এই আইন হওয়ার অঙ্গীকারেই আমদানি কর বসিয়াছে। আমদানি কর না উঠিয়া গেলে, এ আইন রদেরও সম্ভাবনা নাই! আমরা এ উভয়কেই সমান আপদজনক বিবেচনা করি। বেঙ্গল কাউন্সিলে ড্রেণেজ কর প্রস্তুত হইয়াছে; অবিলম্বেই আবির্ভূত হইয়া জমিদার ও রায়তের কর-ভারপীড়িত স্কন্ধ পুনঃ প্রপীড়িত করিবে। তাহার পূর্ব্বেই কাপড়ের কর উপস্থিত। দেশে অন্নবস্ত্রের একেই ত এই সচ্ছলতা তাহার উপর আইন কানুনের এমন সব মেওয়া ফল, পরম রমণীয়ই বটে! তবে আমাদের শত্রুশিবির হইতে বরং কিঞ্চিৎ মঙ্গল আগমনের আশা করা যাইতে পারে। আমদানি মাশুলে মাঞ্চিষ্টারের মহাজন ও শক্তিশালী শ্রমজীবীগণ আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন। এ আপত্তি উগ্রভাব ধারণ করিলে, তাহা উল্লংঘন করা বড় সহজ-সাধ্য হইবে না; একটা সুযোগ খুঁজিয়া আমদানি কর উঠাইতেই হইবে। যদি আদৌ কোনও আশা থাকে, ইহাই এখন আশা।

পৌষ সংক্রান্তি।

দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বগগনে যেন প্রভাত হোমানল জ্বলিয়া উঠিল এবং বৃহৎ প্রান্তরের শিশিরসিক্তিত শ্যামল তৃণদল, আইরি বন, গোধূমের দীর্ঘ শীর্ষ আলোকে ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল।

সেই প্রান্তরের মধ্য দিয়া আইল ঘুরিয়া আঁকা বাঁকা সংকীর্ণ পথে চলিতে লাগিলাম। তখনও পথে লোক চলিতে আরম্ভ হয় নাই, কেবল খেজুর গাছ হইতে দুই একজন গাছি খর্জ্জুর রস সঞ্চয় করিয়া বাঁকের দুইদিকে আট দশটা ছোট কলসী ঝুলাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে এবং অদূরবর্ত্তী গমের জমীতে একটা বৃষ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পরম সুখে গোধূম শীর্ষ চর্ব্বণ করিতেছে, পৌষের প্রচণ্ড-শীত তাহার বিশাল দেহকে কাতর করিতে পারে নাই, ক্ষেত্র স্বামীর উদ্যত দণ্ডকেও সে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

আরও অর্দ্ধ ক্রোশ অতিক্রম করিলাম, ক্রমে দুই একটি মনুষ্য দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইতে লাগিল, দুইটি রাখাল গায়ে কাঁথা জড়াইয়া গোরু ঠেঙ্গাইতে ঠেঙ্গাইতে গোচারণের মাঠে প্রবেশ করিল—সঙ্গে দুইটি নবজাত বৎস ছিল, মুক্ত প্রান্তরে এই প্রভাতের সূর্য্যালোকে তাহারা আনন্দে ছুটিতে লাগিল এবং তাহারা বহুদূরবর্ত্তী হইলে তাহাদের স্নেহবৎসল মাতা চলিতে চলিতে এক একবার উন্নত মস্তকে স্থির দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিতে লাগিল।

আইলের একদিকে শর্ষপ অন্য দিকে ছোলার ক্ষেত ; প্রাতঃ-সূর্য্যের স্বর্ণময় আভায় শর্ষপের পীতবর্ণ ফুলগুলিতে চক্ষু ধাঁধিয়া যায়। একটি স্ত্রীলোক শরিষা ক্ষেতের মধ্যে হইতে বাছিয়া বাছিয়া "তারামণি" ফুল তুলিয়া ঝুড়িতে ফেলিতেছে। ফুলগুলি শর্ষপ ফুল অপেক্ষা কিছু বড়, বর্ণ ঈষৎ পাতলা এবং কৃষ্ণরেখাঙ্কিত,

ইহা সুস্বাদু ব্যঞ্জনরূপে পল্লীবাসীগণ ব্যবহার করিয়া থাকে। পাশে ছোলার জমীতে ছোলার ছোট ছোট ঘনশ্যাম ঝোপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল এবং সাদা ফুলগুলি ফুটিয়া রহিয়াছে, সেখানেও একটি স্ত্রীলোক বসিয়া ছোলার কচি কচি ডগা ভাঙ্গিতেছে। এই ফুল ও শাক তুলিয়া পাড়ায় বিক্রয় করিবে। পয়সার পরিবর্ত্তে তাহারা চাউল গ্রহণ করিতেই ভালবাসে, কারণ জানে পল্লীগ্রামের গৃহলক্ষ্মীগণ চাউল অপেক্ষা পয়সাকে অধিক আদর করেন সুতরাং আধপাখি চাউলের মূল্য এক পয়সা অপেক্ষা কম না হইলেও তাহা লইয়া তাহারা যে ফুল বা শাক দেয় তাহার মূল্য অর্দ্ধ পয়সা অপেক্ষাও কম; সরলহৃদয় গৃহলক্ষ্মীগণ সন্তুষ্ট মনে তাহাই গ্রহণ করেন। এই সকল শাকবিক্রয়িত্রীর দিন ইহা-তেই বেশ সুখে চলিয়া যায়, ইহার উপর কাহারো ছেলেটি হয়ত রাখাল, সে সারামাস গৃহস্থের গরু চরাইয়া তাহার মনিবের নিকট যাহা পায় তাহাই তাহার মাসিক ব্যয়ের পক্ষে যথেষ্ট, কেহ কেহ গৃহপ্রাঙ্গণে তরি তরকারী লাগায়, তাহা বিক্রয় করে, ঘরের খোরাকও চলে, এতদ্ভিন্ন ছোট ছোট মেয়েরা ডোবা ও বিল হইতে কাপড় কিম্বা ছোট ছোট জাল ছাঁকা দিয়া চিংড়ি চ্যাং সোলমাছের পোনা প্রভৃতি মাছ ধরিয়া আনে, এই সকল কারণে অতি দুর্ব্বৎসরেও পল্লীগ্রামে নিম্নশ্রেণীর লোক অনাহারে মরে না।

ঘুরিতে ঘুরিতে একটা পতিত জমীর উপর আসিয়া পড়িলাম, অনেক দিনের পতিত জমী লাঙ্গলের সাধ্য নাই, তাহাতে দন্তস্ফুট করে। আট দশ জন মজুর "দেঁড়ো" কোদালী লইয়া সেই জমী কোপাইতেছে; আট দশখানি কোদালী এক সঙ্গে উঠিতেছে, শাণিতধার সূর্য্যকিরণে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, আবার এক সঙ্গে

সেই অনুর্ব্বর কঠিন মৃত্তিকার উপর পড়িয়া বড় বড় চাপ উঠাইয়া ফেলিতেছে।

বেলা আটটার সময় "কাজলার খালের" কাছে আসিলাম। কাজলার খাল হইতে বাসুদেবপুর এক ক্রোশেরও কিছু কম, এখানে আসিয়া আবার গতিরোধ হইল, খালের যে অংশ দিয়া লোকে গতিবিধি করে সেখানে এক হাঁটু জল, আমার পায়ে জুতা এবং মোজা, আমরা নগরবাসী, নগ্নপদে এই জল ও কর্দ্দম অতিক্রম করার বিড়ম্বনা বন্ধুগৃহে নিমন্ত্রণের প্রলোভন অপেক্ষা অনেক অধিক—বিশেষ যদি শীত কাল না হইত! কিং-কর্ত্তব্য ভাবিতেছি, এমন সময় একজন পথিক জানাইল যদি আমি আইল ধরিয়া আরও আধ ক্রোশ দক্ষিণে যাই তাহা হইলে পুলের উপর উঠিয়া দিব্য "থরা শুকনো" ভাবে যাইতে পারিব, জুতা এবং মোজার জন্য দুর্ভাবনা থাকিবে না।

তাহাই কর্ত্তব্য মনে করিলাম। আবার আইল ধরিয়া সেই পুলের উদ্দেশে চলিলাম, আমার বামভাগে খাল; কিন্তু ক্রমেই খালের জল গভীর বোধ হইতে লাগিল, একস্থানে দেখিলাম পদ্মবন, পদ্মপত্রে সেই গভীর স্থির নির্ম্মল জল ঢাকিয়া আছে, প্রচুর ফুল ফুটিয়া ঢল ঢল কান্তি বিকাশ করিতেছে, দুই তীরে শস্যশ্যামল সমতল ক্ষেত্র, দশমিনিটের মধ্যে পুলের উপর উঠিলাম।

পুলটি বড় নহে; তিন চারিটি তালগাছ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দুই তীরের উপর ফেলিয়া তাহাতে মাটী চাপা দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর দিয়া লোকে জিনিষপত্র মাথায় করিয়া বাসুদেবপুরে হাট করিতে যায়। বাসুদেবপুরের নীল কুটীর ম্যানেজার ডন্ সাহেব এবং তাঁহার দেওয়ান জনার্দ্দন বিশ্বাস ঘোড়ায় চড়িয়া এই পুলের উপর দিয়া নীলের জমী তদারক

করিতে যান। বাসুদেব পুরের কুটীর সাহেবরাই এই পুল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

পুলের উপর আসিয়া দাঁড়াইলাম। ইহার দুই দিকের বিস্তার অনেক খানি, খানিকটা যায়গা বেশ পরিষ্কার, নিচে বালি ঝক্ ঝক্ করিতেছে, দুই একটা চাঁদা বা কাঁকাল মাছ সেই অগভীর নির্ম্মল জলের মধ্যে কখন ভাসিতেছে, কখন লঘুডানা অতিবেগে সঞ্চালিত করিয়া শৈবাল দলে লুকাইতেছে, আবার বাহির হইয়া আসিতেছে। বোধ হইল এই স্থানে পল্লীবাসীগণ স্নান করে। উত্তর তীরে সবুজ গালিচার মত শুশুনির শাক।

একটু দূরে দেখিলাম হেলাঞ্চা ও কল্মি বন নিবিড় হইয়া আসিয়াছে, কল্মির ঈষৎ শ্বেত ও বায়লেট রঙ্গের শত শত ফুল ফুটিয়া আছে, এবং তাহার উপর এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী পুচ্ছ নাচাইয়া চরিয়া বেড়াইতেছে--ছেলেবেলার একটা কথা মনে পড়িল ছোট ছোট মেয়েরা সেকালে পুকুর পূজা করিবার সময় বলিত :—

"হেলঞ্চ কল্মি লক্ লক্ করে
তার উপরে পক্ষী চরে
রাজার বেটা পক্ষী মারে।"

হেলঞ্চ কল্মি লক্ লক্ করিতেছে, তাহার উপরে পক্ষীও চরিতেছে বটে কিন্তু দেখিলাম রাজার বেটার পরিবর্ত্তে দুটো বাগ্দির বেটা অদূরে বসিয়া ছিপদিয়া মাছ মারিতেছে, তাহাদিগকে দেখিয়া কস্মিন কালেও রাজার বেটা বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নহে।

আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। সম্মুখে খর্জ্জুর বৃক্ষপূর্ণ একটি মাঠ, তাহার অপর প্রান্তে বৃহৎ তেঁতুল গাছ, সেই গাছ অতিক্রম করিলেই বাসুদেবপুর। খর্জ্জুর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া

দেখিলাম ছেলের দল রসের জন্য খেজুর গাছে ছোট ছোট ভাঁড় ও বাসের চোঙা বাঁধিয়া যাইতেছে, ফিঙ্গে শালিক এবং বুলবুল্ প্রভৃতি পক্ষী দলে দলে খেজুর গাছে বসিতেছে, চারিদিকে উড়িতেছে, রস পান করিতেছে।

তেঁতুল গাছের নিকট গুড়ের বাইন। খেজুরের পাতা একত্র বাঁধিয়া খানিকটা যায়গা ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে, তাহারই মধ্যে রস জ্বাল দেওয়ার বৃহৎ উনন, রাজ্যের ভাঁট ও কালকাসিন্দে প্রভৃতি গুল্ম কাটিয়া সেখানে জমা করা হইয়াছে এবং সেই শুষ্ক গুল্ম জ্বালাইয়া রসে জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত হইতেছে। দশ পনেরটি ছোট ছোট ছেলে পাতার ঠোঙ্গা লইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া আছে, গুড় জ্বাল হইলে তাহারা প্রত্যেক ঠোঙ্গায় একটু একটু ভাগ লইয়া থাকে, এবং সানন্দ চিত্তে তাহার আস্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক চরিতার্থ হয়।

বেলা নটার সময় নিমন্ত্রণ গৃহে উপস্থিত হইলাম। বন্ধুর সঙ্গে তাঁহাদের বাগানে চলিলাম, সেখান হইতে ইঁচোড় সংগ্রহ করিয়া আনা হইল, সজিনার ফুল ভাঙ্গানো হইল, তাঁহাদের চালে লাউ শিম, আঙ্গিনায় বেগুণ ছিল তাহাও উত্তোলিত হইল; এতদ্ভিন্ন পালঙের শাক, মোচার ঘণ্ট প্রভৃতির বন্দোবস্তও বাদ গেল না। আর চিনি কিম্বা নূতন খেজুর গুড়ের পরিবর্ত্তে খেজুরের রসের পায়েস। আহারের সময় আনন্দমঠে দুর্ভিক্ষের বৎসর ভগিনীগৃহে জীবানন্দ গোস্বামীর আহারের ঘটা মনে পড়িয়া গেল।

আহারাদি শেষ হইতে না হইতে একদল চাষার ছেলে খুব আয়োজন করিয়া ভিক্ষা করিতে আসিল, ইহাদের এ ভিক্ষা "স্পেসাল"—ইহাকে ভিক্ষা নামে অভিহিত করা যায় না, ইহা একটা অধিকার—এই ভিক্ষা লইয়া আজ ইহারা সকলে মিলিয়া প্রফুল্ল

মনে 'পোষলা' করিবে। পৌষের শেষ দিন এই ভিক্ষা গ্রহণের নিয়ম। ইহারা সমস্বরে ছড়া বলিয়া ভিক্ষা করে,

"যে দেবে ডালা ডালা
তার হবে সাত গোলা,
যে দেবে বাটা বাটা
তার হবে সাত বেটা,
যে দেবে বাটি বাটি
তার হবে সাত বেটী,
যে দেবে মুটো মুঠো
তার হবে হাত ঠুঁটো।"

অতি কঠিন অভিশাপের ভয় থাকিলেও চন্দোরাঁ ঝি তাহাদিগের ধামিতে তিন চারি মুষ্টি চাউল দিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তাহাতে দাতা এবং গৃহীতা কাহারো আনন্দের অসদ্ভাব হইল না। এই দল চলিয়া গেলে আর একদল মুসলমান মানিকপীরের গান গাহিতে গাহিতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং পূর্ব্বমত ভিক্ষা লইয়া প্রস্থান করিল।

দুই প্রহরের সময় দ্বিতলের একটি কক্ষে শুইয়া নিদ্রাকর্ষণের উপক্রম হইয়াছে, এমন সময় শ্যামার শিষ শুনিয়া আমি পূর্ব্বদিকের একটি বাতায়ন উন্মুক্ত করিলাম; সে দিকে বাঁসবন, রোদ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে এবং সূর্য্যের দুই একটি কিরণধারা ঘন বংশপত্রের মধ্য দিয়া নিম্নবর্ত্তী ভাঁট বনের উপর বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, ঝোপের ভিতর বসিয়া শ্যামা শিষ দিতেছে এবং নিকটবর্ত্তী নিবিড়পত্র কামরাঙ্গা গাছের শাখায় বসিয়া একটা ঘুঘু অতি করুণস্বরে তাহার মর্ম্মবেদনা সেই আলস্যমন্থরগতি উদাস মধ্যাহ্নের স্তব্ধ বক্ষে ঢালিয়া দিতেছে।

বাঁস ঝাড়ের নিকটে একটি দিঘি। প্রায় চারিদিকেই বেতবন,

পূর্ব্বদিকে একটা মেঠোরাস্তা—এবং সেই দিকেই কিছু পরিস্কার, মাঠের গোরু সে দিকে নামিয়া জলপান করে এবং পাড়ার মেয়েরা কলসী করিয়া বিকালে সে দিক হইতে জল লইয়া যায়।

বৈকালে আমি একবার খিড়কীর দ্বার খুলিয়া বাঁসবনের নীচে দিয়া বেতের ঝোপের পাশদিয়া—দিঘির ধারে উপস্থিত হইলাম। সম্মুখে একটি মধুর দৃশ্য উন্মুক্ত হইল। বেলা পড়িয়াছে। দীঘিকার অপর প্রান্তস্থ একটা বটগাছের দীর্ঘছায়া দীঘির জলে আসিয়া পড়িয়াছে, দূরে দূরে গোরু চরিয়া বেড়াইতেছে এবং তীরে রাখালের দল 'পোষলা' সারিয়া "ডাণ্ডা গুলি" খেলিতেছে। দুই একটি পল্লী-বালিকা আসিয়া কলসী ভরিয়া জল লইয়া গেল, তাহাদের ক্ষুদ্র দেহভার অপেক্ষা জলপূর্ণ কলসাগুলি অধিক ভারী। কিন্তু তাহাই তাহারা কেমন শান্তভাবে কক্ষে তুলিয়া হেলিয়া দুলিয়া লইয়া চলিয়াছে।

সন্ধ্যাকালে পল্লীবাসিনীগণ গৃহপ্রাঙ্গণ সাদা আলিপানায় চিত্রিত করিতে লাগিল এবং ঘরে ঘরে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। সকল পাড়াতেই আজ আনন্দোৎসব। গৃহে গৃহে গৃহিণীগণ পিঠে, পুলি, আঁদশা ভাজিতেছেন, যে যাহার আত্মীয়, যে যাহার প্রিয় সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছে।

রাত্রে সমারোহপূর্ব্বক বন্ধুগৃহে আহারাদি সম্পন্ন হইল। বাল্য-কালে যে সকল মিষ্টান্ন অতি উপাদেয় বলিয়া বোধ হইত, এবং এদানী যাহার প্রতি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া নিষিদ্ধ মাংসের প্রতি একান্ত অনুরাগ জন্মিয়াছে, শৈশবের সেই সকল রুচিকর খাদ্য আজিকার এই আতিথ্য সৎকারের মধ্যে প্রীতিকর হইয়া উঠিল।

রাত্রিশেষে কলরবের মধ্যে নিদ্রাভঙ্গ হইল। গায়ে গরম কাপড় জড়াইয়া একবার ছাদের উপর আসিলাম। পাড়ার যুবতী ও বালিকাগণ দীপহস্তে গৃহাঙ্গনে ইতস্তত বেড়াইতেছে এবং সমস্বরে কি বলিতেছে। দেখিতে দেখিতে বন্ধুগৃহেও সে শব্দ শুনিতে পাইলাম—আলোক হস্তে বিনয়কুমারের কন্যা ও ছোট ভগ্নিটি আলপনার উপর চাউল গুড়া ও একটি করিয়া দুর্ব্বামণ্ডিত, সিন্দূর-রঞ্জিত গোবরের নুড়ি রাখিয়া যাইতেছে এবং বলিতেছে—

পৌষ মাস লক্ষ্মী মাস যেও না
ভাতের হাঁড়িতে থাক পৌষ যেও না
পোয়াল গাদায় থাক পৌষ যেও না
লেপ কাঁথায় থাক পৌষ যেও না
পৌষ মাস লক্ষ্মী মাস যেও না।"

কিন্তু তথাপি পৌষ গেল, পল্লীবাসিনীদিগের সমবেত আকুল আহ্বান তাহাকে রাখিতে পারিল না। অতি প্রত্যূষে আমি বন্ধুগৃহ হইতে বিদায় লইয়া বাহির হইলাম। পূর্ব্বদিক ফরসা হইলেও আকাশে তখন দুই একটি তারা ছিল এবং পশ্চিম আকাশে কৃষ্ণ-পক্ষের ম্লান চন্দ্র ঢলিয়া পড়িয়াছিল, পশ্চাতে বাঁসবন নিস্তব্ধ, নিদ্রা-মগ্ন—অস্তোন্মুখ চন্দ্রের ক্ষীণ কিরণে বাঁসবনের ও দীর্ঘ নিমগাছের সুপ্ত ছায়া সেই পুরাতন অট্টালিকা ও গৃহপ্রাঙ্গণের স্থানে স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সেই চন্দ্রকরে আলিপানাগুলি বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে এবং তাহার উপর গোবরের নুড়িগুলিও সুন্দর দেখাইতেছে।

কৃষ্ণচরিত্র।

ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মনে একটা সচেষ্টতা এবং স্বাধীনতার উদ্যম দেখা দিয়াছে। সেই উদ্যমটি একবার জাগ্রত হইয়া উঠিলে তাহাকে কোন একটিমাত্র বিষয়ে বদ্ধ করিয়া রাখা যায় না; দাবানল একবার প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলে সে আর গণ্ডী মানিয়া চলে না। আমাদের এই নূতন জীবন-চাঞ্চল্য, সমাজ-তন্ত্র, সম্রাজ্যতন্ত্র, ধর্ম্মতন্ত্র, সর্ব্বত্রই আঘাত বিস্তার করিতেছে। ইংরাজ মনে মনে বলিতেছে, ভারতবর্ষ তাহার এই নূতন উদ্যম কেবল যদি সমাজে এবং ধর্ম্মে প্রয়োগ করিয়া ক্ষান্ত হয় তাহা হইলেই ভাল হয়, রাজ্যতন্ত্রে তাহার সচেষ্ট দৃষ্টি না পড়াই উচিত; আমরা যাহা করিতেছি তাহা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়া আমা-দিগকে মা বাপ জ্ঞান করিয়া সে সন্তুষ্ট থাক্; কিন্তু চিরপ্রচলিত কুসংস্কার ও কুপ্রথাগুলির প্রতি তীক্ষ্ণ বিচারের ছুরি চালনা করা তাহার কর্ত্তব্য। আবার আমাদের এক শ্রেণীর পেট্রিয়ট আছেন তাঁহারা স্বাধীন বিচারশক্তি কেবল রাজ্যতন্ত্রেই প্রয়োগ করিতে পরামর্শ দেন—এবং সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধভাবে চির-প্রথার অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু কোন একটা প্রবল শক্তির উদ্বোধন হইলে সে কোন এক পক্ষের সঙ্কীর্ণ সুবিধা মানিয়া চলে না; যে কোন উপলক্ষ্যে আমাদের মনের উদ্যম একবার সজাগ হইয়া উঠিলে তাহার আঘাতবেগ নানা বিষয়ের অভিমুখে ধাবিত হইতে থাকে।

এই কারণে, প্রথম ইংরাজি শিক্ষা পাইয়া আমরা যখন রাজ-নীতির সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দিলাম, সমাজনীতি এবং ধর্ম্ম-নীতিও সেই নিষ্ঠুর পরীক্ষার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয় নাই।

তখন ছাত্রমাত্রেরই মনে আমাদের সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা অসন্তোষ ও সংশয়ের উদ্রেক হইয়াছিল।

বিচারের পর কাজের পালা। মতের দ্বারা ভাল মন্দ স্থির করা কঠিন নহে কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তদনুসারে আপন কর্ত্তব্য নিয়মিত করা অত্যন্ত দুরূহ। রাজ্যতন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের নিজের কর্ত্তব্য অতি যৎসামান্য, কারণ, রাজত্বের অধিকার আমাদের হস্তে কিছুই নাই; এই জন্য পোলিটিকাল সমালোচনা এখনো অত্যন্ত তীব্র ও প্রবলভাবে চলিতেছে, তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার দ্বিধা অথবা বাধা অনুভব করিবার কোন কারণ ঘটে নাই; কিন্তু সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য আমাদের নিজের হাতে; অতএব ধর্ম্ম ও সমাজনীতি সম্বন্ধে বিচারে যাহা স্থির হয় কাজে তাহার প্রয়োগ না হইলে সে জন্য আপনাকে ছাড়া আর কাহাকেও দোষী করা যায় না। মানুষ বেশিক্ষণ আপনাকে দোষী করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, এবং নিজের প্রতি দোষারোপ করিয়া অম্লান বদনে বসিয়া থাকাও তাহার পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। এই জন্য সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক একটি কৈফিয়ৎ বাহির করিয়া আমরা মনকে সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ করিলাম; অবশেষে এমন হইল, যে, আমাদের যাহা কিছু আছে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ইহা আমরা কিছু অধিক উচ্চস্বরে এবং প্রাণপণ বল সহকারে ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এরূপ ব্যবহার যে কপট ও কৃত্রিম আমি তাহা বলি না। বস্তুতঃ, সমাজ ও ধর্ম্মের মূল জাতীয় প্রকৃতির এমন গভীরতম দেশে অনুপ্রবিষ্ট, যে, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে নানা দিক্ হইতে নানা গুরুতর বাধা আসিয়া পড়ে এবং পুরাতন অমঙ্গলের স্থলে নূতন অমঙ্গল মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। এমন স্থলে শঙ্কিতচিত্তে

পুনরায় নিশ্চেষ্টতা অবলম্বন করিতে প্রবৃত্তি হয় এবং সেই নিশ্চেষ্টতার পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত স্পর্দ্ধার সহিত আস্ফালন করাও অস্বাভাবিক নহে;—বুক ফুলাইয়া সর্ব্বসাধারণকে বলিতে ইচ্ছা করে ইহা আমাদের হার নহে, জিৎ।

আমাদের বঙ্গসমাজের এইরূপ উল্টা রথের দিনে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র রচিত হয়। যখন বড় ছোট অনেকে মিলিয়া জনতার স্বরে স্বর মিলাইয়া গোলে হরিবোল দিতেছিলেন তখন প্রতিভার কণ্ঠে একটা নূতন সুর বাজিয়া উঠিল;—বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র গোলে হরিবোল নহে। ইহাতে সর্ব্বসাধারণের অনুমোদন নাই, সর্ব্বসাধারণের প্রতি অনুশাসন আছে।

যে সময়ে কৃষ্ণচরিত্র রচিত হইয়াছে সেই সময়ের গতি এবং বঙ্কিমের চতুর্দ্দিকবর্ত্তী অনুবর্ত্তীগণের ভাবভঙ্গী বিচার করিয়া দেখিলে এই কৃষ্ণচরিত্রগ্রন্থে প্রতিভার একটি প্রবল স্বাধীন বল অনুভব করা যায়।

সেই বলটি আমাদের একটি স্থায়ী লাভ। সেই বলটি বাঙ্গালীর পরম আবশ্যক। সেই বল স্থানে স্থানে ন্যায় এবং শিষ্টতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে তথাপি তাহা আমাদের ন্যায় হীনবীর্য্য ভীরুদের পক্ষে একটি অভয় আশ্রয়দণ্ড।

ভগবদ্গীতায় ফললাভকে তুচ্ছ করিয়া কার্য্যের গৌরব কীর্ত্তিত হইয়াছে; আমাদের বর্ত্তমান সমালোচ্য গ্রন্থেও কি প্রমাণ হইয়াছে বা না হইয়াছে তাহাকে অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, যে মূল মন্ত্রে এই গ্রন্থখানি প্রাণশক্তি লাভ করিয়াছে তাহাকেই শিরোধার্য্য করিয়া লইব।

যখন আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও আত্মবিস্মৃত হইয়া অন্ধভাবে শাস্ত্রের জয়ঘোষণা করিতেছিলেন তখন বঙ্কিমচন্দ্র বীর-

দর্পসহকারে কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে স্বাধীন মনুষ্যবুদ্ধির জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রকে ঐতিহাসিক যুক্তি দ্বারা তন্নতন্নরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন এবং চিরপ্রচলিত বিশ্বাসগুলিকেও বিচারের অধীনে আনয়ন পূর্ব্বক অপমানিত বুদ্ধিবৃত্তিকে পুনশ্চ তাহার গৌর-বের সিংহাসনে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছেন।

আমাদের মতে কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের নায়ক কৃষ্ণ নহেন, তাহার প্রধান অবিনায়ক, স্বাধীন বুদ্ধি, সচেষ্ট চিত্তবৃত্তি। প্রথমতঃ তিনি বুঝাইয়াছেন জড়ভাবে শাস্ত্রের অথবা লোকাচারের অনু-বর্ত্তী হইয়া আমরা পূজা করিব না, সতর্কভার সহিত আমাদের মনের উচ্চতম আদর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া পূজা করিব। তাহার পরে দেখাইয়াছেন যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাস্য নহে, যাহা বিশ্বাস্য তাহাই শাস্ত্র। এই মূল ভাবটিই কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের ভিতরকার অধ্যাত্মশক্তি, ইহাই সমস্ত গ্রন্থটিকে মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে।

বর্ত্তমান গ্রন্থে কৃষ্ণচরিত্রের শ্রেষ্ঠতা এবং ঐতিহাসিকতা প্রমাণের বিষয়। গ্রন্থের প্রথমাংশে লেখক ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণচরিত্রের রীতিমত ইতিহাস সমালোচনা এই প্রথম। ইতি-পূর্ব্বে কেহ ইহার সূত্রপাত করিয়া যায় নাই এই জন্য ভাঙ্গিবার এবং গড়িবার ভার উভয়ই বঙ্কিমকে লইতে হইয়াছে। কোন্‌টা ইতিহাস তাহা স্থির করিবার পূর্ব্বে কোন্‌টা ইতিহাস নহে তাহা নির্ণয় করা বিপুল পরিশ্রমের ও বিচক্ষণতার কাজ। আমাদের বিবেচনায় বর্ত্তমান গ্রন্থে বঙ্কিম সেই ভাঙ্গিবার কাজ অনেকটা পরিমাণে শেষ করিয়াছেন—গড়িবার কাজে ভাল করিয়া হস্তক্ষেপ করিবার অবসর পান নাই।

মহাভারতকেই বঙ্কিম প্রধানতঃ আশ্রয় করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে মহাভারতের মধ্যে বিস্তর

প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে। অথচ ঠিক কোন্‌টুকু যে মূল মহাভারত তাহা তিনি স্থাপনা করিয়া যান নাই। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "প্রচলিত মহাভারত আদিম বৈয়াসিকী সংহিতা নহে। ইহা বৈশম্পায়ন সংহিতা বলিয়া পরিচিত, কিন্তু আমরা প্রকৃত বৈশম্পায়ন সংহিতা পাইয়াছি কি না তাহা সন্দেহ। তার পরে প্রমাণ করিয়াছি, যে, ইহার প্রায় তিন ভাগ প্রক্ষিপ্ত।"

বঙ্কিম মহাভারতে তিনটি স্তর আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রথম স্তরের রচনা উদার ও উচ্চ কবিত্বপূর্ণ; দ্বিতীয় স্তরের রচনা অনুদার এবং কাব্যাংশে কিছু বিকৃতিপ্রাপ্ত এবং তৃতীয় স্তর বহুকালের বহুবিধ লোকের যদৃচ্ছামত রচনা।

এ কথা পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য যে, কাব্যাংশের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচার করিয়া স্তর নির্ণয় করা নিতান্তই আনুমানিক। রুচিভেদে কবিত্ব ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়। আবার, একই কবির রচনার একাংশ অপরাংশের সহিত কবিত্ব হিসাবে আকাশ পাতাল তফাৎ হয় এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ নহে। অতএব ভাষার প্রভেদ ঐতিহাসিকের প্রধান সমালোচ্য বিষয়, কবিত্বের প্রভেদ নহে। মহাভারতের মধ্যে এই ভাষার অনুসরণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কবির রচনা নির্ণয় করা এবং মূল মহাভারত নির্ব্বাচন করা প্রভূত শ্রমসাধ্য।

দ্বিতীয় কথা এই যে, ভাল কবির রচনায় ভাল কাব্য থাকিতে পারে কিন্তু ঐতিহাসিকতা কবিত্বের উপর নির্ভর করে না। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধবিবরণসম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে নানা স্থানের নানা লোকের মুখে নানা গল্প প্রচলিত ছিল। কোন উৎকৃষ্ট কবি সেই সকল গল্পের মধ্য হইতে তাঁহার কবিত্বের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ ও সংগঠন করিয়া লইয়া একটি সুসঙ্গত সুন্দর কাব্য রচনা

করিয়া থাকিতে পারেন এবং অনেক অকবি ও কুকবিবর্গ তাঁহার সেই কাব্যের মধ্যে তাঁহাদের নিজের জানা ইতিহাস জুড়িয়া দিতে পারেন। সে স্থলে সুকাব্যের অপেক্ষা অকাব্য ঐতিহাসিক হিসাবে অধিকতর নির্ভরযোগ্য হইতে পারে। এ কথা কাহারও অবিদিত নাই যে, কাব্যহিসাবে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিতে হইলে সমগ্র ইতিহাসকে অবিকৃত ভাবে গ্রহণ করা যায় না। শেক্‌স্‌পীয়ারের কোন ঐতিহাসিক নাটকে যদি পরবর্ত্তী সত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ ঐতিহাসিক অসম্পূর্ণতা পূরণ করিয়া দিবার জন্য নিজ নিজ রচনা নির্ব্বিচারে প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিতে থাকেন তবে তাহাতে কাব্যের কত ত্রুটি, মূলের সহিত কত অসামঞ্জস্য এবং শেক্‌স্‌পীয়ারবর্ণিত চরিত্রের সহিত কত বিরোধ ঘটিতে থাকে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে; সে স্থলে কাব্যসমালোচক কবিত্ব বিচার করিয়া শেক্‌স্‌পীয়ারের মূল নাটক উদ্ধার করিতে পারেন কিন্তু ইতিহাস-সমালোচক ইতিহাস উদ্ধারের জন্য এক মাত্র শেক্‌স্‌পীয়ারের মূল গ্রন্থের উপরেই নির্ভর করিবেন এমন কথা বলিতে পারি না।

যাহা হউক; মহাভারতে, যে, নানা কালের নানা লোকের রচনা আছে তাহা স্বীকার্য্য; কিন্তু তাহাদিগকে পৃথক করিয়া তাহাদের রচনা কাল ও তাহাদের আপেক্ষিক সত্যাসত্য নির্ণয় যে কেমন করিয়া সাধিত হইতে পারে তাহা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

কেবল, বঙ্কিম বাবু অনৈতিহাসিকতার একটি যে লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন সে সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ থাকিতে পারে না; তাহা অনৈসর্গিকতা। প্রথমতঃ, যাহা অনৈসর্গিক তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। দ্বিতীয়তঃ, ইতিহাসের যে অংশে অনৈসর্গিকতা দেখা যায়, সে অংশ যে, ঘটনাকালের বহু পরে রচিত তাহা মোটামুটি বলা যাইতে পারে।

বঙ্কিমবাবু অনৈতিহাসিকতার আর একটি যে লক্ষণ স্থির করিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। যে অংশে কোন ঐতি-হাসিক মহৎ ব্যক্তি দেবতা বলিয়া পূজিত হইয়াছেন সে অংশও যে পরবর্ত্তী কালের যোজনা তাহা সুনিশ্চিত।

অতএব বঙ্কিম যে সকল স্থলে কৃষ্ণচরিত্র হইতে অতিপ্রাকৃত অমানুষিক অংশ বর্জ্জন করিয়াছেন সে স্থলে কোন ঐতিহাসিকের মনে বিরুদ্ধ তর্ক উদয় হইতে পারে না। কিন্তু যেখানে তিনি, মহাভারতের একাংশের সহিত অসঙ্গত বলিয়া কিছু পরিত্যাগ করিয়াছেন সেখানে পাঠকের মন নিঃসংশয় হইতে পারে না। কারণ, একটা বড় লোক এবং বড় ঘটনা সম্বন্ধে দেশে বিচিত্র জন-শ্রুতি প্রচলিত থাকে। সেই সকল জনশ্রুতি বর্জ্জন এবং মার্জ্জন-পূর্ব্বক ভিন্ন কবি আপন আদর্শঅনুযায়ী ভিন্নরূপ কাব্য রচনা করিতে পারেন। কেহবা শ্রীকৃষ্ণকে পরম ধর্ম্মশীল দেবপ্রকৃতির মানুষ বলিয়া গড়িতে পারেন, কেহবা তাঁহাকে কূটবুদ্ধি রাজ-নীতিজ্ঞ চক্রীরূপে চিত্রিত করিতে পারেন। সম্ভবতঃ উভয়েরই চিত্র অসম্পূর্ণ। এবং পরস্পরবিরোধী হইলেও সম্ভবতঃ উভয়ের রচনাতেই আংশিক সত্য আছে। বস্তুতঃ নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন ইতিহাস হিসাবে কে বেশি নির্ভরযোগ্য।

এই হেতু, বঙ্কিম, মহাভারতবর্ণিত কৃষ্ণের প্রত্যেক উক্তি এবং মত যতটা বিস্তারিত ব্যাখ্যার সহিত আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহা হইতে যে ঐতিহাসিক চরিত্র গঠন করিয়াছেন তাহা আমা-দের মতে যথেষ্ট তথ্যমূলক নহে। বঙ্কিমবাবুও মধ্যে মধ্যে বলিয়া-ছেন, যে, মহাভারতে কৃষ্ণের মুখে যত কথা বসানো হইয়াছে সবই যে কৃষ্ণ বাস্তবিক বলিয়াছিলেন তাহা নহে, তদ্দারা, কৃষ্ণসম্বন্ধে কবির কিরূপ ধারণা ছিল তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু

কবির আদর্শকে সর্ব্বতোভাবে ঐতিহাসিক আদর্শের অনুরূপ বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে কবির কাব্য ব্যতীত অন্যান্য অনুকূল প্রমাণের আবশ্যক। আমরা একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করি।—বঙ্কিমবাবু বলিতেছেন,—

"কুন্তী পুত্রগণ ও পুত্রবধূর দুঃখের বিবরণ স্মরণ করিয়া কৃষ্ণের নিকট অনেক কাঁদাকাটা করিলেন। উত্তরে কৃষ্ণ যাহা বলিলেন তাহা অমূল্য। যে ব্যক্তি মনুষ্যচরিত্রের সর্ব্বপ্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছে সে ভিন্ন আর কেহই সে কথার অমূল্যত্ব বুঝিবে না। মূর্খের ত কথাই নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'পাণ্ডবগণ নিদ্রা তন্দ্রা ক্রোধ হর্ষ ক্ষুধা পিপাসা হিম রৌদ্র পরাজয় করিয়া বীরোচিত সুখে নিরত রহিয়াছেন। তাঁহারা ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করিয়া বীরোচিত সুখে সন্তুষ্ট আছেন; সেই মহাবল-পরাক্রান্ত মহোৎসাহসম্পন্ন বীরগণ কদাচ অল্পে সন্তুষ্ট হয়েন না। বীর ব্যক্তিরা হয় অতিশয় ক্লেশ না হয় অত্যুৎকৃষ্ট সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন; আর ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যাবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু উহা দুঃখের আকর; রাজ্যলাভ বা বনবাস সুখের নিদান'।"—

বঙ্কিমবাবু মহাভারত হইতে কৃষ্ণের যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা সুগভীর ভাবগর্ভ উপদেশে পূর্ণ। কিন্তু ইহা হইতে ঐতিহাসিক কৃষ্ণের চরিত্রনির্ণয়ের বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায় এমন আমরা বিশ্বাস করি না। ইহাতে মহাভারতকার কবির মানব চরিত্রজ্ঞতা এবং হৃদয়ের উচ্চতা প্রকাশ করে। উদ্যোগ-পর্ব্বের নবতিতম অধ্যায়ে কৃষ্ণের এই উক্তি বর্ণিত আছে; ইহার প্রায় চল্লিশ অধ্যায় পরেই কুন্তীর মুখে বিদুলা-সঞ্জয় সংবাদ নামক একটি পুরাতন কাহিনী সন্নিবেশিত হইয়াছে; তাহাতে তেজস্বিনী

বিদুলা তাঁহার যুদ্ধচেষ্টাবিমুখ পুত্র সঞ্জয়কে ক্ষত্রধর্ম্মে উৎসাহিত করিবার জন্য যে কথাগুলি বলিয়াছেন কৃষ্ণের পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তির সহিত তাহার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। বিদুলা বলিতেছেন—"এখনো পুরুষোচিত চিন্তাভার বহন কর। অল্পদ্বারা পরিতৃপ্ত রাখিয়া অপরিমেয় আত্মাকে অনর্থক অবমানিত করিও না।" "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিম্নগা সকল যেমন অল্প জলেই পরিপূর্ণা হয় এবং মূষিকের অঞ্জলি যেমন অল্প দ্রব্যেই পূর্ণ হইয়া উঠে সেইরূপ কাপুরুষেরাও অত্যল্পমাত্রে পরিতৃপ্ত হওয়ায় সহজেই সন্তুষ্ট হইতে থাকে।" "চিরকাল ধূমিত হওয়া অপেক্ষা মুহূর্ত্তকাল জ্বলিত হওয়াও শতগুণে শ্রেষ্ঠ।" "ইহসংসারে প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ অত্যল্প বস্তুকে অপ্রিয় বোধ করেন; অত্যল্প বস্তু যাহার প্রিয় হয়, তাহার সেই অল্পবস্তুই নিশ্চয় অনিষ্টকর হইয়া থাকে।" "যাহারা ফলের অনিত্যত্ব স্থির করিয়াও কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ না হয় তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধ হইতেও পারে, না হইতেও পারে; কিন্তু অনিশ্চিত বোধে যাহারা একেবারেই অনুষ্ঠানে বিরত হয় তাহারা আর কস্মিন্ কালেও কৃতকার্য্য হইতে পারে না।"

ইহা হইতে এই দেখা যাইতেছে যে, কর্ত্তব্যপরায়ণতাসম্বন্ধে মহাভারতের কবির আদর্শ অত্যন্ত উচ্চ ছিল, এবং সেই আদর্শ তিনি নানা উদাহরণের দ্বারা নানা স্থানে প্রচার করিয়াছেন। মহাভারত ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এমন কল্পনা করাও অসঙ্গত হয় না, যে, এক সময়ে ভারতে কর্ম্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণার উদ্দেশে কবি লোকবিখ্যাত কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধবৃত্তান্ত মহাকাব্যে গ্রথিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভীষ্ম, ভীম, কর্ণ, দ্রোণ প্রভৃতি মহাভারতের প্রধান নায়কগুলিমাত্রেই কর্ম্মবীরের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তস্থল; এমন কি, গান্ধারী এবং দ্রৌপদীও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার

মহিমায় দীপ্তিমতী। সেই জন্য গান্ধারী দুর্য্যোধনকে ত্যাগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং দ্রৌপদী বলিয়াছিলেন "অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে।"

অতএব বঙ্কিম যাহা বলিতেছেন তাহাতে যদি প্রমাণের কোন ত্রুটি না থাকে তবে তদ্দ্বারা ইহাই স্থির হইয়াছে, যে, কোন একটি অজ্ঞাতনামা কবির মনে মহত্ত্বের আদর্শ অতি উচ্চ ছিল; এবং তাঁহার সেই উচ্চতম আদর্শ সৃষ্টিই মহাভারতের কৃষ্ণ। কৃষ্ণ ঐতিহাসিক হইতে পারেন কিন্তু মহাভারতের কৃষ্ণ যে সর্ব্বাংশে ঐতিহাসিক কৃষ্ণের প্রতিরূপ তাহার কোন প্রমাণ নাই। ইহাও দেখা যাইতেছে, যে, এই মহাভারতেই ভিন্ন লোক ভিন্ন আদর্শের কৃষ্ণ সংগঠন করিয়াছেন।

যেখানে এক সাক্ষী বিরোধী কথা কহিতেছে সেখানে অন্যান্য সাক্ষী ডাকিয়া সত্য সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু বঙ্কিম বাবু দেখাইয়াছেন মহাভারতে কৃষ্ণের জীবনের যে অংশ বর্ণিত হইয়াছে অন্য কোন পুরাণেই তাহা হয় নাই; সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষীর সাক্ষ্য তুলনা করিয়া সত্য উদ্ধারের যে উপায় আছে এ স্থলে তাহাও নাই।

অতএব, বঙ্কিম বাবুর প্রমাণ মত দেখিতে পাইতেছি, ব্যাসরচিত মূল মহাভারত বর্ত্তমান নাই। এখন যে মহাভারত পাওয়া যায় তাহা ব্যাসের মুখ হইতে বৈশম্পায়ন, বৈশম্পায়নের মুখ হইতে উগ্রশ্রবার পিতা, পিতার মুখ হইতে উগ্রশ্রবা, এবং উগ্রশ্রবার মুখ হইতে অন্য কোন একজন কবি সংগ্রহ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ এ মহাভারতের মধ্যেও কালক্রমে নানা লোকের রচনা মিশ্রিত হইয়াছে; তাহা নিঃসংশয়ে বিশ্লিষ্ট করিবার কোন নির্ভরযোগ্য

উপায় আপাততঃ স্থির হয় নাই। তৃতীয়তঃ, অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ হইতে তুলনা দ্বারা মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করিবারও পথ নাই।

সুতরাং এখনো বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণচরিত্র ইতিহাসের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তিনি চেষ্টা করিয়াছেন, এবং সেই চেষ্টাই তাঁহার প্রধান গৌরব। কেবল চেষ্টা নহে; তিনি যে প্রণালীতে কাজ করিয়াছেন এবং মনের যে ভাবটি রক্ষা করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালী পাঠকদিগের শিক্ষাবিধানের পক্ষে মহামূল্য।

এক্ষণে ঐতিহাসিক সমালোচনা শেষ করিয়া সমালোচ্য গ্রন্থ-প্রকাশিত কৃষ্ণের চরিত্র বর্ণনা সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য আছে দ্বিতীয় প্রবন্ধে ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইব।

নীতির ধর্ম্ম।

বুদ্ধ চরিত।

যে মুহূর্ত্তে সিদ্ধার্থ এই চিন্তায় উপস্থিত হইলেন, যে বিশুদ্ধ নীতি অবলম্বনই দুঃখ বিনাশের এবং নির্ব্বাণের একমাত্র উপায় তাঁহার চক্ষু হঠাৎ উন্মীলিত হইল। আর তিনি অন্ধকারে রহিলেন না, তাঁহার দৃষ্টি আলোকে পূর্ণ হইল। আর তাঁহার কোন ভয় রহিল না। এই সেই নির্ব্বাণ যাহা প্রাপ্ত হইলে জীবন্মুক্ত হয়, যাহার প্রশংসা কবিগণ সহস্র মুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা পাইলে দেবতারা পুলকিত হন এবং যাহার আগমনে সমস্ত প্রকৃতি আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকে। এই সেই নির্ব্বাণ যাহার প্রভাবে সমুদয় চরাচর

বুদ্ধের অধীনস্থ হয় এবং যাহার নির্দ্দেশে সকল অসম্ভবই সম্ভব হয়। সিদ্ধার্থ সহসা এই আলোক পাইলেন। ইহা প্রকৃত প্রত্যাদেশ—সচরাচর ইহা লোকে পায় না। সিদ্ধার্থ ছয় বৎসর ইহার জন্য সাধন করিতেছিলেন। এ রত্ন পাইবার জন্য তিনি সংসার, রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য্য, রাজভবন, প্রিয়তমা পত্নী প্রাণসম পুত্র সকলকে বিসর্জ্জন দিয়া পথে পথে ভিক্ষুক হইয়া বেড়াইতেছিলেন। সামান্য রাজত্ব হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া তিনি এখন পৃথিবীপতি হইলেন। এ কথা অত্যুক্তি হইল না। কেননা যে লোক এত বড় দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিলেন, যাঁহার আত্ম বিসর্জ্জন কেবল সংসার লইয়া নয়, রাজত্ব লইয়া নয়, কিন্তু কামনা লইয়া, সে লোক কি সকলের পূজ্য না হইয়া থাকিতে পারেন? ঈদৃশ জনকে লোকে সামান্য অর্ঘ্য দেয় না—মনের সমগ্র কৃতজ্ঞতা, ভক্তি; শ্রদ্ধা, উপাসনা তাঁহার চরণে অর্পিত করে। আমরা একটি সামান্য কামকে মন হইতে তাড়াইতে পারি না, আর তিনি সিংহনাদে পৃথিবীকে বলিতে পারিলেন—"আমার মনে কামরিপু তিল মাত্র স্থান পায় না, এখন কামনাঅগ্নি একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়াছে!" অনেকে বলেন যে বুদ্ধ এমন সহজ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কি রূপে এত খ্যাতি লাভ করিয়াছেন? ভাল হইলে জন্মের দুঃখ যায় এ কে না জানে? এ আবিষ্ক্রিয়া করিবার জন্য এক জন মহাপুরুষের জন্মাইবার কি প্রয়োজন ছিল? বিশুদ্ধ মত, বিশুদ্ধ ভাব, বিশুদ্ধ কথা, বিশুদ্ধ কার্য্য, বিশুদ্ধ জীবনোপায়, বিশুদ্ধ চেষ্টা, বিশুদ্ধ স্মৃতি, বিশুদ্ধ চিন্তা - এ সকলেতে নূতন কি আছে? সকলেই ত মানেন যে ভাল কথা কহা উচিত, ভাল মতে জীবনকে চালান উচিত। বাস্তবিক বৌদ্ধ ধর্ম্ম এত বড় কিসে? পৃথিবীর ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সংখ্যা গ্রহণ করিলে দেখা যায় যে বৌদ্ধ সংখ্যাই

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এত লোক কি কেবল "সত্য কথা কহা উচিত", "জীব হিংসা করা উচিত নহে" ঈদৃশ সত্য লইয়া বৌদ্ধ হইয়াছে ?

বুদ্ধের যে এত সম্মান এবং তিনি জীবদ্দশায় যে এত শ্রদ্ধা ভক্তি পাইয়াছিলেন, তাহার কারণ সহজে বুঝা যায়। একজন রাজ-পুত্র রাজ্যকামনা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন, ইহাই ত এক অভূতপূর্ব্ব কাহিনী। তাহার পর সেই রাজকুমার পথে পথে বিচরণ করিয়া অবশেষে কঠোর তপস্যা করিতে লাগি-লেন। ইহা কি লোমহর্ষণ ব্যাপার নহে? তাহার পর সেই রাজকুমার ঋষিপ্রদর্শিত সকল উপায়কে মিথ্যা প্রমাণ করিয়া ঘোর সাধন দ্বারা এক নূতন পথ, নূতন ধর্ম্ম আবিষ্কার করিলেন এবং আজীবন আপনি দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া সেই ধর্ম্ম নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রচার করিলেন। এমন সুপুরুষ রাজকুমার, সংসার-সুখ ত্যাগ করিয়া, গৈরিক পরিধান করিয়া, সামান্য ভিক্ষুকের ন্যায় বেড়াইবেন, এ দৃশ্যে কাহার মন না চমকিত হয়? কে না হৃদয়ের ভক্তি তাঁহার চরণে উৎসর্গ করে? আত্মবিসর্জ্জন ধর্ম্ম-প্রচারের প্রধান সহায়। যখন একজন রাজপুরুষ এই আত্মবিস-র্জ্জনের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন তখন তাঁহার ধর্ম্ম যে সকলে গ্রহণ করিবে, তাঁহার দৃষ্টান্ত যে সকলে অনুসরণ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! অতএব বৌদ্ধধর্ম্মের জয় বুদ্ধের জীবনেই দেখিতে হইবে। এত বড় ত্যাগস্বীকারের দৃষ্টান্ত ভারত অবহেলা করিতে পারিল না। এতদ্ব্যতীত আর একটি কথা আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম এ দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ রূপে নূতন ধর্ম্ম। ভারত ধর্ম্মপ্রধান দেশ ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু এখানে পূজা, যাগ, যজ্ঞ, ভক্তি, যোগ এই লইয়াই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বলিয়া একটি পদার্থ সকলেই

মানে, কিন্তু ধর্ম্ম নীতিপ্রধান ইহা তখনকার লোকেরা স্বীকার করিতে চাহিত না। এদেশে কোন লোক অতিশয় ভক্তিতে মত্ত হইতে পারে, অথচ জীবনে নীতি দেখান আবশ্যক, এমন কি জীবনে নীতি না দেখাইলে ধর্ম্ম হয় না, ইহা সকলে স্বীকার করিতে নাও পারে। বুদ্ধের সময় যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদি লইয়াই ধর্ম্ম ছিল, কিন্তু তাহাতে নীতির প্রাধান্য ছিল না। ভারতে কোন ধর্ম্ম নীতির সহিত যোগ অনেক দিন রাখিতে পারে না। ইহার প্রমাণ আজও দেখিতে পাই। বৌদ্ধধর্ম্মেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। বুদ্ধ সেই জন্য দেশের অভাব বিবেচনা করিয়া পুরাতন মার্গে গমন না করিয়া একেবারে একটি নূতন পথ বাহির করিলেন। নীতিই ধর্ম্ম এই তাঁহার ধর্ম্মের সার কথা। এবং তিনি যত সাধন ও নিয়ম-প্রণালী স্থাপন করিলেন তাহারও উদ্দেশ্য সেই নীতির ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করা।

এখন দেখিতে হইবে নীতিধর্ম্মের অর্থ কি। সাধারণতঃ আমরা যাহাকে নীতিধর্ম্ম বলি ইহা তাহা নহে। যে ধর্ম্মে বলে—*সত্য কথা কও, মিথ্যা কথা কহিও না, দয়া কর, জীবহত্যা* করিও না, এ ধর্ম্ম সে ধর্ম্ম নহে। বাস্তবিক সকল ধর্ম্মেই এই সকল নীতিবিষয়ক আদেশ আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম কেবল এই প্রকার ধর্ম্ম হইলে অন্য ধর্ম্মের সঙ্গে ইহার কোন প্রভেদ থাকে না। অথচ প্রত্যেক ধর্ম্ম একটি বিশেষ সত্য, বিশেষ মত, বিশেষ সাধনা লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। যদি সকল ধর্ম্মের নীতির অংশটি নির্ব্বাচন করিয়া তাহাই বৌদ্ধধর্ম্ম বলিয়া বর্ণিত হয়, তাহা হইলে সে ধর্ম্মের নূতনত্ব কোথায় থাকে? নীতিধর্ম্ম দুই প্রকার—এক প্রকার সামান্য ধর্ম্ম, আর এক প্রকার উচ্চ ধর্ম্ম। এ দুইটি স্তরে স্তরে স্থাপিত আছে। প্রায় সকল লোকের এই সামান্য

ধর্ম্মটি থাকিতে পারে ও আছে। কিন্তু উচ্চতর স্তরে দণ্ডায়মান হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। দুই ধর্ম্মই পুণ্য লইয়া গঠিত, দুইএতেই পাপের সহিত সংগ্রামের ব্যবস্থা। কিন্তু একটিতে কেবল পাপের সঙ্গে সংগ্রাম চলিতে থাকে, অথচ পাপ চলিয়া নাও যাইতে পারে। আর একটিতে পাপ একেবারে চলিয়া যায় এবং তাহার পর সংগ্রাম আর থাকে না। আমি একটি ক্ষেত্রে নানা প্রকার বীজ বপন করিয়া দেখিলাম যে কতকগুলি অনিষ্টকর গাছ-গাছড়া তাহাদিগকে বৃক্ষে পরিণত হইতে দিতেছে না। সে স্থলে আমি কি করি? সেই গাছ গাছড়াদিগকে কাটিয়া ফেলি। তাহা-তেও কি আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়? সেই গাছগাছড়া মূল লইয়া আছে। সেই মূলগুলিকে বিনাশ না করিলে আমি অভিলষিত ফল পাইব না। সেই জন্য অগ্নি দিয়া তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া দিতে হইবে। দগ্ধ করিলে আর গাছ গাছড়া থাকিবে না, এবং আমার ইচ্ছামতে সুন্দর সুন্দর ফলফুলের বৃক্ষসকল রোপণ করিতে পারিব। মনুষ্যের প্রকৃতি সেইরূপ একটি ক্ষেত্র বুঝিতে হইবে। আমি কতকগুলি সদনুষ্ঠান করিব মানস করিয়াছি। কিন্তু পাপ আসিয়া আমার কল্পনাকে বিনষ্ট করে। আমি এক এক করিয়া সেই পাপসমূহকে কাটিতে আরম্ভ করি। কিন্তু একটি কাটিতে আর একটি হয়, এবং যতবার কাটি ততবার তাহারা আবার বর্দ্ধিত হইয়া আমার শুভ ইচ্ছাকে বিনাশ করে। আমাদিগের জীবনে এইরূপে ক্রমাগত পাপের সঙ্গে সংগ্রাম চলিতেছে। এ যুদ্ধে আত্মার উপকার হয় বটে। কিন্তু তাহাতে পাপ যায় না, যেহেতু পাপ আমাদিগের স্বভাবে মূল লইয়া আছে। * অতিশয়

* মাটিন লুথার বলিয়া গিয়াছেন যে মানুষের পাপ ঠিক তাহা। শ্মশ্রুর ন্যায়। ইহাকে ক্ষুর দিয়া কাটিয়া ফেল, তাহা আবার হইবে। আমরা যতদিন বাঁচিয়া

পবিত্র হৃদয়েও পাপের সমুদয় বীজ নিহিত আছে। যখন তখন সেই সকল বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ধর্ম্মোন্নতির ব্যতিক্রম করাইয়া দিতে পারে। সেই জন্য ধর্ম্মের সুফল স্থায়ী করিবার জন্য সেই বীজসমূহকে একেবারে দগ্ধ করিয়া দেওয়া চাই। দগ্ধ হইলে আর ধর্ম্মের কোন ব্যাঘাত থাকিবে না। নির্ব্বিরোধে নিরাপদে ধর্ম্মবৃক্ষ বর্দ্ধিত হইয়া সুফল প্রদান করে। এই যে ধর্ম্ম ইহাকেই নীতির উচ্চধর্ম্ম বলিয়া মানি। ইহাই বৌদ্ধধর্ম্ম। বুদ্ধ পাপকে বৃক্ষ বলিয়া রূপক না করিয়া অগ্নির সহিত উপমা দিয়া গিয়াছেন। তৃষ্ণা-রূপ অগ্নি মনকে সদা দহন করিতেছে। তাহাকে নাশ করার নামই নির্ব্বাণ। এই নির্ব্বাণই তাঁহার ধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহারই মাহাত্ম্য বৌদ্ধ কবিরা সহস্র স্বরে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ইহাই বৌদ্ধদিগের স্বর্গ, ইহাই মুক্তি। ইহাই একমাত্র শান্তির আবাস। এই নির্ব্বাণ বুদ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ধর্ম্ম-ইতিহাস এ পর্য্যন্ত কেহ লিখেন নাই। এক একটি ধর্ম্মের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সকল-ধর্ম্ম লইয়া মনুষ্যজাতির ইতিহাস এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এরূপ ইতিহাস আজকাল জগতের একটি বৃহৎ অভাব। ইহা পড়িলে আমরা ধর্ম্মের নিয়ম-সমূহ জানিতে পারিব। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইবার ভিন্ন ভিন্ন পথ। ভিন্ন ভিন্ন রোগের ইহারা ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ। মানবজাতির সকল সময়ে এক অভাব থাকে না। যুগে যুগে ইহাদিগের অভাব ভিন্ন হয়। মনুষ্যেরা ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে

থাকি, ততদিন নাপিতের হস্ত হইতে উদ্ধার নাই। যখন দেখি যে ধর্ম্ম আত্মা ও শরীরের সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতেছে এবং যখন আরও দেখি যে আত্মা শরীর-গত, তখন শরীর যে সর্ব্বদা আত্মাকে পরাভূত করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কথাটি ঠিক।

অগ্রসর হইতেছে ইহা ধর্ম্ম ইতিহাস পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। একজন লোকের উন্নতি ধাপে ধাপে উঠে। প্রথমে একটি অভাব দূরীকৃত হইয়া আর একটি অভাব আইসে, তাহা দূরীকৃত হইলে আর একটি আইসে, ক্রমে সে সর্ব্বোচ্চ পদবীতে স্থান পায়। অবশেষে আমরা সমুদয় জীবনটি অবলোকন করিয়া বুঝিতে পারি কেমন স্তরের উপর স্তর উঠিয়া সেই ধর্ম্মজীবনটি গঠিত হইয়াছে। একটির উপর আর একটি স্তর যাহা উঠিয়াছে; ঠিক সেইটিই হওয়া উচিত, অন্য কোন স্তর তাহার উপর বসাইলে ঠিক হইত না। সেইরূপ সমগ্র মানবজাতির উন্নতি স্বাভাবিক ভাবে গঠিত। একটি স্তরের উপর আর একটি স্তর—অন্য একটি স্তর হইলে তাহা ভুল হইত। বৎসর, যুগ ভাবিলে দেখি যে বৌদ্ধধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের পূর্ব্বে আসিয়াছিল। তাহার অগ্রে এ দেশে বৈদিক ধর্ম্ম এবং ইহুদি জাতির মধ্যে মুসার ধর্ম্ম হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহারা মনুষ্যের শৈশবাবস্থার ধর্ম্ম। শৈশব কালের যে স্বভাব যৌবনে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যৌবনকালের পরীক্ষায় শৈশবের নিয়ম খাটে না। বৌদ্ধধর্ম্ম যখন আসিয়াছিল তখন ভারতবাসীরা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। সুতরাং তাহাদিগের সেই যৌবনোপযোগী একটি নূতন ধর্ম্ম আবশ্যক হইয়াছিল। যৌবনকালের প্রথমেই কি ধর্ম্ম হওয়া উচিত? আমরা বলি – বৌদ্ধধর্ম্ম। অর্থাৎ কি না, নীতির ধর্ম্ম। আমরা সামান্য ধর্ম্মের কথা বলিতেছি না। যাঁহারা উচ্চধর্ম্ম চান, তাঁহাদিগের পক্ষে বৌদ্ধধর্ম্মই প্রথম ধর্ম্মসোপান করিতে হইবে। মন হইতে কামনার অগ্নি নির্ব্বাণ কর, অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ কর, তাহা হইলে পরে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম,প্রভৃতি আবশ্যক হইবে।

কেহ কেহ বলেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম নিরীশ্বর ধর্ম্ম, অতএব ইহাকে

ধর্ম্ম বলা যায় না। ধর্ম্ম, তাহার সন্দেহ নাই। যাহাতে মুক্তির পথ নির্ণীত আছে, যাহাতে মনুষ্যে মনুষ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ ও কর্ত্তব্য বর্ণিত আছে, যাহাতে পাপ পুণ্যের প্রভেদ লক্ষিত হয়, যাহাতে বিবেকের অনন্ত অলঙ্ঘনীয় আদেশ সকল বিবৃত আছে, যাহাতে পুরস্কার এবং দণ্ডের বিধি আছে, তাহাকে ধর্ম্ম বলিতেই হইবে। তবে যে বৌদ্ধধর্ম্মে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই, তাহার গভীর তাৎপর্য্য আছে। বুদ্ধ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মকে লইয়া এত সূক্ষ্মবিচার ছিল, তাঁহার স্বরূপ সকল এত চুলচেরা ভাবে বর্ণিত হইত, যে সে ব্রহ্মকে বুঝিতে পারা কি জানা একেবারে অসম্ভব ছিল। সেই ব্রহ্মের সঙ্গে ক্রিয়া-কলাপের ঘোর ঘটা ছিল—এতদুর ছিল যে ধর্ম্মনীতিকে কোনমতে স্পর্শ করিতে পারিত না। বুদ্ধ দেখিলেন যে, এ ব্রহ্মকে লোকে কখন পাইবে না এবং এ ব্রহ্মকে লইয়া নাড়াচাড়া করিলে ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। ব্রহ্মকে জানিবার জন্য মনের যে অবস্থা হওয়া উচিত সে অবস্থা না পাইলে ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব নহে। সে অবস্থা পুণ্যের অবস্থা। যে ঘরে ঠাকুর থাকেন সে ঘর ভক্তেরা সদাই পরিষ্কার রাখেন। এমন কি পাদুকা লইয়া সে ঘরে প্রবেশ নিষেধ। ইহার অর্থ এই যে মনই ব্রহ্মের আবাস স্থান। সেই ঠাকুর ঘর পরিষ্কার না রাখিলে ঠাকুর সেখানে থাকেন না। অপরিষ্কার দুর্গন্ধময় মনে ব্রহ্মের বাস একেবারে অসম্ভব। সেই জন্য বুদ্ধ মনকে পরিষ্কার করিবার জন্যই তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি কেবল মাত্র ঘর শুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। ঘর শুদ্ধ করিলে সেই ঘরে কি ঠাকুর বা কোন্ ঠাকুর আসিবেন তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি যদি ঠাকুর-বিষয়ক কোন মত চালাইতেন, তাহা হইলে লোকে সেই ঠাকুরের বিচার লইয়া ব্যস্ত হইত, ন্যায়শাস্ত্রের

সাহায্যে সেই ঠাকুরের স্বরূপ নির্ণয় করিতেই আগ্রহ দেখাইত। তাহা হইলে কিন্তু বুদ্ধের কার্য্য হইত না। তিনি যেন ঠাকুরের বিষয় একেবারে অজ্ঞ, এই ভাবে তিনি কেবল ইহাই বলিতে লাগিলেন —"কামনা নির্ব্বাণ কর, নির্ব্বাণ কর।" তিনি অন্য কোন কথা বলিতে পৃথিবীতে আসেন নাই। নির্ব্বাণ তাঁহার এক মন্ত্র। যৌবনকালে যে সকল বিভীষিকা আছে, ঘোর রিপুর নির্য্যাতন দেখা যায়, পাপের সঙ্গে ক্রমাগত যে সংগ্রাম চলে, তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে গেলে অন্য মন্ত্র নিষ্ফল হয়। সেই জন্য আমাদিগের শিক্ষাপ্রণালীতে যুবকদিগকে নীতির পথে রাখাই সুব্যবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। বুদ্ধ ঠিক সেই নির্ব্বাণ-মন্ত্র দিয়া এ দেশকে এবং জগতবাসীদিগকে যৌবনের পাপ ও রিপুপ্রাধান্য হইতে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

উচ্চ ধর্ম্মজীবন অবলম্বন করিতে গেলে বৌদ্ধধর্ম্মই প্রথম সোপান বলিয়া বোধ হয়। দেখ আমাদিগের দেশে যোগের ধর্ম্মে, ভক্তির ধর্ম্মে পাপ পুণ্যের বিষয়ে অধিক উল্লেখ নাই; বাস্তবিক যে ধর্ম্ম যে সত্যটি বলিতে আসিয়াছে তাহা ভিন্ন অন্য কথা কিছুই বলে না। যোগধর্ম্মে যোগের কথাই পাওয়া যায়, বৈষ্ণবধর্ম্মে ভক্তির কথাই প্রধান। অনেকের মনে সংস্কার আছে যে তবে যোগী হইলে কিম্বা ভক্ত হইলে পাপ পুণ্য বিচারের আবশ্যকতা থাকে না। আমরা সেই জন্য যোগীদিগকে অনেক সময় পাপ করিতে দেখি। ঋষিদিগের জীবনে কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুদিগের প্রাবল্য আছে স্বীকার করিতে হইবে। ইহা অতি শোচনীয় ব্যাপার তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু শাস্ত্রের গভীর মর্ম্ম আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। বাস্তবিক যোগ ও ভক্তির ধর্ম্মে পাপ পুণ্য বিচারের স্থান নাই। ইহার অর্থ এই যে যোগে নিমগ্ন হইবার পূর্ব্বে পাপের নির্ব্বাণ হওয়া

আবশুক। যে কামনাতে মনের চাঞ্চল্য আইসে তাহা নির্ব্বাণ না করিলে মনের একাগ্রতা কিরূপে হইবে? পাপের নির্ব্বাণ হইলে তবে যোগে নিমগ্ন হওয়া যায়, পাপের অনুরক্তি চলিয়া গেলে তবে ঈশ্বরে অনুরাগ হয়। যদি পাপ থাকে তাহা হইলে পদে পদে কুচিন্তা আসিয়া মনকে অন্যদিকে নিক্ষিপ্ত করে। সেই জন্য মনকে পরিষ্কার করিয়া, ঠাকুর ঘর শুদ্ধ করিয়া তবে যোগেশ্বরকে লইয়া, ভক্তবৎসলকে লইয়া, পূজা আরম্ভ করা সম্ভব। এই কথাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, সকল ধর্ম্মের পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম, অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্ম। ধর্ম্মশাস্ত্রের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, নির্ব্বাণের ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথম এবং তাহার পরে ক্রমান্বয়ে যে সকল ধর্ম্ম আসা উচিত তাহারা আসিয়াছে।

ক্ষাত্রচর্য্য।

সকলেই জানেন, জর্ম্মণীতে প্রজাসাধারণকেই সৈন্যশ্রেণীতে ভুক্ত হইতে হয়। অন্যান্য বিদ্যার সহিত দেশরক্ষা করিবার বিদ্যা সম্বন্ধে দেশের প্রত্যেক অধিবাসী শিক্ষিত ও প্রস্তুত।

প্রাচীন ভারতবর্ষে যেমন ব্রাহ্মণ মাত্রেই ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হইত, এবং ছাত্র অবস্থা হইতেই তাহার শিক্ষা বিধান চলিতে থাকিত—তেমনি, জর্ম্মনী দেশেও প্রত্যেক জর্ম্মন পাঠাবস্থায় যে প্রণালীতে শিক্ষা লাভ করে, যে বিশেষ বিধানে মানুষ হইয়া উঠে তাহাকে ক্ষাত্রচর্য্য নাম দেওয়া যাইতে পারে। প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবন যেরূপ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ছিল, জর্ম্মন [illegible] সেইরূপ ক্ষাত্রচর্য্যাশ্রম।

ইংরাজি বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে ছাত্রদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে, জর্ম্মণীতে সেরূপ নাই। সেখানে কেবল ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা পাঠ হইয়া থাকে। আহার ব্যবহার সম্বন্ধে ছাত্রদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, বক্তৃতাকালে তাহারা উপস্থিত না থাকিলেও তাহাদিগকে শাসনের দ্বারা বাধ্য করা হয় না।

সেখানে ছাত্রগণ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সাধারণতঃ এক এক প্রদেশের ছাত্র মিলিয়া এক এক সম্প্রদায় গঠিত করে। এই সম্প্রদায়গুলিকে বলে Korps কোর্প্‌স্‌।

প্রত্যেক কোর্প্‌সের অধীনে একটি করিয়া পানশালা এবং যুদ্ধশালা আছে। তিনজন কর্ম্মচারী দ্বারা কোর্প্‌সের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। প্রধান কর্ম্মচারী কোর্প্‌স্‌-সভাধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় কর্ম্মচারী, সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রদের মধ্যে যতকিছু দ্বন্দ্বযুদ্ধ ঘটে তাহার তত্ত্বাবধারণ করেন। এবং যুদ্ধের সমস্ত নিয়ম পালন সম্বন্ধে তিনিই দায়ী। যদি কোন ছাত্র অপর ছাত্রের দ্বারা যুদ্ধে আহূত হয় তবে এই দ্বিতীয় কর্ম্মচারীকে জানায় এবং তিনি যুদ্ধের স্থান কাল নির্ণয় ও বন্দোবস্ত করেন, এবং নির্দ্দিষ্টকালের বারো ঘণ্টা পূর্ব্বে যুদ্ধার্থীকে সতর্ক করিয়া দেন। তৃতীয় কর্ম্মচারী সম্পাদক এবং ধনাধ্যক্ষ। সভার কার্য্যবিবরণ রক্ষা করা, চাঁদা আদায় করা, বিল্‌ শোধ করা, চিঠিপত্র লেখা তাহার কাজ।

যাহাতে কোর্প্‌সের প্রত্যেক সভ্য নিয়মিত অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকে সভাপতি তজ্জন্য আপনাকে দায়ী জ্ঞান করেন। নূতন সভ্যগণ যাহাতে কোন বিপদে জড়িত না হয় অথবা অলসভাবে কাল যাপন না করে প্রধান সভ্যগণ তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ জর্ম্মন সমাজে বিশেষরূপে প্রচলিত। পাঠকগণ বোধ করি সম্প্রতি সংবাদপত্রে দেখিয়া থাকিবেন সেখানকার সম্রাট্‌

নিয়ম করিয়াছেন যে কোন সৈনিক কর্ম্মচারী দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহূত হইয়া যুদ্ধে অসম্মতি প্রকাশ করিলে তিনি সৈন্যশ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইবেন। আহূত হইয়া যুদ্ধে বিমুখ হওয়া প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয়দের পক্ষেও অত্যন্ত অগৌরবের বিষয় ছিল—জর্ম্মণজাতির মধ্যে সেই ক্ষত্রনীতি প্রচলিত। সুতরাং তাহাদিগকে ছাত্রাবস্থা হইতেই সমাজের উপযোগী শিক্ষা লাভ করিতে হয়। এই জন্য জর্ম্মন ছাত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রথা একটা বিশেষ গৌরবের স্থান অধিকার করিয়াছে।

নূতন সভ্যগণ কিরিচ খেলিতে শিখিবামাত্র, বিবাদের কারণ থাক্ বা না থাক্, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ক্রীড়াযুদ্ধের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়; এইরূপে তাহারা ক্রমশঃ যুদ্ধে অনুরাগী ও শস্ত্রবিদ্যায় অভ্যস্ত হইতে থাকে। তাহার পর যখন রীতিমত বিবাদমূলক যুদ্ধ বাধিয়া উঠে তখন কোর্প্‌সের নিযুক্ত ডাক্তার ও সভ্যগণের সম্মুখে নীতিরক্ষা পূর্ব্বক যুদ্ধ হইয়া থাকে। পনেরো মিনিট কালের অধিক যুদ্ধের নিয়ম নহে। সেই সময় উত্তীর্ণ হইলেই অথবা গুরুতর আঘাত প্রযুক্ত ডাক্তার থামিতে বলিলেই যুদ্ধে ক্ষান্ত দিতে হয়।

এই কোর্প্‌সের পঞ্চায়তে ন্যায় অন্যায় সম্মান অসম্মানের বিচার হইয়া থাকে। এক কোর্প্‌স্‌ভুক্ত কোন সভ্য যদি অপর সভ্যের প্রতি কোনরূপ অশিষ্টাচরণ করে তবে সে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য; যদি অস্বীকার করে তবে তাহাকে অপমানসহকারে কোর্প্‌স্ হইতে দূর করিয়া দেওয়া হয়; এবং জর্ম্মন্ সাম্রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত প্রত্যেক কোর্প্‌সের সভ্যকে পত্রদ্বারা সেই সংবাদ জ্ঞাপন করা হয়। কেহ কোন গর্হিত আচরণে লিপ্ত হইলে পূর্ব্বোক্তরূপে দেশের সমস্ত ছাত্রসমাজে তাহার কলঙ্ক ঘোষিত হয়, কেবল তাহাই নহে, সংসারে প্রবিষ্ট ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণের নিকটেও অপরা-

পত্রদ্বারা রাষ্ট্র হইয়া থাকে। এ শাসন বড় সামান্য ব্যাপার নহে।

কোর্পসের সভ্যগণ কেবল যে যুদ্ধ এবং অধ্যয়ন লইয়া থাকে তাহা নহে। তাহাদের প্রমোদ সভাও আছে। সঙ্গীত এই প্রমোদ সভার প্রধান অঙ্গ। প্রত্যেক সভ্যের হাতে একটি করিয়া ষ্ট্যাণ্ডার্ড গানের বই থাকে, তাহাতে গানের কথা এবং স্বরলিপি প্রকাশিত আছে। জর্ম্মানিতে প্রায় প্রত্যেক বিদ্যালয়ে স্বরলিপি দেখিয়া গান গাওয়া শেখানো হয় এই জন্য এই সকল প্রমোদ সভায় সঙ্গীত নিদারুণ কোলাহলে পরিণত হয় না। কণ্ঠস্বর তরুণ পুরুষোচিত প্রবল, সুরগুলি সহজ এবং প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ, গানের কথাগুলি সরল এবং মহৎ,কারণ তাহা বড় বড় কবির কাব্য হইতে নির্ব্বাচিত। কবিতাগুলির ভাব দেশানুরাগ অথবা সখ্যমূলক, মোটের উপরে, জাতিসাধারণের অন্তরের কথা। এই ছাত্রসভার সম্মিলিত সঙ্গীত-ধ্বনিতে হৃদয় কি রূপ মুগ্ধ এবং উর্দ্ধে বহমান হইতে থাকে, তাহা, যাহারা না শুনিয়াছে তাহারা বুঝিতে পারিবে না। জর্ম্মণদের জীবনযাত্রায় সঙ্গীত একটি প্রধান অঙ্গ। সাধারণের মধ্যে স্বদেশা-নুরাগ প্রচার করিবার এমন উপায় আর নাই, এবং এমন শান্তি-পূর্ণ বিশুদ্ধ আমোদও আর কিছু হইতে পারে না।

আমরা খ্যাতনাম্নী ঔপন্যাসিক ম্যারিয়ন ক্রফর্ডের গ্রাইফেন্-ষ্টাইন্ গ্রন্থে প্রকাশিত জর্ম্মণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণ্ হইতে কিয়দংশ উপরে সংকলিত করিয়া দিলাম। সম্প্রতি বাঙ্গালী ছাত্রদের নীতি-সংশোধনের জন্য নানারূপ সভা এবং চেষ্টা দেখা দিতেছে। এ সময়ে উক্ত বিবরণ আমাদের প্রয়োজনে লাগিতে পারে। আমা-দের বিশ্ববিদ্যালয়ও জর্ম্মণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় বক্তৃতাশালা। সাধারণতঃ ছাত্রদের নীতি এবং আচরণ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের

কর্ত্তৃপক্ষের কোন হাত নাই এবং হাত থাকাও সম্ভব নহে। ছাত্রগণ যদি নিজেরা উদ্যোগ করিয়া দল বন্ধন করে এবং আপনাদিগকে কঠিন নিয়মে বদ্ধ করিতে পারে তবেই তাহাদের স্থায়ী মঙ্গল হইতে পারে। দল বাঁধিবার এবং নিয়মে চলিবার শিক্ষা বাঙ্গালীর পক্ষে যেমন আবশ্যক এমন আর কিছুই নহে। কেবলমাত্র স্বার্থ এবং ভয়ের শাসনই আমাদের নিকট বলবান- কিন্তু নিয়মের শাসনে আপনাকে বদ্ধ করিতে শিখি নাই বলিয়া কোন বৃহৎ অনুষ্ঠান আমাদের দ্বারা সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাণের ভয় ত্যাগ করিবার শিক্ষাও মানুষ হইয়া উঠিবার পক্ষে একটি প্রধান সাধনা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ছাত্রদিগকে তলোয়ার খেলিতে দিতে আমাদের রাজা অথবা সমাজ কেহই সম্মত হইবেন না অতএব সে দুরাশা ত্যাগ করিতে হয় তথাপি যখন আমরা য়ুরোপের স্বদেশপ্রিয় নির্ভীক বীরজাতিগণের মহৎ উদ্দেশ্যে আত্মবিসর্জ্জনের আদর্শ দেখিয়া মুগ্ধ হই এবং মনে করি কেবল দরখাস্ত লিখিয়া এবং সভা করিয়া আমরা সেই মহত্ত্ব লাভ করিব তখন যেন স্মরণ করি যে, জীবনের প্রতিপদে এবং সমাজের সহস্র প্রথায় তাহারা নির্ভীক হইতে, উদ্যোগী হইতে, মহৎ হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছে। আমাদের দেশে ব্রহ্মচর্য্য যেমন কঠিন আশ্রম ছিল ক্ষাত্রচর্য্যও তদপেক্ষা অল্প কঠিন নহে।

গান।

[অনুবাদ।]

(Hark, hark, the lark at heaven's gate sings.—
Cymbeline.)

ঐ শুন সখি স্বর্গতোরণে
চাতক তুলেছে মধুতান।
সূর্য্যদেবতা পূর্ব্বগগণে
খুলিয়া দেছেন স্বর-যান।
সরসে কমল-কুসুমপাত্র
অমল কিরণে ভরিয়াছে ;
তীরেতে অতসী এখনি মাত্র
কনক নেত্র মেলিয়াছে।
নিখিলের যত মোহিনী সৃষ্টি
সবারি সঙ্গে তুমিও, প্রাণ,
উঠ—উঠ—
জাগ, মধুমতী, খুল নয়ান!

সমালোচনা।

হাসি ও খেলা। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত। মূল্য দশ আনা।

বইখানি ছোট ছেলেদের পড়িবার জন্য। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। ছেলেদের জন্য যে সকল বই

আছে তাহা স্কুলে পড়িবার বই; তাহাতে স্নেহের বা সৌন্দর্য্যের লেশমাত্র নাই; তাহাতে যে পরিমাণে উৎপীড়ন হয় সে পরিমাণে উপকার হয় না।

ছেলেরা অত্যন্ত মূঢ় অবস্থাতেও কত আনন্দের সহিত ভাষা-শিক্ষা এবং কিরূপ কৌতূহলের সহিত বস্তুজ্ঞান লাভ করিতে থাকে তাহা কাহারও অগোচর নাই। প্রকৃতি যে নিয়মে যে প্রণালীতে ছেলেদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, মানুষ তাহার অনুসরণ না করিয়া নিজের পদ্ধতি প্রচার করিতে গিয়া শিশুদিগের শিক্ষা অনর্থক দুরূহ করিয়া তুলিয়াছে এবং তাহাদের আনন্দময় সুকুমার জীবনে একটা উৎকট উপদ্রব আনয়ন করিয়াছে।

শিক্ষা দিতে হইলে শিশুদের হৃদয় আকর্ষণ করা বিশেষ আবশ্যক; তাহাদের স্বাভাবিক কল্পনা শক্তি এবং কৌতূহল প্রবৃত্তির চরিতার্থতাসাধন করিয়া তাহাদিগকে জ্ঞানের পথে অগ্রসর করিতে হইবে; বর্ণমালা প্রভৃতি চিহ্নগুলিকে ছবির দ্বারা সজীব এবং শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে ভাল ভাল চিত্রের দ্বারা মনের মধ্যে মুদ্রিত করিয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ, এক সঙ্গে তাহাদের ইন্দ্রিয়-বোধ, কল্পনা শক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন সাধন করিতে হইবে। সেইরূপ করা হয় না বলিয়াই অধ্যাপনার জন্য শিশু-দিগকে বিভীষিকার হস্তে সমর্পণ করিতে হয়। বালকদিগের অনেক বালাই আছে; সবচেয়ে প্রধান বালাই পাঠশালা।

পাঠশালার শুষ্ক শিক্ষাকে সরস করিয়া তুলিবার প্রত্যাশা রাখি না। কারণ, অধিকাংশ লোকের ধারণা, যে, ঔষধ যতই কুস্বাদু, চিকিৎসার পক্ষে তাহা ততই উপযোগী, এবং কঠোর ও অপ্রিয় শিক্ষাই শিশুদের অজ্ঞানবিনাশের পক্ষে সবিশেষ ফলপ্রদ। অতএব, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকপ্রণয়নের ভার বিদ্যালয়ের নিষ্ঠুর

কর্ত্তৃপক্ষদের হস্তে রাখিয়া আপাততঃ ছেলেদের ইচ্ছাপূর্ব্বক ঘরে পড়িবার বই রচনা করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে; নতুবা বাঙ্গালীর ছেলের মানসিক আনন্দ ও স্বাস্থ্যানুশীলনের এবং বুদ্ধিবৃত্তির সহজ পুষ্টিসাধনের অন্য উপায় দেখা যায় না।

হাসি ও খেলা বইখানি সংকলন করিয়া যোগীন্দ্র বাবু শিশুদিগের এবং শিশুদিগের পিতামাতার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বইখানি যেমন ভাল বাঁধানো, তেমনি ভাল করিয়া ছাপানো এবং ছবিতে পরিপূর্ণ। নিঃসন্দেহ গ্রন্থখানি অনেক ব্যয়সাধ্য হইয়াছে। আশা করি, যাহাতে প্রকাশককে ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে হয় সে জন্য বাঙ্গালী অভিভাবক মাত্রেই দৃষ্টি রাখিবেন।

এই গ্রন্থে যে রচনাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা শিশুপাঠ্য। স্থানে স্থানে ভাষা ও ভাবের কথঞ্চিৎ অসঙ্গতি দোষ ঘটিয়াছে কিন্তু সে গুলি সত্ত্বেও যে, এই বইখানি শিশুদের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। বালকদের হস্তে পড়িয়া অল্পকালের মধ্যে একখানি হাসি ও খেলার যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছে তাহা দর্শন করিলে গ্রন্থপ্রণয়নকর্ত্তা এককালে শোক ও আনন্দ অনুভব করিতেন। এরূপ গ্রন্থের পক্ষে, শিশু হস্তের অবিরল ব্যবহারে মলিন ও বিবর্ণ মলাট এবং বিচ্ছিন্নপ্রায় পত্রই সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল সমালোচনা।

সাধন সপ্তকম্। মূল্য চারি আনা।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র, শঙ্করাচার্য্যের যতিপঞ্চক, সাধনপঞ্চক, অপরাধভঞ্জন স্তোত্র, ও মোহমুদ্গার, কুলশেখরের মুকুন্দমালা, এবং বিশ্বরূপস্তোত্র বাঙ্গলা পদ্যানুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষায় এমন অনেক শ্লোক পাওয়া যায়, যাহা কেবলমাত্র

উপদেশ অথবা নীতিকথা, যাহাকে কাব্যশ্রেণীতে ভুক্ত করা যাইতে পারে না। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার সংহতিগুণে এবং সংস্কৃত শ্লোকের ধ্বনিমাধুর্য্যে তাহা পাঠকের চিত্তে সহজে মুদ্রিত হইয়া যায় এবং সেই শব্দ ও ছন্দের ঔদার্য্য শুষ্ক বিষয়ের প্রতিও সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য অর্পণ করিয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গলায় তাহাকে ব্যাখ্যা করিয়া অনুবাদ করিতে গেলে তাহা নিতান্ত নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। বাঙ্গলা উচ্চারণে যুক্ত অক্ষরের ঝঙ্কার, হ্রস্ব দীর্ঘস্বরের তরঙ্গলীলা, এবং বাঙ্গলা পদে ঘনসন্নিবিষ্ট বিশেষণবিন্যাসের প্রথা না থাকাতে সংস্কৃত কাব্য বাঙ্গলা অনুবাদে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর শুনিতে হয়। যতিপঞ্চকের নিম্নলিখিত শ্লোকে বিশেষ কোন কাব্যরস আছে তাহা বলিতে পারিনা –

পঞ্চাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তঃ
পতিং পশূনাং হৃদি ভাবয়ন্তঃ
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।—

তথাপি ইহাতে যে শব্দযোজনার নিবিড়তা ও ছন্দের উত্থানপতন আছে তাহাতে আমাদের চিত্ত গুণী হস্তের মৃদঙ্গের ন্যায় প্রহত হইতে থাকে; কিন্তু ইহার বাঙ্গলা পদ্য অনুবাদে তাহার বিপরীত ফল হয়;—

পঞ্চাক্ষর যুক্ত মন্ত্র পরম পাবন,
একান্তেতে সদা যারা করে উচ্চারণ;
নিখিল জীবের পতি, পশুপতি দেবে,
হৃদয়েতে ভক্তিভরে সদা যারা ভাবে;
ভিক্ষাশী হইয়া, সুখে সর্ব্বত্র চারণ,
কৌপীনধারীরা হেন, বটে ভাগ্যবান্

সাধনা।

য়ুরোপীয় সঙ্গীত।

পৌষ মাসের সাধনায়, 'সঙ্গীতের গঠনরীতি' শীর্ষক প্রবন্ধে, আমরা সঙ্গীতচর্চ্চার বর্ত্তমান প্রণালীর ত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। যতপ্রকার ত্রুটি আবিষ্কার করা যাইতে পারে, সবগুলি সংশোধন হইলে, আমাদের বর্ত্তমান প্রণালী সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, বলা যাইতে পারে।

তথাপি কেবল দোষ সংশোধনে আবদ্ধ থাকিলে, উন্নতিপথে অল্পদূরমাত্র অগ্রসর হওয়া যায়। অন্তরের দোষের দূরীকরণ যেমন আবশ্যক, বাহির হইতে নূতন গুণের আনয়নও তেমনি আবশ্যক।

য়ুরোপীয় সঙ্গীতরাজ্য আমাদের সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে;—ইচ্ছা হইলে, উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে, আমরা তাহার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারি, এবং অনুসন্ধান করিয়া যদি আমাদের দেশের সঙ্গীতকে অলঙ্কৃত করিবার উপযুক্ত কোন রত্ন পাওয়া যায়, তাহা হইলে পরিশ্রম সার্থক হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি?

প্রথমতঃ সকল বিষয়েই য়ুরোপীয়দের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া বিস্তর শিক্ষা লাভ করা যায়। শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য প্রত্যেক ছোট-খাট বিষয়ে যে কত দূর পর্য্যন্ত পরিশ্রম ও যত্ন করা যাইতে পারে,

তাহা যুরোপীয় দৃষ্টান্তের পূর্ব্বে, আমাদের দেশের কাহারো কল্পনা·তেও আসিত না। উপস্থিত ক্ষেত্রেও সে কথা খাটে। প্রত্যেক যন্ত্রের গঠন সম্বন্ধে উহারা কত চিন্তা করিয়াছে। কোন্ জাতীয় কাঠ ব্যবহারে কি ফল পাওয়া যায়—সে কাঠ কি ভাবে কাটিলে অল্প আয়তনে অধিক শব্দ পাওয়া যায়—তন্তু বা তারের কত লম্বাই, ওজন, টান প্রভৃতি হইলে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর আওয়াজ পাওয়া যায়—ইত্যাদি। ইহার ফলে উহাদের সামান্য ব্যাঞ্জো বা মাণ্ডোলীন যন্ত্র, যাহা ভিক্ষুকেরা রাস্তায় রাস্তায় বাজাইয়া বেড়ায়, তাহা গঠনে এবং আওয়াজে আমাদের ভাল ভাল সেতার প্রভৃতিকে লজ্জা দিতে পারে। শুধু তাহা নহে। কোন্ ভঙ্গীতে বসিলে বা দাঁড়াইলে শরীরের মাংসপেশীসকল ভালরকম কার্য্য করিতে পারে—কি ভাবে যন্ত্র ধারণ করিলে অঙ্গুলিচালনার সুবিধা হয়—তন্তু বা তারের কোন্ স্থানে ছড় বা মেজরাফ লাগাইলে আওয়াজের কিরূপ তারতম্য ঘটে—এ সকল বিষয়েও উহারা মনোযোগ দিয়া থাকে এবং এইরূপে নিজ শরীর এবং বাদ্যযন্ত্র উভয়কেই পূর্ণমাত্রায় কাজে খাটাইতে সক্ষম হয়।

ইহা ত গেল সঙ্গীতের উপকরণের কথা—বাহিরের কথা। এখন দেখা যাক উহাদের সঙ্গীতের ভিতর হইতে কি পাওয়া যায়। আমাদের সঙ্গীতের সহিত উহাদের সঙ্গীতের সাতটি মূল সুর এবং পাঁচটি কোমল সুরের যা ঐক্য। ইহা ছাড়া আর সকলই ভিন্ন। তবে প্রধানতঃ দুইটি মূল প্রভেদের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১। সুরের গঠনপ্রণালীর ভিন্নতা।

২। যুরোপীয় সঙ্গীতে স্বরমিশ্রণ প্রণালীর প্রাধান্য এবং দেশীয় সঙ্গীতে উহার অভাব।

এই দুইটির মধ্য হইতে গ্রহণ করিবার উপযুক্ত কিছু পাওয়া যাইতে পারে কি না, বিচার করিবার পূর্ব্বে স্মরণ রাখা উচিত আমরা দেশী সঙ্গীত পরিবর্ত্তন করিতে বসি নাই, উহার জন্য অলঙ্কার সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি মাত্র। যেহেতু, য়ুরোপীয়দের অনেকগুলি ভাল গুণ আমাদের দেশে স্থান পাওয়া বাঞ্ছনীয় হইলেও হঠাৎ সাহেব সাজিতে গেলে কোন উপকার হয় না, পরন্তু ফিরিঙ্গিতে পরিণত হইতে হয়; অথবা যেহেতু, য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে বঙ্গসাহিত্যের অনেক উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও, ভাষার গঠনের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া য়ুরোপীয় ভাব ঢুকাইতে গেলে, বঙ্গভাষার মর্য্যাদা রক্ষা হয় না; সেইহেতু দেশী সঙ্গীতের উন্নতি করিতে গিয়া উহার দেশীত্ব নাশ না হয়, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

এখন বিবেচ্য এই যে আমাদের সঙ্গীতের বিশেষত্ব কোন্ খানে? কতখানি এবং কিরূপে পরিবর্ত্তন করিলে উহা ক্ষুণ্ণ হইবে? আমাদের বিবেচনায় সুরের গঠনপ্রণালী বজায় রাখিলে আর কোন গোল হইবে না। গঠন যে একেবারে অপরিবর্ত্তনীয় তাহা নহে। আদিম কাল হইতে আমাদের সঙ্গীতের গঠন নিশ্চয়ই অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও সম্ভবতঃ পরিবর্ত্তিত হইবে। কিন্তু এ পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক নিয়মানুসারে হইয়া থাকে সুতরাং উহাতে আমাদের হস্তক্ষেপ না করাই ভাল। অতএব য়ুরোপীয় গঠনপ্রণালী হইতে আমরা বিশেষ কিছু আদায় করিতে পারিব না।

তবে য়ুরোপীয় সুর হইতে যে আমরা কোন রকম উপকার পাইতে পারিব না, এমন নহে। দেশী সুরের গঠন যেমন আছে তেমনি রাখিয়া আমরা উহাদের সুর গ্রহণ করিতে পারি। গীতি-

নাট্যে কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় বিশেষ সুর দরকার। এ স্থলে সচরাচর চলিত সুর দিলে ভাবের সে বিশেষত্ব রক্ষা হয় না। এই জন্য গীতিনাট্যে বিদেশী সুর অনেক সময়ে খুব কাজে লাগে। কতকগুলি গুজরাটী গীতিনাট্যে বিলাতি সুর এরূপ কাজে লাগান হইয়াছে। বাঙ্গলায়ও, সাধনাসম্পাদক-মহাশয়কৃত 'বাল্মীকি-প্রতিভা' গীতিনাট্যে, অনেকগুলি য়ুরোপীয় সুর ব্যবহার করিয়া ফল পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া অন্য গানেও সুযোগমত বিলাতী সুর প্রয়োগ হইতে পারে। গোয়াদ্বীপের নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেক পোর্ত্তুগীজ সুর চলিত আছে। মান্দ্রাজ অঞ্চলেও ইংরাজি সুরের (বেশীর ভাগ মজার গানে) ব্যবহার দেখা যায়। সব গুলি কিছু উপযোগিতা হিসাবে নির্ব্বাচিত অথবা উপযুক্ত কথার সহিত বসান হয় নাই। কিন্তু ভাল (অর্থাৎ দেশী ভাবের উপযোগী) সুর যদি বাছিয়া লওয়া হয় এবং তাহাতে উপযুক্ত কথা বসান হয় তাহা হইলে অনেকগুলি ভাল গান তৈয়ারী হইতে পারে।

অবশ্য এ দোআঁসলা গানগুলাকে খাঁটি য়ুরোপীয় ঢঙে গাহিলে আমাদের কাণে বড় অদ্ভুত লাগিবে সেই জন্য দেশী খোঁচখাঁচ দিয়া একটু পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া আবশ্যক। স্বরলিপির স্থানে দুইটি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত গানের নমুনা দেওয়া যাইতেছে। প্রথমটির সুর পর্ত্তুগীজ—ভাবে বোধ হয় ইহা কিছু বদলান হইয়াছে। দ্বিতীয়টি স্কচ্—উহা প্রায় খাঁটি অবস্থাতেই আছে। এই দুইটি দৃষ্টান্ত হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে বাঙ্গালা কথার সহিত বিলাতী সুর কেমন খাপ খাইতে পারে। * । এইরূপ গানের সুর

* ভারতী ১৬শ ভাগ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত "মন্দঃ মন্দঃ" এবং ভারতীর অপর এক সংখ্যায় প্রকাশিত "সকাতরে ওই" এই দুইটি গান পর্ত্তুগীজ সুরের আর দুইটি দৃষ্টান্ত।

সংগ্রহ ছাড়া য়ুরোপীয় সুর-গঠনপ্রণালী হইতে আর বড় কোন উপকার পাওয়া যাইবে না।

কিন্তু, স্বরমিশ্রণ প্রণালী আমাদের সঙ্গীতে সম্ভবমত প্রয়োগ করা হইলে, বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। আমাদের সঙ্গীতে যে স্বরমিশ্রণ মোটেই করা হয় না তাহা নহে। গান গাহিবার সময়ে একটি সুর ধরিয়া রাখিলে এক রকমের স্বরমিশ্রণ হয়। গানের প্রত্যেক স্বরের সহিত এই খরজ যুক্ত হইতে থাকে। তানপুরায় ষড়জপঞ্চমের রেশে অথবা সেতারাদির ষড়জপঞ্চমের ঝঙ্কারে মূল সুরের প্রত্যেক স্বরের সহিত উক্ত দুইটি স্বর যুক্ত হইতে থাকে। ইহা অপেক্ষা জটিল স্বরসংযোগও দৈবাৎ শুনা যায় যথা, যখন গানের সহিত এসরাজ বা সারঙ্গী বাজিতেছে, গাইয়ে যখন তান দিতেছেন বাজিয়ে তখন সাদাসিধা ভাবে বাজাইতেছেন, আবার গাইয়ে যখন সুরে ফিরিয়া আসিতেছেন তখন বাজিয়ে তান দিতেছেন।

কিন্তু, এ সকল থাকিলেও, ইহার ভিতরকার নিয়মটা কেহ জানেন না—সে বিষয়ে কেহ চিন্তাও করেন না; সেই জন্য এক সুর গাওয়া বা বাজান অপেক্ষা, এইরূপ স্বরমিশ্রণের দ্বারা, কিছু সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় না—বরং অনেক সময়ে সৌন্দর্য্য খর্ব্ব হইতে দেখা যায়। মনে করা যাক তানপুরার সহিত গান হইতেছে। গাইয়ে ষড়জ পঞ্চম অথবা গান্ধার উচ্চারণ করিবার সময়ে কোন গোল নাই, কিন্তু রেখাব অথবা ধৈবতের সঙ্গে তানপুরায় ষড়জ-পঞ্চমের যোজনা কিছু বিরক্তিজনক বোধ হইবে, * এবং নিখাদ অথবা মধ্যমের সহিত (কোমল সুরগুলির ত কথাই নাই) ষড়জ-

* পূর্ব্ব নোটে উল্লিখিত "সকাতরে" গানের স্বরলিপিতে প্রথম প্রণালী সঙ্গতের ভাল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

পঞ্চম একেবারেই কর্কশ লাগিবে। গান যখন চলিতেছে তখন, কতকটা গানের দিকে সমস্ত মনোযোগ থাকাতে, কাহারো কানে ইহা ততটা নাও ঠেকিতে পারে ; কিন্তু হার্মোনিয়ম যন্ত্রে উল্লিখিত সুরগুলি একত্র বাজাইয়া দেখিলে, সুরজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই পীড়া বোধ হইবে। এখন সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যে জিনিষ মনোযোগ এবং শিক্ষার অভাবে পার পাইয়া যায় অথচ শিক্ষিত ব্যক্তি মনোযোগ দিলে নিতান্তই কর্কশ বোধ করে, তাহা সংশোধনের যোগ্য। এ স্থলে য়ুরোপীয় প্রণালী অবলম্বন করিলে কি হইত ? য়ুরোপীয়েরা আমাদের তানপুরার ন্যায় গানের সহিত গ্বিতার যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। এই যন্ত্রে সেতারের মত পর্দ্দার দ্বারা সুর বদলাইবার উপায় আছে সুতরাং উহারা ষড়জ, গান্ধার অথবা পঞ্চম গাহিবার সময়ে যেমন ষড়জ পঞ্চমের ঝঙ্কার দিতে পারে তেমনি রেখাব, মধ্যম অথবা ধৈবত উচ্চারণের সময় রেখাব ধৈবতের ঝঙ্কার দিতে পারে এবং এইরূপে স্বরমিশ্রণের নিয়মানুসারে প্রত্যেক স্বরের সহিত তাহার উপযুক্ত স্বরসমষ্টি যোজনা করিতে পারে।

এই নিয়মগুলি আমাদের প্রথমতঃ শিক্ষা করা উচিত। কিন্তু শুধু য়ুরোপীয় শিক্ষাপুস্তক হইতে নিয়ম শিখিলেই যথেষ্ট হইবে না। সেগুলি আমাদের সঙ্গীতে প্রয়োগ করিবার নিয়ম আবিষ্কার করিতে হইবে। স্বরমিশ্রণ শাস্ত্রে দুই শ্রেণীর নিয়ম আছে। এক শ্রেণীয়কে প্রাকৃতিক বলা যাইতে পারে। কোন্ দুই বা অধিক স্বর যুক্ত হইলে ভাল শুনাইবে ইহা বৈজ্ঞানিক নিয়ম জানিলে বলিয়া দেওয়া যায়। এ জাতীয় নিয়ম সকল সঙ্গীত শাস্ত্রে বজায় থাকিতেই হইবে—ইহা অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু আর এক শ্রেণীর নিয়ম আছে যাহাতে কোন্ স্বরসমষ্টির পর কোন্‌টি থাকিলে রচনা

ভাল হয় তাহার বিধান পাওয়া যায়। এ বিধান সুরের গঠন-প্রণালী অনুসারে বদলাইবার কথা এবং সম্ভবতঃ য়ুরোপীয় সঙ্গীতে এবং আমাদের সঙ্গীতে ভিন্ন হইবে।

এ সব বিষয়ে বিচার করিতে হইলে বোধ জন্মান আবশ্যক এবং আমাদের দেশে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের চর্চ্চা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। দুরদৃষ্টবশতঃ আমরা য়ুরোপীয় সঙ্গীতের প্রথম নমুনা-স্বরূপ খেলো ইংরাজি গান শুনিতে পাই। সেগুলিকে যে আমরা শৃগাল কুক্কুরের ডাকের সহিত তুলনা করিয়া থাকি তাহা কেবলমাত্র আমাদের বোধশক্তির অভাবে নহে। য়ুরোপীয়েরাও এইগুলিকে ঠাট্টা করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া গলার আওয়াজ সম্বন্ধে য়ুরোপীয়দের সহিত আমাদের রুচির বিশেষ ভেদ আছে। উহারা যে রকম গলায় গান গাহিতে ভালবাসে তাহা অভ্যাস হইতে আমাদের একটু সময় লাগে। কিন্তু রসজ্ঞ শিক্ষার্থী যদি প্রথম নমুনায় পিছপাও না হইয়া ইতালীয় জর্ম্মাণ প্রভৃতি সঙ্গীতের চর্চ্চা করেন তাহা হইলে ভরসা করিয়া বলা যাইতে পারে যে তিনি পরিশ্রমের শতগুণ মূল্য পাইবেন।

তবে এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে প্রথমবার উহাদের কোন শ্রেষ্ঠ বাদ্যরচনা শুনিলেই কিন্তু ভাল লাগিবে না। এমন কি বার দুইতিন শুনিলেও সহসা রসগ্রহণ ক্ষমতা জন্মাইবে না। আমাদের পক্ষে উহাদের সঙ্গীতের রসগ্রহণ করা দুই কারণে বিশেষ শক্ত। প্রথমতঃ উহাদের সুরগঠন প্রণালীর সহিত পরিচয় না থাকাতে কোন স্বরশ্রেণীকে একটা সুর বলিয়া হয়ত ধরিতেই পারা যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ একটি রচনার সমগ্র স্বর-বিন্যাসের মধ্য হইতে কোন কয়টি স্বরের দ্বারা মূল সুরটি গঠিত হইতেছে এবং কোন্ স্বরগুলি আনুষঙ্গিক ভাবে ব্যবহার করা হই-

তেছে মাত্র, ইহা পৃথক করিয়া ধরা অভ্যাস ব্যতীত একপ্রকার অসম্ভব।

এই আনুষঙ্গিক স্বরগুলি মূল সুরের সহিত দুই ভাবে যুক্ত হইয়া থাকে। এক প্রণালী অপেক্ষাকৃত সহজ। ইহাতে প্রধান সুর স্বতন্ত্র ভাবে বাজিতে থাকে এবং খাদের দিকের কতকগুলি স্বরসমষ্টি সঙ্গে সঙ্গে তাল রাখিয়া সঙ্গতের কার্য্য করে। এইরূপ সঙ্গতের দ্বারা কতকটা তানপূরার অনুরূপ কানে সুর থাকে কতকটা তবলা জাতীয় যন্ত্রের অনুরূপ নানা বোলের দ্বারা তালের বিচিত্র ভাব প্রদর্শন করা হয়, এবং উপরন্তু প্রধান সুরের ভাবের ব্যাখ্যার কার্য্যও হইয়া থাকে। অতএব এ প্রণালী যে আমাদের সুরের সঙ্গৎ হিসাবে বিশেষ কাজে লাগিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সাদাসিধা ভাবের সুরের পক্ষে—উল্লিখিত প্রণালীর সঙ্গৎ যথেষ্ট। কিন্তু এমন অনেক সুর আছে যাহার মধ্য হইতে অনেক জটিল ভাব আদায় করা যাইতে পারে। তাহার উপায়স্বরূপ য়ুরোপীয় সঙ্গীতে আর এক প্রণালী ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহাতে মূল সুরের সঙ্গৎ হিসাবে পূর্ব্ব প্রণালীর ন্যায় কতকগুলি গঠনহীন স্বরসমষ্টির পরিবর্ত্তে, দুইতিনটি স্বতন্ত্র সুর তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাজিতে থাকে। এই সুর কয়টির প্রত্যেক ছত্র পরস্পরের সহিত স্বরমিশ্রণের নিয়মানুসারে মিলিত হইতে থাকে। এইরূপে যে সৌন্দর্য্যের কত দূর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পারে তাহা যে না শুনিয়াছে তাহার ভালরূপ ধারণা হওয়াই কঠিন। পূর্ব্ব প্রণালীতে মনের কোন একটি ভাবকে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া তাহার নানা অবস্থা দেখান যাইতে পারে।

মনে করা যাক প্রিয়বিয়োগশোকে কেহ কাতর আছে; সমস্ত দিনের বৈষয়িক ঝঞ্ঝাটের পর, শরীর মনের ক্লান্তির সঙ্গে

সঙ্গে শোকেরও কিয়ৎ পরিমাণে উপশম হইয়াছে; বাহ্য প্রকৃতি, জ্যোৎস্নালোক এবং মলয় বাতাসের দ্বারা, মনকে শান্তি প্রদান করিবার সাহায্য করিতেছে; সম্ভবতঃ উপস্থিত দুঃখের তীব্রতার হ্রাস হওয়াতে পূর্ব্ব সুখদুঃখের স্মৃতি মনের মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। এ অবস্থায় বাহিরে শান্তি, মনে সুখদুঃখপ্রবাহ, কিন্তু তথাপি উভয় ভাবের মধ্য দিয়া, উভয়কেই অতিক্রম করিয়া, দুর্দ্দমনীয় শোক মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে, সে চলিয়া গেছে, আর° আসিবে না,—এই কথা, একঘেয়ে সুরের ন্যায়, আঁর সমস্ত ভাবপ্রবাহের সহিত, কখন প্রধান কখন অপ্রধান আকারে, ধ্বনিত হইতে থাকিবে। এইরূপ একটি অবস্থা সুর-সম্মিশ্রণের দ্বারা অতি সুন্দররূপে চিত্রিত করা যায়। শুধু তাহা নহে। এই দ্বিতীয় সুরসম্মিশ্রণ প্রণালীর দ্বারা নাট্যকাব্যের অনুরূপ রচনা সম্ভব—যাহাতে, এক পক্ষে ছত্রে ছত্রে গীতিকাব্যের সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায়, প্রত্যেক লোকের চরিত্রগঠনের নৈপুণ্যে চমৎকৃত হইতে হয়, অপর পক্ষে সমগ্র রচনার কল্পনার মহত্ত্ব-জনিত আনন্দও উপভোগ করা যায়।

শিক্ষার্থীকে পুনর্ব্বার সাবধান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য যে এ সকল জটিল উঁচুদরের য়ুরোপীয় সঙ্গীতের রসগ্রহণে ইচ্ছুক হইলে পরিশ্রম আবশ্যক। কিন্তু এ পরিশ্রমের আবশ্যকতা দোষস্বরূপ গণ্য হইতে পারে না। উচ্চশ্রেণীর সুখের অধিকারী হইতে গেলে নিজেকে তাহার উপযুক্ত করিবার নিমিত্ত কষ্ট স্বীকার করা অনিবার্য্য। যে লোক মেঠোসুরে অভ্যস্ত, কালোয়াতী গান তাহার ভাল না লাগিতে পারে কিন্তু সেটা কালোয়াতী গানের দোষ নহে। তেমনি য়ুয়োপীয় সঙ্গীতের রসগ্রহণ করিতেও বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক।

জর্ম্মণির একজন শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ বেটোফেনের বাজনার স্বর-সম্মিশ্রণপ্রণালীর দ্বারা সঙ্গীতের উৎকর্ষ কতদূর হইতে পারে তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু উহাঁর কোন রচনা, প্রথমবার শুনিলে, অনভ্যস্ত ভারতবর্ষীয় শ্রোতার নিকট কতকগুল নিরর্থক শব্দের মত বোধ হইবে। যদি সে ব্যক্তি, পরিশ্রম করিয়া সাধারণ য়ুরোপীয় গানবাজনা শিক্ষার পর, আবার সেই একই রচনা শোনে তাহা হইলে স্থানে স্থানে হয়ত সুরের আভাস পাইতে থাকিবে। শুভাদৃষ্টক্রমে যদি এই একই রচনা বার কতক শিক্ষার্থীর কর্ণে পতিত হয়, তাহা হইলে সে আবিষ্কার করিবে যে জিনিষটি ক্রমে বড়ই ভাল লাগিতে আরম্ভ করিয়াছে। এরূপ বার দশেক আবৃত্তির পর, তবেই এই এক রচনার মধ্যে বুঝিবার কতটা আছে তাহা সে প্রকৃত পক্ষে ধরিতে পারিবে। সে দেখিবে যে, য়ুরোপীয় সঙ্গীতে সে এক অগাধ সৌন্দর্য্যখণি প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং অশিক্ষিত অবস্থায় তাহার নিকট যাহা প্রস্তররাশি বলিয়া বোধ হইত, এক্ষণে তাহার প্রত্যেকটি এক একটি অমূল্য রত্ন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।

যে সাধন করিতে হইবে তাহা কিছু কঠিন, কিন্তু যে ফল পাওয়া যাইবে তাহা ততোধিক সুখদায়ক—ইহাই আমাদের অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতানুসারে, সঙ্গীতানুরাগী পাঠকগণের নিকট আমাদের বক্তব্য এই যে, অভ্যাস এবং সংস্কারের জড় বাধা অতিক্রম করিয়া মানুষের আনন্দের পরিধি বিস্তৃত করিয়া দেওয়া আমাদের পরম কর্ত্তব্য। যেমন ইংরাজি সাহিত্য হইতে অকুণ্ঠিত চিত্তে আমরা বিচিত্র ভাব গ্রহণ করিতেছি, তেমনি য়ুরোপীয় সঙ্গীত হইতে সৌন্দর্য্য আহরণ করিয়া আমাদের স্বদেশীয় সঙ্গীতের আনন্দ-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া তুলিলে তদ্দ্বারা আমাদের

দেশানুরাগ ক্ষুণ্ণ হইবে না, পরন্তু তাহাতে আমাদের দেশহিতৈষিতাই চরিতার্থ হইবে।

স্বরলিপি।

কর্ণাটী ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও
ফিরায়ো না জননী।
দীনহীনে কেহ চাহে না তুমি তারে রাখিবে জানি হে।
আর আমি যে কিছু চাহিনে চরণতলে বসে থাকিব.
আর আমি যে কিছু চাহিনে জননী বলে শুধু ডাকিব,
তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথায়
কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াব!
ঐ যে হেরি তমসঘনঘোরা গহন রজনী।

৪।২

সা রা ॥ গা -া গা -া। গা -মগা রা -গা। পা মা গা রগরা।
ব ড় ॥ আ — শা —। ক — রে —। এ সে ছি গো।

। সা সা রা গরা। সা -া -া -া। সা ধ্া সা রা।
। কা ছে ডে কে। ল — — ও। ফি রা য়ো —।

। পা -া -া মা। গা রগরা সা রা ॥ পা -া ধা না।
। না — — জ। ন নী ব ড় ॥ দী — ন হী।

। র্সা -া -া নধা। পা ধা পা মা। গা -া -া -মগা।
। নে — — —। কে হ চা হে। না — — —।

। রা -া গা সা। রগরা -া -া -া। সা ন্া প্া ধ্া।
। তু — মি তা। রে — — —। রা — খি বে।

। রা -া সগরা -া। সা -া -া -া। সা -া গা রা।
। জা — নি —। হে — — —। আ র্ আ মি।

। গা -া -া -া। পা মা গা রা। ধা -া -া -া।
। যে — — —। কি ছু চা হি। নে — — —।

। সা ন্া ধ্া ন্া। রা -া -া গরা। সা ন্া ধ্া ন্া।
। চ র ণ ত। লে — — —। বং সে থা কি।

। প্া -া -া -া। সা -া গা রা। গা -া -া -া।
। ব — — —। আ র্ আ মি। যে — — —।

। পা মা গা রা। ধা -া -া -া। না ধা পা ধা।
। কি ছু চা হি। নে — — —। জ ন নী ব।

। র্সা -া -া -া। র্সা না ধা নধা। পা -া -া -া।
। লে — — —। শু ধু ডা কি। ব — — —।

। ধা না র্সা -া। পা পা পা -া। ধা না পা -া।
। তু মি না —। রা খি লে —। গৃ হ আ র।

। মা গা রা রা। ধা -া -া -া। পা মা গা রা।
। পা ই ব কো। থা — — —। কেঁ দে কেঁ দে।

। সা -ন্া ধ্া ন্া। রা -া -া -া। সা -া -া -া।
। কো — থা বে। ড়া — — —। ব — — —।

। পা -া -া -া। সা -া -া -া। রা -া -া -া।
। ঐ — — —। যে — — —। হে — — —।

। গা -া -া -া। পা মা গা রা। সা ন্‌া ধ্‌া -া।
। রি — — —। ত ম স ঘ। ন ঘো রা —।

। ধা পা মা গা। রগরা সা সা রা॥
। গ হ ন র। জ নী ব ড়॥

মিশ্র—একতালা।

ফুলে ফুলে ঢোলে ঢোলে বহে কিবা মৃদু বায়।
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়।
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়।
কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায়।

৩।৩

॥ মা -া মা। পাঃ -মঃ পা। ধা র্সা ধা। পধপা -মা পা।
॥ ফু — লে। ফু — লে। ঢো — লে। ঢো — লে।

। ধাঃ -পঃ মা। মরা -া সা। সা -রা রমা। মা -া -া।
। ব — হে। কি — বা। মৃ — দু। বা — য়।

স গ
। সা -া সা। মা -া মা। মগমা -পা পা। পমপা -ধা পা।
। ত — টি। নী — হি। ল্লো — ল। তু — লে।

। মা -া মগা। মা -ধা পা। মপমা -গা মা। রা -া সা।
। ক — ল্লো। লে — চ। লি — য়া। যা — য়।

। র্সা -া নর্সর্রা। র্সা -ঞা ধা। ঞা -া ধঞর্সা। ঞা -ধা পা।
। পি — ক। কি — বা। কু — ঞ্জে। কু — ঞ্জে।

। র্সা -ধা মা। র্স -ধা মা। র্সা -ঞর্সঞা ধা। পা -া -সা।
। কু — হু। কু — হু। কু — হু। গা — য়।

।সা -মা মা। পাঃ -মঃ পা। ধা -র্সা ধা। পধপা -মা পা।
।কি — জা। নি — কি। সে — র। লা — গি।

র
।ধাঃ -পঃ মা। মরা -া সা। সা -রা -মা। মা -া -া॥
।প্রা — ণ। ক — রে। হা — য়। হা — য়॥

ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন।

বুদ্ধচরিত।

সেই রাত্রে, অঞ্জনাব্দের ১৩৩ সনে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সিদ্ধার্থের মনে হঠাৎ দিব্যজ্ঞান উপস্থিত হয়। ধর্ম্মজগতের নিয়মই এই যে হৃদয় শূন্য হইলে দেবভাব তাহাকে অধিকার করে এবং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তাহার আয়ত্ত হয়। তিনি অনন্ত ধনের অধিকারী হইলেন,—তাঁহার আর কি চাহিবার আছে? কি ধনে তাঁহাকে ধনী করিতে পারে? পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য যে তাঁহার নিকট তুচ্ছ পদার্থ। তিনি এতদিন সিদ্ধার্থ ছিলেন—আজ হইতে বুদ্ধ হইলেন। এখন হইতে আমরা তাঁহাকে বুদ্ধ বলিয়া ডাকিব।

যে দিন এই ব্যাপারটি ঘটিল সে দিন জগতের আনন্দের আর সীমা রহিল না। কথিত আছে যে পৃথিবীতে যত বৃক্ষ ছিল সকলই সেই মুহূর্ত্তে ফল ফুলে পরিশোভিত হইল। পাষাণময় পর্ব্বতমালা হইতে নানা বর্ণের পুষ্পরাশি বিকশিত হইল এবং সমুদয় বিশ্ব যেন একটি বৃহৎ পুষ্পোদ্যানে পরিণত হইল। সমুদ্রের লবণাক্ত জল মিষ্ট হইল এবং স্রোতস্বতী স্তম্ভিত হইয়া জল-স্রোত বদ্ধ

করিল। বুদ্ধ সেই বোধিদ্রুমের সন্নিধানে ঊনপঞ্চাশৎ দিবস সমাধিতে নিমগ্ন রহিলেন। এত বৎসরের পরিশ্রম, কষ্ট, পরীক্ষা, ব্যাকুলতা অবশেষে চলিয়া গেল।

এই ঊনপঞ্চাশৎ দিনে তিনি বোধিবৃক্ষের চতুর্দ্দিকে এক এক স্থানে সাত দিন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে কিঞ্চিৎ আহার করিয়াও লইয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহার মনে এই প্রশ্নটির উদয় হয়—"এখন কি কর্ত্তব্য? আমি এত বৎসর ধরিয়া যে সাধন করিয়াছি ইহা সহজ ব্যাপার নহে। এ ধর্ম্ম অনায়াসলব্ধ হইতে পারে না। সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা অতলস্পর্শ। অধিক পরিশ্রম, আয়াস, যত্ন না করিলে আমার চতুর্ব্বর্গ সত্যকে কেহ আয়ত্ত করিতে পারিবে না। অনেক ত্যাগ স্বীকার না করিলে এই অষ্টাঙ্গ মার্গ অবলম্বন করা যায় না। সুতরাং মনুষ্যেরা এ ধর্ম্ম কি প্রকারে লইবে? তাহারা যে এখনও ষড় রিপুর বশীভূত, তাহারা যে এখনও পরিবর্ত্তনচক্রে ঘুরিতেছে। সে পরিবর্ত্তন নির্ব্বাণ অবস্থার ঠিক বিপরীত। এ ধর্ম্ম কঠিন। আমি যদি ইহা প্রচার করি, মনুষ্যেরা ইহা বুঝিতে পারিবে না এবং সমুদয় চেষ্টা বিফল হইবে। অতএব আমি যে কষ্ট পাইয়াছি তাহাই যথেষ্ট, দুর্ব্বল মানবদিগকে অনর্থক কষ্টে ফেলিয়া কোন লাভ নাই।" বুদ্ধ এই ভাবিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন এমন সময় ব্রহ্মা হঠাৎ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইলেন। তিনি স্বর্গে থাকিয়া বুদ্ধের মনে কি হইতেছিল তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বুঝিতে পারিয়াই মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া বুদ্ধের সম্মুখে আগমন করিয়া তাঁহাকে এই নিবেদন করিলেন—"হে বুদ্ধ, তুমি নব ধর্ম্ম লোকদিগকে দান করিতে কুণ্ঠিত হইও না। দেখ, মানবকুল ধ্বংসপ্রাপ্তির দিকে উন্মুখ হইয়াছে। তাহাদিগের অবস্থা অতিশয় শোচ-

নীয়। তাহারা অহোরাত্র অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। অজ্ঞানে চক্ষু উন্মীলিত করিতে পারিতেছে না। বিপন্ন হইয়া হাহাকার করিতেছে। সদ্ধর্ম্ম দিয়া তাহাদিগকে বিপদ হইতে মুক্ত কর। যাহা তুমি এত আয়াস সহকারে লাভ করিয়াছ তাহা অনর্থক হইতে দিও না। নির্ব্বাণ-মুক্তি প্রচার কর, জীবকুলের গতি হউক।" যখন ব্রহ্মার এই বচনগুলি তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি আর নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না। হঠাৎ এক অপূর্ব্ব দয়া তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিল। তিনি দেখিলেন যে 'বাস্তবিক জগত পাপে দগ্ধ হইতেছে বাস্তবিক অজ্ঞানবশতঃ লোকেরা ভ্রান্ত হইয়া পথহারা হইয়াছে। যদি তিনি দয়া না করেন, তাহা হইলে কে আর দয়া করিবে? অতএব "নিশ্চিন্ত থাকিব না, লোকদিগকে ধর্ম্ম দিব" এই বলিয়া ব্রহ্মার নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন। ব্রহ্মা এই কথা শুনিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এই আখ্যায়িকা হইতে আমরা একটি শিক্ষা পাইতেছি। বুদ্ধ যে নিরীশ্বর ছিলেন না, তাহা এই কথা হইতে প্রমাণিত হইতেছে। তাঁহার ধর্ম্মে ঈশ্বরের স্থান ছিল না, এ কথা সত্য। কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে ছাড়েন নাই, এ কথাও সত্য। তিনি প্রত্যাদেশের দ্বারা চালিত হইতেন। বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার সমুদয় ইতিহাস এই কথার পরিচয় দিতেছে। এই যে তাঁহার মনে নিরাশা ও নিরুদ্যম ভাব আসিয়াছিল, এই যে তিনি মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার ধর্ম্ম লোকে গ্রহণ করিতে পারিবে না—এবং সেই জন্য তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া নিজের ধর্ম্ম নিজের কাছে রাখিতে প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন—এই যে তাঁহার মনের ভাব কি উপায়ে সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল? ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভগ্ন করিলেন, ব্রহ্মার কথা শুনিবামাত্র তাঁহার মন দয়াতে পূর্ণ হইল। বাস্তবিক এই ঘট-

নাটি ধর্ম্মের একটি আশ্চর্য্য নিয়মকে প্রমাণ করিতেছে। ধর্ম্মের নিয়ম, এই যে, মন শূন্য হইলেই তাহাতে তৎক্ষণাৎ দেব-ভাবের আবির্ভাব হয়। যখনই বুদ্ধ কামনা নির্ব্বাণ করিলেন, তখনই কি হইল? তাঁহার মন হইতে পাপচিন্তা গেল। এবং পাপ-চিন্তা গিয়া কি আসিল? দয়া। অর্থাৎ কি না একটি মন্দ গিয়া তৎপরিবর্ত্তে একটি ভাল আসিল। দয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ। জীবে দয়া—কেবল মানবদিগের প্রতি দয়া নহে, সমুদয় জীবদিগের প্রতি দয়া—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, যাহাদিগের জীবন আছে, তাহাদিগের প্রতি দয়া করা বৌদ্ধদিগের প্রথম কর্ত্তব্য। তাহার পর অন্য সকল পুণ্য আসিবে। আপাততঃ ইতি-হাসের কথাতে এইটি প্রমাণীকৃত হইল যে যেমন বুদ্ধের হৃদয় শূন্য হইল, তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে দয়া আসিল। সে দয়া তিনি কোথা হইতে পাইলেন? আপনা হইতে পান নাই। স্বর্গ হইতে সে কথা আসিয়াছিল। তিনি বলিতেছিলেন—আমি নিস্তব্ধ হইয়া থাকিব। ব্রহ্মা বলিলেন, না। বুদ্ধের পর গ্রীস-দেশীয় সক্রে-টিস্ ঠিক সেই কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বুদ্ধির দিক হইতে মন শূন্য করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন যে তাঁহার মন অজ্ঞানে পূর্ণ। অন্য সকলে বলিত—"আমি এই জানি এবং এই জানি"। তিনি জানিতেন যে তিনি কিছুই জানিতেন না। যে মুহূর্ত্তে তিনি এই সত্যটি হৃদয়ে স্পষ্ট-রূপে অনুভব করিলেন, সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার অন্তর হইতে অহ-ঙ্কার দূর হইল এবং সেই মুহূর্ত্তে তিনি অন্তররাজ্যে দৈববাণী শুনিতে লাগিলেন। কোন একটি দৈবশক্তি বা দৈব পুরুষ তাঁহাকে সর্ব্বদা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিষয় আদেশ দিতেন। তিনি সেই শক্তি বা পুরুষকে Demon বলিয়া ডাকিতেন। বুদ্ধ সম্বন্ধে যে

ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল, এটি আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি। Demon না আসিয়া ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিও না। জীবেরা অজ্ঞানবশতঃ মৃতপ্রায় রহিয়াছে, অতএব শীঘ্র প্রচারে বাহির হও।" ইহাকেই প্রত্যাদেশ বলা যায়, এবং ইহা দৈব ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে বুদ্ধের মনে দয়া আসিল কেন? অন্য কোন ভাব আসিল না কেন? প্রাকৃতিক নিয়মে দয়াই আসিবে ইহার কারণ কি? তাহার উত্তর এই যে, যতদিন মানুষ সংসারে বদ্ধ থাকে, তত দিন তাহার দয়া মমতা সকলই গৃহের চারি প্রাচীরের মধ্যে সঙ্কীর্ণভাবে অবস্থিতি করে, এবং তাহার হৃদয় প্রশস্ত হইতে পারে না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে সংসার-শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হয়, যখন তাহার আর পরিবার থাকে না, আপনার বলিবার আর কিছুই থাকে না, যখন পাপ পর্য্যন্ত হৃদয়কে ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তখন তাহার হৃদয় সঙ্কীর্ণ না থাকিয়া বিশ্বব্যাপী হয়, তখন সে কয়েক জনের না হইয়া সমগ্র মানব-জাতির হয়। তাহার স্নেহ, তাহার মায়া, তাহার দয়া সকল লোকের প্রতি প্রধাবিত হয়। আমরা এটি অনেক মহাপুরুষ-দিগের জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহারা সংসার হইতে মুক্ত হইয়াই জীবদিগের জন্য কাঁদিতে থাকেন। এটি অতি স্বাভাবিক ভাব। কেন না দয়ার অপেক্ষা প্রবল শক্তি আর কি আছে? যেমন বাষ্পের দ্বারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শকট এবং অর্ণবযান চালিত হয়, তেমনি দয়া দ্বারা উত্তেজিত হইয়া মহাপুরুষেরা পর্ব্বতসম বিপদ, দুঃখ, কষ্ট, পরীক্ষা অতিক্রম করিয়া মনুষ্যসমাজকে নূতন ধর্ম্ম, নূতন ভাব, নূতন আচার ব্যবহারের দিকে লইয়া যান। বুদ্ধ যে এত প্রকার অদ্ভুত কাণ্ড করিতে পারিয়াছিলেন,

তাহার মূলে কোন্ শক্তি নিহিত ছিল? কেবল দয়া। তিনি জীবদিগের জন্য কেবল কাঁদিতেন। তাহাদিগের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইত। আর তিনি দয়ার বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। রাজসংসার পরিত্যাগ করিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় দেশ বিদেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, আর দুই হস্তে কেবল দীন দুঃখী পাপীদিগকে জ্ঞানরত্ন প্রদান করিতে লাগিলেন। এক দয়ার উত্তেজনায় তিনি এত লীলা খেলিতে পারিলেন। সে লীলার মধ্যে যে সকল অদ্ভুত ঘটনাবলী দেখিতে পাই, তাহা কেবল দয়ারই জন্য।

বুদ্ধের মনে এখন এই প্রশ্ন উত্থিত হইল—"কাহার নিকট এই ধর্ম্ম প্রচার করি?" তিনি ভাবিলেন—"আলাড় কনাম এবং রামপুত্র উদক এই দুই জনের নিকট রাজগৃহ পরিত্যাগ করিবার সময় আমি প্রথম শিক্ষা লাভ করি। ইহাঁদেরই নিকট যাই না কেন?" কিন্তু তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিতে গিয়া শুনিলেন যে তাঁহারা সম্প্রতি পরলোকগত হইয়াছেন। সে দিকে নিরাশ হইয়া তিনি মনে করিলেন—"আমার পাঁচজন শিষ্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে বাস করিতেছে। তাহাদিগেরই নিকট প্রথম ধর্ম্ম প্রচার করি না কেন?" এই ভাবিয়া তিনি বাহির হইলেন। পথিমধ্যে উপকাম নামক একজন ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। গৌতমের শান্তভাব এবং সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া উপকাম চমৎকৃত হইয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সৌম্য, বল দেখি কোথা হইতে তুমি এ মূর্ত্তি পাইয়াছ?" তোমার শরীর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। তোমাকে দেখিলে ভাল না বাসিয়া থাকা যায় না। তোমার বদন শান্তিতে পূর্ণ। এমন কোন্ ধর্ম্ম আছে যাহা পাইয়া তুমি এত আনন্দ এবং শান্তি লাভ করিয়াছ? কোন্ গুরুর কৃপায়

তুমি এত গুণের অধিকারী হইয়াছ? বুদ্ধ বলিলেন—"আমি পরিবর্ত্তনশীল জগতের অতীত হইয়াছি সংসার, অবিদ্যা, পাপ এবং কামনাকে জয় করিয়াছি। আমার কোন গুরু নাই, দেবতাদিগের মধ্যে আমার সমান কেহ নাই। আমি জিন, এখন বারাণসীতে নব ধর্ম্মের ডঙ্কা বাজাইব।" উপকাম এত লম্বা লম্বা কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। শুনিয়া কিন্তু ভাল লাগিল না। বুদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তোমার পথ ঐ দিকে।" এই বলিয়া তিনি বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে উপকাম আর এক সময়ে বুদ্ধের শিষ্য হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া বুদ্ধ প্রথমেই এই অভ্যর্থনা পাইলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি কিছু মাত্র ভগ্নোদ্যম হইলেন না। ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন। ক্রমে কর্ণপুর রোহিতবস্তু ইত্যাদি গ্রাম অতিক্রম করিয়া অবশেষে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। এইখানে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধ পুস্তক মাত্রেই তাহার উল্লেখ আছে। কথিত আছে যে বুদ্ধ একটি নৌকায় উঠিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় নাবিক তাঁহার নিকট হইতে পারে যাইবার ভাড়া চাহিল। বুদ্ধ বলিলেন—"আমার নিকট ত কোন মুদ্রা নাই। বিনা মুদ্রায় পার করিয়া দিতে পার ত যাইব।" নাবিক তাহাতে সম্মত না হওয়াতে বুদ্ধ নৌকায় আরোহণ করিতে পারিলেন না। ঠিক সেই সময়ে এক পাল বক গঙ্গার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। বুদ্ধ বলিলেন—"ইহারা ত পারে যাইবার জন্য মুদ্রা দিতেছে না। তবে আমি কেন দিব? ইহারা স্বাভাবিক বলে উড়িতে পারে, আমি আধ্যাত্মিক বলে কেন উহাদের মত উড়িতে পারিব না?" এই বলিয়া বুদ্ধ অক্লেশে উড়িতে উড়িতে ওপারে উপস্থিত হই-

লেন। "কি মন্দ কার্য্য করিলাম"—এই বলিয়া নাবিক তখন অনেক আক্ষেপ করিতে লাগিল। ঘটনাটি লোকপরম্পরায় বিম্বিসার নৃপতির কর্ণে গেল। তিনি তাহা শুনিয়া এই আদেশ দিলেন যে, সাধু সন্ন্যাসীরা নদী পার হইতে চাহিলেই তাঁহাদিগকে যেন বিনা মূল্যে পার করা হয়।

বুদ্ধ বারাণসী নগরীতে উপস্থিত হইলেন। বারাণসীর চারিদিকে তখন চারিটি প্রবেশদ্বার ছিল। বুদ্ধ পশ্চিম দ্বার দিয়া নগরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষার্থে রাস্তায় রাস্তায় পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। খাদ্য সংগ্রহ করা হইলে তিনি বরণা নদীর তীরে আহার সমাপন করিয়া মৃগদাব কাননাভিমুখে গমন করিলেন। এই কানন তখন বহুসংখ্যক ঋষির নিবাস ছিল। ইহা কাশী হইতে দেড় ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত ছিল। বৌদ্ধেরা সেই স্থানকে সারনাথ বলিত। এখন তাহার নাম ধামেক। *

মৃগদাব কাননে তিনি সেই পাঁচজন শিষ্যকে দেখিতে পাইলেন। যখন উহারা দূর হইতে বুদ্ধকে দেখিল তখন তাহারা পরস্পর এই বলাবলি করিতে লাগিল —"দেখ, দেখ, গৌতম আসিতেছেন। নিশ্চয় শিষ্য অনুসন্ধানে বা ভিক্ষা সংগ্রহার্থে নির্গত হইয়াছেন। দেখিয়াছ কেমন শরীরের কান্তি হইয়াছে? আর অনাহার সহ্য হইল না। ধর্ম্ম কর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া এখন কেবল শরীরের পুষ্টি সাধনের জন্যই তৎপর দেখিতেছি। আমরা এ প্রকার লোককে কোন মতে অভ্যর্থনা করিব না,অগ্রসর হইয়া পথ প্রদর্শন করিয়া এখানে আনিব না, প্রণাম করিব না,পাদ প্রক্ষালনের আয়োজন করিব না এবং আসনে বসিতেও বলিব না।" এই মন্ত্রণা করিয়া তাহারা বসিয়া রহিল।

* সারনাথের কথা আমার অশোক-চরিত গ্রন্থে বিবৃত আছে।

কেবল তাহাদিগের মধ্যে বৃদ্ধ কৌণ্ডিল্য এই মন্ত্রণায় সম্মত হন নাই। ক্রমে বুদ্ধ নিকটতর হইলেন, তাহারাও গাত্রোত্থান করিয়া উঠিল— "আয়ুষ্মন্, নমস্কার করিতেছি।" "গৌতম, নমস্কার করিতেছি।" "গৌতম নমস্কার করি।" গৌতম এই সম্বোধন শুনিয়াই বলিতে লাগিলেন—"আমাকে আয়ুষ্মন্ বা গৌতম বলিয়া উপহাস করিওনা। তোমরা মৃত্যুর পথে রহিয়াছ। সেই পথে থাকিলে পদে পদে দুঃখ ও নিরাশা আসিবে। আমি অমৃতত্ব লাভ করিয়াছি—এখন আমি বুদ্ধ। তোমাদিগের নিকট ধর্ম্ম প্রচারার্থ আসিয়াছি। অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর—আমি তোমাদিগকে নির্ব্বাণের পথে লইয়া যাইব। আমার কথা শুনিলে আর তোমাদিগকে মায়াময় সংসার-চক্রে ঘূর্ণায়মান হইতে হইবে না। সেই অভ্রান্ত নিত্য অবস্থা যেখানে পরিবর্ত্তন নাই, জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, পাপের দাহ নাই, সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নিত্য শান্তি সম্ভোগ করিবে। কিন্তু এ অবস্থা পাইতে গেলে সংসারকামনা, সুখের প্রত্যাশা সকলই পরিত্যাগ করিতে হইবে।" বুদ্ধের কথা শুনিয়া তাহাদিগের মনে কোন প্রকার সংস্কারই হইল না। তাহারা বলিল—"তুমি বুদ্ধ কি করিয়া হইবে? যে শিষ্য অনুসন্ধানে বাহির হয়, যে অন্ন ভিক্ষার জন্য পর্য্যটন করে, সে আবার বুদ্ধ কিরূপে হইবে?" বুদ্ধ আবার তাহাদিগকে ঐকথা বলিলেন, আবার তাহারা অবিশ্বাসসূচক বাক্য প্রয়োগ করিল। আবার বুদ্ধ বলিলেন—"আমি বলিতেছি আমি বুদ্ধ হইয়াছি। চতুর্ব্বর্গ সত্য আমার ঐশ্বর্য্য, এবং নির্ব্বাণের পথ আমার সম্মুখে পরিষ্কার।" শিষ্যেরা বুদ্ধের উৎসাহ ও আগ্রহ দেখিয়া এবার অবনত-মস্তক হইল। তিনি তাহাদিগকে একান্তমনে, সুগম্ভীর স্বরে ধর্ম্মের সারতত্ত্বগুলি বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—"হে ভিক্ষুদল, তোমরা সংসার ত্যাগ করিয়াছ। দুইটি ব্যাপার তোমাদিগকে চির-

কালের জন্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, যথা ইন্দ্রিয়জনিত সুখ এবং অতিরিক্ত অনর্থক শারীরিক নির্যাতন। আমি এই দুই ভ্রান্তিজনক পথ পরিত্যাগ করিয়াছি। আমার মার্গ এই দুই পথের মধ্যবর্ত্তী। ইহা অবলম্বন করিয়াই আমি এখন প্রজ্ঞা লাভ করিয়াছি। আমার চক্ষু এতদিন অন্ধ ছিল, এখন দেখিতে পাইতেছে। আমার মন অজ্ঞ ছিল, এখন জানিতে পারিতেছে। পূর্ণ শান্তি এখন আমার ভাগ্যে আসিয়াছে। আমার আধ্যাত্মিক জীবন প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সুতরাং আমি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। ভিক্ষুগণ তোমরা যদি এ অবস্থাতে আসিতে চাও, এই মধ্যবর্ত্তী পথ অবলম্বন কর। তোমাদিগের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে; অন্তরে জ্ঞানালোক উদিত হইবে এবং তোমরা নির্ব্বাণের অধিকারী হইবে। সম্যক্‌দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্‌বাক, সম্যগ্ দীপিকা, সম্যক্ কার্য্য, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি, এই অষ্টাঙ্গমার্গ তোমাদিগের হইবে। এ পথ অবলম্বন করিলে তোমরা জন্মমৃত্যুর শৃঙ্খল ভেদ করিবে। কর্ম্মফল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আর অনন্তকাল ধরিয়া পুনর্জন্মভার বহন করিতে হইবে না।

"ভিক্ষুগণ এখন চতুর্বর্গ সত্যের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। সে সত্যগুলি কি ? (১) ইহাই সত্য যে জগতে কেবল দুঃখ আছে। (২) ইহাই সত্য যে জীবনে দুঃখ সঞ্চিত হইতে থাকে। (৩) ইহাই সত্য যে এই দুঃখরাশিকে বিনাশ করা যায়। (৪) ইহাই সত্য যে দুঃখ বিনাশ করিবার জন্য একটি বিশেষ পথ আছে। যে চতুবর্গ সত্যের কথা বলিলাম যদি জিজ্ঞাসা কর তাহাদিগের প্রকৃত অর্থ কি, আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর।

"দুঃখ আছে ইহার অর্থ এই যে জীবনে জন্ম মৃত্যু জরা বার্দ্ধক্যজনিত দুঃখ বিনা আর কিছুই নাই। জগতে দুঃখ সঞ্চিত হইতে

থাকে, ইহার অর্থ এই যে, তৃষ্ণায় উত্তেজিত হইয়া জীব সর্ব্বদা নব সম্ভোগ অনুসন্ধান করে এবং নব সম্ভোগ আবিষ্কার করিতে গিয়া মন সদা উদ্বিগ্ন ও চিন্তাশীল থাকে। সেই জন্য মনের কষ্টের শেষ থাকে না, ক্রমাগত সঞ্চিত হইতে থাকে। দুঃখকে বিনাশ করা যায়, ইহার অর্থ এই যে তৃষ্ণার একেবারে নির্ব্বাণ হইলে মনে ভাবনা বা চিন্তা কিছুই থাকে না। সুতরাং দুঃখের অন্তর্ধান হয় এবং অন্তরে নিত্য শান্তি বর্ত্তমান থাকে। দুঃখ বিনাশ করিবার পথ আছে, ইহার অর্থ পূর্ব্বে উল্লিখিত অষ্টাঙ্গমার্গ অবলম্বন করা।

"ভিক্ষুগণ, এই সকল কথা কেহ আমাকে শিক্ষা দেয় নাই। ইহারা স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক বলে উদ্ভূত, কাহারও সাহায্যে পাই নাই। যে অবস্থা হইতে প্রকৃত জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে অবস্থা আমি পাইয়াছি। এখন দেখ আমার অন্তরে জ্ঞান সমুজ্জ্বল হইয়াছে। আর আমাকে ভ্রমে পতিত হইতে হইবে না, আর পরিবর্ত্তন হতবুদ্ধি করিবে না। মুক্তি আমার করতলন্যস্ত। এই আমার শেষ জন্ম, ভবিষ্যতে আর "আমি" বলিয়া আমার স্থিতি নাই।"

বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে বৃদ্ধ কৌণ্ডিল্য নিস্তব্ধ থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষু হইতে মোহকুজ্ঝাটিকা বিদূরিত হইল, মনে যে দুর্গন্ধময় পাপরূপ কর্দ্দম সঞ্চিত ছিল স্বর্গ হইতে যেন বৃষ্টি আসিয়া তাহা প্রক্ষালন করিয়া দিল। দুঃখের অতীত, স্বাধীনচিত্ত, নির্ম্মল-দৃষ্টি হইয়া তিনি সত্যসূর্য্যকে সম্মুখে অনুভব করিলেন। বুদ্ধকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন—ভগবন্, আপনার ধর্ম্মগ্রহণ করিলাম। আমাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করুন। আপনার অনুগত দাস হইব এই ব্রত লইলাম।" বুদ্ধ বলিলেন—"তথাস্তু! ধর্ম্মে দীক্ষিত হও, প্রকৃত ব্রাহ্মণের মত শুদ্ধাচারী হও, দুঃখের কারণসমূহকে নির্ব্বাণ কর।" কৌণ্ডিল্য অপর চারিজনকে

ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার কথা শুনিয়া তাহারাও ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিল। অবশেষে বুদ্ধ তাহাদিগকে এই বলিয়া উপদেশ দিলেন—"হে ভিক্ষুগণ, আমি প্রতি জন্মে সম্যক্ স্মৃতি অভ্যাস করিয়াছিলাম এবং বিশুদ্ধ পথে চলিয়াছিলাম বলিয়া পূর্ণ মুক্তি এবং প্রত্যাদেশের অধিকারী হইতে পারিয়াছি। তোমরাও তাহাই কর। সেই পথে বিচরণ কর, তাহা হইলে তোমরাও পূর্ণ বোধির অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।"

বৌদ্ধদিগের ভাষায় বলিতে গেলে সেই দিবস বুদ্ধ ধর্ম্ম-চক্র প্রবর্ত্তন করিলেন। এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া মর্ত্তের দেবদেবীরা, দিকপালগণ এবং স্বর্গস্থ দেবতাদল সমস্বরে উচ্চধ্বনিতে বলিয়া উঠিলেন--"আজ বারাণসীধামে, মৃগদাব আশ্রমে, ভগবত ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ, দেব বা দেবী, ব্রহ্মা বা মার, বিশ্বসংসারে কেহই আর সে চক্র নিরস্ত করিতে পারিবে না।" এই জয়শব্দ একমুহূর্ত্ত ব্রহ্মালোকে প্রতিধ্বনিত হইল। বিশ্ব কম্পিত হইল এবং একটি অতুল জ্যোতি আসিয়া ইহলোককে আলোকিত করিল। কথিত আছে যে সেই দিন বক্তৃতা শুনিয়া ১৮,০০০,০০০,০০০ দেবতা এবং উপদেবতা মুক্তি প্রাপ্ত হন এবং ধরাতলে সেই দিন বুদ্ধকে লইয়া ছয়জন ভিক্ষু হইলেন।

আপদ।

সন্ধ্যার দিকে ঝড় ক্রমশঃ প্রবল হইতে লাগিল। বৃষ্টির ঝাপট, বজ্রের শব্দ, এবং বিদ্যুতের ঝিক্‌মিকিতে আকাশে যেন সুরাসুরের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কালো কালো মেঘগুলো মহা-প্রলয়ের জয়পতাকার মত দিগ্বিদিকে উড়িতে আরম্ভ করিল,

গঙ্গার এপারে ওপারে বিদ্রোহী ঢেউগুলো কলশব্দে নৃত্য জুড়িয়া দিল, এবং বাগানের বড় বড় গাছগুলো সমস্ত শাখা ঝট্‌পট্‌ করিয়া হা হুতাশ সহকারে দক্ষিণে বামে লুটোপুটি করিতে লাগিল।

তখন চন্দননগরের বাগানবাড়িতে একটি দীপালোকিত রুদ্ধ কক্ষে খাটের সম্মুখবর্ত্তী নীচের বিছানায় বসিয়া স্ত্রীপুরুষে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। শরৎ বাবু বলিতেছিলেন, আর কিছু দিন থাকিলেই তোমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিবে, তখন আমরা দেশে ফিরিতে পারিব। কিরণময়ী বলিতেছিলেন, আমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিয়াছে, এখন দেশে ফিরিলে কোন ক্ষতি হইবে না।

বিবাহিত ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, কথাটা যত সংক্ষেপে রিপোর্ট্‌ করিলাম তত সংক্ষেপে শেষ হয় নাই। বিষয়টি বিশেষ দুরূহ নয়, তথাপি বাদ প্রতিবাদ কিছুতেই মীমাংসার দিকে অগ্রসর হইতেছিল না; কর্ণহীন নৌকার মত ক্রমাগতই ঘুর খাইয়া মরিতেছিল; অবশেষে অশ্রুতরঙ্গে ডুবি হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল। শরৎ কহিলেন, ডাক্তার বলিতেছে আর কিছু দিন থাকিয়া গেলে ভাল হয়। কিরণ কহিলেন, তোমার ডাক্তার ত সব জানে! শরৎ কহিলেন, জান ত, এই সময়ে দেশে নানা প্রকার ব্যামোর প্রাদুর্ভাব হয় অতএব আর মাস দুয়েক কাটাইয়া গেলেই ভাল হয়। কিরণ কহিলেন, এখানে এখন বুঝি কোথাও কাহারো কোন ব্যামো হয় না!

পূর্ব্ব ইতিহাসটা এই। কিরণকে তাহার ঘরের এবং পাড়ার সকলেই ভালবাসে, এমন কি, শাশুড়ি পর্য্যন্ত। সেই কিরণের যখন কঠিন পীড়া হইল তখন সকলেই চিন্তিত হইয়া উঠিল—এবং ডাক্তার যখন বায়ুপরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিল, তখন গৃহ এবং

কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া প্রবাসে যাইতে তাহার স্বামী এবং শাশুড়ি কোন আপত্তি করিলেন না। যদিও গ্রামের বিবেচক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই, বায়ুপরিবর্ত্তনে আরোগ্যের আশা করা এবং স্ত্রীর জন্য এতটা হুলস্থুল করিয়া তোলা নব্য স্ত্রৈণতার একটা নির্লজ্জ আতিশয্য বলিয়া স্থির করিলেন এবং প্রশ্ন করিলেন, ইতিপূর্ব্বে কি কাহারও স্ত্রীর কঠিন পীড়া হয় নাই, শরৎ যেখানে যাওয়া স্থির করিয়াছেন সেখানে কি মানুষরা অমর, এবং এমন কোন দেশ আছে কি যেখানে অদৃষ্টের লিপি সফল হয় না—তথাপি শরৎ এবং তাঁহার মা সে সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তখন গ্রামের সমস্ত সমবেত বিজ্ঞতার অপেক্ষা তাঁহাদের হৃদয়লক্ষ্মী কিরণের প্রাণটুকু তাঁহাদের নিকট গুরুতর বোধ হইল। প্রিয়ব্যক্তির বিপদে মানুষের এরূপ মোহ ঘটিয়া থাকে।

শরৎ চন্দননগরের বাগানে আসিয়া বাস করিতেছেন, এবং কিরণও রোগমুক্ত হইয়াছেন, কেবল শরীর এখনও সম্পূর্ণ সবল হয় নাই। তাঁহার মুখে চক্ষে একটি সকরুণ কৃশতা অঙ্কিত হইয়া আছে, যাহা দেখিলে হৃৎকম্প সহ মনে উদয় হয়, আহা, বড় রক্ষা পাইয়াছে!

কিন্তু কিরণের স্বভাবটা সঙ্গপ্রিয়, আমোদপ্রিয়। এখানে একলা আর ভাল লাগিতেছে না; তাহার ঘরের কাজ নাই, পাড়ার সঙ্গিনী নাই, কেবল সমস্ত দিন আপনার রুগ্ন শরীরটাকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে মন যায় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দাগ মাপিয়া ঔষধ খাও, তাপ দাও, পথ্য পালন কর, ইহাতে বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে; আজ ঝড়ের সন্ধ্যাবেলায় রুদ্ধগৃহে স্বামী স্ত্রীতে তাহাই লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। কিরণ যতক্ষণ উত্তর দিতেছিল ততক্ষণ উভয় পক্ষে সমকক্ষভাবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছিল,

কিন্তু অবশেষে কিরণ যখন নিরুত্তর হইয়া বিনা প্রতিবাদে শরতের দিক হইতে ঈষৎ বিমুখ হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বসিল তখন দুর্ব্বল নিরুপায় পুরুষটির আর কোন অস্ত্র রহিল না। পরাভব স্বীকার করিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় বাহির হইতে বেহারা উচ্চৈঃস্বরে কি একটা নিবেদন করিল। শরৎ উঠিয়া দ্বার খুলিয়া শুনিলেন, নৌকা ডুবি হইয়া একটি ব্রাহ্মণ বালক সাঁতার দিয়া তাঁহাদের বাগানে আসিয়া উঠিয়াছে।

শুনিয়া কিরণের মান অভিমান দূর হইয়া গেল; তৎক্ষণাৎ আলনা হইতে শুষ্কবস্ত্র বাহির করিয়া দিলেন, এবং শীঘ্র এক বাটি দুধ গরম করিয়া ব্রাহ্মণের ছেলেকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ছেলেটির লম্বা চুল, বড় বড় চোখ, গোঁফের রেখা এখনো উঠে নাই। কিরণ তাহাকে নিজে থাকিয়া ভোজন করাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শুনিলেন, সে যাত্রার দলের ছোকরা, তাহার নাম নীলকান্ত। তাহারা নিকটবর্ত্তী সিংহ বাবুদের বাড়ি যাত্রার জন্য আহূত হইয়াছিল; ইতিমধ্যে নৌকা ডুবি হইয়া তাহাদের দলের লোকের কি গতি হইল জানে; সে ভাল সাঁতার জানিত, কোন মতে প্রাণ রক্ষা করিয়াছে।

ছেলেটি এইখানেই রহিয়া গেল। আর একটু হইলেই সে মারা পড়িত এই মনে করিয়া তাহার প্রতি কিরণের অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হইল। শরৎ মনে করিলেন, হইল ভাল, কিরণ একটা নূতন কাজ হাতে পাইলেন এখন কিছুকাল এইভাবেই কাটিয়া যাইবে। ব্রাহ্মণ বালকের কল্যাণে পুণ্যসঞ্চয়ের প্রত্যাশায় শাশুড়িও প্রসন্নতা লাভ করিলেন। এবং অধিকারী মহাশয় ও যমরাজের হাত হইতে সহসা এই ধনী পরিবারের হাতে বদলি হইয়া নীলকান্ত বিশেষ আরাম বোধ করিল।

কিন্তু অনতিবিলম্বে শরৎ এবং তাঁহার মাতার মত পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তাঁহারা ভাবিলেন আর আবশ্যক নাই, এখন এই ছেলেটাকে বিদায় করিতে পারিলে আপদ যায়।

নীলকান্ত গোপনে শরতের গুড়গুড়িতে ফড় ফড় শব্দে তামাক টানিতে আরম্ভ করিল। বৃষ্টির দিনে অম্লানবদনে তাঁহার সখের সিল্কের ছাতাটি মাথায় দিয়া নব বন্ধু সঞ্চয়চেষ্টায় পল্লিতে পর্য্যটন করিতে লাগিল। কোথাকার একটা মলিন গ্রাম্য কুক্কুরকে আদর দিয়া এমুনি স্পর্দ্ধিত করিয়া তুলিল যে, সে অনাহূত শরতের সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্ম্মল জাজিমের উপর পদপল্লব চতুষ্টয়ের ধূলিরেখায় আপন শুভাগমনসংবাদ স্থায়ীভাবে মুদ্রিত করিয়া আসিতে লাগিল। নীলকান্তের চতুর্দ্দিকে দেখিতে দেখিতে একটি সুবৃহৎ ভক্তশিশুসম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল, এবং সে বৎসর গ্রামের আম্রকাননে কচি আম পাকিয়া উঠিবার অবসর পাইল না।

কিরণ এই ছেলেটিকে বড় বেশি আদর দিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। শরৎ এবং শরতের মা সে বিষয়ে তাঁহাকে অনেক নিষেধ করিতেন কিন্তু তিনি তাহা মানিতেন না। শরতের পুরাতন জামা মোজা এবং নূতন ধুতি চাদর জুতা পরাইয়া তিনি তাহাকে বাবু সাজাইয়া তুলিলেন। মাঝে মাঝে যখন তখন তাহাকে ডাকিয়া লইয়া তাঁহার স্নেহ এবং কৌতুক উভয়ই চরিতার্থ হইত। কিরণ সহাস্যমুখে পানের বাটা পাশে রাখিয়া খাটের উপর বসিতেন, দাসী তাঁহার ভিজে এলোচুল চিরিয়া চিরিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া শুকাইয়া দিত এবং নীলকান্ত নীচে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া নলদময়ন্তীর পালা অভিনয় করিত— এইরূপে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন অত্যন্ত শীঘ্র কাটিয়া যাইত। কিরণ শরৎকে তাঁহার সহিত একা-

সনে দর্শকশ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু শরৎ অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন এবং শরতের সম্মুখে নীলকান্তের প্রতিভাও সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পাইত না। শাশুড়ি এক একদিন ঠাকুর-দেবতার নাম শুনিবার আশায় আকৃষ্ট হইয়া আসিতেন কিন্তু অবিলম্বে তাঁহার চিরাভ্যস্ত মধ্যাহ্নকালীন নিদ্রাবেশ ভক্তিকে অভিভূত এবং তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিয়া দিত।

শরতের কাছ হইতে কানমলা চড়টা চাপড়টা নীলকান্তের অদৃষ্টে প্রায়ই জুটিত; কিন্তু তদপেক্ষা কঠিনতর শাসনপ্রণালীতে আজন্ম অভ্যস্ত থাকাতে সেটা তাহার নিকট অপমান বা বেদনা-জনক বোধ হইত না। নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, পৃথিবীর জল স্থল বিভাগের ন্যায় মানবজন্মটা আহার এবং প্রহারে বিভক্ত; প্রহারের অংশটাই অধিক।

নীলকান্তের ঠিক কত বয়স নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন; যদি চোদ্দ পনেরো হয় তবে বয়সের অপেক্ষা মুখ অনেক পাকিয়াছে বলিতে হইবে; যদি সতেরো আঠারো হয় তবে বয়সের অনুরূপ পাক ধরে নাই। হয় সে অকাল-পক্ক, নয় সে অকাল-অপক্ক।

আসল কথা এই, সে অতি অল্প বয়সেই যাত্রার দলে ঢুকিয়া রাধিকা, দময়ন্তী, সীতা এবং বিদ্যার সখী সাজিত। অধিকারীর আবশ্যকমত বিধাতার বরে খানিকদূর পর্য্যন্ত বাড়িয়া তাহার বাড় থামিয়া গেল। তাহাকে সকলে ছোটই দেখিত, আপনাকেও সে ছোটই জ্ঞান করিত, বয়সের উপযুক্ত সম্মান সে কাহারও কাছে পাইত না। এই সকল স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক কারণ প্রভাবে সতেরো বৎসর বয়সের সময় তাহাকে অনতিপক্ক সতেরোর অপেক্ষা অতিপরিপক্ক চোদ্দর মত দেখাইত। গোঁফের রেখা না ওঠাতে এই ভ্রম আরো দৃঢ়মূল হইয়াছিল। তামাকের ধোঁয়া

লাগিয়াই হৌক্ বা বয়সানুচিত ভাষা প্রয়োগবশতই হৌক্, নীল-কান্তের ঠোঁটের কাছটা কিছু বেশি পাকা বোধ হইত, কিন্তু তাহার বৃহৎ তারাবিশিষ্ট দুইটি চক্ষের মধ্যে একটা সারল্য এবং তারুণ্য ছিল। অনুমান করি, নীলকান্তের ভিতরটা স্বভাবতঃ কাঁচা, কিন্তু যাত্রার দলের তা' লাগিয়া উপরিভাগে পক্কতার লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

শরৎ বাবুর আশ্রয়ে চন্দননগরের বাগানে বাস করিতে করিতে নীলকান্তের উপর স্বভাবের নিয়ম অব্যাহতভাবে আপন কাজ করিতে লাগিল। সে এতদিন যে একটা বয়ঃসন্ধিস্থলে অস্বাভাবিক-ভাবে দীর্ঘকাল থামিয়া ছিল, এখানে আসিয়া সেটা কখন্ এক সময় নিঃশব্দে পার হইয়া গেল। তাহার সতেরো আঠারো বৎসরের বয়ঃক্রম বেশ সম্পূর্ণভাবে পরিণত হইয়া উঠিল।

তাহার সে পরিবর্ত্তন বাহির হইতে কাহারও চোখে পড়িল না, কিন্তু তাহার প্রথম লক্ষণ এই, যে, যখন কিরণ নীলকান্তের প্রতি বালকযোগ্য ব্যবহার করিতেন সে মনে মনে লজ্জিত এবং ব্যথিত হইত। একদিন আমোদপ্রিয় কিরণ তাহাকে স্ত্রীবেশে সখী সাজিবার কথা বলিয়াছিলেন, সে কথাটা অকস্মাৎ তাহার বড়ই কষ্টদায়ক লাগিল অথচ তাহার উপযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাইল না। আজকাল তাহাকে যাত্রার অনুকরণ করিতে ডাকিলেই সে অদৃশ্য হইয়া যাইত। সে যে একটা লক্ষ্মীছাড়া যাত্রার দলের ছোকরার অপেক্ষা অধিক কিছু নয় এ কথা কিছুতে তাহার মনে লইত না।

এমন কি,সে বাড়ির সরকারের নিকট কিছু কিছু করিয়া লেখা-পড়া শিখিবার সংকল্প করিল। কিন্তু বৌঠাকরুণের স্নেহভাজন বলিয়া নীলকান্তকে সরকার দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না—এবং

মনের একাগ্রতা রক্ষা করিয়া পড়াশুনো কোন কালে অভ্যাস না থাকাতে অক্ষরগুলো তাহার চোখের সাম্‌নে দিয়া ভাসিয়া যাইত। গঙ্গার ধারে চাঁপাতলায় গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়া কোলের উপর বই খুলিয়া সে দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিত; জল ছল্ ছল্ করিত, নৌকা ভাসিয়া যাইত, শাখার উপরে চঞ্চল অন্যমনস্ক পাখী কিচ্‌মিচ্ শব্দে স্বগত উক্তি প্রকাশ করিত, নীলকান্ত বই-য়ের পাতায় চক্ষু রাখিয়া কি ভাবিত সেই জানে অথবা সেও জানে না। একটা কথা হইতে কিছুতেই আর একটা কথায় গিয়া পৌঁছিতে পারিত না, অথচ, বই পড়িতেছি মনে করিয়া তাহার ভারি একটা আত্মগৌরব উপস্থিত হইত। সাম্‌নে দিয়া যখন একটা নৌকা যাইত তখন সে আরও অধিক আড়ম্বরের সহিত বইখানা তুলিয়া লইয়া বিড় বিড় করিয়া পড়ার ভান করিত; দর্শক চলিয়া গেলে সে আর পড়ার উৎসাহ রক্ষা করিতে পারিত না।

পূর্ব্বে সে অভ্যস্ত গানগুলো যন্ত্রের মত যথানিয়মে গাহিয়া যাইত, এখন সেই গানের সুরগুলো তাহার মনে এক অপূর্ব্ব চাঞ্চল্য সঞ্চার করে। গানের কথা অতি যৎসামান্য, তুচ্ছ অনুপ্রাসে পরিপূর্ণ, তাহার অর্থও নীলকান্তের নিকট সম্যক্ বোধগম্য নহে, কিন্তু যখন সে গাহিত—

ওরে রাজহংস, জন্মি দ্বিজবংশে, এমন নৃশংস কেন হলি রে,

বল্ কি জন্যে,এ অরণ্যে, রাজকন্যের প্রাণসংশয় করিলি রে,—

তখন সে যেন সহসা লোকান্তরে জন্মান্তরে উপনীত হইত—তখন চারিদিকের অভ্যস্ত জগৎটা এবং তাহার তুচ্ছ জীবনটা গানে তর্জ্জমা হইয়া একটা নূতন চেহারা ধারণ করিত। রাজ-হংস এবং রাজকন্যার কথা হইতে তাহার মনে এক অপরূপ ছবির আভাস জাগিয়া উঠিত, সে আপনাকে কি মনে করিত স্পষ্ট করিয়া

বলা যায় না, কিন্তু যাত্রার দলের পিতৃমাতৃহীন ছোকরা বলিয়া ভুলিয়া যাইত। নিতান্ত অকিঞ্চনের ঘরের হতভাগ্য মলিন শিশু যখন সন্ধ্যাশয্যায় শুইয়া, রাজপুত্র, রাজকন্যা এবং সাত রাজার ধন মাণিকের কথা শোনে তখন সেই ক্ষীণ দীপালোকিত জীর্ণ গৃহ-কোণের অন্ধকারে তাহার মনটা সমস্ত দারিদ্র্য ও হীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এক সর্ব্বসম্ভব রূপকথার রাজ্যে একটা নূতন রূপ, উজ্জ্বল বেশ এবং অপ্রতিহত ক্ষমতা ধারণ করে; সেইরূপ গানের স্বরের মধ্যে এই যাত্রার দলের ছেলেটি আপনাকে এবং আপনার জগৎটিকে একটি নবীন আকারে সৃজন করিয়া তুলিত; জলের ধ্বনি, পাতার শব্দ, পাখীর ডাক, এবং যে লক্ষ্মী এই লক্ষ্মী-ছাড়াকে আশ্রয় দিয়াছেন তাঁহার সহাস্য স্নেহমুখচ্ছবি, তাঁহার কল্যাণমণ্ডিত বলয়বেষ্টিত বাহু দুইখানি এবং দুর্লভ সুন্দর পুষ্পদল-কোমল রক্তিম চরণযুগল কি এক মায়ামন্ত্রবলে রাগিণীর মধ্যে রূপা-ন্তরিত হইয়া যাইত। আবার এক সময় এই গীতি-মরীচিকা কোথায় অপসারিত হইত, যাত্রার দলের নীলকান্ত ঝাঁক্‌ড়া চুল লইয়া প্রকাশ পাইত, আমবাগানের অধ্যক্ষ প্রতিবেশীর অভিযোগ-ক্রমে শরৎ আসিয়া তাহার গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া চড় কসাইয়া দিতেন, এবং বালক ভক্তমণ্ডলীর অধিনায়ক হইয়া নীলকান্ত জলে স্থলে এবং তরুশাখাগ্রে নব নব উপদ্রব সৃজন করিতে বাহির হইত।

ইতিমধ্যে শরতের ভাই সতীশ কলিকাতা কলেজের ছুটিতে বাগানে আসিয়া আশ্রয় লইল। কিরণ ভারি খুসি হইলেন, তাঁহার হাতে আর একটি কাজ জুটিল; উপবেশনে আহারে আচ্ছাদনে সমবয়স্ক ঠাকুরপোর প্রতি পরিহাসপাশ বিস্তার করিতে লাগিলেন। কখনও হাতে সিঁদুর মাখিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরেন, কখনো

তাহার জামার পিঠে বাঁদর লিখিয়া রাখেন, কখনো ঝনাৎ করিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সুললিত উচ্চহাস্যে পলায়ন করেন। সতীশও ছাড়িবার পাত্র নহে; সে তাঁহার চাবি চুরি করিয়া, তাঁহার পানের মধ্যে লঙ্কা পূরিয়া, অলক্ষিতে খাটের খুরার সহিত তাঁহার আঁচল বাঁধিয়া প্রতিশোধ তুলিতে থাকে। এইরূপে উভয়ে সমস্ত দিন তর্জ্জন ধাবন হাস্য, এমন কি, মাঝে মাঝে কলহ, ক্রন্দন, সাধাসাধি এবং পুনরায় শান্তিস্থাপন চলিতে লাগিল।

নীলকান্তকে কি ভূতে পাইল কে জানে! সে কি উপলক্ষ্য করিয়া কাহার সহিত বিবাদ করিবে ভাবিয়া পায় না, অথচ তাহার মন তীব্র তিক্তরসে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে তাহার ভক্ত বালক-গুলিকে অন্যায়রূপে কাঁদাইতে লাগিল, তাহার সেই পোষা দিশী কুকুরটাকে অকারণে লাথি মারিয়া কেঁই কেঁই শব্দে নভোমণ্ডল ধ্বনিত করিয়া তুলিল, এমন কি, পথে ভ্রমণের সময় সবেগে ছড়ি মারিয়া আগাছাগুলার শাখাচ্ছেদন করিয়া চলিতে লাগিল।

যাহারা ভাল খাইতে পারে তাঁহাদিগকে সম্মুখে বসিয়া খাও-য়াইতে কিরণ অত্যন্ত ভালবাসেন। ভাল খাইবার ক্ষমতাটা নীল-কান্তের ছিল, সুখাদ্য দ্রব্য পুনঃ পুনঃ খাইবার অনুরোধ তাহার নিকট কদাচ ব্যর্থ হইত না। এই জন্য কিরণ প্রায় তাহাকে ডাকিয়া লইয়া নিজে থাকিয়া খাওয়াইতেন, এবং এই ব্রাহ্মণ বালকের তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার দেখিয়া তিনি বিশেষ সুখ অনুভব করিতেন। সতীশ আসার পরে অনবসরবশতঃ নীলকান্তের আহার-স্থলে প্রায় মাঝে মাঝে কিরণকে অনুপস্থিত থাকিতে হইত;—পূর্ব্বে এরূপ ঘটনায় তাহার ভোজনের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না; সে সর্ব্বশেষে দুধের বাটি ধুইয়া তাহার জলসুদ্ধ খাইয়া তবে উঠিত,—কিন্তু আজকাল কিরণ নিজে ডাকিয়া না খাওয়াইলে

তাহার বক্ষ ব্যথিত তাহার মুখ বিস্বাদ হইয়া উঠিত, না খাইয়া উঠিয়া পড়িত, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে দাসীকে বলিয়া যাইত, আমার ক্ষুধা নাই। মনে করিত, কিরণ সংবাদ পাইয়া এখনি অনুতপ্তচিত্তে তহোকে ডাকিয়া পাঠাইবেন, এবং খাইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিবেন, সে তথাপি কিছুতেই সে অনুরোধ পালন করিবে না, বলিবে, আমার ক্ষুধা নাই। কিন্তু কিরণকে কেহ সংবাদও দেয় না, কিরণ তাহাকে ডাকিয়াও পাঠান না; খাবার যাহা থাকে দাসী খাইয়া ফেলে। তখন সে আপন শয়নগৃহের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া অন্ধকার বিছানার উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া ফাঁপিয়া মুখের উপর সবলে বালিশ চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে থাকে; কিন্তু কি তাহার নালিশ, কাহার উপরে তাহার দাবী, কে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিবে! যখন কেহই আসে না তখন স্নেহময়ী নিদ্রা আসিয়া ধীরে ধীরে কোমল করস্পর্শে এই মাতৃহীন ব্যথিত বালকের অভিমান শান্ত করিয়া দেন।

নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা হইল সতীশ কিরণের কাছে তাহার নামে সর্ব্বদাই লাগায়; যে দিন কিরণ কোন কারণে গম্ভীর হইয়া থাকিতেন সে দিন নীলকান্ত মনে করিত সতীশের চক্রান্তে কিরণ তাহারই উপর রাগ করিয়া আছেন।

এখন হইতে নীলকান্ত একমনে তীব্র আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সর্ব্বদাই দেবতার নিকট প্রার্থনা করে, আর জন্মে আমি যেন সতীশ হই, এবং সতীশ যেন আমি হয়। সে জানিত ব্রাহ্মণের একান্তমনের অভিশাপ কখন নিস্ফল হয় না, এই জন্য সে মনে মনে সতীশকে ব্রহ্মতেজে দগ্ধ করিতে গিয়া নিজে দগ্ধ হইতে থাকিত, এবং উপরের তলা হইতে সতীশ ও তাহার বৌঠাকুরাণীর উচ্ছ্বসিত উচ্চহাস্যমিশ্রিত পরিহাসকলরব শুনিতে পাইত।

নীলকান্ত স্পষ্টতঃ সতীশের কোনরূপ শত্রুতা করিতে সাহস করিত না, কিন্তু সুযোগমত তাহার ছোটখাট অসুবিধা ঘটাইয়া প্রীতিলাভ করিত। ঘাটের সোপানে সাবান রাখিয়া সতীশ যখন গঙ্গায় নামিয়া ডুব দিতে আরম্ভ করিত, তখন নীলকান্ত ফস্ করিয়া আসিয়া সাবান চুরি করিয়া লইত—সতীশ যথাকালে সাবানের সন্ধানে আসিয়া দেখিত সাবান নাই। একদিন নাহিতে নাহিতে হঠাৎ দেখিল তাহার বিশেষ সখের চিকনের কাজ করা জামাটি গঙ্গার জলে ভাসিয়া যাইতেছে, ভাবিল হাওয়ায় উড়িয়া গেছে কিন্তু হাওয়াটা কোন্‌দিক হইতে বহিল তাহা কেহ জানে না। একদিন সতীশকে আমোদ দিবার জন্য কিরণ নীলকান্তকে ডাকিয়া তাহাকে যাত্রার গান গাহিতে বলিলেন—নীলকান্ত নিরুত্তর হইয়া রহিল। কিরণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর আবার কি হলরে? নীলকান্ত তাহার জবাব দিল না। কিরণ পুনশ্চ বলিলেন, সেই গানটা গা না!—সে আমি ভুলে গেছি বলিয়া নীলকান্ত চলিয়া গেল।

অবশেষে কিরণের দেশে ফিরিবার সময় হইল। সকলেই প্রস্তুত হইতে লাগিল;—সতীশও সঙ্গে যাইবে। কিন্তু নীলকান্তকে কেহ কোন কথাই বলে না। সে সঙ্গে যাইবে কি থাকিবে সে প্রশ্নমাত্র কাহারও মনে উদয় হয় না। কিরণ নীলকান্তকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলেন তাহাতে শাশুড়ি স্বামী এবং দেবর সকলেই একবাক্যে আপত্তি করিয়া উঠিলেন, কিরণও তাঁহার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। অবশেষে যাত্রার দুইদিন আগে ব্রাহ্মণ বালককে ডাকিয়া কিরণ তাহাকে স্নেহবাক্যে স্বদেশে যাইতে উপদেশ করিলেন। সে উপরি উপরি কয়দিন অবহেলার পর মিষ্টবাক্য শুনিতে পাইয়া আর থাকিতে পারিল না, একেবারে কাঁদিয়া

উঠিল। কিরণেরও চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল;—যাহাকে চির-কাল কাছে রাখা যাইবে না, তাহাকে কিছুদিন আদর দিয়া তাহার মায়া বসিতে দেওয়া ভাল হয় নাই বলিয়া কিরণের মনে বড় অনুতাপ উপস্থিত হইল। সতীশ কাছে উপস্থিত ছিল, সে অতবড় ছেলের কান্না দেখিয়া ভারি বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—আরে মোলো! কথা নাই বার্ত্তা নাই, একেবারে কাঁদিয়াই অস্থির!—কিরণ এই কঠোর উক্তির জন্য সতীশকে ভৎর্সনা করিলেন; সতীশ কহিল, তুমি বোঝনা বৌদিদি, তুমি সকলকেই বড় বেশি বিশ্বাস কর; কোথাকার কে তাহার ঠিক নাই, এখানে আসিয়া দিব্য রাজার হালে আছে। আবার পুনর্মূষিক হইবার আশঙ্কায় আজ মায়া-কান্না জুড়িয়াছে—ও বেশ জানে যে দু ফোঁটা চখের জল ফেলিলেই তুমি গলিয়া যাইবে।

নীলকান্ত তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল;—কিন্তু তাহার মনটা সতীশের কাল্পনিক মূর্ত্তিকে ছুরি হইয়া কাটিতে লাগিল, ছুঁচ হইয়া বিঁধিতে লাগিল, আগুন হইয়া জ্বালাইতে লাগিল, কিন্তু প্রকৃত সতীশের গায়ে একটি চিহ্নমাত্র বসিল না, কেবল তাহারই মর্ম্মস্থল হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে সতীশ একটি সৌখীন দোয়াতদান কিনিয়া আনিয়াছিল, তাহাতে দুইপাশে দুই ঝিনুকের নৌকার উপর দোয়াত বসান, এবং মাঝে একটা জর্ম্মন্ রৌপ্যের হাঁস উন্মুক্ত চঞ্চুপুটে কলম লইয়া পাখা মেলিয়া বসিয়া আছে, সেটির প্রতি সতীশের অত্যন্ত যত্ন ছিল; প্রায় সে মাঝে মাঝে সিল্কের রুমাল দিয়া অতি সযত্নে সেটি ঝাড়পোঁচ করিত। কিরণ প্রায়ই পরিহাস করিয়া সেই রৌপ্যহংসের চঞ্চু-অগ্রভাগে অঙ্গুলির আঘাত করিয়া বলিতেন, ওরে রাজহংস, জন্মি দ্বিজবংশে এমন নৃশংস কেন হলিরে—এবং

ইহাই উপলক্ষ্য করিয়া দেবরে তাঁহাতে হাস্যকৌতুকের বাগ্‌যুদ্ধ চলিত!

স্বদেশযাত্রার আগের দিন সকাল-বেলায় সে জিনিষটা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কিরণ হাসিয়া কহিলেন, ঠাকুরপো, তোমার রাজহংস তোমার দময়ন্তীর অন্বেষণে উড়িয়াছে। কিন্তু সতীশ অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। নীলকান্তই যে সেটা চুরি করিয়াছে সে বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র রহিল না—গতকল্য সন্ধ্যার সময় তাহাকে সতীশের ঘরের কাছে ঘুর ঘুর করিতে দেখিয়াছে এমন সাক্ষীও পাওয়া গেল। সতীশের সম্মুখে অপরাধী আনীত হইল। সেখানে কিরণও উপস্থিত ছিলেন। সতীশ একেবারেই তাহাকে বলিয়া উঠিলেন, তুই আমার দোয়াত চুরি করে' কোথায় রেখেছিস্, এনে দে!

নীলকান্ত নানা অপরাধে এবং বিনা অপরাধেও শরতের কাছে অনেক মার খাইয়াছে, এবং বরাবর প্রফুল্লচিত্তে তাহা বহন করিয়াছে। কিন্তু কিরণের সম্মুখে যখন তাহার নামে দোয়াৎ চুরির অপবাদ আসিল, তখন তাহার বড় বড় দুই চোখ আগুনের মত জ্বলিতে লাগিল; তাহার বুকের কাছটা ফুলিয়া কণ্ঠের কাছে ঠেলিয়া উঠিল; সতীশ আর একটা কথা বলিলেই সে তাহার দুই হাতের দশ নখ লইয়া ক্রুদ্ধ বিড়ালশাবকের মত সতীশের উপর গিয়া পড়িত। তখন কিরণ তাহাকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া মৃদুমিষ্টস্বরে বলিলেন—নীলু, যদি সেই দোয়াৎটা নিয়ে থাকিস্ আমাকে আস্তে আস্তে দিয়ে যা, তোকে কেউ কিছু বল্‌বে না!

তখন নীলকান্তর চোখ ফাটিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, অবশেষে সে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিরণ বাহিরে আসিয়া বলিলেন, নীলকান্ত কখনই চুরি করে নি! শরৎ এবং

সতীশ উভয়েই বলিতে লাগিলেন, নিশ্চয়, নীলকান্ত ছাড়া আর কেহই চুরি করেনি। কিরণ সবলে বলিলেন, কখনই না। শরৎ নীলকান্তকে ডাকিয়া সওয়াল করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিরণ বলিলেন, না, উহাকে এই চুরি সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না। সতীশ কহিলেন, উহার ঘর এবং বাক্স খুঁজিয়া দেখা উচিত। কিরণ বলিলেন, তাহা যদি কর, তাহা হইলে তোমার সঙ্গে আমার জন্মশোধ আড়ি হইবে। নির্দ্দোষীর প্রতি কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিতে পাইবে না। বলিতে বলিতে তাঁহার চোখের পাতা দুই ফোঁটা জলে ভিজিয়া উঠিল। তাহার পর সেই দুটি করুণ চক্ষুর অশ্রুজলের দোহাই মানিয়া নীলকান্তের প্রতি আর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইল না।

নিরীহ আশ্রিত বালকের প্রতি এইরূপ অত্যাচারে কিরণের মনে অত্যন্ত দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি ভাল দুই জোড়া ফরাসডাঙ্গার ধুতি চাদর, দুইটি জামা, এক জোড়া নূতন জুতা এবং একটি দশ টাকার নোট লইয়া সন্ধ্যাবেলায় নীলকান্তের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, নীলকান্তকে না বলিয়া সেই স্নেহ-উপহারগুলি আস্তে আস্তে তাহার বাক্সর মধ্যে রাখিয়া আসিবেন। টিনের বাক্সটিও তাঁহার দত্ত। আঁচল হইতে চাবির গোচ্ছা লইয়া নিঃশব্দে সেই বাক্স খুলিলেন। কিন্তু তাঁহার উপহারগুলি ধরাইতে পারিলেন না। বাক্সর মধ্যে লাঠাই, কঞ্চি, কাঁচা আম কাটিবার জন্য ঘষা ঝিনুক, ভাঙ্গা গ্লাসের তলা প্রভৃতি নানা জাতীয় পদার্থ স্তূপাকারে রক্ষিত। কিরণ ভাবিলেন, বাক্সটি ভাল করিয়া গুছাইয়া তাহার মধ্যে সকল জিনিষ ধরাইতে পারিবেন। সেই উদ্দেশে বাক্সটি খালি করিতে লাগিলেন। প্রথমে লাঠাই লাঠিম ছুরি ছড়ি প্রভৃতি বাহির হইতে লাগিল—তাহার

পরে খানকয়েক ময়লা এবং কাচা কাপড় বাহির হইল, তাহার পরে সকলের নীচে হঠাৎ সতীশের সেই বহুযত্নের রাজহংসশোভিত দোয়াতদানটি বাহির হইয়া আসিল। কিরণ আশ্চর্য্য হইয়া আরক্তিমমুখে অনেকক্ষণ সেটি হাতে করিয়া লইয়া ভাবিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কখন্ নীলকান্ত পশ্চাৎ হইতে ঘরে প্রবেশ করিল তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না। নীলকান্ত সমস্তই দেখিল; মনে করিল কিরণ স্বয়ং চোরের মত তাহার চুরি ধরিতে আসিয়াছেন, এবং তাহার চুরিও ধরা পড়িয়াছে। সে যে সামান্য চোরের মত লোভে পড়িয়া চুরি করে নাই, সে যে কেবল প্রতিহিংসা সাধনের জন্য একাজ করিয়াছে, সে যে ঐ জিনিষটা গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবে বলিয়াই ঠিক করিয়াছিল, কেবল এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতাবশতঃ ফেলিয়া না দিয়া নিজের বাক্সর মধ্যে পুরিয়াছে সে সকল কথা সে কেমন করিয়া বুঝাইবে! সে চোর নয়, সে চোর নয়! তবে সে কি? কেমন করিয়া বলিবে সে কি! সে চুরি করিয়াছে কিন্তু সে চোর নহে; কিরণ যে তাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন এ নিষ্ঠুর অন্যায় সে কিছুতেই বুঝাইতেও পারিবে না, বহন করিতেও পারিবে না।

কিরণ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সেই দোয়াতদানটা বাক্সর ভিতরে রাখিলেন। চোরের মত তাহার উপরে ময়লা কাপড় চাপা দিলেন, তাহার উপর বালকের লাঠাই লাঠি লাঠিম ঝিনুক কাঁচের টুক্‌রা প্রভৃতি সমস্তই রাখিলেন, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার উপহারগুলি ও দশ টাকার নোটটি সাজাইয়া রাখিলেন।

কিন্তু পরের দিন সেই ব্রাহ্মণ বালকের কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। গ্রামের লোকেরা বলিল, তাহাকে দেখে নাই; পুলিস বলিল তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না; শরৎ সপরিবারে

দেশে চলিয়া গেলেন; বাগান একদিনে শূন্য হইয়া গেল; কেবল নীলকান্তের সেই পোষা গ্রাম্য কুকুরটা আহার ত্যাগ করিয়া নদীর ধারে ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল!

ইন্দ্রপূজা।

ইন্দ্র বৈদিক দেবতা। বেদের নানাস্থানে ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তবস্তুতি দেখিতে পাওয়া যায়। (১) অনেকের মতে বৈদিকযুগের শেষাবস্থায় ইন্দ্র পৃথক দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইতেন না। ঋগ্বেদে লিখিত আছে, আচার্য্যেরা একমাত্র পরমেশ্বরকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। (২) ভগবান মনুও ইন্দ্রশব্দ পরমেশ্বরের নামান্তর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (৩) পুরাণে ইন্দ্র দেবগণের রাজারূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। যাহাই হউক—ঈশ্বরের নামান্তর বোধেই হউক, আর পৃথক দেবতাজ্ঞানেই হউক, ইন্দ্রপূজা হিন্দুজাতির মধ্যে বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল। কলিযুগে বৈদিক রীতির প্রায় সমস্তই অন্যথা হইয়াছে। ইন্দ্র বরুণের উদ্দেশে প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নিতে আর

(১) "শং ন ইন্দ্রোবৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণু রুরুক্রমঃ।" ইত্যাদি। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

(২) "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথোদিব্যঃ" ইত্যাদি। ঋগ্বেদ ১। ১৬৪। ৪৬।

(৩) "এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্।
ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্মশাশ্বতম্॥"
মনু ১২শ অধ্যায়, ১২৩।

দেবভোগ্য পবিত্র হবিঃ নিক্ষিপ্ত হয় না। কালী দুর্গা প্রভৃতি পৌরাণিক দেবদেবী ও রামকৃষ্ণাদি অবতারগণ এখন বৈদিক দেবতাগণের স্থান অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু সহস্রলোচন ইন্দ্রকে কেহই পরাস্ত করিতে পারেন নাই। তিনি আজিও বঙ্গীয় পুরন্ধ্রীগণের নিকট প্রতিবর্ষে যথাবিধি পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কিন্তু এ পূজা বৈদিক রীতিতে সম্পন্ন হয় না, কাল পরিবর্ত্তনে পূজা-পদ্ধতিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সত্যযুগের সে সমিধ্ নাই, কুশ নাই, অগ্নি নাই, হোম নাই ;—আছে কেবল ঢাকঢোল নৈবেদ্য, গণ্ডমূর্খ পুরোহিত এবং তথৈবচ প্রতিমা। তবে এক বিষয়ে দেবরাজকে সমস্ত দেবতা অপেক্ষা সৌভাগ্যশালী বলা যাইতে পারে। কোমলকণ্ঠ কামিনীগণের সুমধুর সঙ্গীতনিনাদ এবং নূপুরনিক্কণসমন্বিত সুললিত নৃত্য এই পূজার সর্ব্বপ্রধান উপকরণ। বঙ্গীয় বামাগণের, বিশেষতঃ হিন্দুকুলবধূগণের সঙ্গীত ও নৃত্যের কথা শুনিয়া অনেকেই হয়ত শিহরিয়া উঠিবেন, এবং লেখককে অনৃতবাদী বলিয়া অপরাধী করিবেন। কিন্তু এই প্রবন্ধলেখক সহরবাসী "নাগরিক" নহেন, তিনি পল্লিসমাজে বাস করিয়া বাল্যকালে যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং যুবাকালে স্বকর্ণে শুনিয়াছেন, এ প্রবন্ধে তাহাই লিখিত হইতেছে, ইহাতে অতিরঞ্জনের নাম মাত্রও নাই।

এই ইন্দ্রপূজা কতদিন হইতে বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে, তাহা অবগত হইবার কোন উপায় নাই। বীরভূম, বর্দ্ধমান ও মুরশিদাবাদ ব্যতীত বঙ্গদেশের আর কোন্ কোন্ অংশে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ইহা প্রচলিত আছে কি না বলা যায় না। কবি চণ্ডিদাস তাঁহার পদাবলীর এক স্থানে বলিয়াছেন,

গোকুল নগরে ইন্দ্রপূজা করে
দেখি আইল যত নারী।
নগর ভিতর মহা কলরব
নাগর হৈল পসারি॥

গোকুলনগরের ব্রজবালাদের কথা জানিনা কিন্তু কবি চণ্ডিদাসের জন্মভূমি বীরভূমের জনপদবধূগণ এখনও ইন্দ্রপূজা বিস্মৃত হন নাই।

সাধনমাত্রেরই সিদ্ধি এবং উপায়মাত্রেরই উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক। ইন্দ্রপূজার প্রধান সাধন সঙ্গীত ও নৃত্য যেমন প্রীতিজনক, উদ্দেশ্যও সেইরূপ অতি উপাদেয়। "ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগ" বা "শমদমাদিষট্‌সম্পত্তি"র ন্যায় কোন উৎকট সিদ্ধিলাভ ইহার উদ্দেশ্য নহে। এই "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা" বঙ্গভূমি যাহাতে তৃণশস্যে সুশোভিত হয়, এই জন্যই ইন্দ্রের আরাধনা। দেবমাতৃক প্রদেশে বৃষ্টি ব্যতীত শস্য উৎপন্ন হয় না, কৃষিজীবী প্রজার যথাকালে সুবৃষ্টি একমাত্র অবলম্বন। দেবরাজের অনুগ্রহ না হইলে বৃষ্টি হয় না, মেঘসকল তাঁহার অধীন, সুতরাং পৃথিবীর উৎপাদিকাশক্তি ও শস্য-সম্পত্তি ইন্দ্রের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে। বোধ হয় এই পৌরাণিক আখ্যায়িকাই ইন্দ্রপূজাপ্রবর্ত্তনের মূল কারণ। পূজার অনুষ্ঠানেও ইহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়।

এই ইন্দ্রপূজা বর্দ্ধমান প্রদেশে স্ত্রীসমাজে "ভাঁজো" নামে প্রসিদ্ধ। 'ভজন' শব্দের অপভ্রংশ "ভাঁজো"। পূজার পদ্ধতি এইরূপ ;——

ভাদ্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠীর নাম "মন্থনষষ্ঠী"। মন্থনষষ্ঠীর পূর্ব্বদিন পঞ্চমী তিথিতে মটর, মুগ, ছোলা, অরহর ও বিরি (মাসকলাই)

এই পাঁচ রকম শস্য একটী পাত্রে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। পরদিন ষষ্ঠীপূজাতে উহা নৈবেদ্যস্বরূপ প্রদত্ত হয়। অনন্তর ষষ্ঠীপূজা শেষ হইলে অবশিষ্ট যে শস্য থাকে, তাহা কিঞ্চিৎ সর্ষপসহ নূতন শরাতে ইন্দুর মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হয়। ইহাকে মেয়েলি ভাষায় "শস্‌পাতা," সাধু ভাষায় "শস্য পাতা" বা "শস্য রোপন" বলে। স্ত্রীলোকেরা শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া দ্বাদশী পর্য্যন্ত প্রতিদিন ঐ শরাতে অল্প পরিমাণে জল দিতে থাকেন। ৪।৫ দিন এইরূপ জল দেওয়ার পর যদি ভালরূপ অঙ্কুরোদ্গম হয়, তাহা হইলে এবর্ষে প্রচুর শস্যোৎপন্ন হইবে বুঝিতে পারা যায়।

"মন্থনষষ্ঠীর" পরবর্ত্তী শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে সন্ধ্যার পর ইন্দ্রপূজা হইয়া থাকে। এই জন্য এই তিথির নাম "ইন্দ্র দ্বাদশী"। কৌলিক নিয়মানুসারে গ্রামের কোন ব্রাহ্মণ-গৃহস্থের অন্তঃপুরে একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত অনতিউচ্চ বেদি প্রস্তুত হয়। ঐ বেদিকার উপর হস্তীপৃষ্ঠে অবস্থিত দ্বিহস্ত ইন্দ্রমূর্ত্তি স্থাপিত হয়। অনন্তর সন্ধ্যা সমাগত হইলে, মন্থনষষ্ঠীর দিন নূতন শরাতে যে পঞ্চশস্য রোপন করা হইয়াছে, মহিলাগণ স্বহস্তে সেই শস্যসমেত শরাগুলি বেদিকার চারিদিকে রাখিয়া দেন। সধবা বিধবা এবং কুমারী সকলেরই ইন্দ্রপূজায় অধিকার আছে। সাধারণতঃ ৭।৮ বৎসর হইতে ২০।২৫ বৎসর বয়স্কা রমণীগণ এই পূজায় যোগদান করিয়া থাকেন। সকলে আপন আপন "শস্য" বেদির উপর স্থাপন করিলে পুরোহিত যথারীতি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া পূজা সমাপ্ত করেন।

অনন্তর রজনী প্রহরাতীত হইলে শরজ্জ্যোৎস্নায় চারিদিক যখন আনন্দে এবং আলোকে হাস্য করিতে থাকে, সেই হাস্যময়ী জ্যোৎস্নাবতী রাত্রিতে বালিকা এবং যুবতীগণ মনোহর বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন। তখন অন্তঃ-

পুরের সমস্ত দ্বার দৃঢ়রূপে বন্ধ করা হয়। এ সময়ে কোন পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারেন না। কেবল বাদ্যকর বেদি হইতে কিঞ্চিৎ দূরে পর্দ্দার অন্তরালে বসিয়া বাদ্য বাজাইতে থাকে। কখন কখন ৬।৭ বৎসরের বালকগণও এই উৎসবে প্রবেশাধিকার পাইয়া থাকেন। প্রবন্ধলেখক সৌভাগ্যবশতঃ ৮ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় একবার এই অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

অতঃপর সমবেত মহিলারা পরস্পর হস্তধারণ করিয়া ইন্দ্রপ্রতিমাকে বেষ্টনপূর্ব্বক বেদির চারিদিকে মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হ'ন, এবং সকলে এক সঙ্গে সুরসংযোগে

"ভাঁজো লো কল্‌কলানি মাটির লো শরা।
ভাঁজোর গলায় দেব আমরা পঞ্চ ফুলের মালা।"

এই ছড়া আবৃত্তি করিয়া ইন্দ্রের গলায় পঞ্চপুষ্পের মালা প্রদান করেন। পরে বাদ্যের তালে তালে সকলে পূর্ব্ববৎ হস্তধারণ করিয়া বেদি প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে বলেন,

"এক কলসা গঙ্গাজল এক কলসী ঘি।
বৎসরান্তর একবার ভাঁজো! নাচবো না তো কি॥"

ইহার পর মহিলারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া নৃত্য ও অনেক ছড়াকাটাকাটি করেন। এই সকল ছড়া প্রায়ই মুখে মুখে রচিত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার মধ্যে শ্লীল অশ্লীলের বড় বিচার থাকে না। যাঁহারা দিবাভাগে অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া লজ্জাবতী লতার ন্যায় বিচরণ করেন, তাঁহাদের মুখে অশ্লীল সঙ্গীত; যাঁহাদিগকে অন্তঃপুরপ্রাঙ্গণে নিঃশব্দে ভ্রমণ করিতে হয়, তাঁহাদের পুরুষোচিত তাণ্ডবলীলা; ইহা অতি বিচিত্র রহস্য! কিন্তু রহস্যের মর্ম্মভেদ করা কঠিন নয়। স্বর্গে সুরপুরে দেবরাজ পুরন্দরের সভায় দেবগণের সন্তোষবিধানার্থ অপ্সরাগণ নৃত্য ও সঙ্গীত করেন, পুরাণ-

বর্ণিত এ সকল বৃত্তান্ত হিন্দুসমাজের সর্ব্বত্রই সুপরিচিত। বোধ হয় এই "স্বর্গীয়" প্রথার অনুকরণে শস্য ও বৃষ্টি কামনায় ইন্দ্র-পূজার বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। শুনিতে পাওয়া যায়, সুরসভায় নৃত্যের সময় কোন প্রকার ব্যতিক্রম লক্ষিত হইলে নৃত্যকারিণীকে সমুচিত দণ্ড গ্রহণ করিতে হইত। কিন্তু মর্ত্ত্যের ইন্দ্রসভায় অশ্লীলতা প্রবেশ করিল কিরূপে? শিক্ষা ও শাসনের অভাবই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। আর একটী প্রধান কারণ স্ত্রী ও পুরুষসমাজের অতিমাত্র পার্থক্য। রমণী যাহা পুরুষের সমক্ষে করিতে পারেন না, এবং পুরুষ যাহা রমণীর সমক্ষে করিতে পারেন না, ধর্ম্মানুষ্ঠান হউক আর আমোদপ্রমোদ হউক—তাহা ক্রমশঃ দূষিত হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। পরস্পরের প্রতি সম্ভ্রম-বশতঃ যে আত্মসম্ভ্রম ও আত্মসংযমের উদয় হয়, তাহাই সকল অবস্থার মধ্যে পুরুষ ও নারীকে নীতি ও ধর্ম্মের দিকে ধারণ করিয়া থাকে। আমাদের বোধ হয় যদি ইন্দ্রপূজায় পুরুষের সমক্ষে নৃত্যের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে ইহার ভিতর কোন-প্রকার অভদ্রতা ও অশ্লীলতা প্রবেশ করিতে পারিত না।

ইন্দ্রপূজার বিবরণ এখনও সমাপ্ত হয় নাই, তৎসম্বন্ধে আরও দুই চারিটী কথা বলা আবশ্যক। পূর্ব্বকথিত ছড়া বা গানগুলির অধিকাংশই ব্যক্তিগত উক্তি প্রত্যুক্তি মাত্র। ২।৪টী সাধারণভাবের ছড়াও আছে। আমরা অনেক চেষ্টায় তাহার দুইটীমাত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। ছড়া দুইটী এই—

১। "পূর্ণিমার চাঁদ দেখে তেঁতুল হল বঙ্ক।
গড়ের গুগ্‌লি বলেন, আমি হব শঙ্খ॥"

২। "ওগো ভাঁজো! তুমি কিসের গরব কর?
আইবুড়ো বেটাছেলের বিয়ে দিতে নার॥"

আমাদের কোন আত্মীয়া আরও ভাল ভাল ছড়া সংগ্রহ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অতএব আশা করি আমরা সাধনার পাঠকগণকে তাহা উপহার দিতে সক্ষম হইব।

এইরূপে ছড়াকাটাকাটি, সঙ্গীত ও নৃত্যোৎসবে প্রায় সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইলে পরদিন প্রাতঃকালে সকলে আপন আপন শস্যপূর্ণ শরা মাথায় করিয়া পুষ্করিণীতে বিসর্জ্জন করেন। বিসর্জ্জনের মন্ত্র এই—

"ভাঁজো! এই পথে যেও।
বেণাগাছে কড়ি আছে
দুধ কিনে খেও॥"

আবশ্যক অতীত হইয়া গেলে মানুষ উপকারী সুহৃদ্‌কে এইরূপ মিথ্যা প্রবঞ্চনায় ভুলাইয়া দিবার করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। বেণাগাছে কড়ি নাই, তাহাতে দুধও মিলিবে না—কিন্তু ওটা বোধ করি ভদ্র করিয়া বলা, যে, এখন তুমি নিজের পথ নিজে দেখ, এবং দুধ খাইবার আবশ্যক বোধ কর ত কড়ির সন্ধান করগে।

ইন্দ্রপূজা উপলক্ষে হিন্দুকুলমহিলাগণের নৃত্যগীতপ্রসঙ্গে আরও কিছু বলা আবশ্যক। মহিলাগণের নৃত্য ও সঙ্গীতপ্রথা খাঁটি য়ুরোপীয় প্রথা বলিয়াই অনেকের ধারণা। কিন্তু নৃত্যগীতকলাভিজ্ঞা পতিব্রতা বেহুলার কথা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সুপরিচিত। কি মূল অবলম্বন করিয়া কবি কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ "মনসার ভাসান" রচনা করিয়াছেন বলা যায় না, তবে এই গ্রন্থে সমস্ত উপকরণই খাঁটি বাঙ্গালি বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গীয় সমাজের কোন বিরুদ্ধ কথা বেহুলার উপাখ্যানে স্থান পাইবার সম্ভাবনা নাই। বেহুলার বাল্য-ইতিহাস এইরূপ—

"চন্দ্রমুখী খঞ্জননয়নী কলাবতী।
অধর অরুণ জিনি বিদ্যুতের দ্যুতি ॥
শ্রবণে কুণ্ডল তার খোঁপায় বকুল।
বেহুলার রূপেতে মোহিত অলিকুল ॥
... ...
শিশুকাল হইতে রামা শিখে নৃত্য গীত।
সাধুসুতে জীয়াইবে দৈবের লিখিত ॥
মা বাপের বাটীতে বেহুলা নাচে গায়।
বেহুলার গানেতে অমলা মোহ যায় ॥"

স্ত্রীলোকের নৃত্যগীত সমাজবিগর্হিত একান্ত নিন্দনীয় প্রথা হইলে "সায়বেণে" কখনও স্বীয় দুহিতাকে তাহা শিক্ষা দিতে পারিতেন না ; অথবা কবি একথা উল্লেখ করিতে নিশ্চয়ই কোন প্রকার সঙ্কোচ বোধ করিতেন। কিন্তু বেহুলা ভালরূপ নৃত্য করিতে পারিতেন বলিয়া কবি তাঁহাকে "বেহুলানাচনী" বলিয়া গ্রন্থের নানাস্থানে গৌরব সহকারে পরিচিত করিয়াছেন। ফলতঃ অদ্যাপি পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমাঞ্চলে বিবাহাদি উৎসবের সময় কুলনারীগণ মঙ্গলসঙ্গীত গান করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের "জলসওয়ার" কথা অনেকেই অবগত আছেন। আর সুসভ্য বঙ্গদেশের কোন কোন পল্লীতে আজও ইন্দ্রপূজা উপলক্ষে কুলকামিনীরা নৃত্যসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। বরং ইংরাজি সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল প্রথা ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। বোধ হয় আর ৫০ বৎসরের মধ্যে ইন্দ্রপূজার অস্তিত্ব এদেশে একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

কৃষ্ণচরিত্র।

আমরা গত সংখ্যক সাধনায় বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিকতা আলোচনা করিয়াছিলাম। বঙ্কিম প্রধানতঃ কৃষ্ণচরিত্রকেই উপলক্ষ্য করিয়া কেবল প্রসঙ্গক্রমে মহাভারতের ঐতিহাসিকতা বিচার করিয়াছেন; কিন্তু প্রথমে প্রমাণ ও বিচার প্রয়োগপূর্ব্বক প্রধানতঃ সমস্ত মহাভারতের ইতিহাস-অংশ বাহির করিলে পর, তবে কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিকতা সন্তোষজনক রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

উদাহরণস্বরূপে বলিতে পারি, দ্রৌপদীর পঞ্চপতিগ্রহণ প্রামাণিক সত্য কি না, সে বিষয়ে বঙ্কিম সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; অতএব দেখা আবশ্যক, বঙ্কিম যাহাকে মূল মহাভারত বলিতেছেন তাহার সর্ব্বত্র হইতেই দ্রৌপদীর পঞ্চপতিগ্রহণ বর্জ্জন করা যায় কি না, এবং বঙ্কিম মহাভারতের যে যে অংশ হইতে কৃষ্ণচরিত্রের ইতিহাস সংকলন করিয়াছেন, সেই সেই অংশে দ্রৌপদীর পঞ্চপতিচর্য্যা অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত নাই কি না। বঙ্কিম মহাভারতবর্ণিত যে সকল ঘটনাকে অনৈতিহাসিক মনে করেন সে সমস্ত যদি তিনি তাঁহার কল্পিত মূল মহাভারত হইতে প্রমাণ সহকারে দূর করিয়া দিতে পারেন, তবে আমরা তাঁহার নির্ব্বাচিত অংশকে বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাসরূপে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারি। কিন্তু মহাভারতের ঠিক কতটুকু মূল ঐতিহাসিক অংশ তাহা বঙ্কিম সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট করেন নাই, তিনি কেবলমাত্র কৃষ্ণচরিত্রের ধারাটি অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি এক-স্থানে বলিয়াছেন—"আমিও বিশ্বাস করি না, যে, যজ্ঞের অগ্নি

হইতে দ্রুপদ কন্যা পাইয়াছিলেন, অথবা সেই কন্যার পাঁচটি স্বামী ছিল। তবে দ্রুপদের ঔরসকন্যা থাকা অসম্ভব নহে, এবং তাঁহার স্বয়ংবর বিবাহ হইয়াছিল, এবং সেই স্বয়ংবরে অর্জ্জুন লক্ষবেধ করিয়াছিলেন, ইহা অবিশ্বাস করিবারও কারণ নাই। তার পর, তাঁহার পাঁচস্বামী হইয়াছিল, কি এক স্বামী হইয়াছিল, সে কথার মীমাংসায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।”

প্রয়োজন যথেষ্ট আছে। কারণ, বঙ্কিম মহাভারতকে ইতিহাস বলিয়া জ্ঞান করেন এবং সেই জন্যই মহাভারতবর্ণিত কৃষ্ণ-চরিত্রকে তিনি ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীবিবাহ ব্যাপারটি তুচ্ছ নহে; কিন্তু, এত বড় ঘটনাটি যদি মিথ্যা হয়, এবং সেই মিথ্যা যদি বঙ্কিমের নির্ব্বাচিত মহা-ভারতেও স্থান পাইয়া থাকে তবে তদ্দ্বারা সেই মহাভারতের প্রামাণিকতা হ্রাস ও সেই মহাভারতবর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রের ঐতি-হাসিকতা খর্ব্ব হইয়া আসে। সাক্ষী যখন একমাত্র, তখন তাহার সাক্ষ্যের কোন এক বিশেষ অংশ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে গেলে সাক্ষ্যের অপরাংশে মিথ্যাসংস্রব না থাকা আবশ্যক।

কিন্তু এত আয়োজন করিয়া অগ্রসর হইতে গেলে সম্ভবতঃ কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থখানি বাঙ্গালী পাঠকের অদৃষ্টে জুটিত না। সমুচিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সমস্ত মহাভারতের সমূলক অংশ উদ্ধার করা এক জন লোকের জীবিতকালে সম্ভব কি না সন্দেহ। অত-এব, মহাভারতের বিস্তীর্ণ গহন অরণ্যের মধ্যে বঙ্কিম যে এক সঙ্কীর্ণ পথের সূচনা করিয়া দিয়াছেন তাহা আমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা,—এবং অল্প বিস্ময়ের বিষয় নহে। আমাদের কেবল বক্তব্য এই, যে, তাঁহার কার্য্য পরিসমাপ্ত হয় নাই। বঙ্কি-মের প্রতিভা আমাদিগকে যেখানে উপনীত করিয়াছেন সেই-

খানেই যে আমাদিগকে সন্তুষ্টচিত্তে বসিয়া থাকিতে হইবে, তাহা নহে। তিনি আমাদিগকে অসন্তোষের উদাহরণ দেখাইয়া গিয়াছেন তাহাই আমাদিগকে অনুসরণ করিতে হইবে; সচেষ্টভাবে সত্যের রাজ্য বিস্তার করিতে হইবে। তিনি আমাদের হাতে মুক্তাটি দিয়া যান নাই, দৃষ্টান্ত সহকারে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, যদি মুক্তা চাও ত সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইবে। খুব সম্ভবতঃ আমরা নমস্কার করিয়া বলিব, আমাদের মুক্তায় কাজ নাই, আমরা সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারিব না।

বঙ্কিম, মেকলে কার্লাইল্ লামার্টিন্ থুকিদিদীস্ প্রভৃতি উদাহরণ দেখাইয়া মহাভারতকে কবিত্বময় ইতিহাস বলিতে চাহেন; আমরা মহাভারতকে ঐতিহাসিক কাব্য বলিয়া গণ্য করি। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্রের আদর্শ আমরা ইতিহাস হইতে পাই, অথবা কাব্য হইতে পাই, অথবা কাব্য ইতিহাসের মিশ্রণ হইতে পাই তাহা লইয়া অধিক তর্ক করিতে চাহি না। ফলতঃ ইতিহাস যে বেদবাক্য তাহা নহে; সকলেই জানেন একটা উপস্থিত ঘটনাস্থলেও প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রকৃতরূপে গ্রহণ করিতে এবং প্রকৃতরূপে বর্ণনা করিতে অতি অল্প লোকই পারে। খণ্ড খণ্ড বৃত্তান্ত হইতে একটি সমগ্র মানবচরিত্র ও ইতিহাস রচনা করা আরও অল্প লোকের সাধ্যায়ত্ত। সকলেই জানেন, আত্মীয় সম্বন্ধেও আত্মীয়ের ভ্রম হয় এবং বন্ধুকেও বন্ধু অনেক বিষয়ে বিপরীতভাবে বুঝিয়া থাকেন। অসাধারণ লোককে প্রকৃতভাবে জানা আরও কঠিন;—দূর হইতে এবং অতীত বৃত্তান্ত হইতে তাঁহার যথার্থ প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ বহুল পরিমাণে কাল্পনিক তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রমাণে এবং অনুমানে মিশ্রিত করিয়া একই লোকের এত বিভিন্ন প্রকার মূর্ত্তি গড়িয়া তোলা যায় যে তাহার মধ্যে কোন্‌টা মূলের অনুরূপ তাহা

প্রকৃতিভেদে ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভাবে বিশ্বাস করেন। ইতিহাস-মাত্রই যে বহুল পরিমাণে লেখকের অনুমান ও পাঠকের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ স্থলে কবির অনুমান ঐতিহাসিকের অনুমানের অপেক্ষা প্রকৃত ইতিহাসের অনেক কাছাকাছি যাওয়া কিছুই অসম্ভব নহে। ফষ্টার সাহেব ষ্ট্র্যাফোর্ডের যে জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন, জনশ্রুতি এই যে, তাহা কবি ব্রাউনিংয়ের স্বরচিত বলিলেই হয়, কিন্তু উক্ত কবি অনতিকাল পরে ষ্ট্র্যাফোর্ড্ নামক যে নাটক লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার ইতিহাসের অপেক্ষা অধিকতর সত্য বলিয়া পরে প্রমাণিত হইয়াছে। সেইরূপ, পুরাকালে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবৃত্তান্ত সম্বন্ধে যে সকল কিম্বদন্তি বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত ছিল, মহাভারতের কবি কল্পনাবলে তাহাদের অসম্পূর্ণতা পূরণ করিয়া তাহাদিগকে যে একটি সমগ্র চিত্রে প্রতিফলিত করিয়া তুলিয়াছেন তাহা যে ঐতিহাসিকের ইতিহাস অপেক্ষা অল্প সত্য হইবেই এমন কোন কথা নাই।

তথ্য, যাহাকে ইংরাজিতে fact কহে, সত্য তদপেক্ষা অনেক ব্যাপক। এই তথ্যস্তূপ হইতে যুক্তি এবং কল্পনাবলে সত্যকে উদ্ধার করিয়া লইতে হয়। অনেক সময় ইতিহাসে শুষ্ক ইন্ধনের ন্যায় রাশীকৃত তথ্য পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সত্য, কবির প্রতিভাবলে কাব্যেই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অতএব এত দীর্ঘকাল পরে মহাভারতের কবিবর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিক প্রমাণ লইতে বসা আমরা দুঃসাধ্য এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে বাহুল্য বোধ করি।—সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ ফ্রুড্ সাহেব বলিয়াছেন—যথার্থ মহৎ ব্যক্তির অকৃত্রিম এবং স্বাভাবিক মহত্ত্ব গদ্যের আয়ত্তের বাহিরে; তাহা কেবলমাত্র কবির লেখনী দ্বারাই বর্ণনসাধ্য। ইহার কারণ যাহাই হোক্, ফলতঃ ইহা সত্য। কবিতার এই

সঞ্জীবনীশক্তি আছে এবং গদ্যের তাহা নাই; এবং সেই কারণেই কবিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক।—

আমরা ফ্রুডের উপরিউক্ত কথার এই অর্থ বুঝি যে, মহৎ ব্যক্তির কার্য্যবিবরণ কেবল তথ্য মাত্র, তাঁহার মহত্ত্বটাই সত্য; সেই সত্যটি পাঠকের মনে উদিত করিয়া দিতে ঐতিহাসিকের গবেষণা অপেক্ষা কবি-প্রতিভার আবশ্যকতা অধিক।

সে হিসাবে দেখিতে গেলে মহাভারতের কবিবর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রের প্রত্যেক তথ্যটি প্রকৃত না হইতে পারে; কৃষ্ণের মুখে যত কথা বসান হইয়াছে এবং তাঁহার প্রতি যত কার্য্যকলাপের আরোপ হইয়াছে তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃত্তান্তটি প্রামাণিক না হইতে পারে কিন্তু কৃষ্ণের যে মাহাত্ম্য তিনি পাঠকদের মনে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা মহামূল্য সত্য। কৃষ্ণের যদি ইতিহাস থাকিত তবে সম্ভবতঃ তাহাতে এমন সহস্র ঘটনা উল্লেখ থাকিত যাহা কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলেও তাহার কোন স্থায়ী মূল্য নাই অর্থাৎ সে সকল কাজ কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব প্রকাশ করে না—এমন কি, শেষ পর্য্যন্ত সকল কথা জানা সম্ভব নহে বলিয়া তাহার অনেকগুলি কৃষ্ণের যথার্থ স্বভাবের বিরোধী বলিয়াও মনে হইতে পারিত। প্রত্যেক মানুষে অনেক কাজে নিজের যথার্থ প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও থাকে। মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্রে নিশ্চয়ই সেই সকল অনাবশ্যক এবং আকস্মিক তথ্যগুলি বর্জ্জিত হইয়া কেবল প্রকৃত স্বরূপগত সত্যগুলি নির্ব্বাচিত হইয়াছে— এমন কি, কৃষ্ণ যে কথা বলেন নাই কিন্তু যে কথা কেবল কৃষ্ণই বলিতে পারিতেন, সেই কথা কৃষ্ণকে বলাইয়া, কৃষ্ণ যে কাজ করেন নাই কিন্তু যে কাজ কেবল কৃষ্ণই করিতে পারিতেন সেই কাজ কৃষ্ণকে করাইয়া কবি বাস্তবিক কৃষ্ণ অপেক্ষা তাঁহার কৃষ্ণকে অধিকতর সত্য করিয়া

তুলিয়াছেন। অর্থাৎ, বাস্তব-কৃষ্ণে স্বভাবতই অকৃষ্ণ যাহা ছিল তাহা দূরে রাখিয়া এবং বাস্তবকৃষ্ণ নিজের চরিত্রগুণে কবির মনে যে আদর্শের উদয় করিয়া দিয়াছেন পরন্তু নানা বাহ্য কারণে যাহা কার্য্যে সর্ব্বত্র ধারাবাহিক পরিস্ফুটভাবে ও নির্ব্বিরোধে প্রকাশ হইতে পারে নাই, সেই আদর্শকে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণভাবে প্রস্ফুট করিয়া কবি বাস্তবিক ইতিহাস হইতে সত্যতম নিত্যতম কৃষ্ণকে উদ্ধার করিয়া লইয়াছেন।

অতএব, বঙ্কিম যখন কৃষ্ণচরিত্রের মাহাত্ম্য বাঙ্গালী পাঠক-দিগের মনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন তখন কবির কাব্য হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া লওয়াই তাঁহার উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে। দুর্ভাগ্য-ক্রমে মহাভারত নানা কালের নানা লোকের রচনার মধ্যে চাপা পড়িয়াছে;—কবির মূল আদর্শটি বাহির করা সহজ ব্যাপার নহে। সমস্ত জঞ্জাল দূর করিতে পারিলে, কেবল কৃষ্ণ নহে, ভীষ্ম কর্ণ অর্জ্জুন দ্রৌপদী প্রভৃতি সকলেই উজ্জ্বলতর সম্পূর্ণতর আকারে আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবেন। মহাভারতের আদি কবির মূল রচনাটি উদ্ধার করা হইলে মানবজাতির একটি পরমতম লাভ হইবে।

কিন্তু, মহাভারতের আদি কবির আদর্শ কৃষ্ণচরিত্র কিরূপ ছিল বঙ্কিম নিজের আদর্শ অনুসারে তাহা আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন কিনা তাহা নিঃসংশয়ে বলিবার পূর্ব্বে অষ্টাদশ পর্ব্ব পারাবার হইতে মূল মহাভারতটিকে মন্থন করিয়া লওয়া আবশ্যক। আপাততঃ কেবল একটি বিষয়ে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।

বঙ্কিম যাঁহাকে মহাভারতের প্রথম স্তরের কবি বলেন তিনি কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিতেন না এ কথা বঙ্কিম স্বীকার করি-

য়াছেন ; এমন কি, এই তথ্যটি তাঁহার মতে প্রথম স্তর নির্ণয় করিবার একটি প্রধান উপায়।

কিন্তু বঙ্কিম কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করিতেন। এই মহৎ প্রভেদবশতঃ মহাভারতগত প্রথম স্তরের কবির আদর্শ কৃষ্ণচরিত্র তাঁহার পক্ষে নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া সহজ ছিল না। তিনি যে কৃষ্ণের অন্বেষণে নিযুক্ত ছিলেন সে কৃষ্ণ তাঁহার নিজের মনের আকাঙ্ক্ষাজাত। সমস্ত চিত্তবৃত্তির সম্যক্ অনুশীলনে সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত একটি আদর্শ তিনি ব্যাকুল চিত্তে সন্ধান করিতেছিলেন,—তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বে যাহাকে তত্ত্বভাবে পাইয়াছিলেন ইতিহাসে তাহাকেই সজীব সশরীরীভাবে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য নিঃসন্দেহ তাঁহার নিরতিশয় আগ্রহ ছিল। মনের সে অবস্থায় অন্য কোন কবির আদর্শকে অবিকলভাবে উদ্ধার করা মনুষ্যের পক্ষে সহজ নহে।

উত্তরে কেহ বলিতে পারেন, যে, বঙ্কিম যদিও কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন তথাপি তিনি বারম্বার বলিয়াছেন, যে, ঈশ্বর যখন অবতাররূপে নরলোকে অবতীর্ণ হন তখন তিনি সম্পূর্ণ মানুষ ভাবেই প্রকাশ পাইতে থাকেন, কোন প্রকার অলৌকিক কাণ্ড দ্বারা আপনাকে দেবতা বলিয়া প্রচার করেন না। অতএব, বঙ্কিম, দেবতা কৃষ্ণকে নহে, মানুষ কৃষ্ণকেই মহাভারত হইতে আবিষ্কার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

কিন্তু যে মানুষকে বঙ্কিম খুঁজিতেছিলেন তাহার কোথাও কোন অসম্পূর্ণতা নাই, তাহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপ্রাপ্ত। অর্থাৎ সে একটি মূর্ত্তিমান থিওরি। কিন্তু সম্ভবতঃ মহাভারতকারের কৃষ্ণ দেবতা নহেন, অনুশীলনপ্রাপ্ত চিত্তবৃত্তি নহেন, তিনি

মহাভারতকার এমন একটি মানুষের সৃষ্টি করেন নাই, যিনি মনুষ্য-আকারধারী তত্ত্বকথা বা নীতিসূত্র মাত্র। সেই তাঁহার অত্যুচ্চ কবিপ্রতিভার পরিচায়ক। তিনি তাঁহার বড় বড় বীরদিগকেও অনেক সময় এমন সকল অযোগ্য কাজে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন যাহা ছোট কবিদের সাহসে কুলাইত না। ছোট কবিদের সৃজনশক্তি নাই, নির্ম্মাণ শক্তি আছে; তাহারা যাহা গড়ে তাহা আদ্যোপান্ত নিয়ম অনুসারে গড়ে— কোথাও তাহার মধ্যে ব্যতিক্রম বা আত্মবিরোধ রাখিতে পারে না। প্রকৃত বড় জিনিষের অসম্পূর্ণতাও তাহার বড়ত্ব সূচনা করে;--প্রকৃতি একটা পর্ব্বতকে নিখুঁৎ মণ্ডলাকার করিবার আবশ্যক বোধ করে না— তাহার সমস্ত ভাঙ্গাচোরা তাহার সমস্ত অযত্ন অবহেলা লইয়াও সে অভ্রভেদী রাজগৌরবগর্ব্বিত। সে আপন অপূর্ণতাগুলি এমন অনায়াসে বহন করিতে পারে, যে, তাহার অপূর্ণতার দ্বারা তাহার প্রকাণ্ড সম্পূর্ণতার পরিমাপ হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র বস্তুতে সামান্য অপূর্ণতা মারাত্মক—তাহার প্রতি দৃষ্টি এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে হইলে তাহাকে নিখুঁৎ করাই আবশ্যক হইয়া পড়ে।

মহাভারতকার কবি যে একটি বীরসমাজ সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একটি সুমহৎ সামঞ্জস্য আছে কিন্তু ক্ষুদ্র সুসঙ্গতি নাই। খুব সম্ভব, আধুনিক খ্যাত অখ্যাত অনেক আর্য্য বাঙ্গালী লেখকই সরলা বিমলা দামিনী যামিনী নামধেয়া এমন সকল সতীচরিত্রের সৃষ্টি করিতে পারেন যাঁহারা আদ্যোপান্ত সুসঙ্গত অপূর্ব্ব নৈতিকগুণে দ্রৌপদীকে পদে পদে পরাভূত করিতে পারেন, কিন্তু তথাপি, মহাভারতের দ্রৌপদী তাঁহার সমস্ত অপূর্ণতা অসঙ্কোচে বক্ষে বহন করিয়া এই সমস্ত নব্য বল্মীকরচিত ক্ষুদ্র

নীতিস্তূপগুলির বহু ঊর্দ্ধে উদার আদিম অপর্য্যাপ্ত প্রবল মাহাত্ম্যে নিত্যকাল বিরাজ করিতে থাকিবেন। মহাভারতের কর্ণ সভা-পর্ব্বে পাণ্ডবদের প্রতি যে সকল হীনতাচরণ করিয়াছেন আমাদের নাটক নভেলের দীনেশ রমেশ গণেশ ধনেশবর্গ কখনই তাহা করেন না, তাঁহারা সময়ে অসময়ে স্থানে অস্থানে অনায়াসেই আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন, তথাপি মহাভারতের কবি বিনা চেষ্টায় কর্ণকে যে অমরলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন এই দীনেশ রমেশ গণেশ ধনেশবর্গ সমালোচকপ্রদত্ত সমস্ত ফার্ষ্ট ক্লাশ টিকিট এবং নৈতিক পাথেয় লইয়াও তাহার নিম্নতম সোপান পর্য্যন্ত পোঁছিতে পারে কি না সন্দেহ।

সেই কারণেই বলিতেছিলাম, প্রথম স্তরের মহাভারতকার কবি যদি কৃষ্ণকে দেবতা বলিয়া মানিতেন না ইহা সত্য হয় তবে তিনি যে তাঁহাকে নীতিশিক্ষার অখণ্ড উদাহরণস্বরূপ গড়িয়া-ছিলেন ইহা আমাদের নিকট সম্ভবপর বোধ হয় না। বঙ্কিম মহাভারতের প্রথমস্তররচয়িতাকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্থির করি-য়াছেন, এবং অনেক স্থলে সেই শ্রেষ্ঠত্বের দোহাই দিয়া তিনি কৃষ্ণ-চরিত্র হইতে সমস্ত অসঙ্গতি অসম্পূর্ণতা বাদ দিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলিতেছি সেই শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ যে সঙ্গতি তাহা নহে। এ পর্য্যন্ত হ্যাম্‌লেট্ চরিত্রের সঙ্গতি কেহ সন্তোষজনকরূপে আবি-ষ্কার করিতে পারে নাই, কিন্তু কাব্যজগতের মধ্যে হ্যাম্‌লেট্ যে একটি পরম স্বাভাবিক সৃষ্টি সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ প্রকাশ করে নাই।

অতএব, বঙ্কিম মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্র হইতে সমস্ত মন্দ অংশ বাদ দিয়া যে আদিম মহাভারতকারের আদর্শ কৃষ্ণকেই আবিষ্কার করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে।

এক্ষণে, কথা এই যে, মহাভারতকারের আদর্শ নাই হইল, বঙ্কিমের আদর্শ যদি যথার্থ মহৎ হয় তবে সেও বঙ্গীয় পাঠকদের পক্ষে পরম লাভ বলিতে হইবে।

বঙ্কিমের আদর্শ যে মহৎ এবং কৃষ্ণচরিত্র যে বঙ্গসাহিত্যের পরম লাভ সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু সেই জন্যই কৃষ্ণচরিত্র পাঠ করিতে সর্ব্বদাই মনে এই খেদ উপস্থিত হয়, যে, সাহিত্যে যে প্রণালীতে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে হয় বঙ্কিম সে প্রণালী অবলম্বন করেন নাই।

ফ্রূড্ যে বলিয়াছেন, মহৎ লোকের মাহাত্ম্য ইতিহাস যথার্থরূপে প্রকাশ করিতে পারে না, কাব্য পারে, সে কথা সত্য। কারণ, মাহাত্ম্য পদার্থটি পাঠকের মনে অখণ্ডভাবে সজীবভাবে সঞ্চার করিয়া দিবার জিনিষ। তাহা তর্কদ্বারা যুক্তিদ্বারা ক্রমশঃ খণ্ড খণ্ড আকারে মনের মধ্যে কিয়দংশে প্রমাণিত হইতে পারে, কিন্তু তর্ক যুক্তি তাহাকে হৃদয়ের মধ্যে সর্ব্বাংশে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারে না।

বঙ্কিম, গ্রন্থের প্রারম্ভ হইতেই তরবারী হস্তে সংগ্রাম করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছেন;—কোথাও শান্তভাবে তাঁহার কৃষ্ণের সমগ্র মূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে একত্র ধরিবার অবসর পান নাই।

সে জন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়াও যায় না। কারণ, ভক্তসম্প্রদায়ের বাহিরে, এমন কি, ভিতরেও, কৃষ্ণচরিত্র যেরূপ কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত ছিল তাহাতে প্রথমতঃ সেই পূর্ব্বসংস্কার ঘুচাইবার জন্য তাঁহাকে বিপুল প্রয়াস পাইতে হইয়াছে। যেখানে তাঁহার দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে সেখানকার জঙ্গল সাফ করিবার জন্য তাঁহাকে কুঠার ধারণ করিতে হইয়াছিল। কৃষ্ণসম্বন্ধে আমাদের সংস্কার এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রকৃত কৃষ্ণ যে অনেক

বিভিন্ন, বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র হইতে তাহা আমরা শিক্ষা লাভ করিয়াছি।

কিন্তু বঙ্কিম এই গ্রন্থে অনাবশ্যক যে সকল কলহের অবতারণা করিয়াছেন আমাদের নিকট তাহা অত্যন্ত পীড়াজনক বোধ হইয়াছে। কারণ, যে আদর্শ হৃদয়ে স্থির রাখিয়া বঙ্কিম এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন, সেই আদর্শের দ্বারাই সমস্ত ভাষা এবং ভাব অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলে তবেই সে আদর্শের মর্য্যাদা রক্ষা হয়। বঙ্কিম যদি তুচ্ছ বিরোধ এবং অনুদার সমালোচনার অবতারণা পূর্ব্বক চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন তবে সেই চাঞ্চল্যে তাঁহার আদর্শের নিত্য নির্ব্বিকারতা দূর করিয়া ফেলে। অনেক ঝগড়া আছে যাহা সাপ্তাহিক পত্রের বাদ প্রতিবাদেই শোভা পায় যাহা কোন চিরস্মরণীয় বিষয়সম্বন্ধীয় চিরস্থায়ী গ্রন্থে স্থান পাইবার একেবারে অযোগ্য।

"পাশ্চাত্য মূর্খ" অর্থাৎ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রতি লেখক অজস্র অবজ্ঞা বর্ষণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ সে কাজটাই গর্হিত, দ্বিতীয়তঃ এমন গ্রন্থে সেটা অত্যন্ত অশোভন হইয়াছে। মান্যজনের সমক্ষে অন্য কাহারও প্রতি অযথা দুর্ব্যবহার কেবল দুর্ব্যবহার মাত্র নহে তাহা মান্য ব্যক্তির প্রতিও অশিষ্টতা; বঙ্কিম যাঁহাকে মানবশ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করেন, যিনি একাধারে ক্ষমা ও শৌর্য্যের আধার; যিনি সক্ষম হইয়াও অকারণে, এমন কি, সকারণে অস্ত্র ধারণ করিতে অনেক সময়েই বিরত হইয়াছেন; তাঁহারই চরিত্র প্রতিষ্ঠাস্থলে তাঁহারই আদর্শের সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া মতভেদ-উপলক্ষ্যে চপলতা প্রকাশ করা আদর্শের অবমাননা। কেবল য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রতি নহে, সাধারণতঃ য়ুরোপীয় জাতির প্রতিই লেখক স্থানে অস্থানে

তীব্র বৈরিতা প্রকাশ করিয়াছেন। দুই একটা দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করি।—

শিশুপালের গালি "শুনিয়া ক্ষমাগুণের পরমাধার, পরম যোগী আদর্শ পুরুষ কোন উত্তর করিলেন না। কৃষ্ণের এমন শক্তি ছিল, যে, তদ্দণ্ডেই তিনি শিশুপালকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম— পরবর্ত্তী ঘটনায় পাঠক তাহা জানিবেন। কৃষ্ণও কখন যে এরূপ পরুষবচনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন এমন দেখা যায় না। তথাপি তিনি এ তিরস্কারে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। ইউরোপীয়দের মত ডাকিয়া বলিলেন না, 'শিশুপাল! ক্ষমা বড় ধর্ম্ম, আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম'। নীরবে শত্রুকে ক্ষমা করিলেন।"—

শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমাগুণের বর্ণনাস্থলে অকারণে য়ুরোপীয়দের প্রতি একটা অন্যায় খোঁচা দেওয়া যে কেবল অনাবশ্যক হইয়াছে তাহা নহে; ইহাতে মূল উদ্দেশ্যটি পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়াছে। পাঠকদের চিত্তকে যেরূপ ভাবে প্রস্তুত করিয়া তুলিলে তাহারা কৃষ্ণের ক্ষমা-শক্তির মাহাত্ম্য হৃদয়ে গ্রহণ করিতে পারিত তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। কৃষ্ণচরিত্রের ন্যায় গ্রন্থ কেবল আধুনিক হিন্দুদের জন্য লিখিত হওয়া উচিত নহে, তাহা সর্ব্বকালের সর্ব্বজাতির জন্যই রচিত হওয়া কর্ত্তব্য। পাঠকেরা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন এই অংশ পাঠকালে একজন য়ুরোপীয় পাঠকের মনে কিরূপ বিদ্রোহী ভাবের উদয় হওয়া সম্ভব। বিশেষতঃ, ক্ষমা করিবার সময় ক্ষমা-ধর্ম্মের মহিমাকীর্ত্তন, যে, য়ুরোপীয়দের জাতীয় প্রকৃতি এরূপ সাধারণ কথা লেখক কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন বলা কঠিন। আমাদের শাস্ত্রে এরূপ উদাহরণ ভূরি ভূরি আছে;—যখন বিশ্বা-মিত্র বসিষ্ঠের গাভী বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন এবং নন্দিনী অতিশয় তাড়িত হইয়া আর্ত্তরবে বসিষ্ঠের সম্মুখে

উপস্থিত হইলেন তখন বসিষ্ঠ কহিলেন—"হে ভদ্রে নন্দিনি, তুমি পুনঃ পুনঃ রব করিতেছ, তাহা আমি শুনিতেছি; কিন্তু হে ভদ্রে, যখন রাজা বিশ্বামিত্র তোমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছেন তখন আমি কি করিব! যেহেতু আমি ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ!" পুনশ্চ নন্দিনী তাঁহার নিকট কাতরতা প্রকাশ করিলে তিনি কহিলেন "ক্ষত্রিয়ের বল তেজ এবং ব্রাহ্মণের বল ক্ষমা; অতএব আমি ক্ষমা-গুণে আকৃষ্ট হইতেছি।"

"ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যাবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু উহা দুঃখের আকর; রাজ্যলাভ বা বনবাস সুখের নিদান।"

শ্রীকৃষ্ণের এই মহদুক্তি উদ্ধৃত করিয়া বঙ্কিম বলিতেছেন "হিন্দু পুরাণেতিহাসে এমন কথা থাকিতে আমরা কি না, মেম সাহেব-দের লেখা নবেল পড়িয়া দিন কাটাই, না হয় সভা করিয়া পাঁচজনে জুটিয়া পাখির মত কিচিরমিচির করি।"

ক্ষণে ক্ষণে লেখকের এরূপ ধৈর্য্যচ্যুতি কৃষ্ণচরিত্রের ন্যায় গ্রন্থে অতিশয় অযোগ্য হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষার ভাবে ও ভঙ্গীতে সর্ব্ব-ত্রই একটি গাম্ভীর্য্য, সৌন্দর্য্য ও ঔদার্য্য রক্ষা না করাতে বর্ণনীয় আদর্শচরিত্রের উজ্জ্বলতা নষ্ট হইয়াছে।

বঙ্কিম সামান্য উপলক্ষ্যমাত্রেই য়ুরোপীয়দের সহিত, পাঠকদের সহিত এবং ভাগ্যহীন ভিন্নমতাবলম্বীদের সহিত কলহ করিয়া-ছেন। সেই কলহের ভাবটাই এ গ্রন্থে অসঙ্গত হইয়াছে; তাহা ছাড়া প্রসঙ্গক্রমে তিনি বিস্তর অবান্তর তর্কের উত্থাপন করিয়া পাঠকের মনকে অনর্থক বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রথমতঃ, যখন তিনি কৃষ্ণকে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বলিয়া দাঁড় করাইয়াছেন, তখন ঈশ্বরের অবতারত্ব সম্ভব কি না এ প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া কেবল পাঠকের মনে একটা তর্ক উঠাইয়াছেন অথচ তাহার ভালরূপ

মীমাংসা করেন নাই। নিরাকার ঈশ্বর আকার ধারণ করিবেন কি করিয়া, এরূপ আপত্তি যাঁহারা করেন বঙ্কিম তাঁহাদিগকে এই উত্তর দিয়াছেন যে, যিনি সর্ব্বশক্তিমান তিনি আকার গ্রহণ করিতে পারেন না ইহা অসম্ভব।—যাঁহারা আপত্তি করেন যে, যিনি সর্ব্ব-শক্তিমান তাঁহার দেহ ধারণ করিবার প্রয়োজন কি? তিনি ত ইচ্ছামাত্রেই রাবণ কুম্ভকর্ণ অথবা কংস শিশুপাল বধ করিতে পারেন; তাঁহাদের কথার উত্তরে বঙ্কিম বলেন যে, রাবণ অথবা শিশুপাল বধ করিবার জন্যই, যে, ঈশ্বর দেহ ধারণ করেন তাহা নহে, মনুষ্যের নিকট মনুষ্যত্বের আদর্শ স্থাপন করাই তাঁহার অব-তার হইবার উদ্দেশ্য। তিনি দেবতার ভাবে যদি দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করেন তবে তাহাতে মানুষের কোন শিক্ষা হয় না - পরন্তু তিনি যদি মনুষ্য হইয়া দেখাইয়া দেন মনুষ্যের দ্বারা কতদূর সম্ভব তবেই তাহা আমাদের স্থায়ী কল্যাণের কারণ হয়।—এক্ষণে, তৃতীয় আপত্তি এই উঠিতে পারে যে, ঈশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান হন্, এবং মনুষ্যের নিকট মনুষ্যত্বের আদর্শ স্থাপন করাই যদি তাঁহার অভিপ্রায় হয় তবে তিনি কি আদর্শ মনুষ্যকে অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতে পারেন না—তাঁহার কি নিজেই মনুষ্য হইয়া আসা ছাড়া গত্যন্তর নাই? এইখানেই কি তাঁহার শক্তির সীমা?—বঙ্কিম এই আপত্তি উত্থাপনও করেন নাই, এই আপত্তির উত্তরও দেন নাই।

পরন্তু, সমস্ত গ্রন্থের উদ্দেশ্যের সহিত এই তর্কের কিঞ্চিৎ যোগ আছে। বঙ্কিম নানা স্থলেই স্বীকার করিয়াছেন, যে, মানু-ষের আদর্শ যেমন কার্য্যকারী এমন দেবতার আদর্শ নহে। কারণ, সর্ব্বশক্তিমানের অনুকরণে আমাদের সহজেই উৎসাহ না হইতে পারে। যাহা মানুষে সাধন করিয়াছে তাহা আমরাও সাধন

করিতে পারি এই বিশ্বাস এবং আশা অপেক্ষাকৃত সুলভ এবং স্বাভাবিক। অতএব কৃষ্ণকে দেবতা প্রমাণ করিতে গিয়া বঙ্কিম তাঁহার মানব আদর্শের মূল্য হ্রাস করিয়া দিতেছেন। কারণ, ঈশ্বরের পক্ষে সকলই যখন অনায়াসে সম্ভব তখন কৃষ্ণ-চরিত্রে বিশেষরূপে বিস্ময় অনুভব করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

বঙ্কিম এই গ্রন্থের অনেক স্থলেই যে সকল সামাজিক তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতে গ্রন্থের বিষয়টি বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে মাত্র, আর কোন ফল হয় নাই। "কৃষ্ণের বহুবিবাহ" শীর্ষক অধ্যায়ে, রুক্মিণী ব্যতীত কৃষ্ণের অন্য স্ত্রী ছিল না ইহাই প্রমাণ করিয়া লেখক সর্ব্বশেষে তর্ক তুলিয়াছেন যে, পুরুষের বহুবিবাহ সকল অবস্থাতেই অধর্ম্ম একথা ঠিক নহে। তিনি বলিয়াছেন "সচরাচর অকারণে পুরুষের একাধিক বিবাহ অধর্ম্ম। কিন্তু সকল অবস্থাতে নহে। যাহার পত্নী কুষ্ঠগ্রস্ত বা এরূপ রুগ্ন যে সে কোন মতেই সংসারধর্ম্মের সহায়তা করিতে পারে না, তাহার যে দারান্তর পরিগ্রহ পাপ, এমন কথা আমি বুঝিতে পারি না। যাহার স্ত্রী ধর্ম্মভ্রষ্টা কুলকলঙ্কিনী, সে যে কেন আদালতে না গিয়া দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে পারিবে না তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে না। * * যাহার উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন, কিন্তু স্ত্রী বন্ধ্যা, সে যে কেন দারান্তর গ্রহণ করিবে না, তাহা বুঝিতে পারি না। * * যদি ইউরোপের এ কুশিক্ষা না হইত, তাহা হইলে, বোনাপার্টিকে জসেফাইনের বর্জ্জনরূপ অতি ঘোর নারকীপাতকে পতিত হইতে হইত না; অষ্টম হেন্‌রিকে কথায় কথায় পত্নীহত্যা করিতে হইত না। ইউরোপে আজি কালি সভ্যতার উজ্জ্বলালোকে এই কারণে অনেক পত্নীহত্যা, পতিহত্যা হইতেছে। আমাদের শিক্ষিত

সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, যাহাই বিলাতী, তাহাই চমৎকার, পবিত্র, দোষশূন্য, উর্দ্ধাধঃ চতুর্দ্দশ পুরুষের উদ্ধারের কারণ। আমার বিশ্বাস, আমরা যেমন বিলাতের কাছে অনেক শিখিতে পারি, বিলাতও আমাদের কাছে অনেক শিখিতে পারে। তাহার মধ্যে এই বিবাহতত্ত্ব একটা কথা।”

কৃষ্ণ যখন একাধিক বিবাহ করেন নাই তখন বিবাহ সম্বন্ধীয় এই তর্ক নিতান্তই অনাবশ্যক; তাহা ছাড়া তর্কটারই বা কি মীমাংসা হইল? প্রথম স্থির হইল যাহার স্ত্রী রুগ্ন, অথবা ভ্রষ্টা অথবা বন্ধ্যা সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারে; - কিন্তু য়ুরোপে রুগ্না, ভ্রষ্টা এবং বন্ধ্যার স্বামী সহজে দারান্তর পরিগ্রহ করিতে পারে না বলিয়াই যে, সেখানকার সভ্যতার উজ্জ্বলালোকে এত পত্নীহত্যা হইতেছে তাহা নহে; অনেক সময় পত্নীর প্রতি বিরাগ ও অন্যার প্রতি অনুরাগবশতঃ হত্যা-ঘটনা অধিকতর সম্ভবপর। যদি সে হত্যা নিবারণ করিতে হয় তবে অন্য স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ সঞ্চারকেও দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের ধর্ম্মসঙ্গত বিধান বলিয়া স্থির করিতে হয়। তাহা হইলে “সচরাচর অকারণে পুরুষের একাধিক বিবাহ অধর্ম্ম” এ কথাটার এই তাৎপর্য্য দাঁড়ায় যে, যখন দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে যাইবে তখন যেন একটা কোন কারণ থাকে; কাজটা যেন অকারণে না হয়। অর্থাৎ যদি তোমার স্ত্রী রুগ্ন অক্ষম হয় তবে তুমি বিবাহ করিতে পার, অথবা যদি অন্য স্ত্রী বিবাহ করিতে তোমার ইচ্ছা বোধ হয় তাহা হইলেও তুমি বিবাহ করিতে পার; কারণ, সেইরূপ ইচ্ছার বাধা পাইয়া ইংলণ্ডের অষ্টম হেন্‌রি পত্নীহত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কারণ না থাকিলে বিবাহ করিয়ো না। জিজ্ঞাস্য এই যে, স্বামীকে যে যুক্তি অনুসারে যে সকল স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী করা হইল, ঠিক সেই

যুক্তি অনুসারে অনুরূপ স্থলে স্ত্রীর প্রতি অনুরূপ ক্ষমতা অর্পণ করা যায় কি না? এবং আমাদের সমাজে স্ত্রীর সেই সকল স্বাধীন ক্ষমতা না থাকাতে অনেক স্ত্রী "অতি ঘোর নারকী পাতকে পতিত" হয় কি না?

ইহার অনতিপরেই সুভদ্রাহরণ কার্য্যটা যে বিশেষ দোষের হয় নাই ইহাই প্রতিপন্ন করিতে গিয়া লেখক, "মালাবারী" নামক এক পার্সী—সম্ভবতঃ যাঁহার খ্যাতিপুষ্প বর্ত্তমান কালের গুটি-কয়েক সংবাদপত্রপুটের মধ্যেই কীটের দ্বারা জীর্ণ হইতে থাকিবে—তাঁহার প্রতি একটা খোঁচা দিয়া আর একটা সামাজিক তর্ক তুলিয়াছেন। সে তর্কটারও মীমাংসা কিছুমাত্র সন্তোষজনক হয় নাই, অথচ লেখক অধীর ভাবে অসহিষ্ণু ভাষায় অনেকের সঙ্গে অনর্থক একটা কলহ করিয়াছেন।

বঙ্কিম যদি কৃষ্ণকে দেবতা না মনে করিতেন এবং কৃষ্ণের সমস্ত চিত্তবৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার কোনরূপ থিওরি না থাকিত তাহা হইলে এ সমস্ত তর্কবিতর্কের কোন প্রয়োজন থাকিত না, এবং তিনি সর্ব্বত্র সংযম রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেন। তাহা হইলে তিনি নিরপেক্ষ নির্ব্বিকারচিত্তে মহাভারত-কার কবির আদর্শ কৃষ্ণকে অবিকলভাবে উদ্ধার করিয়া পাঠকদের সম্মুখে উপনীত করিতেন—এবং পাছে কোন অবিশ্বাসী সংশয়ী পাঠক তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রের কোন অংশে তিলমাত্র অসম্পূর্ণতা দেখিতে পায় এ জন্য আগেভাগে তাহাদের প্রতি রোষ প্রকাশ করিয়া তাঁহার গ্রন্থ হইতে উচ্চ সাহিত্যের লক্ষণগত অচঞ্চল শান্তি দূর করিয়া দিতেন না।

যেমন প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের উপরে নেপথ্যবিধান করিতে আরম্ভ করিলে অভিনয়ের রসভঙ্গ হয়, কাব্যসৌন্দর্য্য সমগ্রভাবে শ্রোতৃ-

বর্গের মনের মধ্যে মুদ্রিত হয় না, সেইরূপ বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রে পদে পদে তর্ক যুক্তি বিচার উপস্থিত হইয়া আসল কৃষ্ণচরিত্রটিকে পাঠকের হৃদয়ে অখণ্ডভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধা দিয়াছে। কিন্তু বঙ্কিম বলিতে পারেন, কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থটি ষ্টেজ্ নহে; উহা নেপথ্য; ষ্টেজ্ম্যানেজর আমি নানা বাধা বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিয়া, নানা স্থান হইতে নানা সাজসজ্জা আনয়নপূর্ব্বক কৃষ্ণকে নরোত্তমবেশে সাজাইয়া দিলাম—এখন কোন কবি আসিয়া যবনিকা উত্তোলন করিয়া দিন; অভিনয় আরম্ভ করুন; সর্ব্বসাধারণের মনোহরণ করিতে থাকুন; তাঁহাকে শ্রমসাধ্য চিন্তাসাধ্য বিচারসাধ্য কাজ কিছুই করিতে হইবে না।

দেবোত্তর বিষয়ে পূর্ব্বের আলোচনা।

গবর্ণমেণ্ট আমাদের দেবোত্তর বিষয়ে সম্প্রতি কোন নূতন বিধি ব্যবস্থা করিতে যে অসম্মত হইয়াছেন, তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। ঐ বিষয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব-ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে সেই কারণ জানিতে পারা যায়।

যখন মোহান্ত মহারাজদিগের দুর্ব্ব্যবহারে হিন্দুমণ্ডলী প্রপীড়িত, তখন মুসলমানদিগের সমাজেও নানা দুর্দ্দশার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল। কলিকাতার সেণ্ট্রল নেশনল মেহমেডন এসোসিয়েসন নামক সভা ১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সেই সকল দুরবস্থা বিমোচনার্থ গবর্ণমেণ্টের নিকট এই আবেদন করেন যে, তাঁহাদের যে ওকৃফ্ অর্থাৎ ধর্ম্মসংক্রান্ত সম্পত্তি আছে, তাহা দ্বারা মুসলমানদিগের সুশিক্ষার বিধান করা হয়। তখন এমন ভাব ব্যক্ত

হইয়াছিল যে, ইংরাজী ভাষাতেই শিক্ষা প্রদত্ত হইবে। তাহা কর্ত্তব্য কি না, এই বিষয়ের তথ্য অবধারণ নিমিত্ত ১৮৮৫ সালের ১৫ জুলাই ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট এক প্রস্তাব করেন যে, মুসলমানদিগের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মজ্ঞ, আইনজ্ঞ ও মর্য্যাদাবান্, এমন কতকগুলিন লোকের দ্বারা এক কমিটি গঠিত হউক। যথাকালে এই কমিটির কার্য্য আরম্ভ হইলে সমুদায় মুসলমানমণ্ডলী একপ্রকার ক্ষেপিয়া উঠে। কমিটি কেবল বঙ্গদেশে স্থাপিত হইয়াছিল। উত্তরপশ্চিম ও পঞ্জাব অঞ্চলের মহম্মদীয় লোকেরা তাঁহাদের কোন কথা শুনিতে চাহেন নাই; তাঁহাদের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে সম্মত হন নাই। ক্রমে গোলযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহাতে গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডফরিণ বাহাদুর সাধারণের নিকট জবাবদিহিতে পড়িয়াছিলেন। তদবধি বিজ্ঞাপিত হইল যে, ১৮৬৩ সালের ২০ আইনে গবর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা আর নড়াচড়া করা হইবে না। এই কথা প্রচারিত হইলে সে গোলযোগ মিটিয়া যায়।

এমন অবস্থায় পুনরায় সেই বিষয়ে নূতন আইনের প্রার্থনা করিলে, তাহা যে বিফল হইবে, তাহা নিশ্চিত কথা। বর্ত্তমান প্রস্তাবনায় গবর্ণমেণ্ট লর্ড ডফরিণের সেই সময়কার বাক্যাবলী স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন, ক্ষান্ত হও, আর কেন? ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, দেবোত্তর সম্পত্তি সম্বন্ধে ১৮৬৩ সালের আইন চূড়ান্ত আইন।

তথাপি যখন অভাবের পূরণ হয় নাই, তখন গোলযোগের নিবৃত্তি হইবার নহে। পূর্ব্ব-কথিত অভিনয়ের সময়ে মুসলমান কুল-তিলক সুপ্রসিদ্ধ অনরেবল সর্ সৈয়দ্ আহমদ্ খাঁ বাহাদুর কে সি এস্ আই, এল্ এল্ ডি, মহোদয় রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া সকল পক্ষকে সমুচিতরূপে প্রবোধিত করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়া-

ছিলেন যে, ওকৃফ্ সম্পত্তি কেবল ধর্ম্মসাধনের উদ্দেশে ব্যয়িত হয় বটে; কিন্তু কোন কোন স্থানে ঐ সম্পত্তি দুইটী নির্দ্দিষ্ট বিভাগে নিয়োজিত হইয়া থাকে। এক মস্‌জিদের কার্য্যবিভাগ; দ্বিতীয়, শিক্ষাবিভাগ। খাঁ বাহাদুর বুঝাইয়া দিলেন যে, সম্প্রতি যদি উক্ত ওক্‌ফ্ সম্পত্তি অধিক পরিমাণে শিক্ষা বিধানার্থ ব্যয়িত হয়, তাহা এমন ভাবে হউক, যাহাতে সেই শিক্ষা ধর্ম্মসাধনের অঙ্গীভূত হয়, সেই ব্যবস্থা করিলেই আর কোন ক্ষোভের কারণ থাকে না। অর্থাৎ ওকৃফ সম্পত্তি দ্বারা যে শিক্ষা প্রদত্ত হইবে, তাহা ইংরাজী বাঙ্গালা বা তাদৃশ কোন দেশীয় ভাষায় হইবে না; তদ্দ্বারা নিরীশ্বর শিক্ষাবিধানও হইবে না; হদিস্ (মহাজন বাক্য) কেফা (নমাজাদির মন্ত্র) এবং তপ্‌সির (ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা) প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থের অধ্যয়নে ধর্ম্মের শিক্ষা হয়, তাহাই অধীত হইবে।

অনরেবল খাঁ বাহাদুর উক্ত প্রকারে মুসলমানদিগের হিত বুঝাইয়া দিয়া সকল লোককে যাহা করিতে বলিয়াছিলেন, গত পৌষমাসের সাধনায় আমরা হিন্দুদিগকে তাহারই অনুষ্ঠান করিতে বলিয়াছিলাম।

উক্ত বাহাদুর সপ্রেম অন্তঃকরণে অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় সকল মতওল্লীদিগকে (দেবোদ্দিষ্ট বিষয়ের ট্রষ্টী বা দেবোত্তরধারী) এবং সাধারণতঃ সকল ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন, ওকৃফ্ সম্পত্তি কি প্রকার অবস্থায় আছে এবং তদ্দ্বারা কিরূপ কার্য্য হইতেছে, তত্তাবৎ বিষয় প্রকাশ করিয়া বলুন; এজন্য সমুদায় মুসলমানমণ্ডলী সহরে ও মফঃস্বলে এক যোগে কার্য্য করিতে থাকুন; কোন শঙ্কা নাই; কোন অনিষ্ট হইবে না; যখন মহম্মদীয় লোকদিগের দুরবস্থা বিমোচনার্থ এই চেষ্টা হইতেছে, তখন কোন অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা নাই, প্রত্যুত প্রভূত মঙ্গল লাভের আশা আছে।

আমরা মহম্মদীয়দিগের সামাজিক বিবরণ বিশেষ অবগত নহি। পূর্ব্ববারে সাধনাতে দেবোত্তর বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার ফলস্বরূপ উপরোক্ত কয়েকটী তথ্য জানিতে পারিলাম। অতঃপর আরো জানিতে পারিব। আশা করা যায়, এই বিষয়টী সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিলে হিন্দুসমাজেরও প্রচ্ছন্ন গ্লানি প্রকাশিত হইয়া তাহা তৎক্ষণাৎ বা কিছু বিলম্বে বিদূরিত হইতে পারে।

উপরি উপরি দেখিলে হিন্দু ও মুসলমানী সমাজে আপাততঃ অত্যন্ত প্রভেদ লক্ষিত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহাদের মধ্যে ঐক্য-স্থলও অনেক আছে। মূলে উভয় সম্প্রদায়ই একেশ্বরবাদী। এক-মেবাদ্বিতীয়ং উভয়েরই মূলমন্ত্র। ক্রিয়াকলাপের পদ্ধতিতে বহুল ভিন্ন ভাব দাঁড়াইয়াছে বটে, কিন্তু তন্মধ্যে একতা নাই, এমনও বলা যায় না।

দেবোদ্দিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানের একদশা উপস্থিত। এক আইনে উভয়েরই শাসন হইতেছে ও হইবে। অতএব উভয় সম্প্রদায়ের দেবসেবার ভাব ও অভাব একত্র পর্য্যালোচনা করা যাইতে পারে। তাহাতে যথেষ্ট ফলও আছে।

জমিদারী কাগজে হিন্দুদিগের দেবোত্তর ও মুসলমানদিগের পীরোত্তর এক পর্য্যায়ভুক্ত। উক্ত লক্ষণাক্রান্ত সম্পত্তিকে মুসলমান শাস্ত্রে ওকৃফ্ বলে। (তাহা বহুবচনে ওয়াকফ্ হয়। উচ্চারণের সুবিধার নিমিত্ত আমরা শেষোক্ত বহুবচনান্তপদ ব্যবহার করিব।)

হিন্দুদিগের দেবতা ও মুসলমানদিগের পীর পয়গম্বরাদি দৈব পুরুষ প্রায় তুল্যমূল্য। * হিন্দু দেবমন্দিরে এবং মুসলমান মসজিদে প্রভেদ এই যে, হিন্দুগণ দেবতার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া নানা

* মুসলমান ভ্রাতারা ক্ষমা করিবেন,—আমরা তাঁহাদের ধর্ম্ম সম্পর্কে যে দেব শব্দ প্রয়োগ করি, তাহা তাঁহাদের পীর ও পয়গম্বর বাচক।

উপচারে তাহার অবলম্বনে ঈশ্বরের পূজা করেন; মুসলমানেরা নির-বলম্ব হইয়া নিরাকার ঈশ্বরের আরাধনা করেন। এতদ্ব্যতীত সাধু-সজ্জনগণের এবং দীনান্ধবধিরাদি লোকের ভক্ষ্য পেয়াদি বিতরণ ব্যাপার প্রায় সমান। হিন্দুর বিরাগী ও সন্ন্যাসী এবং মুসলমানদিগের ফকীর ও দরবেশ প্রায় একইভাবে গৃহস্থের সেবা প্রাপ্ত হয়েন। মুসলমানদিগের ব্যয়াতিরিক্ত ধন থাকিলে দীনদরিদ্রের প্রতি জাকাথ্ দিবার নিয়ম আছে। হিন্দুদিগকেও বলা আছে, ইহজন্মে দান না করিলে পরজন্মে কেহ কিছু পাইবেন না। হিন্দুদিগের দান-ধর্ম্মের নানা প্রকার শাস্ত্রীয় বিধান থাকাতে গৃহে গৃহে, পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে বাস্তু-দেবতার ও গ্রাম্য দেবতার এক বা অধিক দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৃহত্তর তীর্থের দেবমন্দির অগণ্য। এই সকল মন্দিরে প্রতিদিন দুই হইতে দুই শত বা ততো-ধিক অভ্যাগত সাধু সজ্জন ও দুঃখী লোক ভোজ্যান্ন প্রাপ্ত হয়েন। বড় বড় তীর্থ-দেবতার প্রসাদ-প্রার্থীর সংখ্যা থাকে না। উৎসব-কালে তাহা আরো অধিক হয়। এ স্থলে হিন্দু ও মুসলমান উভ-য়ের ধর্ম্মকর্ম্মের ঐক্য আছে। মুসলমানদিগের মসজিদেও উক্ত রূপে সাধু ও অতিথির সেবা হয়। রোজাবসানে প্রতিদিন শত শত লোক এক এক মসজিদে এফ্‌তার (পারণা) পাইয়া থাকে। হিন্দু মন্দিরের ন্যায় মুসলমান মসজিদেও সন্ধ্যাকালে দীপদান ও বাদ্যোদ্যম হয়। উভয় স্থলেই সন্ধ্যাকালে ঈশ্বরারাধনা হয়। মহম্মদীয় এক বিশেষ বিধান, সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালের আজান। এই সকল দৈব কর্ম্মে অর্থের প্রয়োজন থাকে।

উক্তরূপ দৈব কর্ম্মের নির্ব্বাহ পক্ষে মহম্মদীয় সম্রাট্ সুলতানের দায়ীত্ব আছে। তজ্জন্য সুলতান্‌কে আমীরল্ মমীন (ধর্ম্মপাল) কহা যায়। কিন্তু ফলে, এদেশে সাধারণের ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধারণেই নির্ব্বাহ

করিয়া থাকে। লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দান দেয়। জ্যকাথের নিয়মে কিছু অর্থ ধনীলোকদিগকে বাধ্য হইয়া দিতে হয়। উত্তরাধিকারীবিহীন হইলে ধনবান লোকের সম্পত্তি "বৈতুল মাল" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া রাজকোষে যায়। তাহাও আবার উক্ত দৈব কর্ম্মার্থে ফিরিয়া আইসে। এবম্প্রকারে ওয়াকফ্ ভাণ্ডার পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

এই ওকৃফ্ বা ওয়াকফ্ সম্পত্তি যাহার হস্তে থাকে, তাহাকে মতওল্লী কহা যায়। তিনি উক্ত সম্পত্তির ট্রষ্টী স্বরূপ। ব্যবস্থা মতে তিনি কেবল উক্ত দানভাণ্ডারের ভাণ্ডারী অর্থাৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহের মালিক। কিন্তু ফলে তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া থাকেন। তেমন অধিকার না পাইলেও নয়। যিনি সৎ ও সাধু উদ্দেশে, ধর্ম্মের জন্য, সম্পত্তি রক্ষা ও তত্ত্বাবধান কর্ম্মের কষ্ট স্বীকার করিবেন, তিনি শত শত লোকের ধর্ম্মতঃ সেবাকারী হইলেও নিতান্ত পরাধীন হইয়া চলিতে পারিবেন কেন?

পরন্তু কালক্রমে এই সকল মতওল্লী, আমাদের দেবোত্তরধারী ব্যক্তিগণের ন্যায় নিরঙ্কুশ হইয়া কার্য্য করিতে করিতে নানা গোলযোগ বাধাইয়া বসেন। যে ধনের সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ-বিচারকারী কেহ নাই, এমন ধন পাইলে তাহার অধিপতি কেনই বা যথেচ্ছাচারী না হইবেন? তাহাতেই আমাদের দেবোত্তর সম্পত্তির ন্যায় মুসলমানদিগের পীরোত্তরাদি সম্পত্তিরও জমিদারী-কাগজ-নির্দ্দিষ্ট ব্যবহারের নানাবিধ ব্যভিচার দৃশ্যমান হইয়া পড়িতেছে। তাহাতে উক্ত ধর্ম্মার্থ-দানের বিতরণকর্ত্তা ও গৃহীতা উভয়েই সমাজকে কলুষিত করিয়া ফেলিতেছেন।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনার পর কয়েক বৎসর গত হইয়াছে। যাহাতে মুসলমান মতওল্লীগণ লোভ ও স্বার্থপরতাদি দোষে জড়িত হইয়া

ধর্ম্মার্থ-দান-সম্পত্তি অপব্যবহার করিতে না পারেন,—অতঃপর যাহাতে তাহার যথোপযুক্ত সার্থকতা সাধন হয়, তজ্জন্য মুসলমান সমাজ এখন আর কি চেষ্টা করিতেছেন, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মুসলমান সমাজের গতি ও ক্রিয়া আমরা অল্পই অবগত আছি। উপরে যাহা বলিলাম, তাহাতে বিস্তর ত্রুটি রহিল। কোন কোন স্থলে অনুচিত আখ্যানজনিত অপরাধ থাকিতেও পারে। কিন্তু সাহস হয়, মহম্মদীয় ভ্রাতৃগণ যদি হিন্দু-দিগের সহিত সখ্য বন্ধন করেন, তাহা হইলে পরস্পরের অবস্থা ও অভাব পরস্পরের বিদিত হইলে অধিকতর শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা হয়। এক রাজার প্রজা—একই আইনে যাহাদের শাসন হয়—তাহাদের একতাই সর্ব্বোপরি ফলপ্রদ।

মহামান্য সর্ব্বগুণালঙ্কৃত অতি প্রবীণ সর্ সৈয়দ বাহাদুর যাহা মুসলমানদিগের প্রতি বলিয়াছেন, সেই উক্তি আমাদের প্রতিও বর্ত্তায়। ভ্রাতৃগণ! পরস্পরের কাছে আপনাদের অবস্থা ও অভাবের কথা খুলিয়া বল; পরস্পর সাহায্য করিতে উদ্যুক্ত হও; সদ্ভাবে কার্য্য কর; সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের পথ প্রাপ্ত হইবে।

কৌতুকহাস্যের মাত্রা।

সেদিনকার ডায়ারিতে কৌতুকহাস্য সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা পাঠ করিয়া শ্রীমতী দীপ্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, -"একদিন প্রাতঃকালে স্রোতস্বিনীতে আমাতে মিলিয়া হাসিয়াছিলাম। ধন্য সেই প্রাতঃকাল এবং ধন্য দুই সখীর হাস্য! জগৎ সৃষ্টি অবধি

এমন চাপল্য অনেক রমণীই প্রকাশ করিয়াছে—এবং ইতি-
হাসে তাহার ফলাফল ভালমন্দ নানা আকারে স্থায়ী হইয়াছে।
নারীর হাসি অকারণ হইতে পারে কিন্তু তাহা অনেক মন্দাক্রান্তা
উপেন্দ্রবজ্রা, এমন কি, শার্দ্দূলবিক্রীড়িতচ্ছন্দ, অনেক ত্রিপদী, চতু-
ষ্পদী এবং চতুর্দ্দশপদীর আদিকারণ হইয়াছে, এইরূপ শুনা যায়।
রমণী তরল স্বভাব বশতঃ অনর্থক হাসে, মাঝের হইতে তাহা
দেখিয়া অনেক পুরুষ অনর্থক কাঁদে, অনেক পুরুষ ছন্দ মিলাইতে
বসে, অনেক পুরুষ গলায় দড়ি দিয়া মরে—আবার এইবার দেখি-
লাম নারীর হাস্যে প্রবীণ ফিলজফরের মাথায় নবীন ফিলজফি
বিকশিত হইয়া উঠে! কিন্তু সত্য কথা বলিতেছি, তত্ত্ব নির্ণয়
অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকারের অবস্থাটা আমরা পছন্দ করি।"

এই বলিয়া সেদিন আমরা হাস্য সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত
হইয়াছিলাম শ্রীমতী দীপ্তি তাহাকে যুক্তিহীন অপ্রামাণ্য বলিয়া
প্রমাণ করিয়াছেন।

আমার প্রথম কথা এই যে, আমাদের সেদিনকার তত্ত্বের মধ্যে,
যে, যুক্তির প্রাবল্য ছিল না সে জন্য শ্রীমতী দীপ্তির রাগ করা
উচিত হয় না। কারণ নারীহাস্যে পৃথিবীতে যত প্রকার অনর্থ-
পাত করে তাহার মধ্যে বুদ্ধিমানের বুদ্ধিভ্রংশও একটি। যে অব-
স্থায় আমাদের ফিলজফি প্রলাপ হইয়া উঠিয়াছিল সে অবস্থায়
নিশ্চয়ই মনে করিলেই কবিতা লিখিতেও পারিতাম, এবং গলায়
দড়ি দেওয়াও অসম্ভব হইত না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, তাঁহাদের হাস্য হইতে আমরা তত্ত্ব
বাহির করিব এ কথা তাঁহারা যেমন কল্পনা করেন নাই, আমাদের
তত্ত্ব হইতে তাঁহারা যে যুক্তি বাহির করিতে বসিবেন তাহাও
আমরা কল্পনা করি নাই।

নিউটন আজন্ম সত্যান্বেষণের পর বলিয়াছেন আমি জ্ঞানসমুদ্রের কূলে কেবল নুড়ি কুড়াইয়াছি; আমরা চার বুদ্ধিমানে ক্ষণকালের কথোপকথনে নুড়ি কুড়াইবার ভরসাও রাখি না—আমরা বালির ঘর বাঁধি মাত্র। ঐ খেলাটার উপলক্ষ্য করিয়া জ্ঞানসমুদ্র হইতে খানিকটা সমুদ্রের হাওয়া খাইয়া আসা আমাদের উদ্দেশ্য। রত্ন লইয়া আসি না, খানিকটা স্বাস্থ্য লইয়া আসি, তাহার পর সে বালির ঘর ভাঙ্গে কি থাকে তাহাতে কাহারও কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

রত্ন অপেক্ষা স্বাস্থ্য যে কম বহুমূল্য আমি তাহা মনে করি না। রত্ন অনেক সময় ঝুঁটা প্রমাণ হয়, কিন্তু স্বাস্থ্যকে স্বাস্থ্য ছাড়া আর কিছু বলিবার যো নাই। আমরা পাঞ্চভৌতিক সভার পাঁচ ভূতে মিলিয়া এপর্য্যন্ত একটা কানাকড়ি দামের সিদ্ধান্তও সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি কি না সন্দেহ, কিন্তু, তবু যতবার আমাদের সভা বসিয়াছে আমরা শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিলেও আমাদের সমস্ত মনের মধ্যে যে সবেগে রক্ত সঞ্চালন হইয়াছে, এবং সে জন্য আনন্দ এবং আরোগ্য লাভ করিয়াছি তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

গড়ের মাঠে এক ছটাক শস্য জন্মে না, তবু অতটা জমি অনাবশ্যক নহে। আমাদের পাঞ্চভৌতিক সভাও আমাদের পাঁচজনের গড়ের মাঠ, এখানে সত্যের শস্যলাভ করিতে আসি না, সত্যের আনন্দলাভ করিতে মিলি।

সেইজন্য এ সভায় কোন কথার পূরা মীমাংসা না হইলেও ক্ষতি নাই, সত্যের কিয়দংশ পাইলেও আমাদের চলে। এমন কি, সত্যক্ষেত্র গভীররূপে কর্ষণ না করিয়া তাহার উপর দিয়া লঘু পদে চলিয়া যাওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

আর একদিক্ হইতে আর এক রকমের তুলনা দিলে কথাটা

পরিষ্কার হইতে পারে। রোগের সময় ডাক্তারের ঔষধ পরম উপকারী কিন্তু আত্মীয়ের সেবাটা বড় আরামের। জর্ম্মান্ পণ্ডিতের কেতাবে তত্ত্বজ্ঞানের যে সকল চরম সিদ্ধান্ত আছে তাহাকে ঔষধের বটিকা বলিতে পার কিন্তু মানসিক শুশ্রূষা তাহার মধ্যে নাই। পাঞ্চভৌতিক সভায় আমরা যে ভাবে সত্যালোচনা করিয়া থাকি তাহাকে রোগের চিকিৎসা বলা না যাক্, তাহাকে রোগীর শুশ্রূষা বলা যাইতে পারে।

আর অধিক তুলনা প্রয়োগ করিব না। মোট কথা এই, সেদিন আমরা চার বুদ্ধিমানে মিলিয়া হাসি সম্বন্ধে যে সকল কথা তুলিয়াছিলাম তাহার কোনটাই শেষ কথা নহে। যদি শেষ কথার দিকে যাইবার চেষ্টা করিতাম তাহা হইলে কথোপকথনসভার প্রধান নিয়ম লঙ্ঘন করা হইত।

কথোপকথনসভার একটি প্রধান নিয়ম—সহজে এবং দ্রুতবেগে অগ্রসর হওয়া। অর্থাৎ মানসিক্ পায়চারি করা। আমাদের যদি পদতল না থাকিত, দুই পা যদি দুটো তীক্ষ্ণাগ্র শলাকার মত হইত, তাহা হইলে মাটির ভিতর দিকে সুগভীর ভাবে প্রবেশ করার সুবিধা হইত কিন্তু এক পা অগ্রসর হওয়া সহজ হইত না। কথোপকথন সমাজে আমরা যদি প্রত্যেক কথার প্রত্যেক অংশকে শেষপর্য্যন্ত তলাইবার চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে একটা জায়গাতেই এমন নিরুপায় ভাবে বিদ্ধ হইয়া পড়া যাইত, যে, আর চলাফেরার উপায় থাকিত না। এক একবার এমন অবস্থা হয়, চলিতে চলিতে হঠাৎ কাদার মধ্যে গিয়া পড়ি; সেখানে যেখানেই পা ফেলি হাঁটু পর্য্যন্ত বসিয়া যায়, চলা দায় হইয়া উঠে। এমন সকল বিষয় আছে যাহাতে প্রতি পদে গভীরতার দিকে তলাইয়া যাইতে হয়; কথোপকথনকালে সেই সকল অনিশ্চিত, সন্দেহতরল বিষয়ে পদা-

র্পণ না করাই ভাল। সে সব জমি বায়ুসেবী পর্য্যটনকারীদের উপযোগী নহে, কৃষী যাহাদের ব্যবসায় তাহাদের পক্ষেই ভাল।

যাহা হউক্, সে দিন মোটের উপরে আমরা প্রশ্নটা এই তুলিয়াছিলাম, যে, যেমন দুঃখের কান্না, তেমনি সুখের হাসি আছে—কিন্তু মাঝে হইতে কৌতুকের হাসিটা কোথা হইতে আসিল? কৌতুক জিনিষটা কিছু রহস্যময়। জন্তুরাও সুখ দুঃখ অনুভব করে কিন্তু কৌতুক অনুভব করে না। অলঙ্কারশাস্ত্রে যে ক'টা রসের উল্লেখ আছে সব রসই জন্তুদের অপরিণত অপরিস্ফুট সাহিত্যের মধ্যে আছে কেবল হাস্যরসটা নাই। হয় ত বানরের প্রকৃতির মধ্যে এই রসের কথঞ্চিৎ আভাস দেখা যায়, কিন্তু বানরের সহিত মানুষের আরও অনেক বিষয়েই সাদৃশ্য আছে।

যাহা অসঙ্গত তাহাতে মানুষের দুঃখ পাওয়া উচিত ছিল, হাসি পাইবার কোন অর্থই নাই। পশ্চাতে যখন চৌকি নাই তখন চৌকিতে বসিতেছি মনে করিয়া কেহ যদি মাটিতে পড়িয়া যায় তবে তাহাতে দর্শকবৃন্দের সুখানুভব করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না। এমন একটা উদাহরণ কেন, কৌতুকমাত্রেরই মধ্যে এমন একটা পদার্থ আছে যাহাতে মানুষের সুখ না হইয়া দুঃখ হওয়া উচিত।

আমরা কথায় কথায় সেদিন ইহার একটা কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। আমরা বলিয়াছিলাম, কৌতুকের হাসি এবং আমোদের হাসি একজাতীয়—উভয় হাস্যের মধ্যেই একটা প্রবলতা আছে। তাই আমাদের সন্দেহ হইয়াছিল, যে, হয় ত আমোদ এবং কৌতুকের মধ্যে একটা প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে; সেইটে বাহির করিতে পারিলেই কৌতুকহাস্যের রহস্য ভেদ হইতে পারে।

সাধারণভাবের সুখের সহিত আমোদের একটা প্রভেদ আছে। প্রতিদিন যথাসময়ে যথাস্থানে স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক অন্নপান করিয়া আমরা সুখে থাকি, একদিন নিয়মভঙ্গ করিয়া অসময়ে নূতন স্থানে কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক চড়িভাতি করিয়া আমরা আমোদ পাই। নিয়মভঙ্গে যে একটু পীড়া আছে সেই পীড়াটুকু না থাকিলে আমোদ হইতে পারে না। আমোদ জিনিষটা নিত্যনৈমিত্তিক সহজ নিয়মসঙ্গত নহে; তাহা মাঝে মাঝে এক একদিনের; তাহাতে বিপুল প্রয়াসের আবশ্যক। সেই পীড়ন এবং প্রয়াসের সংঘর্ষে মনের যে একটা উত্তেজনা হয় সেই উত্তেজনাই আমোদের প্রধান উপকরণ।

আমরা বলিয়াছিলাম কৌতুকের মধ্যেও নিয়মভঙ্গজনিত একটা পীড়া আছে; সেই পীড়াটা অনতিঅধিকমাত্রায় না গেলে আমাদের মনে যে একটা সুখকর উত্তেজনার উদ্রেক করে, সেই আকস্মিক উত্তেজনার আঘাতে আমরা হাসিয়া উঠি। যাহা সুসঙ্গত তাহা চিরদিনের নিয়মসম্মত, যাহা অসঙ্গত তাহা ক্ষণকালের নিয়মভঙ্গ। যেখানে যাহা হওয়া উচিত সেখানে তাহা হইলে তাহাতে আমাদের মনের কোন উত্তেজনা নাই, হঠাৎ, না হইলে কিম্বা আর একরূপ হইলে সেই আকস্মিক অনতিপ্রবল উৎপীড়নে মনটা একটা বিশেষ চেতনা অনুভব করিয়া সুখ পায় এবং আমরা হাসিয়া উঠি।

সেদিন আমরা এই পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম—আর বেশি দূর যাই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আর যে যাওয়া যায় না তাহা নহে। আরও বলিবার কথা আছে।

শ্রীমতী দীপ্তি প্রশ্ন করিয়াছেন, যে, আমাদের চার পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয় তবে চলিতে চলিতে হঠাৎ অল্প হুঁচট্ খাইলে

কিম্বা রাস্তায় যাইতে অকস্মাৎ অল্পমাত্রায় দুর্গন্ধ নাকে আসিলে আমাদের হাসি পাওয়া, অন্ততঃ, উত্তেজনাজনিত সুখ অনুভব করা উচিত।

এ প্রশ্নের দ্বারা আমাদের মীমাংসা খণ্ডিত হইতেছে না, সীমাবদ্ধ হইতেছে মাত্র। ইহাতে কেবল এইটুকু দেখা যাইতেছে যে পীড়নমাত্রেই কৌতুকজনক উত্তেজনা জন্মায় না; অতএব, এক্ষণে দেখা আবশ্যক, কৌতুক-পীড়নের বিশেষ উপকরণটা কি।

জড় প্রকৃতির মধ্যে করুণরসও নাই, হাস্যরসও নাই। একটা বড় পাথর ছোট পাথরকে গুঁড়াইয়া ফেলিলেও আমাদের চোখে জল আসে না, এবং সমতলক্ষেত্রের মধ্যে চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা খাপছাড়া গিরিশৃঙ্গ দেখিতে পাইলে তাহাতে আমাদের হাসি পায় না। নদী নির্ঝর পর্ব্বত সমুদ্রের মধ্যে মাঝে মাঝে আকস্মিক অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহা বাধাজনক, বিরক্তিজনক, পীড়াজনক হইতে পারে, কিন্তু কোন স্থানেই কৌতুকজনক হয় না। সচেতন পদার্থসম্বন্ধীয় খাপছাড়া ব্যাপার ব্যতীত শুদ্ধ জড়পদার্থে আমাদের হাসি আনিতে পারে না।

কেন, তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত কিন্তু আলোচনা করিয়া দেখিতে দোষ নাই।

আমাদের ভাষায় কৌতুক এবং কৌতূহল শব্দের অর্থের যোগ আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক স্থলে একই অর্থে বিকল্পে উভয় শব্দেরই প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহা হইতে অনুমান করি, কৌতূহল বৃত্তির সহিত কৌতুকের বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

কৌতূহলের একটা প্রধান অঙ্গ নূতনত্বের লালসা—কৌতুকেরও একটা প্রধান উপাদান নূতনত্ব। অসঙ্গতের মধ্যে যেমন নিছক বিশুদ্ধ নূতনত্ব আছে সঙ্গতের মধ্যে তেমন নাই।

কিন্তু প্রকৃত অসঙ্গতি ইচ্ছাশক্তির সহিত জড়িত, তাহা জড় পদার্থের মধ্যে নাই। আমি যদি পরিষ্কার পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ দুর্গন্ধ পাই তবে আমি নিশ্চয় জানি, নিকটে কোথাও এক জায়গায় দুর্গন্ধ বস্তু আছে তাই এইরূপ ঘটিল; ইহাতে কোনরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই, ইহা অবশ্যম্ভাবী। জড়প্রকৃতিতে যে কারণে যাহা হইতেছে তাহা ছাড়া আর কিছু হইবার যো নাই, ইহা নিশ্চয়।

কিন্তু পথে চলিতে চলিতে যদি হঠাৎ দেখি একজন মান্য বৃদ্ধ ব্যক্তি খেম্‌টা নাচ নাচিতেছে, তবে সেটা প্রকৃতই অসঙ্গত ঠেকে; কারণ, তাহা অনিবার্য্য নিয়মসঙ্গত নহে। আমরা বৃদ্ধের নিকট কিছুতেই এরূপ আচরণ প্রত্যাশা করি না, কারণ, সে ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন লোক; সে ইচ্ছা করিয়া নাচিতেছে; ইচ্ছা করিলে না নাচিতে পারিত। জড়ের নাকি নিজের ইচ্ছামত কিছু হয় না এই জন্য জড়ের পক্ষে কিছুই অসঙ্গত কৌতুকাবহ হইতে পারে না। এই জন্য অনপেক্ষিত হুঁচট বা দুর্গন্ধ হাস্যজনক নহে। চায়ের চামচ যদি দৈবাৎ চায়ের পেয়ালা হইতে চ্যুত হইয়া দোয়াতের কালির মধ্যে পড়িয়া যায় তবে সেটা চামচের পক্ষে হাস্যকর নহে—ভারাকর্ষণের নিয়ম তাহার লঙ্ঘন করিবার যো নাই; কিন্তু অন্যমনস্ক লেখক যদি তাঁহার চায়ের চামচ দোয়াতের মধ্যে ডুবাইয়া চা খাইবার চেষ্টা করেন তবে সেটা কৌতুকের বিষয় বটে। নীতি যেমন জড়ে নাই, অসঙ্গতিও সেইরূপ জড়ে নাই। মনঃপদার্থ প্রবেশ করিয়া যেখানে দ্বিধা জন্মাইয়া দিয়াছে সেইখানেই উচিত এবং অনুচিত, সঙ্গত এবং অদ্ভুত।

কৌতূহল জিনিষটা অনেক স্থলে নিষ্ঠুর; কৌতুকের মধ্যেও নিষ্ঠুরতা আছে। সিরাজুউদ্দৌলা দুইজনের দাড়িতে দাড়িতে

বাঁধিয়া উভয়ের নাকে নস্য পুরিয়া দিতেন এইরূপ প্রবাদ শুনা যায়—উভয়ে যখন হাঁচিতে আরম্ভ করিত তখন সিরাজউদ্দৌলা আমোদ অনুভব করিতেন। ইহার মধ্যে অসঙ্গতি কোন্‌খানে? নাকে নস্য দিলে ত হাঁচি আসিবারই কথা। কিন্তু এখানেও ইচ্ছার সহিত কার্য্যের অসঙ্গতি। যাহাদের নাকে নস্য দেওয়া হইতেছে তাহাদের ইচ্ছা নয় যে তাহারা হাঁচে, কারণ, হাঁচিলেই তাহাদের দাড়িতে অকস্মাৎ টান পড়িবে কিন্তু তথাপি তাহাদিগকে হাঁচিতেই হইতেছে।

এইরূপ ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসঙ্গতি, উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের অসঙ্গতি, কথার সহিত কার্য্যের অসঙ্গতি এগুলোর মধ্যে নিষ্ঠুরতা আছে। অনেক সময় আমরা যাহাকে লইয়া হাসি সে নিজের অবস্থাকে হাস্যের বিষয় জ্ঞান করে না। এই জন্যই পাঞ্চ-ভৌতিক সভায় ব্যোম বলিয়াছিলেন, যে, কমেডি এবং ট্র্যাজেডি কেবল পীড়নের মাত্রাভেদ মাত্র। কমেডিতে যতটুকু নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হয় তাহাতে আমাদের হাঁসি পায় এবং ট্র্যাজেডিতে যতদূর পর্য্যন্ত যায় তাহাতে আমাদের চোখে জল আসে। গর্দ্দভের মুখস্-পরা বটম্‌কে দেখিয়া টাইটানিয়া যখন প্রেমমোহে মুগ্ধ হইতেছেন তখন তাহা আমাদের হাস্যের বিষয়; কিন্তু সংসারে অনেক গর্দ্দভের নিকট অনেক টাইটানিয়া অপূর্ব্ব মোহবশতঃ যে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া থাকে তাহা মাত্রাভেদে এবং পাত্রভেদে মর্ম্মভেদী শোকের কারণ হইয়া উঠে।

অসঙ্গতি কমেডিরও বিষয়, অসঙ্গতি ট্র্যাজেডিরও বিষয়। কমে-ডিতেও ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসঙ্গতি প্রকাশ পায়। ফল্‌ষ্টাফ্ উয়িণ্ডসর্‌বাসিনী রঙ্গিনীর প্রেমলালসায় বিশ্বস্তচিত্তে অগ্রসর হই-লেন, কিন্তু দুর্গতির একশেষ লাভ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন; —

রামচন্দ্র যখন রাবণ বধ করিয়া, বনবাস প্রতিজ্ঞাপূরণ করিয়া, রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া দাম্পত্য সুখের চরমশিখরে আরোহণ করিয়াছেন এমন সময় অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল, গর্ভবতী সীতাকে অরণ্যে নির্ব্বাসিত করিতে বাধ্য হইলেন। উভয় স্থলেই আশার সহিত ফলের, ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসঙ্গতি প্রকাশ পাইতেছে। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, অসঙ্গতি দুই শ্রেণীর আছে; একটা হাস্যজনক, আর একটা দুঃখজনক। বিরক্তিজনক, বিস্ময়জনক, রোষজনককেও আমার শেষ শ্রেণীতে ফেলিতেছি।

যে লোককে অত্যন্ত পরিশ্রমী বলিয়া জানি তাহাকে একদিন আলস্য করিতে দেখিলে সেইটুকু অসঙ্গতিতে আমাদের মনে কেবল মাত্র ঈষৎ বিস্ময় সঞ্চার হয়—এবং তখনি ইহার মধ্যে একটা সঙ্গত নিয়মের আবিষ্কার করি; বলি, যে, শারীরিক ক্ষমতার সীমা বশতঃ অশ্রান্ত পরিশ্রমী লোকদিগকেও এক এক দিন আলস্য আক্রমণ করিয়া থাকে। যাহার বাপকে এককালে লক্ষপতি বলিয়া জানিতাম তাহাকে হঠাৎ কৌপীন পরিয়া ভিক্ষা করিতে দেখিলে সেই অসঙ্গতিতে মনে দুঃখ বোধ হয়, এবং তাহা হইতে এই একটি সাধারণ নিয়ম বাহির করি, যে, আর্থিক অবস্থা চিরকাল কাহারও সমান যায় না। যাহাকে ধার্ম্মিক বলিয়া ধারণা ছিল হঠাৎ তাহাকে অধর্ম্মাচরণ করিতে দেখিলে লোকবিশেষের নিকট তাহা কৌতুকাবহ মনে হইতেও পারে, না হইতেও পারে; যাহার ভক্তিতে অধিক আঘাত লাগে, বা ভণ্ডামি যাহার কাছে অত্যন্ত কদর্য্য বা পীড়াজনক তাহার কৌতুক বোধ হয় না —; কিন্তু বিশেষ অবস্থা এবং প্রকৃতিবশতঃ এই অসঙ্গতি যাহাকে গভীরভাবে আঘাত না করে তাহার নিকট ইহা বিশেষ কৌতুকের মনে হইতে পারে।

অর্থাৎ অসঙ্গতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত

করে তখনই আমাদের কৌতুক বোধ হয়, গভীরতর স্তরে আঘাত করিলে আমাদের দুঃখ বোধ হয়। শিকারী যখন অনেকক্ষণ অনেক তাক করিয়া হংসভ্রমে একটা দূরস্থ শ্বেত পদার্থের প্রতি গুলি বর্ষণ করে এবং ছুটিয়া কাছে গিয়া দেখে সেটা একটা ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড, তখন তাহার সেই নৈরাশ্যে আমাদের হাসি পায়; কিন্তু কোন লোক যাহাকে আপন জীবনের পরম পদার্থ মনে করিয়া একাগ্রচিত্তে একান্ত চেষ্টায় আজন্মকাল তাহার অনুসরণ করিয়াছে এবং অবশেষে সিদ্ধকাম হইয়া তাহাকে হাতে লইয়া দেখিয়াছে সে তুচ্ছ প্রবঞ্চনামাত্র, তখন তাহার সেই নৈরাশ্যে অন্তঃকরণ ব্যথিত হয়। দুর্ভিক্ষে যখন দলে দলে মানুষ মরিতেছে তখন সেটাকে প্রহসনের বিষয় বলিয়া কাহারও মনে হয় না;—কিন্তু আমরা অনায়াসে কল্পনা করিতে পারি, একটা রসিক সয়তানের নিকট ইহা পরম কৌতুকাবহ দৃশ্য; সে তখন এই সকল অমর-আত্মাধারী জীর্ণকলেবরগুলির প্রতি সহাস্য কটাক্ষপাত করিয়া বলিতে পারে ঐ ত তোমাদের ষড়্‌দর্শন, তোমাদের কালিদাসের কাব্য, তোমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতা পড়িয়া আছে; নাই শুধু দুইমুষ্টি তুচ্ছ তণ্ডুল-কণা, অমনি তোমাদের অমর আত্মা তোমাদের জগদ্বিজয়ী মনুষ্যত্ব একেবারে কণ্ঠের কাছটিতে আসিয়া ধুক্‌ধুক্ করিতেছে!

স্থূল কথাটা এই যে, অসঙ্গতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইতে থাকে।

ব্রাহ্মণ।

(ছান্দোগ্যোপনিষৎ। ৪ প্রপাঠক। ৪ অধ্যায়)

অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য্য; আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রমমাঝে ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধ্‌ভার করি আহরণ
বনান্তর হতে; ফিরায়ে এনেছে ডাকি
তপোবন-গোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধশান্ত-আঁখি
শ্রান্ত হোমধেনুগণে; করি' সমাপন
সন্ধ্যাস্নান, সবে মিলি লয়েছে আসন
গুরু গৌতমেরে ঘিরি কুটীর-প্রাঙ্গণে
হোমাগ্নি আলোকে। শূন্যে অনন্ত গগনে
ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি; নক্ষত্রমণ্ডলী
সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ কুতূহলী
নিঃশব্দ শিষ্যের মত। নিভৃত আশ্রম
উঠিল চকিত হয়ে,—মহর্ষি গৌতম
কহিলেন—বৎসগণ, ব্রহ্মবিদ্যা কহি,
কর অবধান!

হেনকালে অর্ঘ্য বহি'
করপুট ভরি, পশিলা প্রাঙ্গণতলে
তরুণ বালক; বন্দি ফলফুলদলে
ঋষির চরণ-পদ্ম, নমি' ভক্তিভরে
কহিলা কোকিলকণ্ঠে সুধাস্নিগ্ধস্বরে,—

ভগবন্, ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষা-অভিলাষী
আসিয়াছি দীক্ষা তরে কুশক্ষেত্রবাসী
সত্যকাম নাম মোর!
শুনি স্মিতহাসে
ব্রহ্মর্ষি কহিলা তারে স্নেহশান্ত ভাষে—
কুশল হউক্ সৌম্য! গোত্র কি তোমার?
বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে।—
বালক কহিলা ধীরে,—
ভগবন্, গোত্র নাহি জানি। জননীরে
শুধায়ে আসিব কল্য কর অনুমতি!—
এত কহি ঋষিপদে করিয়া প্রণতি
গেলা চলি সত্যকাম, ঘন-অন্ধকার
বন-বীথি দিয়া,—পদব্রজে হয়ে পার
ক্ষীণ স্বচ্ছ শান্ত সরস্বতী, বালুতীরে
সুপ্তিমৌন গ্রামপ্রান্তে জননী-কুটীরে
করিলা প্রবেশ।
ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা';
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি জননী জবালা
পুত্রপথ চাহি; হেরি তারে বক্ষে টানি'
আঘ্রাণ করিয়া শির কহিলেন বাণী
কল্যাণ কুশল। শুধাইলা সত্যকাম—
কহ গো জননী মোর পিতার কি নাম,
কি বংশে জনম? গিয়াছিনু দীক্ষাতরে
গৌতমের কাছে;—গুরু কহিলেন মোরে,—

বৎস, শুধু ব্রাহ্মণের আছে অধিকার
ব্রহ্মবিদ্যালাভে।—মাতঃ, কি গোত্র আমার ?

শুনি কথা, মৃদুকণ্ঠে অবনতমুখে
কহিলা জননী,—যৌবনে দারিদ্র্যদুখে
বহু-পরিচর্য্যা করি পেয়েছিনু তোরে,—
জন্মেছিস্ ভর্ত্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে,
গোত্র তব নাহি জানি, তাত !

পরদিন
তপোবন-তরুশিরে প্রসন্ন নবীন
জাগিল প্রভাত। যত তাপস বালক,
শিশির-সুস্নিগ্ধ যেন তরুণ আলোক,
ভক্তি-অশ্রু-ধৌত যেন নব পুণ্যচ্ছটা,—
প্রাতঃস্নাত স্নিগ্ধচ্ছবি আর্দ্রসিক্ত জটা,
শুচিশোভা সৌম্যমূর্ত্তি সমুজ্জ্বলকায়
বসেছে বেষ্টন করি বৃদ্ধ বটচ্ছায়
গুরু গৌতমেরে। বিহঙ্গকাকলীগান,
মধুপ-গুঞ্জনগীতি, জলকলতান,
তারি সাথে উঠিতেছে গম্ভীর মধুর
বিচিত্র তরুণ কণ্ঠে সম্মিলিত সুর
শান্ত সামগীতি।

হেন কালে সত্যকাম
কাছে আসি ঋষিপদে করিলা প্রণাম,—

মেলিয়া উদার আঁখি রহিলা নীরবে।
আচার্য্য আশীষ করি শুধাইলা তবে,—
কি গোত্র তোমার, সৌম্য, প্রিয়-দরশন?—
তুলি শির কহিলা বালক,—ভগবন্,
নাহি জানি কি গোত্র আমার। পুছিলাম
জননীরে;—কহিলেন তিনি,—সত্যকাম,
বহু-পরিচর্য্যা করি পেয়েছিনু তোরে,
জন্মেছিস্ ভর্ত্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে—
গোত্র তব নাহি জানি।

শুনি সে বারতা
ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা,—
মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল
পতঙ্গের মত—সবে বিস্ময়-বিকল,
কেহ বা হাসিল, কেহ করিল ধিক্কার
লজ্জাহীন অনার্য্যের হেরি অহঙ্কার।

উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন
বাহু মেলি,—বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন—অব্রাহ্মণ নহ তুমি, তাত!
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত!

৭ ফাল্গুন
১৩০১

আলোচনা।

পলিটিক্স্।

আমাদের জাতীয় প্রজাসমিতি বা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কন্‌গ্রেসের দশম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি মিঃ ওয়েব এবং হিন্দুহিতৈষিণী শ্রীমতী অ্যানি বেসেণ্ট্ স্বস্ব বক্তৃতাস্থলে পলিটিক্সের উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

বিবি বেসেণ্টের মতে পলিটিক্স্ ভারতবর্ষের ধাতুর সহিত ঠিক মিশ খায় না। চিন্তা করা, শিক্ষাদান করা এবং কার্য্যসাধন করা এই তিনের মধ্যে প্রথম দুইটি মহত্তর কার্য্যই ভারতবর্ষকে শোভা পায়, শেষোক্ত কার্য্যটা পলিটিক্সের অঙ্গ এবং তাহা ভারতবর্ষীয়ের জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত হয় না।

এসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, অট্টালিকাকে আকাশের দিকে উচ্চ করিয়া তুলিতে হইলে তাহাকে মাটির মধ্যে গভীর করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। যদি কেহ মনে করেন অট্টালিকার যতটুকু মাটির মধ্যে প্রোথিত হইল সেটা অপব্যয় হইল, সেটাকে উচ্চে যোগ করিয়া দিলে অট্টালিকা আরো উচ্চতর হইতে পারিত তবে তাঁহাকে উন্নতির স্থায়িত্ব-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ বলিতে হইবে!

শক্তিপরম্পরার মধ্যে একটা নিবিড় যোগ আছে। যে জাতি কেবল চিন্তা করে কার্য্য করে না তাহার চিন্তাশক্তি ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া যায়; যে জাতি কেবল কার্য্য করে চিন্তা করে না তাহার কার্য্যকারিতা নিষ্ফল হইতে থাকে। একটা জাত কেবল চিন্তা করিবে এবং আর একটা জাত কেবল কার্য্য করিবে এমন বিভাগের নিয়ম টিঁকিতে পারে না; কারণ যে যেখানে অসম্পূর্ণতা পোষণ করে সেইখানে আঘাত লাগিয়াই সে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কোন প্রাণীকে প্রচুর বাঁধা খোরাক দিয়া কেবলমাত্র মেদবৃদ্ধি করিলে তাহার মাংস অন্যের পক্ষে বড় উপাদেয় হয় কিন্তু তাহাতে তাহার নিজের সুবিধা দেখি না; আমরা ঘরে বসিয়া কেবলি চিন্তার খোরাকে পরিপুষ্ট হইয়াছি, তাহাতে অন্যান্য মাংসাশী জাতির বিশেষ উপকার হইয়াছে; এখন বুঝিতেছি শিং নাড়িয়া গুঁতা দিবার শিক্ষাটা আমাদের নিজের পক্ষে বিশেষ কার্য্যকরী।

কিন্তু কেবল আত্মরক্ষার শিক্ষাই পলিটিক্‌স্ নহে। চিন্তালব্ধ উচ্চতর নীতিগুলিকে মনুষ্যসমাজে কার্য্যে পরিণত করিবার উপায়-সাধনও পলিটিক্সের অঙ্গ। এ সম্বন্ধে মিঃওয়েব যাহা বলিয়াছেন তাহা সারগর্ভ। তিনি বলেন—Politics are amongst the most comprehensive spheres of human activity and none should eventually be excluded from their exercise. There is much that is ludicrous, much that is sad, much that is deplorable about them: yet they remain, and ever will remain the most effective field upon which to work for the good of our fellows.

মিঃ ওয়েব বলেন, রাজনীতির নির্ম্মল ক্ষেত্র নীচ স্বার্থপরতা, অর্থলালসা ও আত্ম-পিপাসার পূতিগন্ধময় পঙ্কে কলুষিত হইতে দেওয়া কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। পরার্থপরতায় ও সর্ব্বসাধারণের হিতার্থে আত্মোৎসর্গেরই নাম "পাবলিক লাইফ" বা রাজনীতিকের জীবন। সে জীবন সর্ব্বথা সংস্কৃত, সংযত ও সমুন্নত থাকা প্রয়োজন। যতই ক্ষুদ্র, যতই নিম্ন ও অবনত, অবমানিত ও ঘৃণিত হউক, জাতি বর্ণ শ্রেণী ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে মনুষ্য মাত্রেরই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কার্য্যাধিকার আছে; ফলতঃ অবনতকে উন্নত ও পদদলিতকে মনুষ্যত্বের স্বত্ব ও দায়িত্বাধিকার প্রদান করাই উচ্চ রাজনীতি।

ইহা আধুনিক য়ুরোপীয় প্রজাতান্ত্রিক রাজনীতি বা ডেমোক্রেসীর অনাবিল অংশ। ইহাই "উচ্চতর পলিটিক্স"। এবারকার কঙ্গ্রেস সভাপতি অত্যল্প মাত্র মাত্রায় আমাদিগকে ইহারই আভাস দিয়াছিলেন।

পরন্তু বিবি বেসেণ্ট বলেন পুরাতন সমাজের বনিয়াদ প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ মনুষ্যের কর্ত্তব্যজ্ঞান ও কর্ত্তব্য পরিচালনের উপকরণেই গঠিত হইয়াছিল; তাহার পর মনুষ্যের স্বত্বাধিকার (rights of man) বলিয়া একটী সামগ্রী তাহাতে আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছে। তাঁহার বিবেচনায় মনুষ্যের কর্ত্তব্যপরায়ণতারই সমাজ সংরক্ষণার্থে প্রচুর; উহার সহিত মানুষের স্বাভাবিক স্বত্বাধিকার রক্ষণচেষ্টার সংযোগ শুভদায়ক নহে। অতএব পলিটিক্স কেবল কর্ত্তব্যাবধারণ, পরিচালন ও শাসনেই পর্য্যবসিত হওয়া উচিত; স্বত্বাধিকার বলিয়া যে সামগ্রীটী উপরপড়া হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, উহা মনুষ্যসমাজের সীমানার মধ্যেই না থাকা ভাল। বলা বাহুল্য বিবির এই মর্ম্মের উক্তি এবং ইঙ্গিত, তাঁহার প্রতি আমাদের সবিশেষ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও, আমরা আদৌ অঙ্গীকার বা অনুমোদন করিতে প্রস্তুত নই। তিনি নিজেই অনতিকালপূর্ব্বে, মনুষ্য জাতির স্বাভাবিক স্বত্বাধিকারের সমূহ পক্ষপাতিনী এবং অগ্রগণ্যা পরিচালিকা ও প্রচারিকা ছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া আমাদের ভাগ্যদোষেই, বোধ হয়, তিনি তাঁহার পূর্ব্বপ্রচারিত পবিত্র মত প্রত্যাহার করিতেছেন। কর্ত্তব্যজ্ঞান ও কর্ত্তব্যপালনের মাহাত্ম্য অবিসম্বাদিত। উহা সমাজের, মানুষের মনুষ্যত্বের মূল ভিত্তি, আদি উপাদান; তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু, কর্ত্তব্যানুভব করিয়া কর্ত্তব্যপালন, বোধ হয়, কেবল মানবধর্ম্ম-যুক্ত জীব মানুষেই করে; পশু, পতঙ্গ, কীটানুকীটে মনুষ্যোচিত উচ্চতর কর্ত্তব্যপালন

করে না ; তাহাদের মধ্যে কর্ত্তব্যজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হওয়াই সম্ভবে না। মনুষ্য জানে সে মানুষ ; মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক স্বত্বাধিকার সুতরাং কর্ত্তব্যপালনের দায়িত্ব তাহার আছে। স্মরণ রাখা আবশ্যক স্বত্বাধিকারের সঙ্গেই দায়িত্ব সংযুক্ত। মনুষ্য যে সকল স্থলে পশু অপেক্ষাও অধম বলিয়া পরিগণিত, তথায় তাহার কর্ত্তব্যজ্ঞান পশু অপেক্ষা অধিক হওয়ার আশা করা যায় না। ফলতঃ মনুষ্যের স্বাভাবিক স্বত্বাধিকারজনিত দায়িত্ব হইতেই প্রধানতঃ তাহার কর্ত্তব্যজ্ঞান উদ্ভূত হয়। যেস্থানে সে দায়িত্বের অভাব, সেস্থলে কর্ত্তব্যজ্ঞানের অনটন অবশ্যম্ভব। পরন্তু, মনুষ্যত্বের স্বত্বাধিকারে বঞ্চিত হইলে তাহার উদ্ধার সাধনে তৎপর হওয়া নিজেই মানবধর্ম্মের একটী প্রধান কর্ত্তব্য।

যে ব্রাহ্মণ প্রাচীন ভারতে চিন্তা করিত এবং শিক্ষাদান করিত তাহার কি কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞানই ছিল স্বত্বাধিকার ছিল না? রাজ্যের মধ্যে তাহার কি একটা বিশেষ স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল না? অপর সাধারণের নিকট তাহার কি কোন প্রকার দাবী ছিল না? প্রাচীন ইতিহাসে এমন আঁভাসও কি পাওয়া যায় না যে, এক সময়ে ব্রাহ্মণের স্বত্বাধিকার লইয়া ক্ষত্রিয়ের সহিত তাহার রীতিমত বিরোধ বাধিয়াছিল? ব্রাহ্মণ যদি আত্মসম্মান, আপনার স্বত্বাধিকার রক্ষা করিতে না পারিত তবে সে কি চিন্তা করিতে এবং শিক্ষা দান করিতে সক্ষম হইত? পরন্তু তখন রাজা এবং গুরু, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ আপন স্বত্ব এতদূর পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন যে, অপর সাধারণের মনুষ্যোচিত অধিকার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছিল—তাহাদের চিন্তার স্বাধীনতা তাহাদের মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন—ভারতবর্ষের পতনের সেই একটা প্রধান কারণ। এখনকার পলিটিক্সের

গতি অনুসারে সর্ব্বসাধারণেই আপনার স্বাভাবিক স্বত্ব পূর্ণমাত্রায় লাভ করিবার অধিকারী। সকলেই আপন মনুষ্যগৌরব অনুভব করিয়া মনুষ্যত্বের কর্ত্তব্য সাধনে উৎসাহী হইবে। যাহার হাতে ক্ষমতা আছে সে আপন খেয়াল অনুসারে অক্ষম ব্যক্তিকে উৎপীড়ন করিবে না, যাহার হাতে শাস্ত্র আছে সে কেবলমাত্র অনুশাসন দ্বারা অন্যের চিন্তা এবং কার্য্যকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিবে না। রাজমন্ত্রীরাও ন্যায়মতে (অর্থাৎ দীনতম ব্যক্তিরও ন্যায্য স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া) আইন করিবেন, রাজপুরুষেরাও আইনমতে শাসন করিবেন, গুরুও যুক্তির দ্বারা আপন মত প্রচার করিবেন। এইরূপে প্রত্যেকে আপন স্বত্বাধিকার রক্ষা করিতে পারিলে তবেই আপন সাধ্যমত আপনার উন্নতি এবং সেই সঙ্গে জগতের উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইবে। স্বত্বাধিকার ব্যতীত কর্ত্তব্য অনুভব করা এবং কর্ত্তব্য পালন করা সম্ভব নহে। স্বত্বাধিকার সংক্ষেপ হইলে কর্ত্তব্যের পরিধিও সংক্ষিপ্ত হইয়া আসে।

ইংলণ্ড, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার বৈভববিলাসের বিপন্নতা ও বীভৎস ব্যাপার দেখাইয়া বিবি বেসেণ্ট্ আমাদিগকে পাশ্চাত্য জড়বাদের আপাতমনোহর এবং অত্যন্ত মোহকর আদর্শ পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক ভারতীয় প্রাচীনকালপ্রবর্ত্তিত অধ্যাত্মপথ অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সদুপদেশ সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় পুণ্য দেশেও একেবারে পঞ্চবিংশতি কোটি মহামুনির উদ্ভব সম্ভবপর নহে। যথাসম্ভব লোক আধ্যাত্মিক হইয়াও যথেষ্ট পরিমাণে পার্থিব লোক বাকি থাকিবে। তাহারা যাহাতে আত্মসম্ভ্রম, উন্নতি এবং মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে সে জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক; যাঁহারা না আধ্যাত্মিক না পার্থিব তাঁহাদের মত শোচনীয় জীব জগতে আর নাই।

পাশ্চাত্যের পাপাদর্শ অতি সাবধানেই পরিবর্জ্জনীয়। কিন্তু, পুণ্যাদর্শও যদি সেখানে পাই, তাহা পরিত্যাগ করিব কেন? মিঃ ওয়েব আইরিশম্যান। আইয়িশে ইংরেজে স্বার্থ ও রাজনৈতিক সত্বাধিকারের সম্বন্ধটা যে খুব সুমিষ্ট তাহা নহে। সকলেই জানেন সে সম্বন্ধ তীব্র তিক্তরসমিশ্রিত। এতাদৃশ অবস্থায় মিঃ ওয়েব আইরিশ "হোমরুলার" হইয়াও, ইংরাজের একটী অতি মহৎ স্বরূপের আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি এই;—

"ইংরাজেরা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা স্বভাবতঃ অধিকতর সাহসীও নয়, সৎ ও শক্তিশালীও নয়। তাহাদের আত্ম-নির্ভরতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের উচ্চতা হইতেই, তাহাদের বিজয়কীর্ত্তি ও কার্য্যসফলতা অংশতঃ উদ্ভূত। তাহারা যাহা সঙ্কল্প করে, নিশ্চয়ই তাহা সিদ্ধ করে। অন্যান্য লোকের ন্যায়, তাহারাও স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই হউক কিম্বা রাজ্য-শাসন ব্যাপারেই হউক; যখন তাহারা সাধারণের হিতসাধন সংকল্প করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল, তখন তাহারা কোন ক্রমেই ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া সে সংকল্প সাধনে বিরত হইবে না; সে কার্য্য সম্পাদনে কিছুতেই শৈথিল্য করিবে না; ইহা নিশ্চয়। এবং ইহাও নিশ্চয় যে, তাহারা পরস্পরে পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে জানে। অতএব এই সকল বিষয়ে ইংরাজ গুণের আদর্শ আমাদের গ্রহণীয়।"

এ দেশীয়দিগের বিশেষতঃ এ দেশে অধুনা যাঁহারা রাজনৈতিক ব্যাপারে সংলিপ্ত, ও রাজ-প্রদত্ত আংশিক আত্ম-শাসনাধিকার ব্যপদেশে সাধারণ জনসাধারণের কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত তাঁহাদের আপাততঃ যত কিছু শিক্ষণীয় আছে তাহার মধ্যে উপরোক্ত

শিক্ষা সর্ব্বপ্রধান স্থানীয়। জনসাধারণের কার্য্যে অক্ষুণ্ণ ও আন্তরিক মনঃসংযোগ, শ্রম এবং অনুরাগ এবং তাহা সম্পাদনকালে আত্ম-স্বার্থের বা আত্মীয় স্বজনের ব্যক্তিগত বিরোধী স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বসাধারণের স্বার্থ বিনষ্ট না করা, উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাদের এই দুইটী শিক্ষা অতিশয় আবশ্যক হইয়াছে। কাউন্সিলের মেম্বর, মিউনিসিপাল কমিশনর, ডিষ্ট্রীক্ট ও লোকালবোর্ডের সদস্য হইতে গ্রাম্য চৌকিদারি সমিতির পঞ্চায়েতদিগের পর্য্যন্ত অল্পাধিক পরিমাণে ঐ দুই শিক্ষার প্রয়োজন। পরন্তু নগরবাসী ও গ্রাম্য লোকদিগেরও এ শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন থাকা উচিত নয়। ইহাই স্বায়ত্তশাসনাধিকারের অস্থিমজ্জা প্রাণ। এই শিক্ষার অভাবে, বলিতে লজ্জার ও ঘৃণার উদ্রেক হয়, আমরা যে এক বিন্দু আত্মশাসনাধিকার পাইয়াছি অনেকস্থলেই তাহার কেবল অপব্যবহার হইতেছে। ফলতঃ সাধারণের কার্য্য সম্পাদন সম্বন্ধে এই শিক্ষায় সুশিক্ষিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা অতিরিক্ত পরিমাণে আত্মশাসনাধিকার পাইবার উপযুক্ত হইব, এ কথা বলিতে অন্ততঃ আমরা সাহসী নহি। আমাদের মধ্যে আত্ম-গরিমা প্রকাশের ইদানীং ইয়ত্তা নাই। অতএব এস্থলে আমরা সেটা না করিয়া, সংগোপনে যদি দুই একটী আত্মকথা এবং আসল কথার আলোচনা করিয়া থাকি, তাহাতে ইষ্ট বই অনিষ্ট হইবে না। সংবাদপত্রের আস্ফালন ও অফিসিয়াল রিপোর্টের আবরণ ক্ষণকালের জন্য দূরে রাখিয়া, উপস্থিত ক্ষেত্রে, আমাদের আত্মশাসনব্যাপারের অপক্ষপাত সমালোচনা করিয়া অকপট চিত্তে বলুন দেখি সে বিষয়ে আমাদের উপযুক্ততা কিরূপ জন্মিয়াছে?

কিন্তু, আমরা চিরকালই অনুপযুক্ত থাকিব এমনও কেহ মনে করিবেন না। কোনও কার্য্যের প্রথমে ও প্রারম্ভে পরিপক্কতা

স্বভাবতই সম্ভবে না। কেবল সেই পরিপক্কতার কপট পরিচয় দেওয়াই মহাভ্রম। পক্ষান্তরে, গবর্ণমেণ্টের অযথা কঠোরতা এবং অশেষ ক্রটী সত্বেও উহা মূলতঃ প্রজাতান্ত্রিক প্রণালী। ভারতীয় ইংরাজের অসীম প্রভুত্ব-স্পৃহার অভ্যন্তরেও শাসনপ্রণালীর প্রজা-তান্ত্রিক আসক্তি অলক্ষে বিদ্যমান। য়ুরোপীয় ডেমক্রেসীকে একে-বারে অতিক্রম করিয়া য়ুরোপীয়দিগের শাসনযন্ত্র কোথায়ও চলিতে পারে না। কোন না কোনও প্রকারে তাহার সঙ্গে সংশ্রব রাখিতে বাধ্য হয়। সুতরাং সাধারণ মত ও জনসাধারণের স্বত্বাধিকারকে উহা একেবারেই উপেক্ষা করিতে পারে না। ইহাই অবশ্য আমা-দিগের আশা এবং এ আশা একান্ত বৃথা আশাও নহে। ইংরাজ শাসনের যেরূপ গতি প্রকৃতি তাহাতে এমন দিন অবশ্যই এক সময়ে আসিতে পারে, যখন এদেশীয়েরা শ্রেণী ও সম্প্রদায়নির্বিশেষে বৃটিশ প্রজার প্রাপ্য স্বত্বাধিকারের সম্যক বা আংশিক অংশ পাইলেও পাইতে পারে। কিন্তু, তাহার উপযুক্ত ও তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। প্রজানীতি, প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠিত ও সমগ্রদেশে পরিব্যাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে, বৃটিশ রাজ-নীতি, বৃটিশ প্রজার স্বত্বাধিকার এ দেশায়দিগকে দিবেন না, ইহা নিশ্চয়; পরন্তু আমাদের অনুপ-যুক্ততা ও অপ্রস্তুত অবস্থায় তাহা দেওয়াও নিষ্ফল। উষরক্ষেত্রে বীজ বপন বৃথা। আমাদের আশঙ্কা, ক্ষেত্র অদ্যাপি প্রস্তুত হয় নাই। প্রকৃত প্রজানৈতিক পলিটিক্সের এখনও আমাদের মধ্যে অত্যন্ত অভাব। পলিটিক্স এখনও আমাদের মধ্যে একটা পোষাকী জিনি-ষের বেশী আর কিছুই নয়। উহা এখনও আমাদের রক্ত মাংসে মেধ মজ্জায় মিশে নাই। উহা অদ্যাপি আমাদের প্রাত্যহিক জীবন ধারণের আহার্য্য স্বরূপ হয় নাই। তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের দাসত্ব ঘুচিয়া প্রকৃত ও পুষ্টিকর প্রজাত্ব জন্মিবে না।

আমরা বোধ হয় আমাদের রাজনৈতিক প্রবণতা কি প্রকৃতির তাহা উপরি উক্ত আলোচনায় কিয়ৎ পরিমাণে বিবৃত করিয়াছি। এক্ষণে, সাম্রাজ্যের রাশিচক্র কৌন্সিলগৃহের উচ্চাকাশে কিরূপে আবর্ত্তিত হইতেছে তাহা খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখা আবশ্যক।

কন্‌গ্রেসে বিদ্রোহ।

কিন্তু তৎপূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। কন্‌গ্রেসের গত অধিবেশনে নর্টন সাহেবের প্রতি কোন বিশেষ বক্তৃতার ভার ছিল বলিয়া কোন কোন সভ্য বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। চরিত্র-দোষজন্য কন্‌গ্রেসের সহিত নর্টনের ঘনিষ্ঠতা তাঁহারা প্রার্থনীয় মনে করেন না।

নর্টন্ যদি সমাজে পতিত হইয়া থাকেন তবে সমাজে তাঁহার নিমন্ত্রণ বন্ধ হইতে পারে—কিন্তু কন্‌গ্রেসসভায় অকৃত্রিম ভারত-হিতৈষী মাত্রেরই অধিকার আছে। হাবড়ার ব্রিজ্ যদি কোন মাতাল এঞ্জিনিয়ারের দ্বারা নির্ম্মিত হইত তবে টেম্পারেন্স সভার সভ্যগণ কি সাঁতার দিয়া নদী পার হইতেন ?

ভারত কৌন্সিলের স্বাধীনতা।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার "সেসন"ই এ শীতে, সতেজ, সর গরম। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক বৈঠক বরং কিছু বিমর্ষ। কটন আইন ও ক্যাণ্টনমেণ্ট বিলের আলোচনায় এক বিরাট সমস্যা উপস্থিত; পুলিশ রেগুলেসন বিলে বিস্তৃত আন্দোলনতরঙ্গ উত্তোলন করিয়াছে। আমাদের সুপ্রিম কৌন্সিল (বা বড় ব্যবস্থাপক সভা) সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন অথবা ষ্টেট সেক্রেটারির সারথ্যে বৃটিশ পার্লামেণ্টের কিঞ্চিৎ অধীন এই প্রশ্ন কটন বা কাপড় সূতার আইন যখন বিল ছিল তখনি অঙ্কুরিত হইয়া ক্যাণ্টনমেণ্ট বিলের

অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় একটা কণ্টকবৃক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। বৃক্ষটার অনেকগুলা শাখা প্রশাখা ও কাঁটা-খোঁচা বাহির হইয়াছে। কটনএক্ট সম্বন্ধে সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের আদেশ বা "ম্যাণ্ডেট্" অথবা ব্যবস্থাপক সভাপতি এলগিন কর্ত্তৃক তাহার উল্লেখ এই আকস্মিক উৎকণ্ঠা উৎপাদন ও বিপদপাতের অব্যবহিত কারণ। "ম্যাণ্ডেট" উক্তিটাই যেন বোধ হয়, অনর্থ ঘটাইয়াছে। ব্যবস্থাপকগণ, বিশেষতঃ 'আনঅফিশিয়াল' এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান মেম্বরেরা মহা বিরক্ত হইয়াছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে ব্যাপস্থাপক সভার বিশাল হিমাচলবৎ গাম্ভীর্য্যের এক বিন্দু ব্যতিক্রম হইয়াছে।

সকলেই জানেন যে ব্যবস্থাপক সভার অসীম স্বাধীনতা সংরক্ষণের চেষ্টায় শ্রীমান স্যর গ্রিফিথ ইভান্স এবং মাননীয় মিঃ প্লেফেয়ার এই দুই রথী অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। ইহাঁদের উভয়েরই বিবেচনায় এখানকার এই আইন-সভার স্বাধীনতা অসীম হওয়া উচিত; অসীমই ছিল; কিছু কাল হইতে ষ্টেটসেক্রেটারী সংকল্প করিয়া সসীম করিতে বসিয়াছেন। ইহা, বে-আইনি, বে-নজিরি এবং বিষম বিপত্তিজনক। ইহাতে করিয়া ব্যবস্থাপক সভার বে-ইজ্জত, সে সভার সভাপতি স্বয়ং রাজপ্রতিনিধির সম্ভ্রমের হানি এবং ব্যবস্থাপকদিগের বিধি ব্যবস্থা বিদ্রুপকর হইবে; পরন্তু, তদ্দ্বারা ভারতরাজ্য শাসন সম্বন্ধেও ভয়ানক বিভীষিকা উপস্থিত হইবে। কেবল তাহাই নহে, বৃটিশ ডেমক্রেসী আদৌ সাম্রাজ্য শাসনে সমর্থ কিনা; সে বিষয়েই (শুনিতেছি) ঘোর সন্দেহ, উপস্থিত হইবে! কেবল সন্দেহ নহে; সে অসমর্থতা সম্পূর্ণরূপে সাব্যস্তই হইবে। The question whether a democracy can govern an Empire will have to be answered in the negative.। পরন্তু, এরূপ, অত্যাচার হইলে, ব্যবস্থাপক

সভায় সুযোগ্য সভ্যই জুটিবে না। সিবিল সার্ব্বিসেও সম্ভবতঃ সমর্থ লোক মিলা ভার হইবে। কেহই আর সাম্রাজ্যের শাসনযন্ত্র ছুঁইতে চাহিবে না; সংহিতাকার ও শাসয়িতাভাবে শাসন-রশ্মি শিথিল হইয়া সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবে না, তাহাই বা কে বলিবে! গবর্ণমেণ্টের প্রতি প্রজাসাধারণের বিশ্বাস থাকিবে না, সম্ভ্রম ও শঙ্কা টলিবে; কাজেই শক্তির হ্রাস হইবে; সুতরাং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল,—ধ্বংসই বটে!

এক দিকে বৃটিশ পার্লামেণ্ট; অপর দিকে ভারত গবর্ণমেণ্ট; মধ্যস্থলে ষ্টেট সেক্রেটারী। এই সেক্রেটারীই হইয়াছেন, এক্ষেত্রে, যত সর্ব্বনাশের মূল। কিন্তু, এই সেক্রেটারী যথার্থই কি আমাদের সংহিতাকারদিগের স্বাধীনতাপহরণে প্রবৃত্ত? যতদূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে কোনও প্রকারেই ত তাঁহার সেরূপ অসদভিসন্ধির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় না।

ভারতে রাজ-শক্তি শতসহস্র স্রোতে, শাখা এবং প্রশাখায় প্রবাহিত। সে শক্তির মূল প্রস্রবণ আদি কেন্দ্রস্থলে ব্যক্তিবিশেষ নহেন, বিরাট বৃটিশ পার্লামেণ্ট, অন্ততঃ ইহাই আমরা অবগত আছি। বিধি ব্যবস্থা ব্যবহারও ইহার বিরোধী নয়। অতএব রাজ-শক্তির আদিকেন্দ্রস্থল বৃটিশ পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক, সে শক্তির সঞ্চালন, সংযম বা সম্প্রসারণ অন্যায় ও অসঙ্গত বলিতে পারি না। ষ্টেট সেক্রেটারী বৃটিশ পার্লামেণ্টের আদেশ, ইচ্ছা ও অবলম্বিত নীতি অনুধাবন করিয়া ভারতশাসন সম্বন্ধে, প্রধান প্রধান বিষয়ে রাজপ্রতিনিধির সমীপে পরামর্শ প্রেরণ করেন। অন্ততঃ লর্ড এলগিন নিজেই, একথা বলিয়াছেন; এবং তাঁহার কথা সমূলক নহে, এমন অনুমান করার কিছুমাত্র কারণও নাই। অতএব ষ্টেটসেক্রেটারীর উপর দোষারোপ করা অনর্থক। তিনি পার্লামেণ্টেরই শক্তি সঞ্চালন করেন; নিজে কোনও

অভিনব নীতি সংগঠন করিয়া পাঠান না; পুরাতন নীতিরও পরিবর্ত্তন করেন না। অতএব অপক্ষপাত বিচার করিলে, এ বিষয়ে তাঁহাকে "বেকসুর" খালাসই দিতে হয়। তিনি তফাৎ হইলে অবশিষ্ট থাকে বৃটিশ পার্লামেণ্ট ও আমাদের ব্যবস্থাপক সভা। সভা কি সত্য সত্যই পার্লামেণ্টকেও প্রত্যাখ্যান করিতে প্রস্তুত? স্যর গ্রিফিথ্ ও মিঃ প্লেফেয়ারের প্রস্তাবে তাহাই বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু, পার্লমেণ্টকে উল্লঙ্ঘন করার এ অভিলাষ বা আবদার এ দেশীয় লোকেরা কখনই অনুমোদন করিতে পারে না। শাসনশক্তির শত শত তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ বিদ্ধ হইয়া তাহাদের আর্ত্তনাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল বৃটিশ পার্লামেণ্ট ও বৃটিশ প্রজা। অতএব শাসকই হউন আর ব্যবস্থাপকই হউন, পার্লামেণ্টের প্রভাব হইতে পৃথক হইয়া, ভারতশাসন ও ভারতীয় বিধি ব্যবস্থা প্রস্তুত করুন, এরূপ প্রস্তাবে এদেশীয়েরা কিছুতেই সায় দিতে পারে না। এ সম্বন্ধে মিঃ মেহতা ব্যবস্থাপক সভায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এদেশীয় সমীচীন ব্যক্তি মাত্রের মত। হইতে পারে, অনেক সময়ে পার্লামেণ্ট হইতে অবিচার ও এ দেশীয় ব্যবস্থাপক সভা ও ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকটে সুবিচারের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু তাহা সত্বেও পার্লা-মেণ্টের উপর, শেষ বিচারের জন্য, নির্ভর করা ভিন্ন উপায় নাই। পালিয়ামেণ্টীয় শাসন ও এঙ্গলোইণ্ডিয়ানের শাসন দুয়ের কোনও-টাই অবশ্য সম্যকরূপে নিরাপদ নহে; কেননা সময়ে সময়ে প্রবল স্বার্থ সংঘাতে সমূহ অমঙ্গলেরই সম্ভাবনা; পক্ষান্তরে এদেশীয়দিগের নিজের শাসনও এখন আকাশকুসুম অপেক্ষাও অসম্ভব; এরূপ স্থলে এঙ্গলোইণ্ডিয়ানের শাসন অপেক্ষা পার্লিমেণ্টের শাসনই আমাদের পক্ষে শ্রেয়; যেহেতু পার্লিমেণ্টের ও বৃটিশ প্রজা সাধা-রণের ন্যায়পরতা ও মহত্ব সাধারণতঃ অধিকতর বিশ্বসনীয়।

পুলিস্‌রেগুলেশন বিল।

এই বিলটি ১৮৬১ সালের ৫ আইন সংশোধনের পাণ্ডুলিপি। ইহার ১৫ ধারার লিখিত বিষয়টী সংশোধন সম্বন্ধেই সমস্যা। ঐ ধারার পূর্ব্ব মর্ম্মানুসারে নিয়ম ছিল এই যে, কোনও স্থানে বাদ বিসম্বাদ বা যে কোনও কারণেই হউক দাঙ্গা হাঙ্গাম হইয়া শান্তিভঙ্গ হইলে বা শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকিলে, তথাকার শান্তি রক্ষার্থে অতিরিক্ত পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত হইত এবং তাহার নির্ব্বাহার্থে স্থানীয় অধিবাসীদিগের উপর একটী কর সংস্থাপিত হইত। কর সংস্থাপিত হইত দোষী ও নির্দোষী নির্বিশেষে; দাঙ্গায় সংশ্লিষ্ট থাকুক বা না থাকুক স্থানীয় লোক মাত্রই সে কর দিতে আইনানুসারে বাধ্য হইত। কিন্তু, এরূপ আইন স্পষ্টতঃ অন্যায়। ইহা কখনই ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারে না যে দোষীর সহিত নির্দ্দোষীও শাস্তি পাইবে।

নির্দ্দোষীর শাস্তি নিবারণ উপরোক্ত সংশোধনের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সাধনের উপায় উদ্ভাবন করা দুষ্কর। গবর্ণমেণ্ট যে উপায় অবলম্বন করিতে চাহেন তাহাতে দোষী ও নির্দোষী নির্ব্বাচনের ভার জিলার মাজিষ্টর ও জজদিগের উপর বিন্যস্ত হয়। জজ বা মাজিষ্টর ইহাদের যিনিই হউন স্থানীয় অবস্থা বুঝিয়া দোষী ও নির্দ্দোষী নির্ব্বাচনে ক্ষমবান হইবেন। সে ক্ষমতা পরিচালন করার দ্বারা দোষী ও নির্দোষী নিরাকরণ কল্পে, দস্তুরমত বিচার প্রণালী অবলম্বন করিয়া সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ ও উকিল মোক্তারের সোয়াল জবাব গ্রহণান্তে, রায় লিখিত হইবে না;—জজ বা মাজিষ্টর স্থানীয় অবস্থানুসারে যাহা স্থির করিবেন তাহাই হইবে। দস্তুরমত দেওয়ানী বিচার যখন হইবে না, তখন অবশ্য তাহার দেওয়ানী

আপিলও চলিবে না। তবে বিভাগীয় কমিসনরের উহাতে হাত থাকিবে।

গবর্ণমেণ্ট পক্ষের যুক্তি এই যে এরূপ স্থলে দস্তুরমত দেওয়ানী বিচার দ্বারা দোষী নির্দ্দোষী নিদ্ধারণ করা সুকঠিন; অথচ নির্দ্দোষীরও রক্ষা পাওয়া উচিত। শান্তি রক্ষা করিতে গবর্ণমেণ্ট স্বতঃ বাধ্য। শান্তিরক্ষার্থে, শান্তিভঙ্গের দণ্ডের জন্য দেওয়ানী বিচার সম্ভবে না। অতএব শাসন ও শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নির্দ্দোষীদিগকে অব্যাহতি দিবার জন্য জিলার জজ ও মাজিষ্টরদিগকে যে অধিকার দেওয়া হইতেছে ইহাই প্রচুর। পূর্ব্বে দোষী ও নির্দ্দোষী দেশসুদ্ধ লোকেরই দণ্ড হইত, এখন অন্ততঃ কতক লোকওত রক্ষা পাইবে। নির্দ্দোষী মাত্রই পরিত্রাণ না পাউক তাহাদের কতকও ত পাইবে। সংশোধিত আইন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও উহা মন্দের ভাল। বিশেষতঃ এ আইন দণ্ড দিবার জন্য নয়, দাঙ্গা নিবারণই ইহার উদ্দেশ্য। গবর্ণমেণ্টের যুক্তি এই।

অপর পক্ষের কথা এই, যে, শান্তিভঙ্গের আশঙ্কাস্থলে যখন দোষী নির্দ্দোষী সকলেরই উপর পুলিসের ব্যয়ভার স্থাপন করা হয় তখন বস্তুতঃ কাহাকেও বিশেষ করিয়া দোষী করা হয় না। ইহাতে কেবল স্থানীয় লোকের পরে শান্তির ট্যাক্স বসান হয় মাত্র। পরন্তু নূতন নিয়মে ব্যক্তিবিশেষদের প্রতি বিনা বিচারে অপরাধের কলঙ্ক এবং দণ্ড আরোপ করিবার ক্ষমতা কর্ত্তৃপুরুষদের থাকিবে অথচ সে কলঙ্ক ক্ষালন করিবার কোন উপায় দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে দেওয়া হইবে না। বিচার হইবে না অথচ দোষী সাব্যস্ত হইবে।

যদি এ কথা বলা যায় যে, আইনমতে বিচার করিতে গেলে অনেক সময় প্রকৃত দোষী ধরা পড়ে না, অতএব কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে সকল সময়েই আইনের দ্বারা বাধ্য করা কর্ত্তব্য নহে, তবে

জিজ্ঞাস্য এই, শাসনপ্রণালীর মধ্যে এই ছিদ্রকে একবার স্থান দিলে কোথায় ইহার সীমা নির্ণয় হইবে? বিচারকেরা যে মনুষ্য-স্বভাবের দুর্ব্বলতাবশতঃ পক্ষপাত করিতে পারেন সে সকল কথা আমরা দূরে রাখিতেছি—স্থূল কথা এই যে, আবশ্যক বুঝিয়া ট্যাক্স বসাইতে গবর্মেণ্টের অধিকার আছে; কিন্তু বিনা বিচারে দোষী করিতে এবং কোন ব্যক্তিকে আপন দোষক্ষালনের অধিকার না দিতে গবর্মেণ্টের ন্যায্য অধিকার নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট যদি স্থানীয় অভিজ্ঞতাবশতঃ সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকেন তবে শান্তিভঙ্গের আয়োজন জন্য চেষ্টা কেন অন্য অপরাধেরও আন্দাজমত খেয়ালমত বিচারের ভার তাঁহার উপর দেওয়া উচিত।

ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি।

জর্ম্মান্ অধ্যাপক ওল্‌ডেন্‌বার্গ্ বুদ্ধের যে জীবনচরিত লিখিয়াছেন, তাহা ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে এবং সেই সূত্রে তাঁহার বাঙ্গালী পাঠকদিগের নিকট পরিচিত হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি জর্ম্মন ভাষায় বেদের ধর্ম্ম নামক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহার অনুবাদের প্রতীক্ষা করিয়া আছি।

মনিষ্ট্ নামক অ্যামেরিকান্ পত্রিকায় সমালোচনাস্থলে এই গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, নিম্নে তাহা সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

আধুনিক হিন্দুগণ আপনাদের শান্তিপ্রিয় নির্দ্বন্দ্ব প্রকৃতিকে শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ বলিয়া গর্ব্ব করে, কিন্তু অধ্যাপক বলেন ইহা তাহাদের দুর্ব্বলতার লক্ষণ। যে সকল মহা দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে য়ুরোপীয় জাতি বলিষ্ঠ পৌরুষ লাভ করিয়াছেন,—ইরাণীদের সহিত বিচ্ছেদের পর ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া অবধি ভারতবাসী আর্য্যগণ সেই সকল প্রবল দ্বন্দ্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্রমশই শিথিলবল হইয়াছেন।

এই ফলশস্যশালী নূতন নিবাসের নিস্তব্ধতার মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ আদিম অসভ্য জাতির সহিত একত্র অবস্থান করিয়া তাঁহাদের হিন্দুত্ব ক্রমশই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। একে ত শীত দেশ হইতে আসিয়া এখানকার আবহাওয়ায় তাঁহাদের অনেকটা নিস্তেজ করিয়াছিল, তাহার পরে অসমকক্ষ অসভ্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত সহজ সংগ্রামে জয় লাভ পূর্ব্বক উর্ব্বরা বসুন্ধরা নির্বাধে ভোগ করিয়া তাঁহাদের চরিত্রে পুরুষোচিত কাঠিন্যের অভাব জন্মিতে লাগিল। তাঁহাদের জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চ্চার মধ্যে সেই কঠিন প্রয়াসের সুকঠোর সংঘাত ছিল না, যদ্দ্বারা বাস্তব জগতের গভীরতা ভেদ করিয়া সফলকাম হইয়া চিন্তারাজ্যের ভূমানন্দলোকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। অতি অনায়াসেই তাঁহারা বস্তুজগতের উপরিতলে সত্যের সহিত কল্পনা, সুন্দরের সহিত অদ্ভুত, বিবিধ নবতর আকারে জড়িত মিশ্রিত করিয়া বিচিত্র চিত্রজাল রচনা করিয়াছিলেন।

ওল্‌ডেন্‌বর্গের মত উদ্ধৃত করিয়া সমালোচক তাঁহার হিন্দু বন্ধুবর্গকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়াছেন উপরিউক্ত কথাগুলি চিন্তা করিয়া নিজেদের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করিয়া দেখিলে আত্মোন্নতি সাধনের যথার্থ উপায় নির্ণয় হইতে পারে। তিনি বলেন, যে সকল প্রাকৃতিক অবস্থাবশতঃ হিন্দুরা অবসর এবং স্বচ্ছলতা লাভ করিয়াছিলেন সেই সকল অবস্থাগতিকেই তাঁহাদের অনুষ্ঠান এবং চিন্তাপ্রণালী এমন কৃত্রিমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের বুদ্ধি স্বেচ্ছাচারিণী কল্পনাকে সঙ্গে লইয়া বড় বড় রহস্যময় প্রহেলিকার সহিত স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিতে ভালবাসিয়াছে—একদিকে তাঁহারা ধর্ম্ম এবং দর্শনের উচ্চতম শ্রেষ্ঠতম ভাবের মঞ্জরী বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন, অপরদিকে তাঁহাদের থিওরিগুলি বাস্তবতথ্যের সহিত একেবারে অসম্বদ্ধ রহিয়া গিয়াছে। যদি ইহা সত্য হয়,

যে, ভারতবর্ষের উন্নতি এক সময় মাঝখানে আসিয়া অবরুদ্ধ হইয়াছে, এবং তরুণতর পাশ্চাত্য সভ্যতা, বলে বুদ্ধিতে বিজ্ঞানে তাহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তবে, দৈবাগত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে তাহার কারণ অন্বেষণ করিতে গেলে ভ্রমে পতিত হইতে হইবে; তাহার প্রকৃত কারণ, বিচারের, বিশেষতঃ আত্মবিচারের অভাব (lack of criticsm, and especialy of self criticism)। পাশ্চাত্যজাতির মধ্যে এই বিচার এবং আত্মবিচারের প্রবৃত্তি নানা উৎপাৎ, প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের দ্বারা সঞ্জাত হইয়াছে। হিন্দুদিগকে সর্ব্বদা এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উন্নতি অর্থে দ্বন্দ্ব;—তাঁহাদিগকে বলিষ্ঠ এবং কার্য্যতৎপর হইতে হইবে, বাস্তব সত্যের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে তাঁহাদিগকে শক্ত হইয়া উঠিতে হইবে। ভারতবর্ষের নিকট, তাহার প্রাচীন আচার্য্যদের নিকট, পাশ্চাত্য জাতি অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছে এক্ষণে পাশ্চাত্যজাতির নিকট ভারতবর্ষের শিক্ষা লাভ করিবার সময় আসিয়াছে; কি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিবার সময় আসিয়াছে; কি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত থাকিতে পারে না;—তাহা আর কিছু নহে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কঠিন যাথাযথ্য (exactness)। এই শিক্ষা করিতে হইবে যে, পরীক্ষাসিদ্ধ অভিজ্ঞতাই সত্যের চরম মানদণ্ড, ধ্যানলব্ধ কল্পনা নহে। (The ultimate criterion of Truth is not apriori speculation, but experience; not subjective thought, but objective reality.)

সমালোচক মহাশয়ের উপদেশে অনেক কথা আছে যাহাতে আমাদের দম্ভে আঘাত লাগিতে পারে, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে ক্রমাগত আত্মশ্লাঘাদ্বারা নিশ্চেষ্ট অহঙ্কারে পরিস্ফীত হইয়া

ওঠাকে মহত্ত্বলাভ বলে না। যে সকল কঠিন আঘাতে আমাদিগকে যথার্থ পৌরুষ দান করে, যাহা অপর্য্যাপ্ত অতি মিষ্ট তরল স্তুতিরসে অহরহ আমাদের আকণ্ঠ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে তাহা আমাদিগকে সাংঘাতিক অন্ধস্নেহে নিরুদ্যম জড়ত্বের দিকে, সর্ব্বপ্রকার শৈথিল্যের দিকে কোমল আলিঙ্গনপাশে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে; তাহার মায়া ছেদন করিতে না পারিলে আমাদের নিস্তার নাই।

ধর্ম্মপ্রচার।

হিন্দু কখনও ধর্ম্মপ্রচার করিতে বাহির হয় নাই। কিন্তু কালের গতিকে হিন্দুকেও বিদেশে স্বধর্ম্মের জয়ঘোষণা করিতে বাহির করিয়াছে। সম্প্রতি আটলাণ্টিক পার হইয়া হিন্দু আপন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিয়া আসিয়াছে এবং সেই নব ধরাতলবাসীগণ আমাদের প্রাচীন ধরাতলের পুরাতন কথা শুনিয়া পরিতৃপ্তি প্রকাশ করিয়াছে। ইহাতে উভয় জাতিরই গৌরবের কথা। পুরুষানুক্রমে এবং শৈশবকাল হইতেই যে সকল সংস্কারের মধ্যে বর্দ্ধিত হওয়া যায়, তাহার বাহিরের কথা, এমন কি, বিরোধী কথা, ধৈর্য্যের সহিত ও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা বড় কঠিন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা ত আপনাদিগকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উদার বলিয়াই জানি, কিন্তু সংস্কার-বিরোধী কথা আমরা তিলার্দ্ধ পরিমাণও সহ্য করিতে পারি না। অ্যামেরিকা যেরূপ অনুরাগসহকারে বিদেশীর মুখ হইতে হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছে তাহাতে এই প্রমাণ হয়, যে, তাহাদের জাতীয় প্রকৃতির মধ্যে সেই জীবনীশক্তি আছে যাহার প্রধান লক্ষণ, দান করিবার শক্তি এবং গ্রহণ করিবার শক্তি।

যাহা হউক্, আমরা যে আমাদের ধর্ম্মের সত্য প্রচার করিবার জন্য পল্লী ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি ইহা আমাদের নবজীবনের লক্ষণ। এই উপলক্ষ্যে নানা মতের সহিত রীতিমত সংঘর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, সকল বিরোধের সহিত যুদ্ধ করিয়া, সকল আপত্তি খণ্ডন পূর্ব্বক যখন নিজের ধর্ম্মকে সকলের ধর্ম্ম করিয়া তুলিতে পারিব, তখনই প্রকৃত উদারতা লাভ করিব; এখন আমরা যাহাকে উদারতা বলিয়া থাকি, তাহা ঔদাসীন্ত, তাহা সকল অনুদারতার অধম।

সম্প্রতি নুইয়র্ক নগরের নাইণ্টীন্থ সেঞ্চুরি ক্লাবে বিশপ্ থোবর্ণ্ এবং বীরচাঁদ গন্ধী নামক বোম্বাইবাসী জৈনধর্ম্মাবলম্বী ব্যারিষ্টারের মধ্যে "ভারতবর্ষে ক্রিশ্চান্ মিশন্" সম্বন্ধে তর্ক হয়;—ডাক্তর পল্ কেরস্ মধ্যস্থ থাকেন। থোবর্ণ্, মিশনের হিতকারীতা, এবং বীরচাঁদ, তাহার অনুপযোগিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। মধ্যস্থ কেরস্ সাহেব যাহা বলেন তাহার মধ্যে আমাদের প্রণিধান যোগ্য অনেক কথা আছে।

তিনি বলেন, যথার্থ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে প্রচার কার্য্য অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করি সে ধর্ম্ম প্রচার করিতে বিরত হওয়াকে অপক্ষপাত বলে না, তাহাতে ঔদাসীন্ত, এবং প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব প্রকাশ পায়।

আধ্যাত্মিক বিষয়েও প্রতিযোগিতার আবশ্যক, কারণ, প্রতিযোগিতা উন্নতির প্রধান সহায়। ভিন্ন ভিন্ন মতের সংঘর্ষ উপস্থিত না হইলে কখনই সত্যের বিশুদ্ধতা ও উজ্জ্বলতা রক্ষিত হয় না। তিনি বলেন, অখৃষ্টানদের নিকট ধর্ম্মপ্রচার করিতে গিয়া খৃষ্টধর্ম্ম আপন সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া উত্তরোত্তর প্রশস্ত হইয়া উঠে। অনেক সময় পরধর্ম্মের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে গিয়া নিজধর্ম্মের ছিদ্র বাহির হইয়া পড়ে। তাহার একটি উদা-

হরণ দেখাইয়াছেন। স্পেন্স্‌ হার্ডি নামক মিশনারির নাম অনেকে অবগত আছেন। তিনি বুদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক রচনা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের একস্থলে আছে, বুদ্ধ নিজের ও অন্যের পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে যে সকল তথ্য বলিয়াছেন তাহা প্রতারণা মাত্র। কারণ, বুদ্ধ বস্তুতই যদি অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে বিজ্ঞানে যে সকল লুপ্তবংশ প্রাচীন জীবজন্তুর বিবরণ আছে, বুদ্ধের পূর্ব্বজন্মের ইতিহাসে তাহাদের উল্লেখ থাকিত। পৃথিবীকে গোল না বলিয়া সমতল বলাতে বৌদ্ধ সাধুগণকে হার্ডি সাহেব নিন্দা করিয়াছেন। এবং বুদ্ধ যে সকল অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে সেগুলি হার্ডিসাহেবের মতে এত অবিশ্বাস্য, যে, তাহা গম্ভীর ভাবে প্রতি-বাদের যোগ্যই নহে।

কেরস্‌ সাহেব বলেন,হার্ডি সাহেবের এই সকল নিন্দাবাদ শুনিবা মাত্র মনে উদয় হয় যে, খৃষ্টের প্রতিও এ সকল কথার প্রয়োগ হইতে পারে। খৃষ্ট বলেন তিনি এব্রাহামের পূর্ব্বেও ছিলেন অথচ ম্যামথ্‌ কিম্বা টেরোড্যাক্টিল্‌ জন্তুর কোনরূপ উল্লেখ করেন নাই। জলের উপর দিয়া বুদ্ধের গমন যদি অসম্ভব হয় তবে খৃষ্টের গমনই বা কেন সম্ভব হইবে? পৃথিবীর সমতলতা সম্বন্ধে হার্ডিসাহেবের মৌন থাকাই শ্রেয় ছিল, কারণ খৃষ্টানদের হাতে গ্যালিলিয়োর কিরূপ লাঞ্ছনা হইয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছে।

অতঃপর কেরস্‌ সাহেব বলিতেছেন, কিছুকাল হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম পাশ্চাত্য মনের প্রতি আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এধর্ম্মকে য়ুরোপে কে আনয়ন করিল? স্পেন্স হার্ডি প্রভৃতি মিশনারিগণ। তাহারা বৌদ্ধধর্ম্মের দেশে বৌদ্ধধর্ম্মকে বিনাশ করিতে গিয়া খৃষ্টধর্ম্মের দেশে বৌদ্ধধর্ম্মকে আনিয়া উপস্থিত

করিয়াছে এবং যদিচ বৌদ্ধপ্রচারক পাশ্চাত্য দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে যায় নাই তথাপি খৃষ্টান প্রচারক সেই অভাব পূরণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সাহায্যে খৃষ্টধর্ম্মকে প্রশস্ত করিয়া তুলিতেছে।

কেরস্ সাহেবের এই সকল উক্তির মধ্যে আমাদের গর্ব্বানুভব করিবার উপযোগী যে অংশ আছে তাহা আমাদের কাহারও চক্ষু এড়াইবে না, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। ভারতবর্ষের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া খৃষ্টানগণ নিজধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতেছেন ইহা শুনিবামাত্র আমাদের ক্ষুদ্রবক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিবে, কিন্তু কেরস্ সাহেবের উক্তির মধ্যে আমাদের শিক্ষা করিবার যে বিষয় আছে তাহা সম্ভবতঃ আমাদের নিকট সমাদর প্রাপ্ত হইবে না। প্রকৃত কথা এই যে, হিন্দুগণ ঘরে বসিয়া আপনাদের ধর্ম্ম এবং আপনাদের প্রকৃতিকে যত উদার বলিয়া মনে করে তাহা তাঁহাদের কল্পনামাত্র হইতে পারে। যতক্ষণ না প্রকৃত জগৎ রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন ততক্ষণ তাঁহারা যাহাকে সত্য বলিয়া মনে করিতেছেন তাহা প্রকৃত সত্য কি, তাঁহাদের সংস্কার মাত্র তাহার প্রমাণ হইবে না। মিথ্যার সহিত যখন হাতে হাতে সংগ্রাম বাধে তখনই সত্যের প্রভাব প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। আমরা নিজে জানি না আমাদের ধর্ম্ম কতখানি সত্য; কারণ, সে সত্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, সে সত্যকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আমরা মিথ্যার বিরুদ্ধে অগ্রসর হই না; আমরা আপন ধর্ম্মকে আচ্ছাদন করিয়া রাখি; আমরা বলি হিন্দুর ধর্ম্ম কেবল হিন্দুরই; অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যে সত্য আছে সে সত্য অন্যত্র সত্য নহে; অতএব সকল ক্ষেত্রেই তাহাকে উপস্থিত করিয়া তাহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই; কেবল হিন্দুর বিশ্বাসের উপরেই তাহাকে স্থাপিত করিয়া রাখিতে হইবে।

হিন্দুমতে স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ; বৈজ্ঞানিকেরাও বলেন, স্বগোত্রে বিবাহ প্রচলিত হইলে বংশানুক্রমে নানা রোগ, পঙ্গুতা, এবং মানসিক বিকার বদ্ধমূল হইয়া যায়। ধর্ম্মমত সম্বন্ধেও একথা খাটে। যে ধর্ম্ম বহুকাল অবধি অন্য ধর্ম্মের সহিত সমস্ত সংস্পর্শ সযত্নে পরিহার করিয়া কেবল নিজের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ হইয়া উপ-ধর্ম্ম সৃজন দ্বারা বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে, তাহার বংশে উত্তরোত্তর নানাজাতীয় বিকার ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া উঠে। মুসলমানধর্ম্মের সংশ্রববশতঃ ভারতবর্ষের নানাস্থানে হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে অনেক বিপ্লবের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল; এবং আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যেও মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাব কতটা আছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য। বঙ্কিম যদিচ পাশ্চাত্যদের প্রতি বহুল অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন তথাপি তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র যিনি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিবেন তিনি দেখিতে পাইবেন খৃষ্টধর্ম্মের সাহায্য ব্যতীত এ গ্রন্থ কদাচ রচিত হইতে পারিত না। অনেকের নিকট তাহা কৃষ্ণচরিত্রের অগৌরবের বিষয় বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। আমরা বলি ইহা তাহার প্রধান গৌরব। বঙ্কিম খৃষ্টধর্ম্মের আলোকে হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মনিহিত সত্যকে উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের কৃত্রিম সঙ্কীর্ণতা ছেদন করিয়াছেন এবং সেই উপায়েই ইহার যথার্থ মাহাত্ম্যকে বাধামুক্ত করিয়া সর্ব্বদেশকালের উপযোগী করিয়া অস-ঙ্কোচে সগর্ব্বে জগতের সমক্ষে প্রকাশিত করিয়াছেন। বিশুদ্ধ সত্যের উপর কদাচ জাতিবিশেষের শিলমোহরের ছাপ পড়ে না— যেখানে ছাপ পড়ে নিশ্চয় সেখানে খাদ আছে।

গ্রন্থ সমালোচনা।

দেওয়ান গোবিন্দরাম বা দুর্গোৎসব। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থখানি একটি রীতিমত উপন্যাস। লেখক আয়োজনের ক্রটি করেন নাই। ইহাতে ভীষণ অন্ধকার রাত্রি, ঘন অরণ্য, দস্যু, পাতালপুরী, ছদ্মবেশিনী সাধ্বীস্ত্রী, কপটাচারী পাষণ্ড এবং সর্ব্ব বিপৎলঙ্ঘনকারী ভাগ্যবান্ সাহসী সাধু পুরুষ প্রভৃতি পাঠক ভুলাইবার বিচিত্র উপকরণ আছে। গ্রন্থখানির উদ্দেশ্যও সাধু; ইহাতে অনেক সদুপদেশ আছে এবং গ্রন্থের পরিণামে পাপের পতন ও পুণ্যের জয় প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এ কথা একবারও ভুলিতে পারি নাই, যে, গ্রন্থকার পাঠককে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। দেওয়ানজি হইতে উজ্জলা পর্য্যন্ত কেহই সত্যকার সজীব মানুষের মত হয় নাই, তাহারা যে সকল কথা কয় তাহার মধ্যে সর্ব্বদাই লেখকের প্রম্প্‌টিং শুনা যায় এবং ঘটনাগুলির মধ্যে যদিও সম্বরতা আছে কিন্তু অবশ্যসম্ভাব্যতা নাই। এইখানে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখা আবশ্যক, যে, উপন্যাসের সম্ভব অসম্ভব সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রকার বাঁধা মত নাই। লেখক আমাদের বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলেই হইল, তা ঘটনা যতই অসম্ভব হউক্। অনেক রচনায় সুসম্ভব জিনিষও নিজেকে সপ্রমাণ করিয়া উঠিতে পারে না, আবার, অনেক রচনায় অসম্ভব ব্যাপারও চিরসত্যরূপে স্থায়ী হইয়া সায়। "মণ্টেক্রিষ্টো" উপন্যাসবর্ণিত ঘটনা প্রাকৃত জগতে সম্ভবপর নহে কিন্তু "ড্যুমা"র প্রতিভা তাহাকে সাহিত্যজগতে সত্য করিয়া রাখিয়াছে। কপালকুণ্ডলাকে বঙ্কিমের

কল্পনা সত্য করিয়া তুলিয়াছে কিন্তু হয় ত নিকৃষ্ট লেখকের হাতে এই গ্রন্থ নিতান্ত অবিশ্বাস্য হাস্যকর হইয়া উঠিতে পারিত।

গ্রন্থখানি পড়িয়া বোধ হইল, যে, যদিচ ঘটনা সংস্থান এবং চরিত্র রচনায় গ্রন্থকার কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই তথাপি গ্রন্থবর্ণিত কালের একটা সাময়িক অবস্থা কতক পরিমাণে মনের মধ্যে জাগ্রত করিতে পারিয়াছেন। তখনকার সেই খাল বিল মাঠের ভিতরকার ডাকাতী, এবং দস্যুবৃত্তিতে সম্ভ্রান্ত লোকদিগের গোপন সহায়তা প্রভৃতি অনেক বিষয় বেশ সত্যভাবে অঙ্কিত হইয়াছে; মনে হয় লেখক এ সকল বিষয়ে অনেক বিবরণ ভাল করিয়া জানেন; কোমর বাঁধিয়া আগাগোড়া বানাইতে বসেন নাই।

মনোরমা। শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত।

গ্রন্থখানি দুই ফর্ম্মায় সমাপ্ত একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস। আরম্ভ হইয়াছে "রাত্রি দ্বিপ্রহর। চারিদিক নিস্তব্ধ। প্রকৃতিদেবী অন্ধকার সাজে সজ্জিত হইয়া গম্ভীরভাবে অধিষ্ঠিতা।" শেষ হইয়াছে "হায়! সামান্য ভুলের জন্য কি'না সংঘটিত হইতে পারে!" ইহা হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিঁবেন, গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র, ভুলটিও সামান্য কিন্তু ব্যাপারটি খুব গুরুতর।

কৌতুকপ্রিয় সমালোচক হইলে বলিতেন, "গ্রন্থখানির মধ্যে শেক্‌সপিয়ার হইতে উদ্ধৃত কোটেশন্‌গুলি অতিশয় সুপাঠ্য হইয়াছে" এবং অবশিষ্ট অংশসম্বন্ধে নীরব থাকিতেন। কিন্তু গ্রন্থ সমালোচনায় সকল সময়ে কৌতুক করিবার প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, এই কঠিন পৃথিবীতে যখন আর কিছু দিবার সাধ্য থাকে না তখন দুটো মিষ্ট কথা দিবার ক্ষমতা এবং অধিকার সকলেরই আছে, নাই কেবল সমালোচকের। একে ত যে গ্রন্থখানি সমালোচনা করিতে বসে তাহার মূল্যও তাহাকে দিতে হয় না, তাহার

উপরে সুলভ প্রিয়বাক্য দান করিবার অধিকার তাহাও বিধাতা তাহাকে সম্পূর্ণভাবে দেন নাই। এই জন্য, যখন কোন গ্রন্থের প্রতি প্রশংসাবাদ প্রয়োগ করিতে পারি না তখন আমরা আন্তরিক ব্যথা অনুভব করি। নিজের রচনাকে প্রশংসাযোগ্য মনে করা লেখকমাত্রেরই পক্ষে এত সাধারণ ও স্বাভাবিক, যে, সেই ভ্রমের প্রতি কঠোরতা প্রকাশ করিতে কোন লেখকের প্রবৃত্তি হওয়া উচিত হয় না। কিন্তু গ্রন্থকার যথার্থই বলিয়াছেন—হায়! সামান্য ভ্রমের জন্য কি না সংঘটিত হয়! অর্থব্যয়ও হয়, মনস্তাপও ঘটে।

সাধনা।

মুক্তির পথ।

মনুষ্যজাতির আদি পিতা ও আদি মাতা জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়া ধরাতলে পাপ দুঃখ ও মৃত্যু আনয়ন করেন, এইরূপ একটা কিংবদন্তী বহুদিন হইতে স্থলবিশেষে প্রচলিত আছে।

এই কিংবদন্তীর ভিতর হইতে একটা গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বাহির করিতে পারা যায়। জ্ঞান হইতে পাপের ও দুঃখের উৎপত্তি, অজ্ঞান অবস্থায় পাপ নাই, দুঃখ নাই, এই কথাটা জগতের অন্যতম বিভীষিকাময় সত্য।

স্থলান্তরে আবার ইহা হইতে বিসদৃশ আর একটা তত্ত্ব-কথা প্রচলিত আছে। জ্ঞান হইতে দুঃখের উৎপত্তি যেমন একটা প্রচলিত ধর্ম্মতত্ত্বের ভিত্তি, জ্ঞানের পূর্ণতায় দুঃখের বিনাশ সেইরূপ আর একটা ধর্ম্মতত্ত্বের মূল।

কোন্ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য এখানে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার প্রয়োজন নাই। উভয়েরই মূলেই কতকটা সত্য নিহিত আছে স্বীকার না করিলে চলে না।

তবে মানবজাতির অন্তর্গত দুইটা বড় বড় সম্প্রদায়কে এই দুই বাক্যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন সুখপন্থায় লইয়া গিয়াছে, ইহা একটা প্রকাণ্ড ঐতিহাসিক সত্য।

জ্ঞান হইতে দুঃখের উৎপত্তি হইয়াছে; অতএব যোগেযাগে

ধরাতল হইতে জ্ঞানের অন্তর্দ্ধান সাধন করিতে পারিলেই বোধ করি দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করা যাইতে পারে। অন্ততঃ ন্যায়-শাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট প্রচলিত যুক্তির বলে এইরূপ সিদ্ধান্ত আসিয়া দাঁড়ায়। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভোজন করিয়া একবার তাহার রসাস্বাদন ঘটিয়া গেলে, রসনাকে পুনরায় সেই রসান্বেষণে নিবৃত্ত করা একরূপ অসাধ্য হইয়া উঠে। অতএব সেরূপ চেষ্টায় সহসা কোন ফল পাওয়া যায় না। পরন্তু সমগ্র ফার্মাকোপিয়া অনুসন্ধান করিলে এমন কোন বমনকারক ভেষজের ব্যবস্থা দেখা যায় না, যাহার সাহায্যে মনুষ্যজাতির জঠর হইতে এই বিষময় খাদ্যকে একেবারে বাহির করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তথাপি যখন দুঃখনিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ এবং সেই পরম-পুরুষার্থ সাধনের উপায় বিধানই মানবজাতির হিতৈষী শিক্ষক-সম্প্রদায় ও গুরুমণ্ডলীর জীবনের একমাত্র ব্রত; তখন এই বিষ-পদার্থের বিরেচন বা উদ্গীরণের কোন সদুপায় বর্ত্তমান না থাকিলেও তাহার কুফল নিবারণের জন্য কোনরূপ প্রতিষেধক আণ্টিডোটের ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত না হইলে বড়ই বিস্ময়ের বিষয় হইত। বলা বাহুল্য মানবজাতির পরম হিতচিকীর্ষুগণের আবিষ্কৃত জ্ঞানতরুর বিষময় ফলের বিষত্ব-প্রতিষেধক ঔষধের ইংরাজি নাম faith, বাঙ্গালায় বুঝি ভক্তি।

ইংরাজি শব্দটার বাঙ্গালা তর্জ্জমায় ভক্তি শব্দ নিয়োগ করিতে গেলে একটু সাবধান হওয়া আবশ্যক। ইংরাজিতে আর একটি শব্দ আছে যাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবব্যঞ্জক, এই শব্দটি reverence। আমাদের দীনা বঙ্গভাষায় দুর্ভাগ্যক্রমে উভয় শব্দের পরিবর্ত্তেই ভক্তি শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ভাস্বর মহিমার সম্মুখে আপনার ক্ষুদ্রতা লইয়া দণ্ডায়মান

হইলে, আনন্দ ও ভয় এই উভয়কে স্পর্শমাত্র করিয়া যে একটা মনোভাব উপস্থিত হয়, এবং যাহা সেই ক্ষুদ্রতাকে মহিমা হইতে দূরে লইয়া গিয়া স্বস্থানে অবস্থিত রাখে, অথচ সেই মহিমাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহার আকর্ষণে আকৃষ্ট ও তাহার দীপ্তিতে প্রদীপ্ত থাকিতে চায়, সেই মনোভাবকে ভক্তি বলা যায়; ইহারই ইংরাজি নাম reverence। মনুষ্যের মধ্যে যখন এই সামগ্রীর একান্ত অভাব হয়, তখন ধরাখানা সরার মত হইয়া যায়, হিমাচল সমতলে পরিণত হয় ও চন্দ্র সূর্য্য দীপ্তিহীন নিষ্প্রভ হইয়া প্রকৃতির কান্তি মলিন হইয়া আসে। প্রার্থনা, মনুষ্যের ও প্রকৃতির সেই শোচনীয় অবস্থা ইতিহাসে বিলম্বিত হউক।

আর একটা অর্থে ভক্তি শব্দ কখন কখন ব্যবহৃত হয়, তাহারই ইংরাজি নাম faith। বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রয়োগের উদাহরণ কোন কোন স্থানে পাওয়া যায়। একটা উদাহরণ অনেকের মুখস্থ থাকিবে; —ভক্তিতে পাইবে—তর্কে বহুদূর; অর্থাৎ কি না এমন কোন সামগ্রী বিশ্বজগতে বর্ত্তমান আছে বলিয়া তোমাকে বিশ্বাস করিতেই হইবে, মানবের সমগ্র বুদ্ধিবৃত্তি সমবেত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে যাহার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান করিতেছে। যে একমাত্র ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া মনুষ্য আপনার মর্য্যাদা ও মহত্ত্ব ও অস্তিত্ব অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিতেছে ও এতাবৎ পর্য্যন্ত করালখর্পরধরা প্রকৃতির নির্ম্মম কবল হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছে সেই ভিত্তিভূমির মূল উৎপাটনের জন্য মানবজাতিকে নির্লজ্জভাবে অসঙ্কোচে আহ্বান করিতে কুণ্ঠিত হয় না, এমন ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষ সংসারে বিরল নহে। মানবাত্মার প্রতি বিদ্রোহ সাধনে এই সকল ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের কিরূপ পুণ্য সঞ্চয় ঘটিতেছে তাহা ঠিক্ বলিতে পারি না; তবে সংসারের

বৰ্ত্তমান অবস্থায়, নিউটন তাঁহার কুক্কুরের প্রতি ঘটনাবিশেষে যে বাক্য প্রয়োগ করিয়া আপন মহামূল্য সম্পত্তির বিনাশজনিত মনঃক্ষোভ শান্ত করিয়াছিলেন, সেই বাক্যই অবজ্ঞার সহিত ও কৃপার সহিত ইহাদের প্রতি প্রয়োগ করিয়া নিরস্ত থাকিতে হয়।

এই সঙ্কীর্ণ সঙ্কুচিত ও হীন অর্থে ভক্তি শব্দের প্রয়োগ ভাষার মধ্যে থাকিতে পারে; কিন্তু আমরা সম্প্রতি উহার এইরূপ অপ-ব্যবহারে একান্ত কাতর। এবং ভক্তি শব্দ মহত্তর মনোবৃত্তির জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া আমরা এই আত্মদ্রোহী ও জাতিদ্রোহী বৃত্তির জন্য বিশ্বাস শব্দ ব্যবহার করিব।

প্রায় দুই হাজার বৎসর হইতে নরসমাজে এক সম্প্রদায় কোলা-হলরবে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করিয়া চীৎকার করিয়া আসিতেছেন, জ্ঞান হইতে দুঃখের উৎপত্তি। অতএব মুক্তি চাও ত জ্ঞানমার্গ পরিহার করিয়া বিশ্বাসের পন্থা অবলম্বন কর। যদি পরমপুরুষার্থ লাভে তোমার বাঞ্ছা থাকে, তবে বুদ্ধিবৃত্তিকে নিরোধ কর ও জ্ঞানের অন্বেষণে ফিরিও না, ব্যক্তিবিশেষে ও বাক্যবিশেষে বিশ্বাস স্থাপনা করিয়া পরমানন্দে কাল যাপন কর। মুক্তি তোমার হস্তে।

বস্তুতই মানবের মত হতভাগ্য জীব দুনিয়ার মধ্যে দুর্লভ। মনুষ্য ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল; এবং চিরন্তন নিয়মমতে যে ক্ষুদ্র সে দুর্ভাগা; যে দুর্ব্বল সে দীন। তাহার অক্ষমতার কারণে সে পরের নিকট কৃপাভিক্ষার জন্য চিরকাল লালায়িত ও তাহার অসহায় পরমুখ-প্রেক্ষিতার ফলে চিরকাল ধরিয়া বিড়ম্বিত ও প্রতারিত। সামান্য একটা কল মেরামতের প্রয়োজন হইলে আমরা উপযুক্ত মিস্ত্রী অথবা কারিগরের সন্ধান করি; কিন্তু মানবদেহ নামক উৎকট রহস্যপূর্ণ যন্ত্রটা কোন অজ্ঞাত কারণে সহসা বিকল হইয়া পড়িলে

যে কোন হাতুড়ে ডাক্তার আমাদের নিকট ধন্বন্তরি বলিয়া গৃহীত হয়। ঠিক্ এই কারণেই সৃষ্টির প্রথমদ্দিবস হইতে আজ পর্য্যন্ত মানবসন্তান প্রকৃতির হস্তে বিবিধ বিধানে লাঞ্ছিত হইয়া দুঃখ-যন্ত্রণায় ত্রাহিস্বরে ডাকিয়া আসিতেছে এবং যে কোন ব্যক্তি আপন মূর্খতা ও নির্ল্লজ্জতার উপর নির্ভর করিয়া আপনাকে এই সনাতন দুঃখব্যাধির একমাত্র অমোঘ ঔষধের একমাত্র আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া জাহির করিয়াছে, অন্ধ অসহায়ের মত তাহারই প্ররোচনায় ভ্রান্ত হইয়া তৎপ্রদত্ত কুপথ্য সেবন করিয়া পরিত্রাণের আশায় মুগ্ধ হইয়াছে।

অসভ্য জাতিবিশেষের মধ্যে তাহাদের সর্দ্দারের মৃত্যু হইলে তাহার শব সমাহিত করিবার সময় তাঁহার স্ত্রীপুত্র ভৃত্যাদি নিতান্ত অন্তরঙ্গগণকে বলিদান দিয়া প্রেতপুরুষের তৃপ্তির জন্য একত্র সমাধিদানের প্রথা প্রচলিত আছে, এবং এই প্রকার বিভীষিকা ও পৈশাচিকতা লইয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বক্তৃতার প্রথাও সভ্যতর সমাজে প্রচলিত আছে। কিন্তু সেই সকল সভ্যতর সমাজের মধ্যেও কল্পিত প্রেতমূর্ত্তির প্রসাদনের জন্য ডঙ্কা পিটাইয়া হর্ষোল্লোসের সহিত মানবাত্মার বলিদানের আয়োজন হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কোন্ প্রথা অধিকতর ভয়াবহ তাহা আলোচনার বিষয়।

জ্ঞান হইতে দুঃখের উৎপত্তি হইয়াছে স্বচ্ছন্দে স্বীকার করিতে পারি; কিন্তু সেই দুঃখবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য জ্ঞানের আ-লোক ত্যাগ করিয়া অজ্ঞানের অন্ধকারে প্রবেশ করিতে হইবে, এইরূপ আদেশ নতশিরে বহন করিতে সুস্থ ও মোহমুক্ত মানবাত্মা নিশ্চয়ই অসম্মত হইবে। বলা বাহুল্য এই অসম্মতিই মানবাত্মার স্বাস্থ্যের ও অবিমুগ্ধতার একমাত্র পরিচয়।

জ্ঞানবর্জ্জিত বিশ্বাসে মুক্তি হয়, সৌভাগ্যক্রমে সর্ব্বত্র সর্ব্বজাতির

মধ্যে এই বাক্য প্রতিধ্বনিত হয় নাই। জ্ঞানে যাহার উৎপত্তি জ্ঞানের পূর্ণবিকাশই তাহার ধ্বংসের একমাত্র উপায় এই মত অন্যত্র প্রচারিত হইয়াছে। বলিবার প্রয়োজন নাই কোথায় কোন্ সময়ে এই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল।

তবে জ্ঞানের পূর্ণতায় দুঃখের নিবৃত্তি প্রকৃতপক্ষে সম্ভব কি না আলোচ্য বিষয়। যতদূর দেখা যায় জ্ঞানের বিকারের সহিত দুঃখের আগ্রহ বাড়িয়া যায় বলিয়াই বোধ হয়। নানা ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা হইয়াছে।

এক সম্প্রদায় আছেন যাঁহারা পৃথিবীতে দুঃখের অস্তিত্ব একেবারে স্বীকার করিতে চাহেন না, তাঁহাদের সহিত কোন কথা কহা দুঃসাধ্য। মানব অনুভূতির তীব্রতম ও প্রধানতম বিষয়ই দুঃখ; ইহার অস্তিত্বে সন্দিহান হইলে নাচার। মনুষ্যবংশের অধিকাংশকেই ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া প্রায় পদে পদে যে প্রাণের প্রসারণবিরোধী, জীবনের শোণিতশোষী বাহ্যশক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইতে হয়, ইহা নিত্যঘটনা ও প্রত্যক্ষ ব্যাপার। সংগ্রামে একটু শিথিলপ্রযত্ন হইলেই জীবন রক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠে, এমন কি অটুট বিক্রমের সহিত যুদ্ধ চালাইলেও জীবনরক্ষা সকল সময়ে সাধ্য হয় না, ইহাও নিত্য প্রত্যক্ষ ঘটনা। ইহার দুঃখ নামকরণ করিতে না চাও সে স্বতন্ত্র কথা; ইহা আভিধানিক বিবাদের বিষয়; আমরা যাহাকে দুঃখ অভিধান দিতেছি, তাহার অভাবের প্রমাণ নহে।

তবে সাধারণতঃ এই দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় না এবং ইহার উৎপত্তির কারণ নানা ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

প্রাচীন জরথুস্ত্রপ্রবর্ত্তিত মতানুসারে বিশ্বজগতে দুই বিধাতা কার্য্য করিতেছে, একের কার্য্য পুণ্যবিধান, অপরের কার্য্য দুঃখ-

বিধান। শেষ পর্য্যন্ত বোধ করি পুণ্যবিধাতারই জয় এবং মনুষ্যের কর্ত্তব্য সেই পুণ্যবিধানে সাহায্যদান।

শেমিটিক সম্প্রদায়সকলেও এইরূপ দুই বিধাতার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সুখবিধাতার পরাক্রম দুঃখবিধাতার অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবেই অধিক, এমন কি তিনি ইচ্ছা করিলে সমুদয় দুঃখের বিলোপ সাধনেও বোধ করি সমর্থ। তবে তাঁহার আদেশে অবহেলাই এই হতভাগ্য মনুষ্যজাতির প্রতি নিদারুণ ক্রোধের কারণ, এবং এই ক্রোধের ফলেই নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত মনুষ্যকে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে দুঃখভোগ করিতে হইবে এই তাঁহার ব্যবস্থা ও আদেশ। আদিম পিতা-মাতার পাপে সমগ্র ভবিষ্যৎ সন্ততিবংশ কিরূপে নিগ্রহভাজন হইতে পারে, এবং পরম কারুণিকত্বের সহিত এই তীব্র ক্রোধ ও প্রতিহিংসার কিরূপে সামঞ্জস্য ঘটিতে পারে, তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। বোধ হয় ইহা জগদীশ্বরের কেবল খেয়ালমাত্র, অথবা রহস্যময় দুর্ভেদ্য জাগতিক নিয়মাবলীর অন্তর্গত একটা অন্যতর বিধানমাত্র। যাহাই হউক, প্রতিদ্বন্দ্বী দুঃখবিধাতা যে তাঁহার সাধের জগতে বাদ ঘটাইয়া অনর্থ ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা তাঁহার একটু অদূরদৃষ্টি অসাবধানতার পরিচয় সন্দেহ নাই; তিনি ইহা প্রতীকারে সমর্থ ও প্রতীকার করিয়া দিবেন এই পর্য্যন্ত স্বীকার করা যায়। মানবজাতির আদি দম্পতীকে স্বাধীন ইচ্ছার সহিত অক্ষমতা প্রদান করিয়া কিরূপে তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর ঈর্ষ্যাবৃত্তি পরিতৃপ্তির সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও চিন্তার বিষয় হইতে পারে।

বস্তুতই বিধাতায় করুণাময়ত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলে বড়ই গোলযোগ

উপস্থিত হয়। সেই জন্য এই দুঃখের নানারূপ ব্যাখ্যা দিয়া দুঃখ-টাকে ঢাকিয়া ফেলিবার অথবা উড়াইয়া দিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা হইয়াছে। মনুষ্যের ইচ্ছার স্বাধীনতা ঐরূপ একটা কল্পনা; কিন্তু এ কল্পনাটায় কোনরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না।

আর একরূপ ব্যাখ্যা আছে। দুঃখের পরিণতি পরম সুখ; বিশেষতঃ দুঃখের অভাব ঘটিলে সুখানুভূতির ব্যাঘাত ঘটিত, সেই জন্য শেষ পর্য্যন্ত সুখানুভূতির মাত্রা বাড়াইবার জন্য এই দুঃখের সৃষ্টি। চরমে পুণ্যলাভই এই দুঃখের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য।

আজকাল যাঁহারা অভিব্যক্তিবাদকে ভিত্তি করিয়া দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করিতে বসেন, তাঁহারাও ঐরূপ একটা কথা বলিয়া মানবজাতিকে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা করেন। অভিব্যক্তির আর একটা নাম ক্রমোন্নতি বা ক্রমবিকাশ। সুতরাং অভিব্যক্তির ফলে উন্নতি ও দুঃখনাশ। কিন্তু মৃত্যুর ন্যায় মহাদুঃখজনক ব্যাপারটা যখন প্রত্যেক মনুষ্যের ও সমগ্র মানবকুলের সম্মুখে প্রতি মুহূর্ত্তে আপতনোন্মুখ হইয়া উপস্থিত রহিয়াছে ও তাহার হাত হইতে এড়াইবার কোন উপায় এ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান বা দর্শনশাস্ত্র আবিষ্কার করিল না, তখন ঐরূপ চেষ্টা বৃথা।

ফলে দুঃখের সহিত সুখ আইসে, অবিমিশ্র দুঃখ জগতে নাই, একথাটা যেমন সত্য, সুখের সহিত দুঃখ আইসে, অবিমিশ্র সুখ জগতে নাই, এ কথাটাও তেমনি সত্য। ইহাতে সন্দেহ করিলে সত্যের অপলাপ হয়।

জ্ঞানের বৃদ্ধি দুঃখনাশের প্রয়াসমাত্র এই পর্য্যন্ত নিশ্চয় বলা যায়; কিন্তু জ্ঞানের বৃদ্ধিতে দুঃখের লোপ হইয়া সুখের পরিমাণ বাড়িবে একথা নির্দ্দেশ করিতে ইতস্তত করিতে হয়।

সুতরাং জ্ঞানের পূর্ণতায় মুক্তিলাভ ঘটিবে ইহার সত্যতা

সম্বন্ধে চারিদিক্ হইতে সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়। বোধ করি মানবজাতির এক প্রধান সম্প্রদায় এই কারণেই জ্ঞানের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া অতি নিরুপায় হইয়া বিশ্বাসের মার্গ অবলম্বন করিয়াছে। তুমি বলিতেছ জ্ঞানবৃদ্ধি সহকারে দুঃখের হ্রাস হইবে, কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি জ্ঞানের সহিত দুঃখের উৎপত্তি হইয়াছে ও জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধির সহিত উহার মাত্রা বাড়িয়া যাইতেছে, এরূপ স্থলে জ্ঞানের পূর্ণতায় দুঃখের নাশ কিরূপে মানিতে পারি ?

এই প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর আছে কি না জানি না। তবে এই-রূপে একস্থলে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

তোমরা যাহাকে জ্ঞান বলিতেছ, প্রকৃত পক্ষে তাহা মায়া মোহ বা অজ্ঞান। এই অজ্ঞান হইতেই সৃষ্টি। তোমরা যাহাকে জ্ঞান বল, প্রকৃত পক্ষে যাহা অজ্ঞান বা ভ্রান্তি, তাহা যখন ছিল না, তখন এই জগতের উৎপত্তি হয় নাই। তখন এই জগৎ ছিল কি না ঠিক্ জানি না ; ছিল যদি সত্য হয়, কি ছিল, কি অবস্থায় ছিল, কি ভাবে ছিল, তাহা এখন বলিবার কোন উপায় দেখি না। তার পর হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। এই জগতের উৎপত্তির সহিত দুঃখের উৎপত্তি ও সুখের উৎপত্তি হইয়াছে। সুখ দুঃখ উভয়ই এই জ্ঞাননামধারী অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন, উভয়ই একরকম বিকারের ফল, একই বিক্রিয়ার এপিঠ আর ওপিঠ। এ পিঠ হইতে দেখিলে যাহা সুখ, ও পিঠ হইতে দেখিলে তাহা দুঃখ। যদি কেবল অবিমিশ্র শুদ্ধ সুখ চাও তাহা হইলে তাহা তুমি কোথাও পাইবে না, যদি দুঃখ মাত্র চাও তাহাও কোথাও মিলিবে না। একখানা কটাহের এক পৃষ্ঠ যেমন কুব্জ ও অপর পৃষ্ঠ ন্যুব্জ, এই কুব্জত্ব লোপ করিতে গেলে ন্যুব্জত্ব যায়,আর ন্যুব্জত্ব দূর করিতে

গেলে কুব্জত্ব অন্তর্হিত হয়, আর একের, সুতরাং উভয়েরই লোপ হইলে কটাহের আর কটাহত্ব থাকে না, সেইরূপ অজ্ঞান বা ভ্রান্তি হইতে উদ্ভূত এই জগতের দুঃখভাগ লোপ করিতে গেলে সুখের ভাগ আপনা হইতে লোপ পাইয়া যায়, সুখভাগ লোপ করিতে গেলে দুঃখের ভাগও লোপ পায়, এবং সুখ দুঃখ লোপ করিতে গেলে জগতের আর অস্তিত্ব থাকে না। ভ্রান্তি হইতে ইহার উৎপত্তি এবং সেই ভ্রান্তি যতক্ষণ বর্ত্তমান থাকিবে ততক্ষণ সুখ দুঃখ পরিহারের চেষ্টা বৃথা জল্পনা।

জ্ঞানের পূর্ণতায় এই ভ্রান্তি অথবা অজ্ঞানের বিলোপ হইবার সম্ভব। তখন দুঃখ থাকিবে না সত্য, সেইরূপ তখন সুখও থাকিবে না, তখন এই ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বিচিত্র সুখদুঃখের মূলীভূত সামগ্রী যে জগৎ, তাহারও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।

দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ মনুষ্যের বাঞ্ছনীয় হইতে পারে, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু দুঃখের পরিবর্ত্তে, দুঃখকে দূর করিয়া, তাহার স্থানে, সুখলাভের আশা নিতান্ত মূঢ়তা। সুতরাং মুক্তি অর্থে কেবল দুঃখ হইতে মুক্তি নহে, উহা সুখ হইতেও মুক্তি; উহা ভ্রান্তির পাশ হইতে মুক্তি, উহা জগতের বন্ধন হইতে মুক্তি। এই সুখদুঃখবিনির্ম্মুক্ত হইয়া যদি কখন মনুষ্য অবস্থান করিতে পারে তখনই তাহার পরম পুরুষার্থ সাধিত হইল।

ভারতবর্ষে সময়বিশেষে এইরূপ মুক্তিতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছিল। এই মুক্তিবাদ ভারতবর্ষে জনসমাজকে গঠিত, নিয়মিত ও চালিত করিয়াছিল। মনুষ্যের চিন্তা মনুষ্যকে যে পথে লইয়া যাইতে চায়, মনুষ্য সকল সময়ে সে পথে যায় না। প্রকৃতির পন্থার জটিলতায় জীবনের পন্থাও এত দুর্গম ও এত আঁধার, যে মনুষ্য পদে পদে মরীচিকাভ্রান্ত হইয়া বিপথে যায়। পদে পদে স্খলিত হইয়া

বিপন্ন হয়। ভারতবর্ষে মনুষ্যজাতির ভাগ্যে এই দার্শনিক তত্ত্ব প্রচারে কি সামাজিক ফল ঘটিয়াছে তাহা প্রবন্ধান্তরের আলোচ্য।

দিদি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পল্লীবাসিনী কোন এক হতভাগিনীর অন্যায়কারী অত্যাচারী স্বামীর দুষ্কৃতি সকল সবিস্তারে বর্ণন পূর্ব্বক প্রতিবেশিনী তারা অত্যন্ত সংক্ষেপে নিজের রায় প্রকাশ করিয়া কহিল এমন স্বামীর মুখে আগুন। শুনিয়া জয়গোপাল বাবুর স্ত্রী শশি অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিলেন ;—স্বামী-জাতির মুখে চুরটের আগুন ছাড়া অন্য কোন প্রকার আগুন কোন অবস্থাতেই কামনা করা স্ত্রীজাতিকে শোভা পায় না। অতএব এ সম্বন্ধে তিনি কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ প্রকাশ করাতে কঠিন-হৃদয় তারা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কহিল এমন স্বামী থাকার চেয়ে সাতজন্ম বিধবা হওয়া ভাল। এই বলিয়া সে সভাভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেল।

শশি মনে মনে কহিল, স্বামীর এমন কোন অপরাধ কল্পনা করিতে পারি না, যাহাতে তাঁহার প্রতি মনের ভাব এত কঠিন হইয়া উঠিতে পারে। এই কথা মনের মধ্যে আলোচনা করিতে করিতেই তাহার কোমল হৃদয়ের সমস্ত প্রীতিরস তাহার প্রবাসী স্বামীর অভিমুখে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল ; শয্যাতলে তাহার স্বামী যে অংশে শয়ন করিত সেই অংশের উপর বাহু প্রসারণ করিয়া পড়িয়া শূন্য বালিশকে চুম্বন করিল, বালিশের মধ্যে স্বামীর মাথার

"মুক্তির পথ" প্রবন্ধের ভ্রমসংশোধন—৪০৯ পৃষ্ঠা ১৬ পংক্তি 'কম্পিত' স্থানে 'কল্পিত' হইবে, ৪১০ পৃষ্ঠা ১৪ পংক্তি 'শোণিতদোষী' স্থানে 'শোণিতশোষী' হইবে, ৪১১ পৃষ্ঠা ৬ পংক্তি 'আদেশে' না হইয়া 'আদেশের' হইবে।

আঘ্রাণ অনুভব করিল এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া কাঠের বাক্স হইতে স্বামীর একখানি বহুকালের লুপ্তপ্রায় ফোটোগ্রাফ এবং হাতের লেখা চিঠিগুলি বাহির করিয়া বসিল। সেদিনকার নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন এইরূপে নিভৃত কক্ষে, নির্জ্জন চিন্তায়, পুরাতন স্মৃতিতে এবং বিষাদের অশ্রুজলে কাটিয়া গেল।

শশিকলা এবং জয়গোপালের যে নবদাম্পত্য তাহা নহে। বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল, ইতিমধ্যে সন্তানাদিও হইয়াছে। উভয়ে বহুকাল একত্র অবস্থান করিয়া নিতান্ত সহজ সাধারণ ভাবেই দিন কাটিয়াছে; কোন পক্ষেই অপরিমিত প্রেমোচ্ছ্বাসের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। প্রায় ষোল বৎসর একাদিক্রমে অবিচ্ছেদে যাপন করিয়া হঠাৎ কর্ম্মবশে তাহার স্বামী বিদেশে চলিয়া যাওয়ার পর শশির মনে একটা প্রবল প্রেমাবেগ জাগ্রত হইয়া উঠিল। বিরহের দ্বারা বন্ধনে যতই টান পড়িল কোমল হৃদয়ে প্রেমের ফাঁশ ততই শক্ত করিয়া আঁটিয়া ধরিল; ঢিলা অবস্থায় যাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে নাই এখন তাহার বেদনা টন্‌টন্ করিতে লাগিল। তাই আজ এতদিন পরে এত বয়সে ছেলের মা হইয়া শশি বসন্তমধ্যাহ্নে নির্জ্জন ঘরে বিরহশয্যায় উন্মেষিতযৌবনা নববধূর সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিল। যে প্রেম অজ্ঞাতভাবে জীবনের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, সহসা আজ তাহারই কলগীতিশব্দে জাগ্রত হইয়া মনে মনে তাহারই উজান বাহিয়া দুই তীরে বহু দূরে অনেক সোনার পুরী অনেক কুঞ্জবন দেখিতে লাগিল;—কিন্তু সেই অতীত সুখসম্ভাবনার মধ্যে এখন আর পদার্পণ করিবার স্থান নাই। মনে করিতে লাগিল এইবার যখন স্বামীকে নিকটে পাইব তখন জীবনকে নীরস এবং বসন্তকে নিষ্ফল হইতে দিব না। কতদিন কতবার

তুচ্ছতর্কে সামান্য কলহে স্বামীর প্রতি সে উপদ্রব করিয়াছে আজ অনুতপ্ত চিত্তে একান্ত মনে সংকল্প করিল আর কখনই সে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবে না, স্বামীর ইচ্ছায় বাধা দিবে না, স্বামীর আদেশ পালন করিবে, প্রীতিপূর্ণ নম্রহৃদয়ে নীরবে স্বামীর ভালমন্দ সমস্ত আচরণ সহ্য করিবে; কারণ, স্বামী সর্ব্বস্ব, স্বামী প্রিয়তম, স্বামী দেবতা।

অনেকদিন পর্য্যন্ত শশিকলা তাহার পিতামাতার একমাত্র আদরের কন্যা ছিল। সেই জন্য, জয়গোপাল যদিও সামান্য চাকুরি করিত, তবু ভবিষ্যতের জন্য তাহার কিছুমাত্র ভাবনা ছিল না। পল্লিগ্রামে রাজভোগে থাকিবার পক্ষে তাহার শ্বশুরের যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল।

এমন সময় নিতান্ত অকালে প্রায় বৃদ্ধবয়সে শশিকলার পিতা কালীপ্রসন্নের একটি পুত্রসন্তান জন্মিল। সত্য কথা বলিতে কি, পিতামাতার এইরূপ অনপেক্ষিত অসঙ্গত অন্যায় আচরণে শশি মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল; জয়গোপালও সবিশেষ প্রীতিলাভ করে নাই।

অধিক বয়সের ছেলেটির প্রতি পিতামাতার স্নেহ অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া উঠিল। এই নবাগত, ক্ষুদ্রকায়, স্তন্যপিপাসু, নিদ্রাতুর শ্যালকটি অজ্ঞাতসারে দুই দুর্ব্বল হস্তের অতি ক্ষুদ্র বদ্ধমুষ্টির মধ্যে জয়গোপালের সমস্ত আশা ভরসা যখন অপহরণ করিয়া বসিল, তখন সে আসামের চা-বাগানে এক চাকরি লইল।

নিকটবর্ত্তী স্থানে চাকুরির সন্ধান করিতে সকলেই তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিল—কিন্তু সর্ব্বসাধারণের উপর রাগ করিয়াই হৌক, অথবা চা-বাগানে দ্রুত বাড়িয়া উঠিবার কোন উপায় জানিয়াই হৌক জয়গোপাল কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না;

শশিকে সন্তানসহ তাহার বাপের বাড়ি রাখিয়া সে আসামে চলিয়া গেল। বিবাহিত জীবনে স্বামীস্ত্রীর এই প্রথম বিচ্ছেদ।

এই ঘটনায় শিশু ভ্রাতাটির প্রতি শশিকলার ভারি রাগ হইল। যে মনের আক্ষেপ মুখ ফুটিয়া বলিবার যো নাই তাহারই আক্রোশটা সব চেয়ে বেশি হয়। ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি আরামে স্তনপান করিতে ও চক্ষু মুদিয়া নিদ্রা দিতে লাগিল এবং তাহার বড় ভগিনীটি দুধ গরম, ভাত ঠাণ্ডা, ছেলের ইস্কুলে যাওয়ার দেরি প্রভৃতি নানা উপলক্ষ্যে নিশিদিন মান অভিমান করিয়া অস্থির হইল এবং অস্থির করিয়া তুলিল।

অল্পদিনের মধ্যেই ছেলেটির মার মৃত্যু হইল; মরিবার পূর্ব্বে জননী তাঁহার কন্যার হাতে শিশুপুত্রটিকে সমর্পণ করিয়া দিয়া গেলেন।

তখন অনতিবিলম্বেই সেই মাতৃহীন ছেলেটি অনায়াসেই তাহার দিদির হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। হুহুঙ্কার শব্দপূর্ব্বক সে যখন তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পরম আগ্রহের সহিত দন্তহীন ক্ষুদ্র মুখের মধ্যে তাঁহার মুখ চক্ষু নাসিকা সমস্তটা গ্রাস করিবার চেষ্টা করিত, ক্ষুদ্র মুষ্টির মধ্যে তাঁহার কেশগুচ্ছ লইয়া কিছুতেই দখল ছাড়িতে চাহিত না, সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বেই জাগিয়া উঠিয়া গড়াইয়া তাঁহার গায়ের কাছে আসিয়া কোমল স্পর্শে তাঁহাকে পুলকিত করিয়া মহাকলরব আরম্ভ করিয়া দিত;—যখন ক্রমে সে তাঁহাকে জিজি এবং জিজিমা বলিয়া ডাকিতে লাগিল, এবং কাজকর্ম্ম ও অবসরের সময় নিষিদ্ধ কার্য্য করিয়া, নিষিদ্ধ খাদ্য খাইয়া, নিষিদ্ধস্থানে গমনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি বিধিমত উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিল, তখন শশি আর থাকিতে পারিলেন না। এই স্বেচ্ছাচারী ক্ষুদ্র অত্যাচারীর নিকটে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া দিলেন।

ছেলেটির মা ছিল না বলিয়া তাঁহার প্রতি তাহার আধিপত্য ঢের বেশি হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ছেলেটির নাম হইল নীলমণি। তাহার বয়স যখন দুই বৎসর তখন তাহার পিতার কঠিন পীড়া হইল। অতি শীঘ্র চলিয়া আসিবার জন্য জয়গোপালের নিকট পত্র গেল। জয়গোপাল যখন বহু চেষ্টায় ছুটি লইয়া আসিয়া পৌঁছিল তখন কালিপ্রসন্নের মৃত্যুকাল উপস্থিত।

মৃত্যুর পূর্ব্বে কালিপ্রসন্ন, নাবালক ছেলেটির তত্ত্বাবধানের ভার জয়গোপালের প্রতি অর্পণ করিয়া তাঁহার বিষয়ের শিকি অংশ কন্যার নামে লিখিয়া দিলেন।

সুতরাং বিষয় রক্ষার জন্য জয়গোপালকে কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিতে হইল।

অনেক দিনের পরে স্বামীস্ত্রীর পুনর্ম্মিলন হইল। একটা জড়পদার্থ ভাঙ্গিয়া গেলে আবার ঠিক তাহার খাঁজে খাঁজে মিলাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু দুটি মানুষকে যেখানে বিচ্ছিন্ন করা হয়, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে আর ঠিক সেখানে রেখায় রেখায় মেলে না;—কারণ, মন জিনিষটা সজীব পদার্থ; নিমেষে নিমেষে তাহার পরিণতি এবং পরিবর্ত্তন।

শশির পক্ষে এই নূতন মিলনে নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। সে যেন তাহার স্বামীকে ফিরিয়া বিবাহ করিল। পুরাতন দাম্পত্যের মধ্যে চিরাভ্যাসবশত যে এক অসাড়তা জন্মিয়া গিয়াছিল, বিরহের আকর্ষণে তাহা অপসৃত হইয়া সে তাহার স্বামীকে যেন পূর্ব্বাপেক্ষা সম্পূর্ণতর ভাবে প্রাপ্ত হইল,—মনে মনে প্রতিজ্ঞা

করিল, যেমন দিনই আসুক্ যতদিনই যাক্, স্বামীর প্রতি এই দীপ্ত প্রেমের উজ্জ্বলতাকে কখনই ম্লান হইতে দিব না।

নূতন মিলনে জয়গোপালের মনের অবস্থাটা অন্যরূপ। পূর্ব্বে যখন উভয়ে অবিচ্ছেদে একত্রে ছিল যখন স্ত্রীর সহিত তাহার সমস্ত স্বার্থের এবং বিচিত্র অভ্যাসের ঐক্যবন্ধন ছিল। স্ত্রী তখন জীবনের একটি নিত্য সত্য হইয়াছিল,—তাহাকে বাদ দিতে গেলে দৈনিক অভ্যাসজালের মধ্যে সহসা অনেকখানি ফাঁক পড়িত। এই জন্য বিদেশে গিয়া জয়গোপাল প্রথম প্রথম অগাধ জলের মধ্যে পড়িয়াছিল। কিন্তু ক্রমে তাহার সেই অভ্যাস-বিচ্ছেদের মধ্যে নূতন অভ্যাসের তালি লাগিয়া গেল। কেবল তাহাই নহে। পূর্ব্বে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট নিশ্চিন্তভাবে তাহার দিন কাটিয়া যাইত। মাঝে দুই বৎসর, অবস্থা-উন্নতি-চেষ্টা তাহার মনে এমন প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার মনের সম্মুখে আর কিছুই ছিল না। এই নূতন নেশার তীব্রতার তুলনায় তাহার পূর্ব্বজীবন বস্তুহীন ছায়ার মত দেখাইতে লাগিল। স্ত্রীলোকের প্রকৃতিতে প্রধান পরিবর্ত্তন ঘটায় প্রেম, এবং পুরুষের ঘটায় দুশ্চেষ্টা।

জয়গোপাল দুই বৎসর পরে আসিয়া অবিকল তাহার পূর্ব্বস্ত্রীটিকে ফিরিয়া পাইল না। তাহার স্ত্রীর জীবনে শিশু শ্যালকটি একটা নূতন পরিসর বৃদ্ধি করিয়াছে। এই অংশটি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত,—এই অংশে স্ত্রীর সহিত তাহার কোন যোগ নাই। স্ত্রী তাহাকে আপনার এই শিশুস্নেহের ভাগ দিবার অনেক চেষ্টা করিত—কিন্তু ঠিক কৃতকার্য্য হইত কি না বলিতে পারি না।

শশি নীলমণিকে কোলে করিয়া আনিয়া হাস্যমুখে তাহার স্বামীর সম্মুখে ধরিত—নীলমণি প্রাণপণে শশির গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কাঁধে মুখ লুকাইত, কোন প্রকার কুটুম্বিতার খাতির

মানিত না। শশির ইচ্ছা, তাহার এই ক্ষুদ্র ভ্রাতাটির যত প্রকার মন ভুলাইবার বিদ্যা আয়ত্ত আছে সবগুলি জয়গোপালের নিকট প্রকাশ হয়; কিন্তু জয়গোপালও সে জন্য বিশেষ আগ্রহ অনুভব করিত না এবং শিশুটিও বিশেষ উৎসাহ দেখাইত না। জয়গোপাল কিছুতেই বুঝিতে পারিত না এই কৃশকায় বৃহৎমস্তক গম্ভীরমুখ শ্যামবর্ণ ছেলেটার মধ্যে এমন কি আছে যে জন্য তাহার প্রতি এতটা স্নেহের অপব্যয় করা হইতেছে।

ভালবাসার ভাবগতিক মেয়েরা খুব চট্ করিয়া বোঝে। শশি অবিলম্বেই বুঝিল জয়গোপাল নীলমণির প্রতি বিশেষ অনুরক্ত নহে। তখন ভাইটিকে সে বিশেষ সাবধানে আড়াল করিয়া রাখিত—স্বামীর স্নেহহীন বিরাগদৃষ্টি হইতে তাহাকে তফাতে রাখিতে চেষ্টা করিত। এইরূপে ছেলেটি তাহার গোপন যত্নের ধন, তাহার একলার স্নেহের সামগ্রী হইয়া উঠিল। সকলেই জানেন, স্নেহ যত গোপনের, যত নির্জ্জনের হয় ততই প্রবল হইতে থাকে।

নীলমণি কাঁদিলে জয়গোপাল অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিত—এই জন্য শশি তাহাকে তাড়াতাড়ি বুকের মধ্যে চাপিয়া সমস্ত প্রাণ দিয়া বুক দিয়া তাহার কান্না থামাইবার চেষ্টা করিত;—বিশেষতঃ নীলমণির কান্নায় যদি রাত্রে তাহার স্বামীর ঘুমের ব্যাঘাত হইত, এবং স্বামী এই ক্রন্দনপরায়ণ ছেলেটার প্রতি অত্যন্ত হিংস্রভাবে ঘৃণা প্রকাশ পূর্ব্বক জর্জ্জরচিত্তে গর্জ্জন করিয়া উঠিত তখন শশি যেন অপরাধিনীর মত সঙ্কুচিত শশব্যস্ত হইয়া পড়িত, তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে করিয়া দূরে লইয়া গিয়া একান্ত সানুনয় স্নেহের স্বরে সোনা আমার, ধন আমার, মাণিক আমার বলিয়া ঘুম পাড়াইতে থাকিত।

ছেলেতে ছেলেতে নানা উপলক্ষ্যে ঝগড়া বিবাদ হইয়াই

থাকে। পূর্ব্বে এরূপ স্থলে শশি নিজের ছেলেদের দণ্ড দিয়া ভাই-য়ের পক্ষ অবলম্বন করিত, কারণ, তাহার মা ছিল না। এখন বিচারকের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডবিধির পরিবর্ত্তন হইল। এখন সর্ব্বদাই নিরপরাধে এবং অবিচারে নীলমণিকে কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হইত। সেই অন্যায় শশির বক্ষে শেলের মত বাজিত; তাই সে দণ্ডিত ভ্রাতাকে ঘরে লইয়া গিয়া তাহাকে মিষ্ট দিয়া খেলেনা দিয়া আদার করিয়া চুমো খাইয়া শিশুর আহত হৃদয়ে যথাসাধ্য সান্ত্বনা বিধান করিবার চেষ্টা করিত।

ফলতঃ দেখা গেল, শশি নীলমণিকে যতই ভালবাসে জয়-গোপাল নীলমণির প্রতি ততই বিরক্ত হয়; আবার জয়গোপাল নীলমণির প্রতি যতই বিরাগ প্রকাশ করে, শশি তাহাকে ততই স্নেহসুধায় অভিষিক্ত করিয়া দিতে থাকে। জয়গোপাল লোকটা কখনও তাহার স্ত্রীর প্রতি কোনরূপ কঠোর ব্যবহার করে না এবং শশি নীরবে নম্রভাবে প্রীতির সহিত তাহার স্বামীর সেবা করিয়া থাকে, কেবল এই নীলমণিকে লইয়া ভিতরে ভিতরে উভয়ে উভয়কে অহরহ আঘাত দিতে লাগিল। এইরূপ নীরব দ্বন্দ্বের গোপন আঘাত প্রতিঘাত প্রকাশ্য বিবাদের অপেক্ষা ঢের বেশি দুঃসহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নীলমণির সমস্ত শরীরের মধ্যে মাথাটাই সর্ব্বপ্রধান ছিল। দেখিলে মনে হইত বিধাতা যেমন একটা সরু কাঠির মধ্যে ফুঁ দিয়া তাহার ডগার উপরে একটা বড় বুদ্বুদ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ডাক্তাররাও মাঝে মাঝে আশঙ্কা প্রকাশ করিত ছেলেটি এইরূপ বুদ্বুদের মতই ক্ষণভঙ্গুর ক্ষণস্থায়ী হইবে। অনেক দিন পর্য্যন্ত সে

কথা কহিতে এবং চলিতে শেখে নাই। তাহার বিষণ্ন গম্ভীর মুখ দেখিয়া বোধ হইত, তাহার পিতামাতা তাঁহাদের অধিক বয়সের সমস্ত চিন্তাভার এই ক্ষুদ্র শিশুর মাথার উপরে চাপাইয়া দিয়া গেছেন।

দিদির যত্নে ও সেবায় নীলমণি তাহার বিপদের কাল উত্তীর্ণ হইয়া ছয়বৎসরে পা দিল।

কার্ত্তিকমাসে ভাইফোঁটার দিনে নূতন জামা, চাদর এবং একখানি লালপেড়ে ধুতি পরাইয়া বাবু সাজাইয়া নীলমণিকে শশি ভাইফোঁটা দিতেছেন এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত স্পষ্টভাষিণী প্রতিবেশিনী তারা আসিয়া কথায় কথায় শশির সহিত ঝগড়া বাধাইয়া দিল। সে কহিল, গোপনে ভাইয়ের সর্ব্বনাশ করিয়া ঘটা করিয়া ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিবার কোন ফল নাই। শুনিয়া শশি বিস্ময়ে ক্রোধে বেদনায় বজ্রাহত হইল। অবশেষে শুনিতে পাইল, তাহারা স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া নাবালক নীলমণির সম্পত্তি খাজনার দায়ে নিলাম করাইয়া তাহার স্বামীর পিস্‌তুতো ভাইয়ের নামে বেনামী করিয়া কিনিতেছে। শুনিয়া শশি অভিশাপ দিল, যাহারা এতবড় মিথ্যা কথা রটনা করিতে পারে তাহাদের মুখে কুষ্ঠ হউক্!

এই বলিয়া সরোদনে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া জনশ্রুতির কথা তাহাকে জানাইল। জয়গোপাল কহিল আজকালকার দিনে কাহাকেও বিশ্বাস করিবার যো নাই। উপেন্ আমার আপন পিস্‌তুতো ভাই; তাহার উপরে বিষয়ের ভার দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম—সে কখন্ গোপনে খাজনা বাকি ফেলিয়া মহল হাসিল্‌পুর নিজে কিনিয়া লইয়াছে আমি জানিতেও পারি নাই।

শশি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, নালিশ করিবে না?

জয়গোপাল কহিল, ভাইয়ের নামে নালিশ করি কি করিয়া? এবং নালিশ করিয়াও ত কোন ফল নাই, কেবল অর্থ নষ্ট।

স্বামীর কথা বিশ্বাস করা শশির পরমকর্ত্তব্য, কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। তখন এই সুখের সংসার এই প্রেমের গার্হস্থ্য সহসা তাহার নিকট অত্যন্ত বিকট বীভৎস আকার ধারণ করিয়া দেখা দিল। যে সংসারকে আপনার পরম আশ্রয় বলিয়া মনে হইত—হঠাৎ দেখিল সে একটা নিষ্ঠুর স্বার্থের ফাঁদ—তাহাদের দুটি ভাইবোনকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। সে একা স্ত্রীলোক, অসহায় নীলমণিকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে ভাবিয়া কূল কিনারা পাইল না। যতই চিন্তা করিতে ল্যাগিল, ততই ভয়ে এবং ঘৃণায় এবং বিপন্ন বালক ভ্রাতাটির প্রতি অপরিসীম স্নেহে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল সে যদি উপায় জানিত তবে লাট্‌সাহেবের নিকট নিবেদন করিয়া, এমন কি, মহারাণীর নিকট পত্র লিখিয়া তাহার এই ভাইয়ের সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিত। মহারাণী কখনই নীলমণির বার্ষিক সাত শ আটান্ন টাকার মুনফার হাসিলপুর মহল বিক্রয় হইতে দিতেন না।

এইরূপে শশি যখন একেবারে মহারাণীর নিকট দরবার করিয়া তাহার পিস্‌তুতো দেবরকে সম্পূর্ণ জব্দ করিয়া দিবার উপায় চিন্তা করিতেছে তখন হঠাৎ নীলমণির জ্বর আসিয়া আক্ষেপ সহকারে মূর্চ্ছা হইতে লাগিল।

জয়গোপাল এক গ্রাম্য নেটিভ ডাক্তরকে ডাকিল। শশি ভাল ডাক্তারের জন্য অনুরোধ করাতে জয়গোপাল বলিল, কেন মতি-লাল মন্দ ডাক্তার কি! শশি তখন তাঁহার পায়ে পড়িল, মাথার

দিব্য দিল; জয়গোপাল বলিল, আচ্ছা, সহর হইতে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইতেছি।

শশি নীমলণিকে কোলে করিয়া বুকে করিয়া পড়িয়া রহিল। নীলমণিও তাহাকে এক দণ্ড চোখের আড়াল হইতে দেয় না; পাছে ফাঁকি দিয়া পালায় এই ভয়ে তাহাকে জড়াইয়া থাকে; এমন কি, ঘুমাইয়া পড়িলেও আঁচলটি ছাড়ে না।

সমস্ত দিন এমনি ভাবে কাটিলে সন্ধ্যার পর জয়গোপাল আসিয়া বলিল—সহরে ডাক্তার বাবুকে পাওয়া গেল না, তিনি দূরে কোথায় রোগী দেখিতে গিয়াছেন। ইহাও বলিল, মকদ্দমা উপলক্ষ্যে আমাকে আজই অন্যত্র যাইতে হইতেছে; আমি মতিলালকে বলিয়া গেলাম সে নিয়মিত আসিয়া রোগী দেখিয়া যাইবে।

রাত্রে নীলমণি ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকিল। প্রাতঃকালেই শশি কিছুমাত্র বিচার না করিয়া রোগী ভ্রাতাকে লইয়া নৌকা চড়িয়া একেবারে সহরে গিয়া ডাক্তারের বাড়ি উপস্থিত হইল। ডাক্তার বাড়িতেই আছেন—সহর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। ভদ্র স্ত্রীলোক দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাসা ঠিক করিয়া একটি প্রাচীনা বিধবার তত্ত্বাবধানে শশিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন এবং ছেলেটির চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

পরদিনই জয়গোপাল আসিয়া উপস্থিত। ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত ফিরিতে অনুমতি করিল। স্ত্রী কহিল, আমাকে যদি কাটিয়া ফেল তবু আমি এখন ফিরিব না; তোমরা আমার নীলমণিকে মারিয়া ফেলিতে চাও—উহার মা নাই, বাপ নাই, আমি ছাড়া উহার আর কেহ নাই—আমি উহাকে রক্ষা করিব।

জয়গোপাল রাগিয়া কহিল, তবে এই খানেই থাক, তুমি আর

আমার ঘরে ফিরিয়ো না। শশি তখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া কহিল ঘর তোমার কি! আমার ভাইয়েরই ত ঘর! জয়গোপাল কহিল—আচ্ছা সে দেখা যাইবে!

পাড়ার লোকে এই ঘটনায় কিছুদিন খুব আন্দোলন করিতে লাগিল। প্রতিবেশিনী তারা কহিল, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিতে হয় ঘরে বসিয়া কর না বাপু। ঘর ছাড়িয়া যাইবার আবশ্যক কি! হাজার হৌক্, স্বামীত বটে।

সঙ্গে যাহা টাকা ছিল সমস্ত খরচ করিয়া গহনাপত্র বেচিয়া শশি তাহার ভাইকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিল। তখন সে খবর পাইল, দ্বারিগ্রামে তাহাদের যে বড় জোৎ ছিল, যে জোতের উপরে তাহাদের বাড়ি, নানা রূপে যাহার আয় প্রায় বার্ষিক দেড় হাজার টাকা হইবে সেই জোৎটি জমিদারের সহিত যোগ করিয়া জয়-গোপাল নিজের নামে খারিজ করিয়া লইয়াছে। এখন বিষয়টি সমস্তই তাহাদের—তাহার ভাইয়ের নহে।

ব্যামো হইতে সারিয়া উঠিয়া নীলমণি করুণস্বরে বলিতে লাগিল, দিদি, বাড়ি চল। সেখানে তাহার সঙ্গী ভাগিনেয়দের জন্য তাহার মন-কেমন করিতেছে। তাই বারম্বার বলিল, দিদি আমাদের সেই ঘরে চলনা, দিদি! শুনিয়া দিদি কেবলই কাঁদিতে লাগিল। আমাদের ঘর আর কোথায়!

কিন্তু কেবল কাঁদিয়া কোন ফল নাই—তখন পৃথিবীতে দিদি ছাড়া তাহার ভাইয়ের আর কেহ ছিল না। ইহা ভাবিয়া চোখের জল মুছিয়া শশি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ তারিণী বাবুর অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহার স্ত্রীকে ধরিল। ডেপুটি বাবু জয়গোপালকে চিনিতেন। ভদ্রঘরের স্ত্রী ঘরের বাহির হইয়া বিষয় সম্পত্তি লইয়া স্বামীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে চাহে ইহাতে শশির প্রতি তিনি বিশেষ

বিরক্ত হইলেন। তাহাকে ভুলাইয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ জয়গোপালকে পত্র লিখিলেন। জয়গোপাল শ্যালকসহ তাহার স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক নৌকায় তুলিয়া বাড়ি লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল।

স্বামী স্ত্রীতে, দ্বিতীয় বিচ্ছেদের পর, পুনশ্চ এই দ্বিতীয়বার মিলন হইল! প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ!

অনেক দিন পরে ঘরে ফিরিয়া পুরাতন সহচরদিগকে পাইয়া নীলমণি বড় আনন্দে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সেই নিশ্চিন্ত আনন্দ দেখিয়া অন্তরে অন্তরে শশির হৃদয় বিদীর্ণ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শীতকালে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব মফস্বল পর্য্যবেক্ষণে বাহির হইয়া শীকার সন্ধানে গ্রামের মধ্যে তাঁবু ফেলিয়াছেন। গ্রামের পথে সাহেবের সঙ্গে নীলমণির সাক্ষাৎ হয়। অন্য বালকেরা তাঁহাকে দেখিয়া চাণক্য শ্লোকের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নখী দন্তী শৃঙ্গী প্রভৃতির সহিত সাহেবকেও যোগ করিয়া যথেষ্ট দূরে সরিয়া গেল। কিন্তু সুগম্ভীরপ্রকৃতি নীলমণি অটল কৌতূহলের সহিত প্রশান্ত-ভাবে সাহেবকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। সাহেব সকৌতুকে কাছে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি পাঠ-শালায় পড়?—বালক নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কোন্ পুস্তক পড়িয়া থাক?—নীলমণি পুস্তক শব্দের অর্থ না বুঝিয়া নিস্তব্ধভাবে ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ম্যাজিষ্টর সাহেবের সহিত এই পরিচয়ের কথা নীলমণি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাহার দিদির নিকট বর্ণনা করিল।

মধ্যাহ্নে চাপকান প্যাণ্ট্লুন পাগ্ড়ি পরিয়া জয়গোপাল ম্যাজি-

ষ্ট্রেট্‌কে সেলাম করিতে গিয়াছে। অর্থী প্রত্যর্থী চাপ্‌রাশী কন্‌ষ্টেবলে চারিদিক লোকারণ্য। সাহেব গরমের ভয়ে তাম্বুর বাহিরে খোলা ছায়ায় ক্যাম্পটেবিল পাতিয়া বসিয়াছেন এবং জয়গোপালকে চৌকিতে বসাইয়া তাহাকে স্থানীয় অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। জয়গোপাল তাঁহার গ্রামবাসী সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে এই গৌরবের আসন অধিকার করিয়া মনে মনে স্ফীত হইতেছিল, এবং মনে করিতেছিল এই সময়ে চক্রবর্ত্তীরা এবং নন্দীরা কেহ আসিয়া দেখিয়া যায় ত বেশ হয়!

এমন সময় নীলমণিকে সঙ্গে করিয়া অবগুণ্ঠনাবৃত একটি স্ত্রীলোক একেবারে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, সাহেব, তোমার হাতে আমার এই অনাথ ভাইটিকে সমর্পণ করিলাম, তুমি ইহাকে রক্ষা কর!

সাহেব তাঁহার সেই পূর্ব্বপরিচিত বৃহৎমস্তক গম্ভীরপ্রকৃতি বালকটিকে দেখিয়া এবং স্ত্রীলোকটিকে ভদ্রস্ত্রীলোক বলিয়া অনুমান করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন—কহিলেন, আপনি তাঁবুতে প্রবেশ করুন।—স্ত্রীলোকটি কহিল, আমার যাহা বলিবার আছে আমি এইখানেই বলিব।

জয়গোপাল বিবর্ণমুখে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। কৌতূহলী গ্রামের লোকেরা পরম কৌতুক অনুভব করিয়া চারিদিকে ঘেঁষিয়া আসিবার উপক্রম করিল। সাহেব বেত উঁচাইবামাত্র সকলে দৌড় দিল।

তখন শশি তাহার ভ্রাতার হাত ধরিয়া সেই পিতৃমাতৃহীন বালকের সমস্ত ইতিহাস আদ্যোপান্ত বলিয়া গেল। জয়গোপাল মধ্যে মধ্যে বাধা দিবার উপক্রম করাতে ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ রক্তবর্ণ মুখে গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—চুপ্‌রও! এবং বেত্রাগ্র দ্বারা,

তাহাকে চৌকি ছাড়িয়া সম্মুখে দাঁড়াইতে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। জয়গোপাল মনে মনে শশির প্রতি গর্জ্জন করিতে করিতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নীলমণি দিদির অত্যন্ত কাছে ঘেঁষিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

শশির কথা শেষ হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট্ জয়গোপালকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন এবং তাহার উত্তর শুনিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শশিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন—বাছা, এ মকর্দ্দমা যদিও আমার কাছে উঠিতে পারে না তথাপি তুমি নিশ্চিন্ত থাক—এ সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য আমি করিব। তুমি তোমার ভাইটিকে লইয়া নির্ভয়ে বাড়ি ফিরিয়া যাইতে পার!

শশি কহিল—সাহেব, যতদিন নিজের বাড়ি ও না ফিরিয়া পায় ততদিন আমার ভাইকে বাড়ি লইয়া যাইতে আমি সাহস করি না। এখন নীলমণিকে তুমি নিজের কাছে না রাখিলে ইহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।

সাহেব কহিলেন, তুমি কোথায় যাইবে?

শশি কহিল, আমি আমার স্বামীর ঘরে ফিরিয়া যাইব, আমার কোন ভাবনা নাই।

সাহেব ঈষৎ হাসিয়া অগত্যা এই গলায় মাছুলি পরা কৃশকায় শ্যামবর্ণ গম্ভীর প্রশান্ত মৃদুস্বভাব বাঙ্গালীর ছেলেটিকে সঙ্গে লইতে রাজি হইলেন। তখন শশি বিদায় লইবার সময় বালক তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিল। সাহেব কহিলেন, বাবা তোমার কোন ভয় নেই—এস!

ঘোমটার মধ্য হইতে অবিরল অশ্রু মোচন করিতে করিতে শশি কহিল—লক্ষ্মী ভাই, যা ভাই—আবার তোর দিদির সঙ্গে দেখা হবে! এই বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মাথায় পিঠে

হাত বুলাইয়া কোন মতে আপন অঞ্চল ছাড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে চলিয়া গেল; অমনি সাহেব নীলমণিকে বাম হস্তের দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। সে দিদিগো দিদি করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল; - শশি একবার ফিরিয়া চাহিয়া দূর হইতে প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে তাহার প্রতি নীরবে সান্ত্বনা প্রেরণ করিয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে চলিয়া গেল।

আবার সেই বহুকালের চিরপরিচিত পুরাতন ঘরে স্বামী স্ত্রীর মিলন হইল। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ!

কিন্তু এ মিলন অধিক দিন স্থায়ী হইল না। কারণ, ইহার অনতিকাল পরেই একদিন প্রাতঃকালে গ্রামবাসীগণ সংবাদ পাইল যে, রাত্রে শশি ওলাউঠো রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়াছে— এবং রাত্রেই তাহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেছে।

কেহ এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিল না। কেবল সেই প্রতিবেশিনী তারা মাঝে মাঝে গর্জ্জন করিয়া উঠিতে চাহিত, সকলে চুপ্ চুপ্ করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিত।

বিদায়কালে শশি ভাইকে কথা দিয়া গিয়াছিল আবার দেখা হইবে—সে কথা কোন্‌খানে রক্ষা হইয়াছে জানি না।

পুরাতন ভৃত্য।

ভূতের মতন চেহারা যেমন,
নির্ব্বোধ অতি ঘোর!
যা কিছু হারায়, গিন্নি বলেন
কেষ্টা বেটাই চোর!

উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত,
শুনেও শোনে না কানে।
যত পায় বেত না পায় বেতন
তবু না চেতন মানে।
বড় প্রয়োজন, ডাকি প্রাণপণ
চীৎকার করি' "কেষ্টা,"—
যত করি তাড়া, নাহি পাই সাড়া,
খুঁজে ফিরি সারা দেশটা!
তিনখানা দিলে একখানা রাখে,
বাকি কোথা নাহি জানে।
একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে
তিনখানা করে আনে!
যেখানে সেখানে দিবসে দুপরে
নিদ্রাটি আছে সাধা।
মহা কলরবে গালি দেই যবে
পাজি হতভাগা গাধা,
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসে
দেখে' জ্বলে' যায় পিত্ত!
তবু মায়া তার ত্যাগ করা ভার
বড় পুরাতন ভৃত্য!

ঘরের কর্ত্রী রুক্ষ-মূর্ত্তি
বলে, "আর পারি না কো!
"রহিল তোমার এ ঘর দুয়ার
কেষ্টারে লয়ে থাকো!

"না মানে শাসন, বসন বাসন
অশন আসন যত
"কোথায় কি গেলো, শুধু টাকাগুলো
যেতেছে জলের মত!
"গেলে সে বাজার, সারাদিনে আর
দেখা পাওয়া তার ভার!
"করিলে চেষ্টা কেষ্টা ছাড়া কি
ভৃত্য মেলে না আর!"
শুনে মহা রেগে ছুটে যাই বেগে,
আনি তার টিকি ধরে,'—
বলি তারে "পাজি, বেরো তুই আজই,
দূর করে দিনু তোরে!"
ধীরে চলে যায়, ভাবি, গেল দায়;—
পরদিনে উঠে দেখি
হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে
বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি!
প্রসন্ন মুখ, নাহি কোন দুখ,
অতি অকাতর চিত্ত!
ছাড়ালে না ছাড়ে, কি করিব তারে,
মোর পুরাতন ভৃত্য!

সে বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা
করিয়া দালাল-গিরি।
করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন
বারেক আসিব ফিরি।

পরিবার তার সাথে যেতে চায়,—
বুঝায়ে বলিনু তারে—
পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য ;—
নহিলে খরচ বাড়ে !
লয়ে রশারশি করি কশাকশি
পোঁটলা পুঁটুলি বাঁধি'
বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে
গৃহিণী কহিল কাঁদি,—
"পরদেশে গিয়ে কেষ্টারে নিয়ে
কষ্ট অনেক পাবে !"
আমি কহিলাম "আরে রাম রাম !
নিবারণ সাথে যাবে !"
রেলগাড়ি ধায় ;—হেরিলাম হায়
নামিয়া বর্দ্ধমানে—
কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত
তামাক্ সাজিয়া আনে !
স্পর্দ্ধা তাহার হেন মতে আর
কত বা সহিব নিত্য !
যত তারে দুষি' তবু হনু খুসি
হেরি পুরাতন ভৃত্য !

নামিনু শ্রীধামে ; দক্ষিণে বামে
পিছনে সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা
করিল কণ্ঠাগত !

জন ছয় সাতে মিলি একসাথে
পরম বন্ধুভাবে
করিলাম বাসা, মনে হল আশা
আরামে দিবস যাবে!
কোথা ব্রজবালা, কোথা বনমালা,
কোথা বনমালী হরি!
কোথা, হা হন্ত, চিরবসন্ত!
আমি বসন্তে মরি!
বন্ধু যে যত স্বপ্নের মত
বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ।
আমি একা ঘরে, ব্যাধি-খরশরে
ভরিল সকল অঙ্গ!
ডাকি নিশিদিন সকরুণ ক্ষীণ—
"কেষ্ট আয় রে কাছে!
এতদিনে শেষে আসিয়া বিদেশে
প্রাণ বুঝি নাহি বাঁচে!"
হেরি তার মুখ ভরে' ওঠে বুক,
সে যেন পরম বিত্ত!
নিশিদিন ধরে' দাঁড়ায়ে শিয়রে
মোর পুরাতন ভৃত্য!

মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল,
শিরে দেয় মোর হাত;
দাঁড়ায়ে নিঝুম, চোখে নাই ঘুম,
মুখে নাই তার ভাত।

বলে বার বার, "কর্ত্তা, তোমার
কোন ভয় নাই, শুন,
"যাবে দেশে ফিরে, মা-ঠাকুরাণীরে
দেখিতে পাইবে পুন।"
লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম;
তাহারে ধরিল জ্বরে;
নিল সে আমার কাল-ব্যাধিভার
আপনার দেহ পরে!
হয়ে জ্ঞানহীন কাটিল দুদিন
বন্ধ হইল নাড়ি।
এতবার তারে গেনু ছাড়াবারে,
এতদিনে গেল ছাড়ি'!
বহুদিন পরে আপনার ঘরে
ফিরিনু সারিয়া তীর্থ।
আজ সাথে নেই চিরসাথী সেই
মোর পুরাতন ভৃত্য!

১২ ফাল্গুন, ১৩০১।

নৃত্যকলা।

আমাদের শাস্ত্রে গীত ও বাদ্যের সহিত নৃত্যও সঙ্গীতের অঙ্গ-স্বরূপ গণ্য হইয়াছে; কিন্তু উক্ত কলাদ্বয় অপেক্ষা নৃত্যের এতটা অধঃপতন হইয়াছে যে, ইহাকে উহাদের এক শ্রেণীভুক্ত বলিয়া

মনেই হয় না। চতুঃষষ্টি কলার তালিকা দেখিলে, পুরাকালে কলা শব্দের সহিত যে বিশেষ উচ্চ ভাব জড়িত ছিল তাহা মনে হয় না। বোধ করি সেই জন্যই কালিদাস উচ্চ অঙ্গের কলাবিদ্যাগুলিকে "ললিত কলা" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইংরাজিতে যাহাকে "Fine arts" বলে বাঙ্গলায় বোধ করি তাহাকে ললিত কলা শব্দে অনুবাদ করা যাইতে পারে। কেহ কেহ ফাইন্ আর্ট্স্‌কে বাঙ্গলায় "সূক্ষ্মশিল্প" বলিয়া থাকেন,সেটা আমাদের কানে বড়ই বর্ব্বর ঠেকে।

যাহা হউক, প্রাচীনকালে নৃত্যও সম্ভবতঃ "ললিত কলা" উপাধিতে সম্মান প্রাপ্ত হইত; বর্ত্তমানকালে তাহাকে গীত, বাদ্য, আলেখ্য, নাট্য প্রভৃতির সহিত সমান আসন দেওয়া হয় না।

কিন্তু আমাদের মতে নৃত্যের মধ্যে এমন কোন মূলগত দোষ নাই, যে জন্য উহাকে হীনপদবীতে নামাইয়া দেওয়া যায়। অভিধানে নৃত্য শব্দের সহিত বিলাসিতার ভাব জড়িত আছে বটে—সবিলাসোঽঙ্গবিক্ষেপোনৃত্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ—কিন্তু এ সংজ্ঞা আজকাল খাটে বলিয়া বোধ হয় না। তালমানযুক্ত অঙ্গচালনা মাত্রকেই বাঙ্গলা ভাষায় নৃত্য বলা হয়, এবং তাহার উপর, ভাবোদ্রেক করা উহার উদ্দেশ্য হইলে, আধুনিক মত অনুসারেও নৃত্যকে কলার মধ্যে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া আমাদের দেশেও যে নৃত্যকে চিরকাল হেয় জ্ঞান করা হইত, এমন বোধ হয় না। আদিম মনুষ্য যে আনন্দভরে প্রথম গাহিয়া উঠিয়াছিল, সেই আনন্দেরই প্রভাবে নৃত্যও করিয়াছিল; দুইই সমান স্বাভাবিক এবং দুইয়ের মধ্যে নৃত্যই সম্ভবতঃ আগে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। পর্য্যটকেরা বলেন যে অসভ্য জাতি সকল এতই নৃত্যপ্রিয় যে, যে কোন রকম তালযুক্ত আওয়াজ শুনিলে তাহারা আর থাকিতে পারে না—একেবারে শ্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নাচিতে

থাকে। আমাদের দেশের সাঁওতাল কোল প্রভৃতি জাতি দেখিলে ইহা বুঝা যায়। ইহা হইতে মনে হয় যে, মনুষ্যের শরীর মনের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিবার উপায় যে নৃত্য, তাহাকে অনাদরে সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেওয়া সুবিচার নহে।

কিন্তু নৃত্য কথার অর্থ যাহাই হোক না কেন, আমাদের ভদ্র সমাজে যেরূপে উহার চর্চ্চা হইয়া থাকে, তাহাতে উহার সহিত উচ্চ বা প্রীতিকর ভাবের সম্পর্ক দেখা যায় না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং এ আকারে যে উহা অধিক দিন আমাদের সমাজে থাকিবে না, থাকাও বাঞ্ছনীয় নহে, সে বিষয়েও মতভেদ হইতে পারে না।

প্রচলিত নৃত্যে না থাকে সৌন্দর্য্য না পাওয়া যায় ভাব না দেখা যায় কোন দ্রষ্টব্য বিষয়; এবং আশ্চর্য্য এই যে ইহা বুঝিয়াও অনেকে প্রথা অনুসারে নাচ দিয়া থাকেন। কোন ভদ্রলোকের বাড়িতে নাচের নিমন্ত্রণ হইলে কি দেখা যায়? বাড়ির লোকেরা আতিথ্যে ব্যস্ত, প্রবীণেরা নিদ্রাকুল, নবীনেরা গল্পে মত্ত; এদিকে নাচওয়ালী সারঙ্গীওয়ালার সজোরে মাথা নাড়া এবং তবলাওয়া-লার সশব্দ বাহবা ব্যতীত অন্য কোন উৎসাহের অভাবে দস্তুরমত হাতপা নাড়িতেছে—নিরানন্দ রেখাঙ্কিত মুখে হাসির ভাণ, বে-মানান বে-ঢপ্‌-কাপড় পরিয়া ভাবব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গীর চেষ্টা, মলিনতা ও কলঙ্কের মধ্য দিয়া সৌন্দর্য্য বিকাশের প্রয়াস!—দেখিলে মনে হয় যেন প্রমোদের কঙ্কাল সৌন্দর্য্যের বিদ্রূপমাত্র দেখিতেছি। ভদ্রলোকের বাড়িতে উক্ত প্রকারে এই রীত রক্ষা হইয়া থাকে,—যাহারা আচরণের দ্বারা ভদ্রনাম হারাইয়াছে, তাহাদের নাচের মজলিস সম্বন্ধে আলোচনা না করাই ভাল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এরূপ নৃত্য থাকিয়াও ফল নাই,

থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। এ প্রথায় নৃত্যের কোন উদ্দেশ্যই সফল হয় না। নৃত্যের দ্বারা দুই ভিন্ন কার্য্য সাধন হইতে পারে—অঙ্গচালনা এবং ভাবোদ্রেক। আর একজনকে নাচিতে দেখিয়া প্রথমটির কোন সুবিধা হয় না এবং যে শ্রেণীর লোকেরা নৃত্য করিয়া থাকে, তাহাদের দ্বারা দ্বিতীয়টি হওয়া অসম্ভব।

আজকাল কোন বিষয়ে শুধু দেশী প্রথার আলোচনা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। বিলাতফেরতারা, যাঁরা স্বয়ং ইংরাজ-রমণীর সহিত নাচিয়া আসিয়াছেন, তাঁরা আমাদের দেশে য়ুরোপীয় প্রণালীর নৃত্য চলিত হইলে সুখী হন! পাঠকেরা বোধ হয় অবগত আছেন এ প্রণালী কিরূপ। বাজনা খেমটা বা কাওয়ালী তালে বাজিয়া উঠিলেই উপস্থিত স্ত্রী পুরুষ সকলে পরস্পরের সহিত জোড়া বাঁধিয়া ১, ২, ৩ বা ১, ২, ৩, ৪ মাত্রা অনুসারে পা ফেলিতে ফেলিতে ঘরময় ঘুরিয়া বেড়ান— ১০। ১৫ মিনিট এরূপ করিলে একটা নাচ সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু আর অধিক বর্ণনা বোধ করি আবশ্যক নাই, প্রকৃত বঙ্গসন্তান ইতিমধ্যেই, অপরিচিত বা অল্পপরিচিত স্ত্রীপুরুষে পরস্পরের আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া ঘূর্ণ্যমান হইবার চিত্রে, যথেষ্ট ভীত হইয়া থাকিবেন। আমাদেরও এ বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে সম্পূর্ণ মতের ঐক্য আছে, সুতরাং এ প্রথা 'সভ্যতম' জাতি সকলের অনুমোদিত হইলেও, আমাদের পক্ষে উহাকে বাদ দিয়া কথা কহাই ভাল।

স্ত্রী এবং পুরুষের স্বতন্ত্রভাবে নৃত্যেরও বড় সুবিধা দেখা যায় না। শুধু অসভ্য জাতিদের মধ্যে নহে, এমন অনেক সভ্যজাতিও আছে যাহাদের মধ্যে দিনের কর্ম্ম শেষ হইবার পর, গ্রামের সকলে একত্র হইয়া, যুবক যুবতীরা নৃত্যে মাতিয়া, বৃদ্ধেরা দেখিয়া, বালকবালিকারা শিখিয়া প্রচুর আনন্দ উপভোগ করে। এরূপ প্রথায়,

কোন প্রকার যুক্তির দ্বারা, ভাল বৈ মন্দ কিছুই পাওয়া যায় না! বাউল বৈষ্ণব প্রভৃতিরাও কীর্ত্তন করিতে করিতে নাচিয়া থাকে, কিন্তু আমাদের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় সকল বিষয়ে কিছু অধিক গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে—কোন প্রকার দেহচাঞ্চল্য বা সরল আনন্দ প্রকাশ বা এমন কোন কার্য্য যাহাতে ছেলেমানুষী লেশমাত্র প্রকাশ পায়, তাহার প্রতি উঁহাদের সম্পূর্ণ বিরাগ দেখা যায়! এরূপ অবস্থা যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞতার আধিক্য বশতঃ ঘটিয়াছে, তাহাও ঠিক করিয়া বলা যায় না—যাহারা হাঁচি টিকটিকির সহিত নিজ অদৃষ্টের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুভব করে, এবং যাহারা গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্রন্দনকে ঐহিক, ও পুতুলখেলাকে পারত্রিক উন্নতির উপায় মনে করে, তাহাদের মধ্যে ছেলেমানুষী মোটে নাই বলিলে অন্যায় হয়।

যাহা হউক এ সকল দুরূহ আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাজ নাই। আপাততঃ এইটুকু দেখা যাইতেছে যে, যে কয়প্রকার নৃত্যের উল্লেখ করা গেল, তাহার মধ্যে, একটা না একটা কারণে, কোনটাই আমাদের সমাজে চলিবার বিশেষ সুবিধা নাই।

পাঠক হয়ত এতক্ষণে চটিয়া উঠিয়াছেন—কোন প্রস্তাবই যদি সম্ভবপর না হয় তবে এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কি? এ প্রবন্ধে দুইটি বক্তব্য আছে। প্রথমটি এই যে আমাদের সুগম্ভীর সুসংযত দেশেও এক দল আছে যাহাদের ছেলেমানুষীর প্রতি একান্ত বিরাগ নাই—ইহারা আর কেহ নহে বালক বালিকার দল। ইহারা, আদিকাল হইতে আজও পর্য্যন্ত, এবং পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, একই স্বভাবসম্পন্ন। ইহাদের সুবিধা অনুসারে, দেশীয় অথবা বিদেশীয় নানা প্রকার নৃত্য শিখাইলে যেমন সুসঙ্গত ও সুশোভন হয়, তেমনি উঁহাদেরও পিতামাতাদের উভয়ের পক্ষে

আনন্দদায়ক হয়; তাহার উপর ইহাতে ছেলেদের শারীরিক ও মানসিক শিক্ষার বিশেষ সহায়তা করে।

শারীরিক শিক্ষা কথাটা হয়ত একটু অদ্ভুত শুনাইবে। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, শরীর হৃষ্টপুষ্ট হইলে তাহার আর কোন অভাব থাকে না। কিন্তু যেমন, একটা লোক স্বভাবতঃ যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন, বিদ্যাশিক্ষা না করিলে সে বুদ্ধিকে সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করিতে পারিবে না, সেইরূপ দেহ যতই বলিষ্ঠ হোক না কেন, সে দেহের উপযুক্ত শিক্ষা না হইলে, তাহার দ্বারা দৈনিক সহজ কার্য্যগুলি শোভনরূপে, ও কোন কঠিন কার্য্য অনায়াসে হইবে না। সুতারের কাঠ প্রভৃতি সম্বন্ধে, অথবা কামারের লোহা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আছে; সুশিক্ষিত ভদ্রলোকের, ব্যবসায়ী অপেক্ষা, বিশেষ বিষয়ে কম জ্ঞান থাকিলেও, সাধারণ জ্ঞান অধিক থাকা উচিৎ; সেইরূপ সচরাচর ভদ্রলোক পাকা দাঁড়ির মত দাঁড় টানাতে অথবা পাকা লাঠিয়ালের মত লাঠি খেলাতে মজবুত না হইলেও, তাহার সাধারণ শারীরিক পটুতা ইহাদের অপেক্ষা অধিক হওয়া উচিৎ, অর্থাৎ উঠা, বসা, চলা, খেলা এবং ভদ্রলোকের অবশ্যকর্ত্তব্য সকল কার্য্যই উহার নিপুণ এবং শোভনরূপে করিতে পারা উচিৎ।

এ বিষয়ে আমাদের মনোযোগ কতটা কম এবং অভাব কতটা বেশী তাহা ইংরাজদের সহিত তুলনা না করিলে সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায় না। আমাদের চলিবার সময়ে এলাগোলা ভাব, যেন গায়ের সহিত হাত পা মাথা ভাল করিয়া জোড়া হয় নাই; আমাদের কোমর ভাঙ্গিয়া কুঁজা হইয়া বসা, আমাদের এলোমেলো ভাবে দাঁড় টানা, টেনিস্ প্রভৃতি খেলা;—ইহার সহিত ইংরাজদের যেন স্প্রিংবসানো অনায়াস চাল, সহজ ভাবে খাড়া হইয়া বসা,

সুছাঁদভাবে ব্যায়াম করা তুলনা করিয়া দেখিলে, তবেই প্রকৃত পক্ষে, শিক্ষিত শরীর কাহাকে বলে, তাহা বুঝা যায়। বিলাতে গেলে, শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায়ের কি মেয়ের কি পুরুষের প্রত্যেক ছোটখাট কার্য্য করিবার শোভনতায় মুগ্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

এরূপ শিক্ষার অবশ্য অনেক রকম উপায় হইতে পারে, কিন্তু তাহার মধ্যে ছেলেবেলায় উপযুক্ত লোকের নিকট নাচ শেখাটা যেমন সহজ, তেমনি প্রীতিকর, এবং ইহা, অন্যান্য পড়াশুনার উপর একটা উপরি বোঝা না হইয়া, বরং ছেলেমেয়েদের নিকট ছুটির সময়ের একটা খেলার মত বোধ হইবে। এরূপ শারীরিক গতি-সংযম অভ্যাস করার অনেক স্বাস্থ্যকর সুফল আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই ত গেল অঙ্গচালনা হিসাবে নৃত্য। এখন দেখা যাক্ কলা হিসাবে, অর্থাৎ সঙ্গীতের অঙ্গহিসাবে উহাকে কি স্থান দেওয়া যাইতে পারে। ভাবপ্রকাশের তিন অঙ্গ আছে; কথা, সুর এবং অঙ্গভঙ্গী। আমরা যখন বিশেষরূপে সৌন্দর্য্যভাবকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি, তখন কথাকে সুন্দর কবিতায়, সুরকে সুন্দর সঙ্গীতে এবং অঙ্গভঙ্গীকে সুন্দর নৃত্যে পরিণত করিলে তবে আমাদের উদ্দেশ্য প্রকৃষ্টরূপে সাধিত হইতে পারে। আমাদের দেশেও ভাব বাৎলান নৃত্যের একটা অঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু সচরাচর যে রকম ভাব বাৎলান হইয়া থাকে তাহা সন্তোষজনক নহে—তাহাতে সঙ্গীতের ভাবকে হৃদয়গ্রাহী করিবার বড় সাহায্য করে না, বরং মনকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। ইহার কারণ এই যে, গানের মুখ্য ভাবের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, আনুষঙ্গিক ছোটখাট ভাবের প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া হয়। ‘পিয়া’র নিকট

যখন একজন লোক যাইতেছে এবং পথে বজ্রবিদ্যুতে চকিত হইয়া উঠিতেছে, তখন সে ব্যক্তি 'বিজুলি চম্‌কানো'তে কি রূপে ভয় পাইতেছে তাহাই বেশী করিয়া দেখান হয়; গানের যেটা আসল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ শ্রোতার মনে উক্ত বিরহীর উদ্বিগ্ন চিত্তের একটি চিত্র আনয়ন করা, তাহার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় না।

তাহা ছাড়া ভাববাৎলান আর অভিনয়ে যে প্রভেদ আছে সেটাও মনে রাখা কর্ত্তব্য। শেষোক্তের ন্যায় সম্পূর্ণ চিত্র প্রদর্শন করা ভাববাৎলানর উদ্দেশ্য নহে। গানের ভাবকে পরিস্ফুটন কার্য্যে সহায়তা করাই উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য; সেই জন্য, দুঃখের গানে ম্লান মুখভাব ও অঙ্গে শিথিলতার ভঙ্গী, সুখের গানে মুখে ঈষৎহাসি ও দেহের সোৎসাহ ভাব, উত্তেজনার গানে বিস্ফারিত বক্ষ, ঋজু দেহ, আবশ্যকমত উত্তেজনার ভঙ্গীতে হস্তোত্তলন বা পদাঘাত,—এইরূপ শারীরিক ইঙ্গিতমাত্রই ব্যবহার করা উচিত, কারণ রীতিমত অভিনয় কেবল নাট্যমঞ্চের আশপাশের সমস্ত আয়োজনের মধ্যেই সত্য বলিয়া মনে হয়; উহার বাহিরে বড় ন্যাকামির মত দেখায়। তবে যেরূপ ভাববাৎলান অনুমোদন করা গেল তাহাকেও ঠিক নৃত্যের অঙ্গ বলা যায় না।

অর্থাৎ, কোন রূপ নকল করা নৃত্যেরও অঙ্গ নহে সঙ্গীতেরও অঙ্গ নহে। গানের কথায় কোথাও যদি থাকে দোয়েল ডাকিতেছে অমনি যদি হঠাৎ দোয়েলের মত শিশ্‌ দিয়া উঠা যায় তবে তাহার মধ্যে যতই নৈপুণ্য থাক্‌ তাহা উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীতের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। পাখীর গান শুনিয়া মনে যে একটা অনির্দ্দিষ্ট সৌন্দর্য্যের ভাব জাগ্রত হয়, সঙ্গীতও সুরের বিন্যাস করিয়া শ্রোতার মনে সেই জাতীয় ভাবের উদ্রেক করিতে চেষ্টা করে—পাখীর গানের অবিকল নকল করিয়া সে উদ্দেশ্য সাধন করে না।

তেমনি প্রিয়সমাগমোৎসুক নায়িকা সাজসজ্জা করিতেছে এই বর্ণনাটির মধ্যে যে একটি সৌন্দর্য্যের ভাব জড়িত আছে, সুন্দর নৃত্য সেই ভাবটি মাত্র জাগ্রত করিবার সহায়তা করে—সাজসজ্জা করিবার কাজগুলির অবিকল নকল করিবার চেষ্টা করা কলা-কৌশলের অদ্ভুত বিড়ম্বনা মাত্র। হর্‌বোলার বিদ্যাটাকে যদি সঙ্গীত বিদ্যা বলা যায়, তবে আমাদের প্রচলিত নৃত্যের ভাববাৎলা-নোকেও নৃত্য নাম দেওয়া যাইতে পারে।

আজকাল, কলা হিসাবে, নৃত্যকে প্রধানতঃ গীতিনাট্যে স্থান দেওয়া উচিত। আমাদের দেশে গীতিনাট্য এখনো সেরূপ প্রতি-পত্তি লাভ করে নাই। অনেকে উহার উদ্দেশ্য এবং অর্থ বুঝিতেই পারেন না। তাঁহারা বলেন, নাটকের উদ্দেশ্য প্রকৃত জীবনের একটি সঠিক চিত্র প্রদর্শন করা। কিন্তু প্রকৃত জীবনে লোকে কবিতাতেও কথা কহে না, সুর করিয়াও ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে না। তবে এরূপ ছেলেখেলার অর্থ কি? এ রকম কল্পনা-শক্তিহীন লোককে সংক্ষেপে উত্তর দিতে হইলে এই বলিতে হয় প্রকৃত জীবনে যাহা ঘটিতেছে নাট্যমঞ্চে তাহাই যদি যথাযথভাবে দেখিতে চাও তবে আসল ছাড়িয়া নকল দেখিবার কি আবশ্যক? রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া দেখ না। প্রকৃত পক্ষে, নাটক আমাদিগকে সংসারের অবিকল নকল দেখায় না—পরন্তু সংসারের ভিতর-কার যে গভীর সুখ দুঃখ ও সৌন্দর্য্য যাহা বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন সামান্য-ভাবে আমাদের চোখে পড়ে নাটক তাহাকেই সংহত সমগ্র সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের সম্মুখে উপনীত করে—সংসারযাত্রার অবিকল নকল করিলে আমরা তাহা কখনই পাইতাম না। এই জন্য নাট্যাভিনয় ব্যাপারটাও স্বভাবের মাছিমারা নকল নহে। এক ত নাট্যমঞ্চই নাটকের বিষয়টাকে সাধারণ সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন

করিয়া একটা স্বতন্ত্র কৃত্রিম গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ করিয়া ফেলে;—কারণ দর্শকের মনে এমন একটি মোহসঞ্চার করা আবশ্যক যাহাতে তাহারা প্রকৃত সংসারকে ভুলিতে পারে—যাহাতে তাহারা মনে করিতে পারে এমন একটি জগতে গিয়াছি যেখানে প্রকৃত জগতের শত সহস্র অপ্রাসঙ্গিতা বিচ্ছিন্নতা তুচ্ছতা নাই—যেখানে একটা হইতে আরেকটা আসিয়া পড়ে না, যেখানে রসভঙ্গ নাই, ঘটনাসূত্রের বিচ্ছেদ নাই, যেখানে অন্তরের অত্যন্ত সুগভীর দুরূহ দুষ্প্রকাশ্য ভাবগুলিও লোকে সহজে সুন্দররূপে ব্যক্ত করিতে পারে, যেখানে সংসারের তুচ্ছ প্রথা ও অভ্যাসের আবরণগুলি অপসারিত করিয়া দিয়া মানবের গূঢ় প্রবল মনোভাবগুলি মেঘমুক্ত সূর্য্য হইতে সূর্য্যরশ্মির মত প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অতএব যখন গীতিনাট্য দেখিতে প্রস্তুত হইব তখন যবনিকা উঠিলেই, কল্পনার রথে আরোহণ পূর্ব্বক, প্রতিদিনকার গন্থরাজ্য ছাড়িয়া, সৌন্দর্য্যের মায়ারাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইতে হইবে। সেখানে অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, কবিতায় কথা হয়, সুরে ভাব ব্যক্ত হয় এবং সেখানকার সুন্দর নরনারীগণ মনোহরবেশে সুরম্যস্থানে সুসজ্জিত হইয়া থাকে। এ রাজ্যে যে কখনো গিয়াছে সেই আমাদের এ কথারও সার্থকতা বুঝিতে পারিবে যে, এ রাজ্যের স্বাভাবিক চলাফেরাও নৃত্য হওয়া উচিত। দুঃখের শিথিলতা, সুখের হিল্লোল, আনন্দের উচ্ছ্বাস, ক্রোধের মত্ততা প্রভৃতি মনের ভাবের সকল রকম বাহিক প্রকাশের উপযুক্ত নৃত্য—তালে ঈষৎ শরীর আন্দোলন হইতে গতির প্রবলতা বা সুনিপুণ দ্রুত পদক্ষেপ পর্য্যন্ত—পাওয়া যাইতে পারে।

গীতিনাট্যে বাজনা এবং নাচ, উভয়েরই ব্যবহারে আমরা য়ুরোপীয়দের তুলনায় অনেক পিছাইয়া আছি। ফাল্গুন মাসের

সাধনায় আমরা, গানের সহিত বাজনার যোজনাতে য়ুরোপীয় প্রণালীর দ্বারা কি রকমের সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। নাচ সম্বন্ধেও এ কথা বলা যাইতে পারে যে, য়ুরোপের গীতিনাট্যে এবং অন্যত্র, উহা কি প্রকারে ব্যবহার হইয়া থাকে দেখিলে, নৃত্যকে কি উপায়ে ভাবোদ্রেকের কাজে লাগাইতে হয়, সে বিষয়ে ধারণা হইবে।

সরলতা।

স্রোতস্বিনী কোন এক বিখ্যাত ইংরাজ কবির উল্লেখ করিয়া বলিলেন, কে জানে, তাঁহার রচনা আমার কাছে ভাল লাগে না।

দীপ্তি আরো প্রবলতরভাবে স্রোতস্বিনীর মত সমর্থন করিলেন।

সমীরণ কখন পারতপক্ষে মেয়েদের কোন কথার স্পষ্ট প্রতিবাদ করে না। তাই সে একটু হাসিয়া ইতস্তত করিয়া কহিল, কিন্তু অনেক বড় বড় সমালোচক তাঁহাকে খুব উচ্চ আসন দিয়া থাকেন।

দীপ্তি কহিলেন, আগুন যে পোড়ায় তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য কোন সমালোচকের সাহায্য আবশ্যক করে না—তাহা নিজের বাম হস্তের কড়ে আঙুলের ডগার দ্বারাও বোঝা যায়—ভাল কবিতার ভালত্ব যদি তেমনি অবহেলে না বুঝিতে পারি তবে আমি তাহার সমালোচনা পড়া আবশ্যক বোধ করি না।

আগুনের যে পোড়াইবার ক্ষমতা আছে সমীরণ তাহা জানিত, এই জন্য সে চুপ করিয়া রহিল; কিন্তু ব্যোম বেচারার সে

সকল বিষয়ে কোনরূপ কাণ্ডজ্ঞান ছিল না এই জন্য সে উচ্চস্বরে আপন স্বগত-উক্তি আরম্ভ করিয়া দিল।

সে বলিল—মানুষের মন মানুষকে ছাড়াইয়া চলে, অনেক সময়ে তাহাকে নাগাল পাওয়া যায় না;——

ক্ষিতি তাহাকে বাধা দিয়া কহিল—ত্রেতাযুগে হনুমানের শত যোজন লাঙ্গুল শ্রীমান্ হনুমানজীউকে ছাড়াইয়া বহুদূরে গিয়া পৌঁছিত;—লাঙ্গুলের ডগাটুকুতে যদি উকুন বসিত তবে তাহা চুলকাইয়া আসিবার জন্য ঘোড়ার ডাক বসাইতে হইত। মানুষের মন হনুমানের লাঙ্গুলের অপেক্ষাও সুদীর্ঘ, সেই জন্য এক এক সময়ে মন যেখানে গিয়া পৌঁছায়, সমালোচকের ঘোড়ার ডাক ব্যতীত সেখানে হাত পৌঁছে না। ল্যাজের সঙ্গে মনের প্রভেদ এই যে, মনটা আগে আগে চলে এবং ল্যাজটা পশ্চাতে পড়িয়া থাকে—এই জন্যই জগতে ল্যাজের এত লাঞ্ছনা এবং মনের এত মাহাত্ম্য।

ক্ষিতির কথা শেষ হইলে ব্যোম পুনশ্চ আরম্ভ করিল—বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য জানা, এবং দর্শনের উদ্দেশ্য বোঝা, কিন্তু কাণ্ডটি এমনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, বিজ্ঞানটি জানা এবং দর্শনটি বোঝাই অন্য সকল জানা এবং অন্য সকল বোঝার অপেক্ষা শক্ত হইয়া উঠিয়াছে;—ইহার জন্য কত ইস্কুল, কত কেতাব, কত আয়োজন আবশ্যক হইয়াছে! সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা, কিন্তু সেই আনন্দটি গ্রহণ করাও নিতান্ত সহজ নহে—তাহার জন্যও বিবিধ প্রকার শিক্ষা এবং সাহায্যের প্রয়োজন। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, দেখিতে দেখিতে মন এতটা অগ্রসর হইয়া যায়, যে, তাহার নাগাল পাইবার জন্য সিঁড়ি লাগাইতে হয়। যদি কেহ অভিমান করিয়া বলেন, যাহা বিনা শিক্ষায় না জানা যায় তাহা

বিজ্ঞান নহে, যাহা বিনা চেষ্টায় না বোঝা যায় তাহা দর্শন নহে এবং যাহা বিনা সাধনায় আনন্দ দান না করে তাহা সাহিত্য নহে, তবে কেবল খনার বচন, প্রবাদ বাক্য এবং পাঁচালি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে।

সমীরণ কহিল, মানুষের হাতে সব জিনিষই ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠে। অসভ্যেরা যেমন-তেমন চীৎকার করিয়াই উত্তেজনা অনুভব করে, অথচ আমাদের এমনি গ্রহ, যে, বিশেষ অভ্যাস-সাধ্য শিক্ষাসাধ্য সঙ্গীত ব্যতীত আমাদের সুখ নাই; আরো গ্রহ এই, যে, ভাল গান করাও যেমন শিক্ষাসাধ্য, ভাল গান হইতে সুখ অনুভব করাও তেমনি শিক্ষাসাধ্য। তাহার ফল হয় এই, যে, এক সময়ে যাহা সাধারণের ছিল, ক্রমেই তাহা সাধকের হইয়া আসে। চীৎকার সকলেই করিতে পারে, এবং চীৎকার করিয়া অসভ্য সাধারণে সকলেই উত্তেজনাসুখ অনুভব করে—কিন্তু গান সকলে করিতে পারে না এবং গানে সকলে সুখও পায় না। কাজেই, সমাজ যতই অগ্রসর হয় ততই অধিকারী এবং অনধিকারী, রসিক এবং অরসিক এই দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে থাকে।

ক্ষিতি কহিল, মানুষ বেচারাকে এমনি করিয়া গড়া হইয়াছে, যে, সে যতই সহজ উপায় অবলম্বন করিতে চায় ততই দুরূহতার মধ্যে জড়ীভূত হইয়া পড়ে। সে সহজে কাজ করিবার জন্য কল তৈরি করে কিন্তু কল জিনিষটা নিজে এক বিষম দুরূহ ব্যাপার; সে সহজে সমস্ত প্রাকৃতজ্ঞানকে বিধিবদ্ধ করিবার জন্য বিজ্ঞান সৃষ্টি করে কিন্তু সেই বিজ্ঞানটাই আয়ত্ত করা কঠিন কাজ; সুবিচার করিবার সহজ প্রণালী বাহির করিতে গিয়া আইন বাহির হইল, শেষকালে আইনটা ভাল করিয়া বুঝিতেই দীর্ঘজীবী লোকের বারো আনা জীবনদান করা আবশ্যক হইয়া পড়ে; সহজে আদান-

প্রদান চালাইবার জন্ম টাকার সৃষ্টি হইল, শেষকালে টাকার সমস্যা এমনি এক সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে, যে, মীমাংসা করে কাহার সাধ্য! সমস্ত সহজ করিতে হইবে এই চেষ্টায় মানুষের জানা শোনা খাওয়া দাওয়া আমোদ প্রমোদ সমস্তই অসম্ভব শক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

স্রোতস্বিনী কহিলেন—সেই হিসাবে কবিতাও শক্ত হইয়া উঠিয়াছে; এখন মানুষ খুব স্পষ্টতঃ দুইভাগ হইয়া গিয়াছে; এখন অল্প লোকে ধনী এবং অনেকে নির্দ্ধন, অল্প লোকে গুণী এবং অনেকে নির্গুণ; এখন কবিতাও সর্ব্বসাধারণের নহে, তাহা বিশেষ লোকের; সকলি বুঝিলাম। কিন্তু কথাটা এই, যে, আমরা যে বিশেষ কবিতার প্রসঙ্গে এই কথাটা তুলিয়াছি, সে কবিতাটা কোন অংশেই শক্ত নহে; তাহার মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা আমাদের মত লোকও বুঝিতে না পারে—তাহা নিতান্তই সরল, অতএব তাহা যদি ভাল না লাগে তবে সে আমাদের বুঝিবার দোষে নহে।

ক্ষিতি এবং সমীরণ ইহার পরে আর কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করিল না। কিন্তু ব্যোম অম্লান মুখে বলিতে লাগিল—যাহা সরল তাহাই যে সহজ এমন কোন কথা নাই। অনেক সময় তাহাই অত্যন্ত কঠিন, কারণ, সে নিজেকে বুঝাইবার জন্য কোনপ্রকার বাজে উপায় অবলম্বন করে না,—সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে; *তাহাকে না বুঝিয়া চলিয়া গেলে সে কোনরূপ কৌশল করিয়া* ফিরিয়া ডাকে না। সরলতার প্রধান গুণ এই যে, সে একেবারে অব্যবহিত ভাবে মনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে—তাহার কোন মধ্যস্থ নাই। কিন্তু যে সকল মন মধ্যস্থের সাহায্য ব্যতীত কিছু গ্রহণ করিতে পারে না, যাহাদিগকে ভুলাইয়া আকর্ষণ করিতে

হয়, সরলতা তাহাদের নিকট বড়ই দুর্ব্বোধ। কৃষ্ণনগরের কারী-গরের রচিত ভিস্তি তাঁহার সমস্ত রং চং মশক্ এবং অঙ্গভঙ্গী দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয় এবং অভ্যাসের সাহায্যে চট্ করিয়া আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে—কিন্তু গ্রীক্ প্রস্তরমূর্ত্তিতে রং চং রকম সকম্ নাই—তাহা সরল এবং সর্ব্বপ্রকার প্রয়াসবিহীন। কিন্তু সরল বলিয়া তাহা সহজ নহে। সে কোনপ্রকার তুচ্ছ বাহ্যিক কৌশল অবলম্বন করে না বলিয়াই ভাবসম্পদ তাহার অধিক থাকা চাই।

দীপ্তি বিশেষ একটু বিরক্ত হইয়া কহিল—তোমার গ্রীক্ প্রস্তরমূর্ত্তির কথা ছাড়িয়া দাও! ও সম্বন্ধে অনেক কথা শুনি-য়াছি এবং বাঁচিয়া থাকিলে আরও অনেক কথা শুনিতে হইবে। ভাল জিনিষের দোষ এই, যে, তাহাকে সর্ব্বদাই পৃথিবীর চোখের সাম্‌নে থাকিতে হয়, সকলেই তাহার সম্বন্ধে কথা কহে, তাহার আর পর্দ্দা নাই, আব্রু নাই; তাহাকে আর কাহারও আবিষ্কার করিতে হয় না, বুঝিতে হয় না, ভাল করিয়া চোখ মেলিয়া তাহার প্রতি তাকাইতেও হয় না, কেবল তাহার সম্বন্ধে বাঁধিগৎ শুনিতে এবং বলিতে হয়। সূর্য্যের যেমন মাঝে মাঝে মেঘগ্রস্ত থাকা উচিত, নতুবা মেঘমুক্ত সূর্য্যের গৌরব বুঝা যায় না, আমার বোধ হয় পৃথিবীর বড় বড় খ্যাতির উপরে মাঝে মাঝে সেইরূপ অব-হেলার আড়াল পড়া উচিত—মাঝে মাঝে গ্রীক্ মূর্ত্তির নিন্দা করা ফেশান্ হওয়া ভাল, মাঝে মাঝে সর্ব্বলোকের নিকট প্রমাণ হওয়া উচিত যে, কালিদাস অপেক্ষা চাণক্য বড় কবি। নতুবা আর সহ্য হয় না। যাহা হউক্ ওটা একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা। আমার বক্তব্য এই, যে, অনেক সময়ে ভাবের দারিদ্র্যকে আচারের বর্ব্বরতাকে সরলতা বলিয়া ভ্রম হয়, অনেক সময় প্রকাশক্ষমতার

অভাবকে ভাবাধিক্যের পরিচয় বলিয়া কল্পনা করা হয়--সে কথা-টাও মনে রাখা কর্ত্তব্য।

আমি কহিলাম, কলাবিদ্যায় সরলতা উচ্চ অঙ্গের মানসিক উন্নতির সহচর। বর্ব্বরতা সরলতা নহে। বর্ব্বরতার রং চং আড়ম্বর আয়োজন অত্যন্ত বেশি। সভ্যতা অপেক্ষাকৃত নিরলঙ্কার। অধিক অলঙ্কার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু মনকে প্রতিহত করিয়া দেয়। আমাদের বাঙ্গলা ভাষায় কি খবরের কাগজে, কি উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যে সরলতা এবং অপ্রমত্ততার অভাব দেখা যায়;—সকলেই অধিক করিয়া, চীৎকার করিয়া, এবং ভঙ্গিমা করিয়া বলিতে ভালবাসে; বিনা আড়ম্বরে সত্য কথাটি পরিষ্কার করিয়া বলিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না; কারণ, এখনও আমাদের মধ্যে একটা আদিম বর্ব্বরতা আছে; সত্য সরল বেশে আসিলে তাহার গভীরতা এবং অসামান্যতা আমরা দেখিতে পাই না, ভাবের সৌন্দর্য্য কৃত্রিম ভূষণে এবং সর্ব্বপ্রকার আতিশয্যে ভারাক্রান্ত হইয়া না আসিলে আমাদের নিকট তাহার মর্য্যাদা নষ্ট হয়।

সমীরণ কহিল—কলাবিদ্যায়, সরলতা অর্থে দৈন্য নহে, সরলতা অর্থে স্বাভাবিক সংযম—বিনা চেষ্টায় বিনা আস্ফালনে নিজের সহজ স্বরূপে প্রকাশ হওয়া। সংযম ভদ্রতার একটি প্রধান লক্ষণ। ভদ্রলোকেরা কোন প্রকার গায়ে-পড়া আতিশয্য দ্বারা আপন অস্তিত্ব উৎকটভাবে প্রচার করে না;—বিনয় এবং সংযমের দ্বারা তাহারা আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকে। অনেক সময়ে সাধারণ লোকের নিকট সংযত সুসমাহিত ভদ্রতার অপেক্ষা আড়ম্বর এবং আতিশয্যের ভঙ্গিমা অধিকতর আকর্ষণজনক হয় কিন্তু সেটা ভদ্রতার দুর্ভাগ্য নহে সে সাধারণের ভাগ্যদোষ। সাহিত্যে

সংযম এবং আচারব্যবহারে সংযম উন্নতির লক্ষণ—আতিশয্যের দ্বারা দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাই বর্ব্বরতা।

আমি কহিলাম—এক আধটা ইংরাজি কথা মাপ করিতে হইবে। যেমন ভদ্রলোকের মধ্যে, তেমনি ভদ্র সাহিত্যেও, ম্যানার্ আছে কিন্তু ম্যানারিজ্‌ম্ নাই। ভাল সাহিত্যের বিশেষ একটি আকৃতি প্রকৃতি আছে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহার এমন একটি পরিমিত সুষমা যে আকৃতিপ্রকৃতির বিশেষত্বটাই বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে না। তাহার মধ্যে একটা ভাব থাকে, একটা গূঢ় প্রভাব থাকে, কিন্তু কোন অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা থাকে না। তরঙ্গভঙ্গের অভাবে অনেক সময়ে পরিপূর্ণতাও লোকের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়, আবার পরিপূর্ণতার অভাবে অনেক সময়ে তরঙ্গভঙ্গও লোককে বিচলিত করে, কিন্তু তাই বলিয়া এ ভ্রম যেন কাহারও না হয় যে, পরিপূর্ণতার সরলতাই সহজ এবং অগভীরতার ভঙ্গিমাই দুরূহ।

স্রোতস্বিনীর দিকে ফিরিয়া কহিলাম, উচ্চশ্রেণীর সরল সাহিত্য বুঝা অনেক সময় এই জন্য কঠিন, যে, মন তাহাকে বুঝিয়া লয় কিন্তু সে আপনাকে বুঝাইতে থাকে না।

দীপ্তি কহিল, নমস্কার করি,—আজ আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে। আর কখনও উচ্চ অঙ্গের পণ্ডিতদিগের নিকট উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করিয়া বর্ব্বরতা প্রকাশ করিব না।

স্রোতস্বিনী সেই ইংরাজ কবির নাম করিয়া কহিল, তোমরা যতই তর্ক কর এবং যতই গালি দাও, সে কবির কবিতা আমার কিছুতেই ভাল লাগে না।

স্বরলিপি।

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

চল্‌রে চল সবে ভারত-সন্তান,
মাতৃভূমি করে আহ্বান।
বীর-দর্পে পৌরুষ-গর্ব্বে
সাধ্‌রে সাধ্ সবে দেশের কল্যাণ॥
দেশ দেশান্তে, যাওরে আন্‌তে, নব নব জ্ঞান।
নব ভাবে, নবোৎসাহে, জাগো,
উঠাও রে নবতর তান॥
এক চিত্তে কর তপ, এক মন্ত্র জপ,
শিক্ষা, দীক্ষা, লক্ষ্য, ইচ্ছা, এক—
এক সুরে গাও সবে গান॥
লোকনিন্দা লোকভয়ে না করি দৃক্‌পাত,
যাহা শুভ, যাহা সত্য, ন্যায়,
তাহাতে জীবন কর দান॥
অপমান পদাঘাত স'বে কত আর,
তেজ, বীর্য্য, লজ্জা, মান—সব্
হয়েছে কি অন্তর্ধান?॥
উচ্চ গৌরবের তরে তুচ্ছ নয় কি প্রাণ?
হোক্ না যতই কঠিন ভীষণ বাধা,
ভেঙ্গে চুরে কর্ খান্ খান্॥

৬।০

২´ ৩ ০
। র্সাঃ র্সঃ নর্সা ধনা ॥ পনা ধর্সা না -া । পাঃ ক্ষপঃ গা পা ।
। চল্ রে চল্ সবে ॥ ভার ত,স স্তা ন্ । মা তৃ ভূ মি ।

। গগা রা সা শা। সা -গা সা গা। পা সসা গা পধা।
। করে আ হ্বা ন্। বী র্ দ র্পে। পৌ রুষ গ র্বে।

। র্সাঃ নঃ র্রর্সা র্সর্সা। ননা ধনা পা -ধা। র্সাঃ র্সঃ নর্সা ধনা॥
। সাধ্ রে সাধ্ সবে। দেশে র,ক ল্যা -ণ্। চল্ রে চল্ সবে॥

২
। র্সাঃ র্গঃ র্রা র্মা। র্গাঃ র্রঃ র্সা নধনা।
।(১) দেশ দে শা স্তে। যাও রে আন্ তে।
।(২) এ ক চি ত্তে। ক র ত- প্।
।(৩) লো ক নি ন্দা। লো ক ভ য়ে।
।(৪) অ প মা ন্। প দা ঘা ত।
।(৫) উ চ্চ গৌ র। বে র ত রে।

। পাঃ নঃ ধা র্সা। না -া -া -া।
।(১) ন ব ন ব। জ্ঞা — — ন।
।(২) এ ক ম ন্ত্র। জ — — প্।
।(৩) না ক রি দৃক্। পা — — ত্।
।(৪) স বে ক ত। আ — — র।
।(৫) তু চ্ছ নয় কি। প্রা — — ণ্।

। গা পা মা ধা। পা না ধা র্সা। না র্রা -া -া
।(১) ন ব ভা বে। ন বোৎ সা হে। জা গো — —
।(২) শী ক্ষা দী ক্ষা। ল ক্ষ্য ই চ্ছা। এ — — ক্
।(৩) যা হা শু ভ। যা হা স ত্য। ন্যা — — য়
।(৪) তে জ বী র্য। ল জ্জা মা ন্। স — — ব্
।(৫)হোক্ না য তই। ক ঠিন্ ভী ষণ্। বা ধা — —

।	র্গর্রা	র্মর্সা	নধা	পধা।	র্সা	-া	না	ধনা॥
।(১)	উঠা	ওরে	নব	তর।	তা	-ন্	স	বে॥
।(২)	এক	স্বরে	গাও	সবে।	গা	-ন্	স	বে॥
।(৩)	তাহা	তে,জী	বন	কর।	দা	-ন্	স	বে॥
।(৪)	হয়ে	ছে কি	অ	স্ত।	ধাঁ	-ন্	স	বে॥
।(৫)	ভেঙ্গে	চুরে	কর্	থান্।	থা	-ন্	স	বে॥

ব্যাখ্যা।

১। ক্ক=কড়ি মধ্যম।

২। দ্বিতীয় তাল সম হইতে এই গানের-আরম্ভ।

৩। গানের প্রত্যেক কলির শেষে যেখানে যুগল ছেদ দেখিবে, সেথান হইতে ফিরিয়া গিয়া গোড়ার যুগল ছেদ হইতে আবার গান আরম্ভ করিবে।

৪। ।=এক মাত্রা; ।ঃ=দেড় মাত্রা; ঃ=অর্দ্ধ মাত্রা।

৫। কলিগুলির সুর এক রকম বলিয়া স্বতন্ত্র স্বরলিপি না করিয়া একই স্বরলিপির নীচে কলিগুলি সংখ্যাঙ্কিত করিয়া যথাক্রমে পর-পর বসান হইয়াছে। প্রত্যেক কলির, প্রথম পংক্তিতে যে সংখ্যাঙ্ক দেখিবে, সেই সংখ্যাঙ্ক পরবর্ত্তী যে যে পংক্তির গোড়ায় সেই সেই পংক্তি পূর্ব্বেরই অনুবৃত্তি বলিয়া বুঝিবে।

মেয়েলি ব্রত।

১

রাম দুর্গা বা পূর্ণিমার ব্রত।

আমাদের দেশে পল্লিগ্রামের নারীসমাজে নানাবিধ বারব্রত প্রচলিত আছে। অবিবাহিতা বালিকা, যুবতী এবং বৃদ্ধা সকলেই কোন না কোন ব্রত করিয়া থাকেন। বয়স, এবং সধবা কি বিধবা ইত্যাদি অবস্থাভেদে ব্রতেরও অধিকারভেদ আছে। স্বামীকামনা,

পুত্রকামনা, স্বামী ও পুত্রের কল্যাণকামনা, ঐশ্বর্য্যকামনা, ইত্যাদিরূপ কাম্যবস্তুর উদ্দেশ্যে এই সকল ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্য ইহজন্মে সিদ্ধ হইতে পারে, জন্মান্তরেও হইতে পারে, সুতরাং ব্রতানুষ্ঠান নিষ্ফল, একথা বলিবার যো নাই। ব্রতচর্য্যা করিয়া যিনি ইহজন্মেই অভীষ্ট ফল লাভ করিলেন, তিনি ত পরম সৌভাগ্যশালিনী, যিনি তাহা পারিলেন না, তাঁহারও নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। আবার কোন কোন ব্রত কেবল পরজন্মের উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়, যেমন "দুধে-আল্‌তা" এবং "ধনগুছান"। যিনি অদৃষ্টবশতঃ ইহজন্মে শারীরিক শোভা সৌন্দর্য্যে বঞ্চিত হইয়াছেন, তিনি আগামী জন্মে দুগ্ধমিশ্রিত আল্‌তার ন্যায় চম্পকগৌরকান্তি লাভ করিবার জন্য "দুধে-আল্‌তা" ব্রত করিয়া থাকেন। "ধনগছান" ব্রতটী মূলধনের বহুগুণ সুদ প্রদানকারী একটী প্রকাণ্ড 'ব্যাঙ্ক' বিশেষ। দুই চারিটী কড়ি ও ধান, একটী পৈতার সহিত কোন ব্রাহ্মণকে গচ্ছিতস্বরূপ দান করিলেই পরজন্মে প্রচুর ধনধান্য লাভ হয়, সুতরাং নিতান্ত নির্ব্বোধ ব্যতীত এমন সুযোগ কেহই পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

এই সকল ব্রতের মধ্যে কতকগুলি শাস্ত্রীয়, যেমন "সাবিত্রীব্রত" "অনন্তব্রত" ইত্যাদি আর কতকগুলি অশাস্ত্রীয় বা "মেয়েলি শাস্ত্রীয়" যেমন "সাঁজপূজনী", "পুন্নিপুকুর" ও "ইতুসংক্রান্তি" ইত্যাদি। পুরোহিতের পুঁথিপত্রে এগুলির কোন উল্লেখ পওয়া যায়না। সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রপারাবার মন্থন করিলেও এগুলির অনুকূলে অনুষ্টুভ্‌ছন্দে রচিত একটীও শ্লোক উদ্ধার করিতে পারা যায় না, অথচ আমাদের রমণীসমাজে এই ব্রতগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমরা এই গুলিকেই "মেয়েলিব্রত" নামে অভিহিত করিয়াছি। এই সকল ব্রতোপলক্ষে নানাবিধ আখ্যায়িকা উপদেশ ছড়া ইত্যাদি

প্রচলিত আছে। একটু নিবিষ্টচিত্তে তাহা আলোচনা করিলে আমরা আমাদের সমাজসংক্রান্ত অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি। এই সমুদায় মেয়েলিব্রতের অনুষ্ঠান-পদ্ধতিতে যে কেবল চাল কলা মিষ্টান্ন ও বিশুদ্ধ গব্যরসের উল্লেখ আছে তাহা নহে, আমাদের সমাজের রীতি পদ্ধতি সুখ দুঃখ, আমাদের ভাষার শৈশব ইতিহাস এবং তৎসম্বলিত কিঞ্চিৎ কাব্যরসও আমরা ইহা হইতে আদায় করিতে পারি।

ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে "ব্রতকথা" শুনিবার নিয়ম আছে। শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির ব্রতকথা সংস্কৃতভাষায় লিখিত, সুতরাং ব্রতচারিণীকে বর্ণজ্ঞানশূন্য পুরোহিতের মুখে অশুদ্ধ ও অবোধ্য মন্ত্রগুলি কেবল নীরবে কর্ণস্থ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে হয়। কিন্তু মেয়েলি ব্রতের কথা-গুলি মেয়েলি ভাষায় মেয়েলি ছড়াতে মেয়েলি ভঙ্গীতে রচিত, ইহার শ্রোতা বক্তা সমস্তই স্ত্রীলোক। কোন প্রবীণা রমণী এই ছড়া ও কথাগুলি আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে যখন বর্ণনা করেন, শ্রোতৃমণ্ডলীও শ্রদ্ধাপূর্ণচিত্তে তাহা শ্রবণ করিয়া থাকেন, ইহাতে কথাগুলি তাঁহাদের হৃদয়ক্ষেত্রে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়। এই ব্রতোপাখ্যান হইতে পল্লিবাসিনী রমণীগণ স্বামিভক্তি, দেবভক্তি ভ্রাতাভগিনীর প্রতি স্নেহ-মমতা, পরোপকার প্রভৃতি বিবিধরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন। আমরা সাধনার পাঠকগণকে ক্রমশঃ এই সমুদায় ব্রতের বিবরণ উপহার দিতে চেষ্টা করিব।

আমরা অদ্য যে ব্রতের উপলক্ষে এই প্রস্তাবের অবতারণা করি-য়াছি, তাহার নাম "রামদুর্গা বা পূর্ণিমার ব্রত"। এই ব্রতের সবি-স্তার বিবরণ ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে। এই ব্রতটী "হলোয়ের বটিকা" বিশেষ; ইহার অনুষ্ঠানে সকল কামনাই সিদ্ধ হয়, সুতরাং সকলেই ইহা অবলম্বন করিতে পারেন। এই ব্রতের সমস্ত বিবরণই

মেয়েলি ছড়ায় নিবদ্ধ, কিন্তু ছড়াগুলির সকল স্থলে মিল নাই, বরং মাঝে মাঝে চলিত কথাবার্ত্তার ন্যায় দুই চারিটী কথাও আছে। ছড়াগুলি কোন্ সময়ের রচনা জানিবার কোন উপায় নাই, বহু-কাল হইতে শ্রুতিপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। যাহা হউক আমরা এই ছড়াগুলি অবলম্বন করিয়া প্রথমতঃ ব্রতের উৎপত্তি-বিবরণ ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতির উল্লেখ করিব, পরে উপাখ্যান ভাগ বিবৃত করিতে চেষ্টা পাইব।

অথ ব্রতোৎপত্তি বিবরণ।

"নমঃ নমঃ সদাশিব তুমি প্রাণেশ্বর।
ভক্তিবাহনে প্রভু দেবদিবাকর॥
হরগৌরীর চরণে করিয়া নমস্কার।
যাহার প্রচারে হ'ল দেবীর প্রচার॥
শুন সবে সর্ব্বলোক হয়ে হরষিত।
বড়ই আশ্চর্য্য কথা সূর্য্যের চরিত॥
একদিন কৈলাসশিখরে পশুপতি।
কৌতুকে খেলেন পাশা দুর্গার সঙ্গতি॥
সেইখানে ছিলেন এক ব্রাহ্মণ বরুড়।"

কোন সময়ে কৈলাস পর্ব্বতে হরপার্ব্বতী পাশা খেলিতেছিলেন, বরুড় ব্রাহ্মণ নামা কোন ব্রাহ্মণযুবক তাঁহাদের জন্য পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন। খেলিতে খেলিতে দুর্গা বলিলেন, "কার জিৎ"? শিবও জিজ্ঞাসা করিলেন "কার জিৎ"? মাতৃভক্ত ব্রাহ্মণ বলি-লেন "মায়ের জিৎ"। শিব অমনি ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া ব্রাহ্মণকে শাপ দিলেন, শিবের অভিসম্পাতে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের কুষ্ঠ হইল। আশুতোষ মহাদেবের অকারণে এতটা ক্রোধ প্রকাশ করা অবশ্য

সঙ্গত হয় নাই। যাহা হউক, পীড়ার যন্ত্রণায় ব্রাহ্মণ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন।

"কৃমির কামড়ে বিপ্র পরিত্রাহি ডাকে।
রক্ষাকর হরপার্ব্বতী পড়িলাম বিপাকে॥"

ব্রাহ্মণের কাতরক্রন্দনে দেবী ভগবতীর দয়া হইল; তিনি ব্রাহ্মণকে সূর্য্যের আরাধনারূপ ব্রত অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়া বলিলেন, এই ব্রত করিলে সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়; তুমি ভক্তিভরে "সূর্য্যঅর্ঘ্য" প্রদান কর, তোমার কুষ্ঠ আরোগ্য হইবে এবং তুমি সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় রূপ লাভ করিবে। এইরূপে ব্রতের উৎপত্তি হইল। দুর্গা উপদেশ দিলেন, এই জন্য ইহার নাম "রাম-দুর্গার ব্রত"। পূর্ণিমার দিন ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হয় বলিয়া ইহাকে পূর্ণিমার ব্রতও" বলে।

অথ অনুষ্ঠান পদ্ধতি।

অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যায় অঋণী ব্যক্তির ধান্যক্ষেত্র হইতে ১৭ সতরশিষ্‌ ধান ও ১৭ গাছি দূর্ব্বা তুলিয়া একত্র বাঁধিয়া গৃহে রাখিতে হয়। ধান ও দূর্ব্বা সংগৃহীত হইলে এই দিন একবার সমস্ত ব্রতকথা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে হয়। ইহার পরদিন অর্থাৎ প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতে একবার কথা শুনিবার নিয়ম, কেবল পূর্ণিমার দিন দুইবার প্রাতঃকালে ও আহারের সময়; এইরূপে মোট ১৭ বার কথা শুনিতে হয়। অমাবস্যার দিন যে ধানদূর্ব্বা তুলিয়া রাখা হইয়াছে, পূর্ণিমার দিন প্রাতঃকালে কথা শুনিবার পূর্ব্বে সেই ধান ও দূর্ব্বাদ্বারা পুরোহিত "সূর্য্যঅর্ঘ্য" প্রদান করিবেন। অনন্তর স্ত্রীলোকেরা আবার "মেয়েলি-মন্ত্রে" সূর্য্যের পূজা করিবেন। পূজার উপকরণ ও মন্ত্র এইরূপ,—

"ওড়ফুল যোড় কলা   রক্তচন্দন জবারমালা
ঘিয়ের প্রদীপ তামার টা'টে থুয়ে।
অর্ঘ্য দিলেন দিবাকরে •
এই বোল বলিয়ে—
'নমঃ নমঃ দিবাকর ভক্তির কারণ।
ভক্তিরূপে নাও প্রভু জগৎ কারণ॥
ভক্তিরূপে প্রণাম করিলে তুয়া পায়।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করেন প্রভু দেবরায়'॥"

এইরূপে অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা অর্থাৎ প্রথম পূর্ণিমার ব্রত শেষ হইলে আবার যথাক্রমে পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসের অমাবস্যা হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ প্রতিদিন কথা শ্রবণ, ও প্রত্যেক পূর্ণিমায় পূর্ব্বসংগৃহীত ধান দুর্ব্বাদ্বারা সূর্য্যঅর্ঘ্য প্রদান করিতে হয়। চতুর্থ পূর্ণিমায় অর্থাৎ ফাল্গুনী দোলপূর্ণিমায় ব্রত শেষ হয়। প্রত্যেক পূর্ণিমায় আহারের নিয়ম স্বতন্ত্র। যথা—

"প্রথমেতে গুলিগুলি করিবে ভোজন॥
দ্বিতীয় মাসেতে রামা খাইবে পায়েসে।
তৃতীয় মাসেতে দধি অন্ন খাইবে হরিষে॥
চার মাসে মুগপুলি খাবেন ইচ্ছামতী।
সূর্য্যের কৃপাতে তাঁর কার্য্য হবে সিদ্ধি॥"

প্রথম মাসের "গুলিগুলি"র অর্থ ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। আলোচাল বাঁটিয়া গুলি পাকাইয়া জলে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ ও গুড় অথবা চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইতে হয় ইহার নাম "গুলিগুলি"। যদি বেশী খাইতে না পারে, অন্ততঃ ১৭ গ্রাসও খাইতে হইবে। প্রতি পূর্ণিমায় একবার মাত্র আহারের নিয়ম।

অথ ব্রত-কথা।

ব্রতোৎপত্তি বিবরণ, অনুষ্ঠানপদ্ধতি ও উপাখ্যান, সমস্তই ব্রতকথার অন্তর্গত। ব্রতচারিণীকে এই সমস্তই শ্রবণ করিতে হয়। আমরা এস্থলে কেবল উপাখ্যানভাগ বিবৃত করিতেছি।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে দেবী ভগবতী বরুড় ব্রাহ্মণের প্রতি কৃপা করিয়া রোগ হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাঁহাকে সূর্য্যপূজা-রূপ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ ব্রত গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ব্রাহ্মণ উৎকট রোগযন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া পরম রূপবতী রাজকুমারী ইচ্ছামতীর পাণিগ্রহণ প্রার্থনায় ব্রত আরম্ভ করিলেন। কৃমিকীটজর্জ্জরিত কুষ্ঠরোগগ্রস্ত আতুরের এ-প্রকার প্রার্থনা নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত সন্দেহ নাই। কিন্তু দেবীর বরে আর সূর্য্যের কৃপায় কিছুই অসঙ্গত ও অসম্ভব নহে। সূর্য্য বলিলেন, "তথাস্তু"। কিন্তু কি উপায়ে ইহা সম্পন্ন হয়, রাজ-কন্যা কিছু জানিয়া শুনিয়া আপন ইচ্ছায় কুষ্ঠীকে মাল্যপ্রদান করিবেন না, অতএব কোন কৌশল অবলম্বন আবশ্যক, সূর্য্যের নিকট

"উপদেশ পেয়ে ব্রাহ্মণ
কৈলাস শিখরে পড়িয়ে রহিল।
(একদিন) স্নান করে যান কন্যা সঙ্গে শত নারী।
'পথছেড়ে দাও ব্রাহ্মণ স্নান ক'রে আসি ॥'
বরুড় বলে 'নড়িতে আমার নাহিকো সঙ্গতি।
আমারে লঙ্ঘিয়ে যাও কন্যা ইচ্ছামতী' ॥
'একেত ব্রাহ্মণ তুমি বিষ্ণুর সমান।
তোমারে লঙ্ঘিব আমি কি মতি মোর জ্ঞান?'

'তবে সত্য কর কন্যে পথ ছেড়ে দিই'।
'কি সত্য করিব আমি রাজার কুমারী।
যত লাগে টাকা সিকে সব দিতে পারি' ॥
'টাকা সিকে কড়িতে নাহিকো প্রয়োজন।
তুমি মোরে হবে স্বয়ম্বরা এই আমার মন ॥"

ব্রাহ্মণের এই অদ্ভুত প্রার্থনা শুনিয়া ইচ্ছামতীর মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন

"যাছিল কপালে ব'লে কপালে মেলে ঘা।
অনুমতি দিয়ে কন্যা গেল নিজ ঘর।
নিজ ঘর গিয়ে কন্যা কপাট ঢালিয়ে পড়িয়ে রহিল।
সেথা তার মাতাপিতা জিজ্ঞেসা করিল ॥
'কে তোমায় কহেছে বাণী কহ সত্য বাণী ?'
'কেহ না কহেছে বাণী
স্বয়ম্বরা হইতে লয়েছে আমার মন।'
রাজকন্যা স্বয়ম্বরা রাজ্যে স্বয়ম্বর।
ঘরে ঘরে আনন্দ বাজনা বাজিতে লাগিল।"

স্বয়ম্বরের আয়োজন ও বাদ্যভাণ্ডের কোলাহল শুনিয়া ব্রাহ্মণের হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিল। রাজসভায় যাইবার উপযুক্ত সাজ-সজ্জায় প্রয়োজন ; সুতরাং

"তা দেখে বরুড় ধীরে ধীরে মেলিনীর বাড়ী গেল।
মেলিনী পাইয়ে তারে হরষিত হ'ল ॥
তপ্ত জল করে কুষ্ঠ ধোয়ন করিল।
বিচিত্র আসনে তারে বসাইল ॥
সুগন্ধি চন্দন তার মাল্য গলে দিল।

বলে 'না পারিবে যেতে বাপু

না পারিবে যেতে।

হস্তী ঘোড়ার মনিষ্যের চাপনে মরিবে।'

'না মরিব না মরিব দেবীর দয়ায়।'

তখন সর্ব্ব পুরাণ কথা মেলিনীকে কহে,

—'আমি কুষ্ঠ পড়েছিলাম কৈলাসশিখরে।

কোপকরে সদাশিব শেঁপেছিল মোরে॥

দশা দেখে ভগবতী দয়া বিতরিল।

কামনা করিয়ে ব্রত করেছিলাম আমি।

তাই হব রাজকন্যার স্বামী॥'

তাহা শুনিয়ে মেলিনী হরষিত হলেন।

ধীরে ধীরে বরুড় ব্রাহ্মণ রাজবাড়ী গেলেন॥"

নানা দিগ্দেশীয় রাজগণ দেবর্ষি ও মহর্ষিগণ সভা আলো করিয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে কুষ্ঠীবিপ্র মালিনীপ্রদত্ত সুবাসিত পুষ্পমাল্যশোভিত হইয়া সভার একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। অনন্তর যথাসময়ে রাজকুমারী ইচ্ছামতী সভাতে প্রবেশ করিলেন।

"সভা করে বসেছেন যত দেবগণ,

সভা করে বসেছেন যত ঋষিগণ,

সভা করে বসেছেন যত রাজাগণ।

সবাইকে ছাড়িয়া কন্যা

বরুড় ব্রাহ্মণকে দিলেন মালা।"

রাজকুমারীর এই অসঙ্গত কার্য্য দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন।

"ধিক্ ধিক্ করে যত রাজা প্রজাগণ।

ধিক্ ধিক্ করে যত দেবঋষিগণ॥

ধিক্ ধিক্ করে কন্যা শতগণ।
ধিক্ ধিক্ করে যত দাস দাসীগণ॥"

কন্যা নিজে যখন আপনার পতি মনোনীত করিয়া ব্রাহ্মণকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছেন, তখন রাজা আর কি করিবেন? সমাগত রাজা প্রজা ও পুরনারীগণের উপহাস ধিক্কারে ঘৃণা ও লজ্জায় একবারে ম্রিয়মাণ হইলেন।

"ধিক্ ধিক্ করে সবে কন্যার অন্দরে।
দুঃখিত হইয়ে রাজা কন্যাদান করে॥"

সম্প্রদান কার্য্য শেষ হইলে রাজা বল্লিলেন,

"দেখিবার উচিত পাত্র নহেত কুমারী।
বনবাসে দিয়ে এস বাঁধিয়ে কুমারী॥
দূতগণে ডাকিয়ে রাজা
ইচ্ছামতী ব্রাহ্মণে
রাখিয়ে এলেন বনে॥"

পতিব্রতা রাজকুমারী পতিসহ বনবাসে গমন করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে পতিশুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

"তপ্ত জল ক'রে কুষ্ঠ ধোয়ন করেন।
দুর্গন্ধি সহিতে নারেন দুঃখেতে কাঁদেন॥
'কেন কন্যে! কাঁদ তুমি কিসের কারণ?'
'শুন প্রভু প্রাণনাথ করি নিবেদন॥
দুর্গন্ধ সহিতে নারি কাঁদি যে দুঃখেতে'।
'শুন কন্যে! আমার উত্তর।
আমি কুষ্ঠ পড়েছিলাম কৈলাস শিখরে।
কোপ ক'রে সদাশিব শাঁপেছিল মোরে॥

দশা দেখে ভগবতী দয়াবিতরিল।
সতন্তর শিবকে বলিল॥
কামনা করিয়ে ব্রত ক'রেছিলাম আমি।
তাই তোমার হইয়াছি স্বামী॥
সেই ব্রত ক'রে অর্ঘ্য দাও দিবাকরে।
কুষ্ঠ ঘুচিয়ে সুন্দর হব দেববরে॥"

ব্রতের কথা শুনিয়া ইচ্ছামতীর হৃদয় আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল। অনন্তর তিনি অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যাতে পূর্ব্বোক্ত বিধান অনুসারে সূর্য্য অর্ঘ্য প্রদান করিয়া ব্রত অবলম্বন ও উদ্‌যাপন করিলেন।

"তা শুনিয়ে কন্যা হরষিত হলেন।
অঘ্রাণ মাসে অমাবস্যা পেলেন॥
সতের ধান সতের দূর্ব্বা তোলন করিলেন।
রক্তচন্দন জবাপুষ্প তামার পাত্রে থুলেন॥
অর্ঘ্য দিলেন দিবাকরে
এই বোল বলিয়ে।
'নমঃ নমঃ দিবাকর ভক্তির কারণ।
ভক্তিরূপে নাও প্রভু জগৎ কারণ॥
ভক্তিভাবে প্রণাম করিলে তুয়াপায়।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করেন প্রভু দেবরায়।'
দেবীর দয়াতে কার্য্য হ'ল সিদ্ধি।
আতুর ছিলেন চতুর হ'লেন
কন্দর্প রূপ হ'ল সূর্য্যের মত বর্ণ হ'ল॥"

এইরূপে দেবীর বরে ব্রাহ্মণের কুষ্ঠ আরোগ্য হইয়া দেহ সুবর্ণ-কান্তি ধারণ করিল। রাজকন্যা কামদেবতুল্য রূপযৌবনসম্পন্ন

মনোমত স্বামী লাভ করিয়া আনন্দিত হইলেন। কিন্তু কেবল রূপযৌবন লইয়া মানুষ সুখী হইতে পারে না। কামদেবতুল্য স্বামী লইয়া কি হইবে যদি উদরে অন্ন না থাকে। সুতরাং

"আর এক দিন কন্যা কাঁদেন দুঃখেতে,
'কেন কন্যে কাঁদ তুমি কিসের কারণ!'
'শুন প্রভু প্রাণনাথ করি নিবেদন,
ধন ধান্য বিনে পুরুষের জীবনে মরণ,
ধন ধান্য বিনে পুরুষের সব অন্ধকার,
ধন ধান্য বিনে পুরুষের শোভা নাহি পায়'।
'শুন কন্যে আমার উত্তর,
যে ব্রত ক'রে কন্যে পাইলাম তোমারে,
যে ব্রত ক'রে কন্যে হইলাম সুন্দর,
সেই ব্রত কর কন্যে হবে ধনধান্য'।
তা শুনে কন্যা হরষিত হলেন।
দেবীর দয়াতে তার অদৈন্য ধন॥"

ব্রত করিয়া ইচ্ছামতী অতুল ধনসম্পত্তি দাসদাসী অট্টালিকা সমস্তই লাভ করিলেন। কিন্তু পুত্র বিনা নারীর জীবন বৃথা; পুত্রই গৃহের শোভা, রমণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ, এই জন্য পুত্র কামনায়

"আর এক দিন কন্যা কাঁদেন দুঃখেতে।
'কেন কন্যে কাঁদ তুমি কিসের কারণ?'
'শুন প্রভু প্রাণনাথ করি নিবেদন,
পুত্র বিনে পুরুষের জীবনে মরণ,
পুত্র বিনে পুরুষের সব অন্ধকার,
পুত্র বিনে পুরুষের শোভা নাহি পায়।'

"শুন কন্যে আমার উত্তর,
যে ব্রত করে কন্যে পাইলাম তোমারে,
যে ব্রত করে কন্যে হইলাম সুন্দর,
সেই ব্রত কর কন্যে হবে পুত্র কন্যা।"

পুনর্ব্বার ব্রত করিয়া ইচ্ছামতী পুত্ররত্ন লাভ করিলেন।

"গণনা গণিতে তার নয় মাস গেল।
শুভক্ষণে ইচ্ছামতী পুত্র প্রসবিল॥"

পিতাকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিতা হইয়া ইচ্ছামতী এতদিন দারুণ দুঃখের দশায় কেবল স্বামীর পরিচর্য্যায় আত্মসমর্পণ করিয়া দিন কাটাইয়াছিলেন। যত দিন না স্বামীকে রোগমুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহার হৃদয়ে আর কোন চিন্তাই স্থান পায় নাই। এখন দেবীর বরে আর সূর্য্যের কৃপায় তাঁহার স্বামী উৎকট পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করিয়া রূপযৌবনে শোভান্বিত হইয়াছেন, গৃহ প্রচুর ধনধান্য সুখ সৌভাগ্যে শ্রীসম্পন্ন এবং তাঁহার ক্রোড় পুত্ররত্নে অলঙ্কৃত হইয়াছে। এই সৌভাগ্যের সময় পিতামাতাকে স্বতঃই মনে পড়িল। আশৈশব পিতামাতার স্নেহবাৎসল্য আদর যত্ন, স্বয়ম্বরকালে তাঁহাদের কঠোর ব্যবহার, অবশেষে পিতাকর্ত্তৃক শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে নির্ব্বাসন, এই সমস্ত স্মৃতিপথে উদিত হইয়া ইচ্ছামতীর স্নেহসুকোমল ক্ষুদ্র হৃদয়খানিকে একবারে আকুলিত করিল। তাঁহার অশ্রুসিক্ত বিষণ্ণবদন দেখিয়া স্বামী স্নেহভরে বলিলেন,

"কেন কন্যে কাঁদ তুমি কিসের কারণ?"

ইচ্ছামতী অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদগদস্বরে বলিলেন,

"শুন প্রভু প্রাণনাথ করি নিবেদন।
মাতা পিতে দেখিতে হয়েছে আমার মন॥"

এদিকে দেবী ভগবতীর দয়াতে ইচ্ছামতীর মাতা স্বপ্ন দেখিয়া কন্যার শোকে কান্দিয়া উঠিলেন। রাজার এক শত জন রাণী, সকলেই বহুদিনের পর ইচ্ছামতীর শোকে অধীর হইয়া রাজাকে নানাপ্রকারে অনুযোগ প্রদান করিতে লাগিলেন। ইচ্ছামতীর গর্ভধারিণী প্রধানা মহিষী বলিলেন,

"কোন্ বনে রাখিয়ে এলে কন্থে ইচ্ছামত ?
বনবাস দিয়ে কন্থে না কর তল্লাস।
কন্যার লাগিয়ে মোর লেগেছে হুতাশ ॥"

তখন রাজা দূতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা ইচ্ছামতীর সন্ধান করিতে পারিবে বলিল। অনন্তর দূতগণের পরামর্শে বহু সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে রাজা ও রাণী মথুরা নগরে প্রবেশ করিলেন। দূতগণ বলিল, এইখানে নিবিড় বনের ভিতর আমরা ইচ্ছামতী ও তাঁহার স্বামীকে রাখিয়া গিয়াছিলাম, কে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া এই অরণ্যের মধ্যে অমন সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করিল ? এই সমুদায় অট্টালিকা দাসদাসী হাতী ঘোড়াই বা কাহার ? পরে তাহারা অনুসন্ধানে জানিতে পারিল যে, ইচ্ছামতীই এই রাজ্যের রাণী, ইচ্ছামতীই এই সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী। অনন্তর রাজা ও রাণী কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইচ্ছামতী অবনতমস্তকে পিতামাতার চরণে প্রণাম করিয়া আপনার সুখ-দুঃখের অতীতকাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

"তখন সর্ব্বপুরাণ কথা বলেন পিতারে।
'ইনি কুষ্ঠ পড়েছিলেন কৈলাস শিখরে।
কোপ করে সদাশিব শেঁপেছিল এঁরে ॥
দয়াকরে ভগবতী দয়া বিতরিল।
সেই ব্রতর ফল ইহাঁরে ফলিল ॥

সেই ব্রত করে অর্ঘ্য দিয়াছিলাম আমি।
কুষ্ঠ ঘুচে সুন্দর হইল মম স্বামী॥"

কিন্তু রাজা কন্যার কথায় সহসা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। কন্যা যথার্থ পতিব্রতা কি না পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন,

"মা গো! পুনঃ ব্রত ক'রে অর্ঘ্য দাও দিবাকরে।
সুন্দর ঘুচে কুষ্ঠ কর দেখি এঁরে॥
তবেত প্রত্যয় নয় না হয় প্রত্যয়।"

পিতার প্রত্যয়ের জন্য ইচ্ছামতী ব্রত করিলেন, ব্রতের আশ্চর্য্য শক্তিতে তাহার স্বামীর আবার কুষ্ঠ হইল, ব্রাহ্মণ রোগের যাতনায় পূর্ব্বের ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের যন্ত্রণা দেখিয়া রাজা মহা দুঃখিত হইয়া কন্যাকে বলিলেন,

"সর্ব্বকামনা-ব্রত যদি জান মাতা,
রোগ হ'তে মুক্ত কর ব্রাহ্মণকুমারে।
তবে রহে ভক্তি নইলে না রহে ভক্তি॥"

ইচ্ছামতী পুনর্ব্বার ব্রত করিলেন, দেবীর বরে ব্রাহ্মণ রোগমুক্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ দিব্যশ্রী লাভ করিলেন। কন্যার অপূর্ব্ব ধর্ম্মনিষ্ঠা পাতিব্রত্য এবং ব্রতের অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া রাজার সমুদায় সন্দেহ নিরাকৃত হইল। রাজা সন্দেহের নিমিত্ত মহালজ্জিত হইলেন, এবং কন্যাকে সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,

"সর্ব্বকামনাব্রত যদি জান মাতা,
অপুত্র আছে তোমার মা হউ পুত্রবতী।"

ইচ্ছামতী আবার ব্রত করাতে দেবীর দয়ায় তাঁহার মাতা যথাকালে গর্ভধারণ করিলেন।

"গণনা গণিতে তার নয়মাস গেল,
শুভক্ষণে রাজরাণী পুত্র প্রসবিল॥"

এইরূপে রাজা ও ইচ্ছামতী ধনধান্য পুত্রকন্যা যশঃখ্যাতি লাভ করিয়া পরমানন্দে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। একদিন রাজা কন্যাকে বলিলেন,

"সর্ব্বকামনাব্রত যদি জান মাতা।
আপনি উদ্ধার উদ্ধার পিতা মাতা॥"
তাও শুনিয়ে হরষিত হ'লেন,
অগ্রাণের অমাবস্যা পেলেন,
সতের ধান সতের দূর্ব্বা তোলেন,
অর্ঘ্য দিলেন দিবাকরে।
দেবীর দয়ায় রথ আইলেন।"

উপযুক্ত পুত্রকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া ইচ্ছামতী পিতা মাতা ও স্বামীর সহিত "দিব্য" রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিবেন,

"হেনকালে ব্রতকথা পড়ে গেল মনে,
'আহা আহা এমন আশ্চর্য্য ব্রত
কারে না বলিলাম।'
হেনকালে দেখে এক ব্রাহ্মণকুমারী,
হ্যাদেহে ব্রাহ্মণকুমারী!
একটী ব্রতর কথা কই তোমারে।"

ইচ্ছামতী ব্রাহ্মণকুমারীকে ব্রতের সমুদায় বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। বর্ণনা শেষ হইবামাত্র রথ দিব্যগতিতে দেবলোকে প্রস্থান করিল।

এই ব্রাহ্মণকুমারী হইতেই আমাদের নারীসমাজে এই ব্রত প্রচলিত হইয়াছে এবং বংশপরম্পরায় আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। আমরাও এক ব্রাহ্মণকুমারীর নিকট এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি।

অথ ফলশ্রুতি।

শাস্ত্রের আদেশ এই, "রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ।" অর্থাৎ ক্রিয়াতে রুচি জন্মাইবার জন্য শাস্ত্রে নানাবিধ পুষ্পিত বাক্যরূপ ফলশ্রুতি লিখিত হইয়াছে সমালোচ্য ব্রতের ফলশ্রুতি এইরূপ,—

"যে বলে শোনে তার স্বর্গে বাস।
যে ব্রত করে তার পোরে আশ॥"

ব্রতচারিণীর আশা পূর্ণ হউক্ আর না হউক, বক্তাপ্রবন্ধলেখক এবং শ্রোতা পাঠকবর্গ যে অতি সুলভ উপায়ে স্বর্গবাসের অধিকারী হইতে পারেন, লেখকও পাঠকের পক্ষে ইহা অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

যুগান্তর। *

যাহারা বালি ধুইয়া হীরা বাহির করে, তাহারা অনেককাল বিস্তর বালি ঘাঁটিয়া এক টুকুয়া হীরার সন্ধান পায়। গ্রন্থ-সমালোচকের ভাগ্যেও হীরা সহজে মেলে না; সেই জন্য বহুকাল বিস্তর নীরস এবং নিস্ফল পরিশ্রমের পর যেদিন একখানা যথার্থ গ্রন্থ হাতে আসে সেদিন আনন্দবেগে গ্রন্থকারকে মনুমেণ্টের উপর তুলিয়া দিয়া জয়জয়কার করিতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু সমালোচকের কাজটা এমনি যে, তাহাকে পদে পদে আপন উচ্ছ্বাস সম্বরণ করিয়া চলিতে হয়,—যখন কৃতজ্ঞচিত্তে মুন

---

* যুগান্তর। সামাজিক উপন্যাস। শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী বিরচিত। মূল্য ১।০ আনা।

খাইতেছি তখনো এই কথা মনে রাখিতে হয় কেবলি গুণ গাহিলে চলিবে না, যদি দোষ থাকে তাহাও গাহিতে হইবে!

শিবনাথ বাবুর যুগান্তর উপন্যাসখানি পাঠ করিতে করিতে কর্ত্তব্যক্লান্ত সমালোচকের চিত্ত বহুকাল পরে আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। এমন পর্য্যবেক্ষণ, এমন চরিত্র সৃজন, এমন সরস হাস্য, এমন সরল সহৃদয়তা বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ। লেখক বিশ্বনাথ তর্কভূষণকে আমাদের নিকট পরমাত্মীয়ের ন্যায় পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। এমন সত্যচরিত্র বাঙ্গলা উপন্যাসে ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। লেখক তাঁহাকে সমস্ত তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে প্রত্যক্ষবৎ জাজ্বল্যমান দেখিয়াছেন—তাঁহার চরিত্রটিকে প্রতিদিনের হাস্যে এবং অশ্রুজলে, দোষে এবং গুণে অতি সহজেই সজীব করিয়া তুলিয়াছেন! বিরলবসতি বঙ্গসাহিত্য-রাজ্যে তর্কভূষণ মহাশয় যে একটি জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন এবং আমরা যে একটি স্থায়ী বন্ধুলাভ করিলাম সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ মাত্র নাই।

কেবল তর্কভূষণকে কেন, লেখক, বঙ্গসাহিত্যে নশিপুর নামক আস্ত একটি গ্রাম বসাইয়া দিয়াছেন। এই গ্রামের ক্রিয়াকর্ম্ম, আমোদ প্রমোদ, কৌতুক উপদ্রব, সুজন দুর্জ্জন সমস্তই পাঠকদের চিরসম্পত্তি হইয়া গিয়াছে। তর্কভূষণের টোল, "হাঁসের দল," চিনু ঘোষ, জহরলালের ইতিহাস নূতন-গঠিত সদ্যপঠিত হইলেও তাহা আমাদের নিকট যেন অনেককালের পুরাতন পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে উলোর রামরতন মুখুয্যের ঘরে তর্কভূষণের কনিষ্ঠা কন্যা ভুবনেশ্বরীর ঘরকন্নাও আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ সত্য এবং অত্যন্ত বেদনাজনক হইয়াছে! সংক্ষেপে, তর্কভূষণ, তাঁহার গ্রাম, তাঁহার পরিবার, তাঁহার ছাত্রবর্গ তাঁহার শত্রুমিত্র সকলকে

লইয়া একটি গ্রাম্য গ্রহমণ্ডলীর কেন্দ্রবর্ত্তী সূর্য্যের ন্যায় আমাদের নিকট প্রবল উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন।"

এমন সময়ে আমাদের পরম দুর্ভাগ্যবশতঃ উপন্যাসটি অকস্মাৎ যুগান্তরে লোকান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কোথায় গেল তর্কভূষণ, নশিপুর, হাঁসের দল—কোথা হইতে উপস্থিত নবীনচন্দ্র, হাতিবাগান, নবরত্ন সভা। গ্রন্থকারও নূতন বেশ ধারণ করিলেন। তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক হইলেন ঐতিহাসিক, ছিলেন ভাবুক হইলেন নীতি প্রচারক। আমরা রসসম্ভোগের সত্যযুগ হইতে তর্কবিতর্কের যুগান্তরে আসিয়া অবতীর্ণ হইলাম। গ্রন্থকার পূর্ব্বে যেখানে মানুষ গড়িতেছিলেন এখন সেখানে মত গড়িতে লাগিলেন,—পূর্ব্বে যেখানে আনন্দ নিকেতন ছিল এখন সেখানে পাঠশালা বসিয়া গেল।

এরূপ অঘটন সংঘটন হইল কেন তাহা বলিতে পারি না। তর্কভূষণের বিধবা ভগ্নী বিজয়া এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র হরচন্দ্রের কলিকাতায় আগমন কালটি তাঁহাদের নিজের পক্ষে সুক্ষণ, কিন্তু উপন্যাসের পক্ষে কুক্ষণ,—কারণ সেই উপলক্ষ্যটুকু অবলম্বন করিয়া গ্রন্থের শেষার্দ্ধটি প্রথমার্দ্ধের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। পরস্পরের মধ্যে কোন অবশ্যযোগ নাই।

দুইটা মানুষকে এক দড়ি দিয়া বাঁধিলে ঐক্য হিসাবেও তাহাদের বলবৃদ্ধি হয় না এবং দ্বৈতহিসাবেও তাহাদের সুবিধা হয় না। তেমনি দুই স্বতন্ত্র গল্পকে জবর্দস্তি করিয়া একত্র বাঁধিয়া দিলে একটা গল্পের হিসাবেও তাহারা নষ্ট হয় দুইটা গল্পের হিসাবেও তাহাদের স্বচ্ছন্দ স্বাধীন পরিণতিতে বাধা দেওয়া হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থেও তাহাই হইয়াছে। গ্রন্থকার যদি দুটি গল্পকে বিচ্ছিন্ন আকারে রচনা করিতেন তাহা হইলে সম্ভবতঃ দুটিকেই উৎকৃষ্ট গল্পে পরিণত করিতে পারিতেন।

দ্বিতীয় গল্পটির কথা বলিতে পারি না—কিন্তু প্রথম গল্পটি যে সাহিত্যের অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিত সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। • •

আসল কথা, লেখক নিজেই নূতন যুগের মধ্যে বাস করিতেছেন; এমন কি, নবযুগরথের বাহকবর্গের মধ্যে তিনিও একজন গণ্য ব্যক্তি। তিনি ইহার ঘর্ঘরশব্দ এবং জনতাকোলাহল হইতে কল্পনাযোগে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এতদূরে লইয়া যাইতে পারেন নাই যেখানে শান্তিতে বসিয়া নিপুণ চিত্রকরের ন্যায় ইহাকে চিত্রিত করিতে পারেন। বিচিত্র মতামত এবং তর্ক বিতর্কগুলা একেবারে গোটা আসিয়া পড়ে তাহা রক্তমাংসের মানবাকারে পরিণত হইয়া উঠে না। তাঁহার পঙ্কু, ব্রজরাজ, সুরেন্দ্র গুপ্ত, মথুরেশ, এমন কি, নবীনও খুব ভাল ছেলে বটে কিন্তু সজীব নহে—তাহারা বীজগণিতের ক খ গ অক্ষরের ন্যায় কেবল কতকগুলি চিহ্নমাত্র।

সাহিত্যের চিত্রপটে স্থিতি অপেক্ষা গতি আঁকা শক্ত। যাহা পুরাতন, যাহা স্থির, যাহা নানা দিকে নানা ভাবে সমাজের হৃদয় হইতে রসাকর্ষণ করিয়া শ্যামল সতেজ এবং পরিপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহাকে সত্য এবং সরসভাবে পাঠকের মনে জাজ্বল্যমান করিয়া তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু যাহা নূতন উঠিতেছে, যাহা চেষ্টা করিতেছে যুদ্ধ করিতেছে পরিবর্ত্তনের মুখে আবর্ত্তিত হইতেছে, যাহা এখনো সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি লাভ করে নাই তাহাকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করিতে হইলে বিস্তর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ অথবা ঘাতপ্রতিঘাত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া বিচিত্র নাট্যকলা প্রয়োগ আবশ্যক হয়। কিন্তু সেরূপ করিতে হইলে রচনার বিষয় হইতে রচয়িতার নিজেকে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইতে হয়—অত্যন্ত কাছে থাকিলে, মণ্ডলীর কেন্দ্রের মধ্যে বাস করিলে,

সমগ্রের তুলনায় তাহার অংশগুলি, ব্যক্তির তুলনায় তাহার মত-গুলি, কার্য্যপ্রবাহের তুলনায় তাহার উদ্দেশ্যগুলি যেরূপ বেশি করিয়া চোখে পড়ে—তাহাতে রচনা সত্যবৎ হয় না, তাহার পরিমাণ-সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায়—এবং বাহিরের নির্লিপ্ত পাঠকদের নিকটে কিরূপে বিষয়টিকে সমগ্র এবং সপ্রমাণ করিতে হইবে তাহার ঠাহর থাকে না।

কিন্তু এই দ্বিতীয় নম্বর গল্পটিতেও লেখক যেখানেই নবযুগের আবর্ত্ত ছাড়িয়া খাঁটি মানুষ গুলির কথা বলিয়াছেন সেইখানেই দুই চারিটি সরল বর্ণনায় স্বল্প রেখাপাতে অতি সহজেই চিত্র আঁকিয়াছেন এবং পাঠকের হৃদয়কে রসে অভিষিক্ত করিয়াছেন। এক স্থলে গ্রন্থকার প্রসঙ্গক্রমে শ্রীধর ঘোষের সহিত কেবল চকিতের মত আমাদের পরিচয় করাইয়া তাহাকে অপসৃত করিয়া দিয়াছেন—কিন্তু সেই স্বল্পকালের পরিচয়েই আমাদের মনে একটা আক্ষেপ রাখিয়া গিয়াছেন; আমাদের বিশ্বাস, লেখক মনোযোগ করিলে এই শ্রীধর ঘোষটিকে একটি গ্রন্থের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করিয়া আর একটি উপন্যাসকে প্রাণদান করিতে পারিতেন! আমরা শ্রীধরের সংক্ষেপ পরিচয়টি এস্থলে উদ্ধৃত করি।

"এই ঘোষ পরিবার বৈষ্ণব পরিবার; গোঁসায়ের শিষ্য। শ্রীধর ঘোষ মহাশয় অতি সাত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। উদ-রান্নের জন্য ম্লেচ্ছের অধীনে কাজ করিতেন বটে, কিন্তু নিষ্ঠার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না। আপীষে যখন কর্ম্ম করিতেন, তখন তাঁহার নাসাতে তিলক ও সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ দৃষ্ট হইত। ... মানুষটি শ্যামবর্ণ সুস্থ ও সবলদেহ ছিলেন, মুখটি সদ্ভাবে ও ভক্তিতে যেন গদগদ, সে মুখ দেখিলেই কেমন হৃদয় স্বভাবত তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইত। ঘোষজা মহাশয় আপিসে প্রবেশের দ্বারের পার্শ্বের

ঘরেই বসিতেন; এবং যত গাড়ি মাল আমদানী ও রপ্তানি হইত তাহার হিসাব রাখিতেন। সুতরাং তাঁহাকে প্রতিদিন প্রাতঃকালে আপীসে প্রবেশের সময়ে অনেকবার এই প্রশ্ন শুনিতে হইত—'কি ঘোষজামশাই, খপর কি? সব কুশল ত।' অমনি ঘোষজার উত্তর,—'আজ্ঞে গোবিন্দের কৃপাতে সবই কুশল।' ঘোষজা দোলের সময় কিছু ব্যয় করিতেন; লোকজনকে শ্রদ্ধা সহকারে আহ্বান করিয়া উত্তমরূপ খাওয়াইতেন। এই জন্য আপীসের লোকে মাঘ-মাস পড়িলেই জিজ্ঞাসা করিত 'কি ঘোষজা মশাই এবার দোল করবেন ত?' অমনি উত্তর—'আজ্ঞে কি জানি, যা গোবিন্দের ইচ্ছা।' গোবিন্দের প্রতি নির্ভরের ভাব তাঁহার এমন স্বাভাবিক ছিল, যে, আট বৎসর বয়সে ওলাউঠারোগে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রটির কাল হইলে, তাহারই তিনচারি দিন পরে আপীসের একজন লোক জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি ঘোষজা মশাই, ছেলেদুটো মানুষ হচ্চেত?' ঘোষজা উত্তর করিলেন 'আজ্ঞে দুটো আর কই? এখন ত একটি, কেবল বড়টিই আছে।' প্রশ্নকর্ত্তা বিস্মিত হইয়া কহিলেন 'সে ছেলেটির কি হল?' ঘোষজা উত্তর করিলেন—'আজ্ঞে গোবিন্দ সেটিকে নিয়েছেন।' .... তিনি সাধ করিয়া নাতি নাতনী-দিগের নাম রাখিয়াছিলেন। পুত্রের সর্ব্বজ্যেষ্ঠা কন্যা হইলে তাহার নাম রাধারাণী রাখিলেন। ...... সর্ব্বজ্যেষ্ঠা রাধারাণী তাঁহার প্রথম আদরের ধন ছিল। 'রাধে! রাজনন্দিনি! গরবিনি! শ্যাম-সোহাগিনি!' বলিয়া যখন ডাকিতেন, তখন এক বৎসরের বালিকা রাধারাণী অচিরোদ্গত-দন্তাবলীশোভিত মুখচন্দ্রে একটু হাসিয়া, ঝাঁপাইয়া, তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া পড়িত। তাঁহাকে বুকে চাপিয়া বলিতেন—'রাখালের সনে প্রেম করিস্‌নে রাই!' অমনি চক্ষে জলধারা বহিত।"

এদিকে শিশু কন্যা টিমিমণি, নবীনের সহিত তাঁহার ভ্রাতৃবধূর সম্বন্ধ, নবীনের রাঙামা—এগুলিও লেখক বড় সরল এবং সরস সুমিষ্টভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

লেখক ধারাবাহিক গল্পের প্রতি বড় একটা দৃষ্টিপাত করেন নাই—আমরাও গল্পের জন্য বিশেষ লালায়িত নহি। আমরা একজন রীতিমত মনুষ্যের আনন্দজনক বিশ্বাসজনক জীবন-বৃত্তান্ত চাহি;—নশিপুর গ্রামে তর্কভূষণ পরিবারের আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনিয়া যাইতে আমাদের কিছুমাত্র শ্রান্তি বোধ হইত না, কারণ, তর্কভূষণ আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন এবং লেখকও তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিনী হাস্যবর্ষিণী কল্পনাশক্তি দ্বারা আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু লেখক দুইখানি বহির পাতা পরস্পর উল্টাপাল্টা করিয়া দিয়া এক সঙ্গে বাঁধাইয়া দপ্তরীর অন্ন মারিয়াছেন এবং পাঠকদিগের রসভঙ্গ করিয়াছেন এ আক্ষেপ আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না।

আলোচনা।

ইণ্ডিয়ান্ রিলীফ্ সোসায়েটি।

অর্থাৎ ভারত দুঃখ নিবারণ সভা। সভার নাম হইতেই তাহার উদ্দেশ্য অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সভাটি গোপনে স্থাপিত হইয়া কিছুকাল হইতে ভারতবর্ষের হিতোদ্দেশে নানা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া আসিতেছে। সভা যে পরিমাণে কাজ করিয়াছে সে পরিমাণে আপন নাম ঘোষণা করে নাই ইহাতে আমাদের মনে যথেষ্ট আশার সঞ্চার হয়।

সাধারণতঃ আমাদের দেশের রাজনৈতিকসভাসকল কি কি উদ্দেশ্য এবং উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে তাহা সকলেই অবগত আছেন। এ সভারও সে সকল অঙ্গের কোন ত্রুটি নাই। কিন্তু তাহা ছাড়া ইহার একটি বিশেষত্ব আছে। এ সভা উপযুক্ত বোধ করিলে লোকবিশেষ এবং সম্প্রদায়বিশেষের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। কারণ, সভার মতে, ভারতবর্ষকে যেমন অনুচিত আইন হইতে রক্ষা করা চাই, তেমনি তাহাকে অন্যায় শাসন হইতেও পরিত্রাণ করা আবশ্যক।

সভার এই বিশেষত্বটুকু আমাদের কাছে সব চেয়ে ভাল লাগিতেছে। তাহার বিশেষ কারণও আছে। অনুচিত আইন এবং অন্যায় শাসন যদি কোন মন্ত্রবলে ভারতবর্ষ হইতে একেবারে উঠিয়া যায়,—আইনকর্ত্তারা যদি সম্পূর্ণ অপক্ষপাত এবং অপরিসীম বিচক্ষণ ব্যক্তি হন, ও শাসনকর্ত্তারা সকলেই অভ্রান্ত ন্যায়পর ও অন্তর্য্যামী হইয়া উঠেন তবে দেশের অনেক দুঃখ দূর ও সুখ বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে আমাদের জাতিগত আভ্যন্তরিক অবস্থার অধিক কিছু পরিবর্ত্তন হয় না। কেবল সুআইন এবং সুশাসনে একটা জাত বাঁধিয়া দিতে পারে না; তাহাতে রাজ-ভক্তি এবং রাজনির্ভর বাড়াইয়া দিতে পারে, কিন্তু স্বজাতিভক্তি এবং আত্মনির্ভর তাহাতে বাড়ে না। অথচ সেই স্বজাতিবন্ধনই দেশের সমস্ত স্থায়ী মঙ্গলের মূল ভিত্তি।

গবর্মেণ্টকে কোন প্রকার শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে, স্বজাতি এবং স্বজাতির কর্ত্তব্য কাহাকে বলে এই শিক্ষা দেশের লোককে দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। এ শিক্ষা কেবল বই পড়াইয়া বা বক্তৃতা দিয়া হইতে পারে না, এ শিক্ষা কেবল প্রত্যক্ষ উদাহরণের দ্বারা হইয়া থাকে।

যখন একজন সামান্য চাষা দেখিতে পাইবে তাহাকে বিজাতি-কৃত অন্যায় হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিঃস্বার্থ স্বদেশীয় দল অগ্রসর হইতেছে, এমন কি, পরের বিপদ দূর করিতে গিয়া অনাবশ্যক নিজের বিপদ আহ্বান করিয়া লইতেছে তখন সে অন্তরের সহিত অনুভব করিবে স্বজাতি কাহাকে বলে; তখন সে ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিবে কেবল ভাইবন্ধু তাহার আপন নহে, সমস্ত স্বজাতি তাহার আপন।

অনেক অন্যায় কেবল অবহেলাবশতঃ ঘটিয়া থাকে। যখন জানা থাকে যে, দুর্ব্বল ব্যক্তির অন্যায় প্রতিকারের কোন ক্ষমতা নাই এবং অন্যায়কে সে আপন অদৃষ্টের লিখন জ্ঞান করিয়া তেমন সুতীব্রভাবে অনুভব করে না, তখন তাহার প্রতি সূক্ষ্মভাবে ন্যায়াচরণ করিতে তেমন একান্ত সতর্কতা জন্মে না। তখন তাহার হীনতা উপলব্ধি করিয়া তাহার সুখ দুঃখের প্রতি কথঞ্চিৎ অবজ্ঞা জন্মিয়াই থাকে। কিন্তু যখন প্রত্যেক লোক তাহার স্বজাতির বলে বলী, তখন সে নিজেই অন্যায়ের প্রতি অসহিষ্ণু হইয়া উঠে এবং অন্যেও তাহার প্রতি নির্ব্বিচারে অন্যায় করিতে সাহসী হয় না। কাঁদাকাটি করিয়া পরকে ন্যায়পর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা একত্র হইয়া নিজেকে বলশালী করিবার চেষ্টা করাই সঙ্গত।

রিলীফ সোসাএটি যখন ব্যক্তিবিশেষ অথবা সম্প্রদায় বিশেষকে অন্যায় হইতে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইবে তখন স্বজাতির নিকটে স্বজাতির মূল্য অনেক বাড়াইয়া দিবে। ইহা অপেক্ষা মহৎ উদ্দেশ্য আর কি হইতে পারে? যে অন্যায় নিবারণের জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিবেন সে অন্যায় নিবারণে তাঁহারা সক্ষম না হইতে পারেন কিন্তু সেই নিষ্ফল চেষ্টাতেও তাঁহারা যে ফল লাভ করি-

বেন, তাহা, কোন বিশেষ অন্যায় প্রতিকারের অপেক্ষা অনেক গুরুতর।

অন্যায় আইন রহিত করিয়া ভাল আইন প্রচলিত করা এবং ভারতবাসীদের স্বত্বাধিকার বিস্তার করার জন্য কন্‌গ্রেস্ যে চেষ্টা করিতেছেন সে চেষ্টা পরম হিতকর সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার মুখ্য ফলের অপেক্ষা গৌণ ফল আমাদের নিকট অনেক বেশি মূল্যবান বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষীয় ভিন্ন জাতির একত্র সম্মিলন এবং পরস্পর হৃদয় বিনিময়—ইহাই আমাদের পরম লাভ,—ইংরাজের রাজসভায় আসন লাভ করার অপেক্ষা ইহা অনেক সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। এবং এই কারণেই, রিলীফ্ সোসাএটির অন্যান্য সকল কর্ত্তব্য অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত বিশেষ কর্ত্তব্যটি আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় বলিয়া বোধ হয়। অবস্থাবিশেষে পরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হয়, কিন্তু সকল অবস্থাতেই নিজের স্বাধীন বলবৃদ্ধির চেষ্টাই শ্রেয়।

উদ্দেশ্য সংক্ষেপ ও কর্ত্তব্য বিস্তার।

অনেক সময় বৃহৎ উদ্দেশ্য লইয়া বসিলে অল্পই কাজ হয় এবং উদ্দেশ্য খাটো করিলে ফল বেশি পাওয়া যায়। বিশেষতঃ আমাদের অর্থ এবং সামর্থ্য উভয়ই স্বল্প—এই জন্য যথার্থ নিজের কর্ত্তব্য পালন করিবার ইচ্ছা থাকিলে সে কর্ত্তব্যকে আপন সাধ্যসীমার মধ্যে আনিতে হইবে।

বড় বড় স্বাধীন দেশে প্রায় অধিকাংশ শুভকার্য্যের ভূমিপত্তন হইয়া আছে। এই জন্য কোন একটা ফলাও কাজে প্রবৃত্ত হওয়া তাহাদের পক্ষে সহজ। কিন্তু আমাদের দেশে সকল প্রকার দেশহিতকর কাজ একেবারে গোড়া হইতে আরম্ভ করিতে

হয়। অতএব বহুদূরে না গিয়া নিকট হইতে কাজ সুরু করাই আবশ্যক।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, যাহারা সহজে কর্ম্মপ্রিয় নহে তাহাদিগকে কর্ম্মে উৎসাহিত করিতে হইলে খুব একটা বৃহৎ সংকল্পের উত্তেজনা সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিতে হয়। ছোট কাজ হইতে বড় কাজে যাওয়া, না, বড় কাজ হইতে ছোট কাজে আসা কোন্‌টা স্বাভাবিক পথ সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন ছোট কাজের নদীপ্রবাহ বাহিয়া বড় কাজের সমুদ্রে গিয়া অবতীর্ণ হইতে হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, বড় কাজের গুঁড়ি অবলম্বন করিয়া ছোট কাজের শাখা-প্রশাখায় উত্তীর্ণ হওয়াই সঙ্গত।

আসল কথাটা এই, দেশে যখন একটা নূতন ভাবের আবির্ভাব হয় তখন প্রথমে সেটার দ্বারা আপন কল্পনাকে পরিপূর্ণ করিয়া লইতে হয়;—প্রথমে তাহার সমগ্র বৃহত্ত্বটা সম্মুখে রাখিয়া তাহার সম্যক্ পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়;—প্রথমে সেই ভাবটাকে সাধারণতঃ দেশের আব্‌-হাওয়ার সঙ্গে মিশাইয়া লইতে হয়,—তাহার পরে তাহার গূঢ় প্রভাব ছোট বড় নানা কাজে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে।

সেই জন্য, এক সময়ে বঙ্গসাহিত্যে যে সকল ভারত-জাগান গানের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল এখন তাহাকে অনেকে পরিহাসচক্ষে দেখিয়া থাকেন; কারণ, দেশহিতৈষণার সাধারণ ভাবটা এখন শিক্ষিতসাধারণের নিকট সুপরিচিত হইয়া গিয়াছে; এখন সাধারণ কথার অপেক্ষা বিশেষ কথার প্রয়োজন বেশি। এখন কোন লোককে জাগিতে বলিলে সে বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠে, আরে বাপু, আমি অনেকক্ষণ জাগিয়া বসিয়া আছি এখন কি করিতে হইবে বল দেখি!

যেমন ভাবের সম্বন্ধে তেমনি কাজের সম্বন্ধেও। এখনও আমাদের দেশহিতৈষিণী সভাগুলি অত্যন্ত বৃহৎ ব্যাপক উদ্দেশ্যের মধ্যে আপনাদিগকে দিশাহারা করিয়া রাখিয়াছেন। সে সকল সভার দ্বারা অনেক শুভফল ফলিতেছে সন্দেহ নাই কিন্তু সেই সঙ্গে এমন কতকগুলি সভার আবশ্যক যাঁহারা উদ্দেশ্যের পরিধি সংক্ষিপ্ত করিয়া যথার্থ কর্ত্তব্যের পরিধি বিস্তৃত করিবেন। অর্থাৎ যাঁহারা কেবল আন্দোলন না করিয়া কাজে হাত দিবেন।

আমাদের প্রথমেই মনে হয় সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য বিস্তর সভাসমিতির সৃষ্টি হইয়াছে, এক্ষণে কোন সভা যদি কেবলমাত্র সমস্ত বাঙ্গলা দেশের দুঃখ অভাব মোচনের জন্য কৃতসংকল্প হন তবে সম্ভবতঃ কতকটা বেশি কাজ করিতে পারেন। আমাদের লোকবল, অর্থবল এবং চরিত্রবল যেরূপ, তাহাতে সমস্ত ভারতের হিতসাধনোদ্দেশে আমরা কেবল দরখাস্ত করিতে পারি—কিন্তু কেহ কেহ যদি কেবল বাঙ্গলাদেশের মধ্যেই আপন হিতৈষণার উদ্যম বদ্ধ করেন তবে সম্ভবতঃ কতকটা পরিমাণে কাজ করিতে পারেন—এবং ক্রমে সেই উপায়ে সমস্ত ভারতবর্ষের উন্নতির পাকা ভিত্তি পত্তন করিতে পারেন।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। এখন, অধিকাংশ রাজনৈতিক আন্দোলন ইংরাজিতেই হইয়া থাকে; তাহার কারণ, সমস্ত ভারতবর্ষ এবং সমস্ত ভারতবর্ষের রাজাকে কোন কথা নিবেদন করিতে হইলে অগত্যা ইংরাজি ভাষা অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু তাহার ফল হয় এই যে, কেবল শিক্ষিতের নিকট শিক্ষা ছড়ানো হয়। ইংরাজ যে সর্ব্বদাই খোঁটা দিয়া থাকে যে, আমাদের দেশের পোলিটিকাল আন্দোলন কেবল ইংরাজিশিক্ষিতদিগের কৃত্রিম আন্দোলন, সেই নিন্দাবাদের কোন যথার্থ প্রতিকার করা হয় না। পুলিস্ বিল্,

চৌকিদারী বিল্, প্রভৃতি আইন সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি আমরা বিদেশীভাষায় টাউন্‌হলে প্রকাশ করিয়া থাকি, তদ্দ্বারা সে সকল বিল্ সংশোধন হইতেও পারে কিন্তু বিল্ সংশোধন অপেক্ষা দেশ-সংশোধন ঢের বড় কাজ। এই সকল বিলে দেশের যে প্রজা-সাধারণের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে, সেই প্রজাদিগকে বিল্-গুলির উদ্দেশ্য এবং আমাদের সকলের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহারা কি অধিকার পাইল এবং তাহাদের নিকট হইতে কি অধিকার প্রত্যাহরণ করা হইল ইহা তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলে যে উপকার হইবে ইংরাজ রাজসভায় দরবার করিয়া সে পরিমাণ উপকার হইবে না!

কেবল ইহাই নয়—দেশের রোগনিবারণ শিক্ষাবিস্তার ধন-বৃদ্ধি, শান্তিরক্ষা, অন্যায়প্রতিকার প্রভৃতি সমস্ত কাজে ঢের বেশি তন্ন তন্ন করিয়া মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে। গবর্মেণ্টকে কর্ত্তব্যশিক্ষা দান করিবার বিস্তৃত আয়োজনে সমস্ত উদ্যম নিয়োগ না করিয়া নিজেদের অদূরবর্ত্তী কর্ত্তব্যপালনের জন্য কিছু অবশিষ্ট রাখা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

উৎসবে ব্যসনেচৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।

দারিদ্র্যে, দুর্ভিক্ষে এবং রাজদ্বারে আমরা আপন দেশের লোকের সাহায্যে আপনারা উপস্থিত থাকিয়া স্বজাতিই স্বজাতির সর্ব্বপ্রধান বান্ধব ইহাই প্রমাণ করা আমাদের প্রধান কাজ। পার্লামেণ্টের সহিত বন্ধুত্বস্থাপনচেষ্টাও মন্দ কাজ নহে—কিন্তু দেশের লোকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের ন্যায় ফল তাহাতে পাইব না।

হিন্দু ও মুসলমান।

আমাদের একটা মস্ত কাজ আছে হিন্দুমুসলমানে সখ্যবন্ধন দৃঢ় করা। অন্যদেশের কথা জানি না কিন্তু বাঙ্গলাদেশে যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশি এবং হিন্দু মুসলমানে প্রতি-বেশিসম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। কিন্তু আজকাল এই সম্বন্ধ ক্রমশঃ শিথিল হইতে আরম্ভ করিয়াছে। একজন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী মুসলমান বলিতে-ছিলেন বাল্যকালে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ পরিবারদের সহিত নিতান্ত আত্মীয়ভাবে মেশামেশি করিতেন; তাঁহাদের মা মাসীগণ ঠাকুরাণীদের কোলে পিঠে মানুষ হইয়াছেন। কিন্তু আজ-কাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন হিন্দুয়ানী অকস্মাৎ নারদের ঢেঁকি অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। তাঁহারা নবোপার্জ্জিত আর্য্য অভিমানকে সজারুর শলাকার মত আপনাদের চারিদিকে কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছেন; কাহারো কাছে ঘেঁসিবার যো নাই। হঠাৎবাবুর বাবুয়ানার মত তাঁহাদের হঠাৎহিঁদুয়ানি অত্যন্ত অস্বা-ভাবিক উগ্রভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। উপন্যাসে নাটকে কাগজেপত্রে অকারণে বিধর্ম্মীদের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়া থাকে। আজকাল অনেক মুসলমানেও বাঙ্গলা শিখিতেছেন এবং বাঙ্গলা লিখিতেছেন—সুতরাং স্বভাবতই এক পক্ষ হইতে ইঁট এবং অপরপক্ষ হইতে পাটকেল্ বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। কোথায় তুর্কীর সুল্‌তান তিনশত পাচক রাখিয়াছেন ইহা লইয়া ম্লেচ্ছদিগকে তিরস্কার ও হিঁদুয়ানির বড়াই করিয়া আপন পাড়ার প্রতিবেশিদের সহিত বিরোধের সূত্রপাত করিলে তাহাতে হিন্দুদের, মাহাত্ম্য নহে, পরন্তু ক্ষুদ্রতারই পরিচয় দেওয়া হয়। যদি আমাদের ধর্ম্মের

এমন কোন গুণ থাকে যাহাতে আমাদের পুরাতন পাড়ার লোক-কেও আপন করিয়া লইতে বাধা দেয় তবে সে ধর্ম্মের জন্য অহঙ্কার করিবার কারণ কিছুই দেখি না।

কন্‌গ্রেসে বিদ্রোহ।

কন্‌গ্রেসে নর্টন্‌কে লইয়া যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে আমাদের মত আমরা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম। আমরা এই কথা বলিয়াছিলাম, যে ব্যক্তি সমাজে পতিত, সে যে অকৃত্রিম হিতৈষণাসত্বেও ভারতহিতব্রতে যোগ দিতে পারিবে না আমরা এরূপ জুলুমের কোন অর্থ বুঝিতে পারি না। মনে করা যাক্ হঠাৎ বর্ষায় নদী বাড়িয়া উঠিতেছে, হয় ত এক রাত্রেই জলপ্লাবনে দেশ নষ্ট হইতে পারে; কতকগুলি লোক বাঁধ বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; এমন সময় যদি কোন পাপী লোক আসিয়াও পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে চাহে, নৈপুণ্যের সহিত সেই দুষ্কর কার্য্যে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হয়—তবে কি তাহাকে বলিতে হইবে, আমরা সকলে সাধু এবং তুমি পাপী; অতএব তোমার নৈপুণ্য এবং তোমার হিতৈষণাবৃত্তি লইয়া তুমি চলিয়া যাও তুমি বাঁধ বাঁধিতে পাইবে না? তখন কি ইহা দেখিব না, যাহার যথার্থ হিতেচ্ছা আছে হিত-কর্ম্মে তাহার অধিকার আছে—এবং তাহার অন্য অপরাধ স্মরণ করিয়া তাহাকে ভাল কাজ করিতে বাধা দিলে কেবল তাহাকেই বাধা দেওয়া হয় না, সে কাজকেও বাধা দেওয়া হয়? আমরা এই কথা বলি, দুঃসময়ে যে লোক বাঁধ বাঁধিতে আসিয়াছে, তাহার বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে না যাইতে পারি, তাহার সহিত কন্যার বিবাহ না দিতে পারি—কিন্তু তাহাকে বাঁধ বাঁধিতে বাধা দিতে পারি না। আমাদের মধ্যে এমন নিষ্কলঙ্ক সাধু অতি অল্পই আছেন

যাঁহারা অকৃত্রিম, সদনুষ্ঠান হইতে কোন পাপীকে নিরস্ত করিবার অধিকার অসঙ্কোচে লইতে পারেন ?

আমরা একটি সংক্ষিপ্ত উপমা অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম। সঞ্জীবনী সেই উপমা প্রয়োগে বিষম বিচলিত হইয়া আমাদের প্রতি অত্যন্ত স্থূল গোছের একটা রসিকতা নিক্ষেপ করিয়াছেন। আমরা উপমা প্রয়োগ করিয়াছিলাম সে অপরাধ স্বীকার করিতেই হইবে কিন্তু কাহারও প্রতি গালি প্রয়োগ করি নাই। সঞ্জীবনীর মত কাগজ, যাঁহাকে বিস্তর প্রচলিত মতের সহিত সর্ব্বদা বিরোধ করিতে হয়, তিনি যে আজও মতের অনৈক্যে ধৈর্য্যরক্ষা করিতে শিক্ষা করিলেন না ইহাতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি।

ীয় ব্যাপার।

আমাদের কোন বন্ধু গত মাসের সাধনায় পলিটিক্স্ শব্দের ব্যবহার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন পলিটিক্স শব্দের স্থানে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে কি না ?

বাঙ্গলায় পলিটিক্সের পরিবর্ত্তে রাজনীতি শব্দ প্রচলিত হইয়া গেছে। কিন্তু রাজনীতি শব্দটি পুরাতন, পলিটিক্স আমাদের পক্ষে নূতন। আমাদের দেশে যখন রাজনীতি ছিল তখন ঠিক্ আধুনিক পলিটিক্স ছিল না। সুতরাং উভয় শব্দের মধ্যে অর্থের কিছু ইতর-বিশেষ আছেই। বোধ করি তাহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রীয় ব্যাপার শব্দটি ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক।

যখন পূর্ব্বকার রাজার সহিত এখনকার রাজার অনেক তফাৎ হইয়া গেছে তখন রাজনীতি হইতে রাজা শব্দটাই বাদ দেওয়া দরকার। অতএব রাজনীতি না বলিয়া রাষ্ট্রনীতি বলিলে কথাটা

আরও পরিষ্কার হয় বটে। কারণ, রাষ্ট্রে রাজা থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে। যেমন অ্যামেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রে রাজা নাই, সেখানে রাজনীতি নাই, রাষ্ট্রনীতি আছে। এই হিসাবে রাষ্ট্রনীতি শব্দ রাজনীতি শব্দের অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক।

পলিটিক্স জিনিষটা আমরা ইংরাজের নিকট হইতে পাইয়াছি; অতএব ঐ শব্দটা ইংরাজি আকারে ব্যবহার করিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, তাহাতে উহার ইতিহাসও রক্ষা হয় ভাবও রক্ষা হয়। সেই সঙ্গে যদি একটা বাঙ্গলা প্রতিশব্দ থাকে ত থাক্। রাজনীতি শব্দটি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। অনেক পুরাতন শব্দ কালক্রমে অর্থ পরিবর্ত্তন করে এস্থলেও তাহা খাটিতে পারে। অপর পক্ষে রাষ্ট্রনীতি শব্দটিও দুরূহ নহে, এবং অধিকতর সঙ্গত।

ভালবাসা।

কি আর বুঝাবে বল, জানি যে ও সব!
কিবা ভালবাসাধর্ম্ম, শুনেছি ত তার মর্ম্ম,
পড়েছি কতই তার ব্যাখ্যা অভিনব;—
ভালবাসা স্বর্গসুধা, মিটে সংসারের ক্ষুধা,
যে করে বারেক পান সে হয় অমর,—
ভালবাসা প্রহেলিকা শুনেছি বিস্তর।

ভালবাসা অপার্থিব কত লোকে কয়,
আত্ম বলিদান দিলে তবে ভালবাসা মিলে,

প্রেমিক বাসিয়া ভাল, প্রেম নাহি চায়,
সে চাহে না প্রতিদান, সে করে না অভিমান,
ভালবাসা বিনিময়ে ঘৃণা যদি পায়,
সে দিকে চাহে না সেত, কি ক্ষতি তাহায়!

শুনেছি এ সব তবু, বুঝি নাই কেন!
কেমন এ ক্ষুদ্র প্রাণ পেতে চায় প্রতিদান
পদে পদে অভিমান বাধা পায় যেন;
আমি ভালবাসি যায়, সে কভু না ফিরে চায়
চরণে ধরিলে তার ঠেলে সেই পায়,
এ কথা ভাবিলে তবু বুক ফেটে যায়!

হায় রে, এ ভালবাসা নূতন প্রকার,
ভাল বাসি বলে তাই আপন করিতে চাই'
আত্ম বলিদান নাই, সকলি আমার;
তাহারে আপন করি, পরাণে লইব হরি,
কেন সদা পেতে চাই এই অধিকার,
বুঝিবেনা ভালবাসা নূতন ধারার!

গ্রন্থ সমালোচনা।

নূরজাহান। শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থখানি নাটক। এই নাটকের কি গদ্য, কি পদ্য, কি ঘটনা-সংস্থান, কি চরিত্র চিত্র, কি আরম্ভ, কি পরিণাম সকলি অদ্ভুত

হইয়াছে। ভাষাটা যেন বাঁকা বাঁকা, নিতান্তই বিদেশীর বাঙ্গলার মত এবং সমস্ত গ্রন্থখানিই যেন, পাঠকদের প্রতি পরিহাস বলিয়া মনে হয়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, স্থানে স্থানে ইহাতে নাট্যকলা এবং কবিত্বের আভাস নাই যে তাহাও নহে কিন্তু পরক্ষণেই তাহা প্রলাপে পরিণত হইয়াছে;—তাই এক এক সময়ে মনে হয় লেখকের ক্ষমতা আছে কিন্তু সে ক্ষমতা যেন প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নাই।

শুভ পরিণয়ে।

বন্ধুর শুভ পরিণয়ে কোন প্রচ্ছন্ননামা লেখক এই ক্ষুদ্র কাব্য-গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। ইহা পাঠকসাধারণের জন্য প্রকাশিত হয় নাই, এই কারণে আমাদের পত্রিকায় এ গ্রন্থের সমালোচনা অনাবশ্যক বোধ করি।

ভ্রমসংশোধন।

ফাল্গুনের সাধনায় ৩০০ পৃঃ শেষ প্যারাগ্রাফের শেষে এই কয় লাইন বসিবেঃ—

"কিন্তু মানুষের মনের কোন অবস্থার সমগ্র চিত্র প্রদর্শন করিতে হইলে দ্বিতীয় প্রণালী আবশ্যক।"

সাধনা।

মানভঞ্জন।

রমানাথ শীলের ত্রিতল অট্টালিকায় সর্ব্বোচ্চ তলের ঘরে গোপীনাথ শীলের স্ত্রী গিরিবালা বাস করেন। শয়ন কক্ষের দক্ষিণ দ্বারের সম্মুখে ফুলের টবে গুটিকতক বেলফুল এবং গোলাপফুলের গাছ;—ছাতটি উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা—বহির্দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রাচীরের মাঝে মাঝে একটি করিয়া ইট ফাঁক দেওয়া আছে। শোবার ঘরে নানা বেশ এবং বিবেশ-বিশিষ্ট বিলাতী নারীমূর্ত্তির বাঁধানো এন্‌গ্রেভিং টাঙ্গানো রহিয়াছে; কিন্তু প্রবেশদ্বারের সম্মুখবর্ত্তী বৃহৎ আয়নার উপরে ষোড়শী গৃহস্বামিনীর যে প্রতিবিম্বটি পড়ে, তাহা দেয়ালের কোন ছবি অপেক্ষা সৌন্দর্য্যে ন্যূন নহে।

গিরিবালার সৌন্দর্য্য অকস্মাৎ আলোকরশ্মির ন্যায়, বিস্ময়ের ন্যায়, নিদ্রাভঙ্গে চেতনার ন্যায় একেবারে চকিতে আসিয়া আঘাত করে এবং এক আঘাতে অভিভূত করিয়া দিতে পারে। তাহাকে দেখিলে মনে হয় ইহাকে দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। চারিদিকে এবং চিরকাল যেরূপ দেখিয়া আসিতেছি এ একেবারে হঠাৎ তাহা হইতে অনেক স্বতন্ত্র।

গিরিবালাও আপন লাবণ্যোচ্ছ্বাসে আপনি আদ্যোপান্ত তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে। মদের ফেনা যেমন পাত্র ছাপিয়া পড়িয়া যায়, নবযৌবন এবং নবীন সৌন্দর্য্য তাহার সর্ব্বাঙ্গে তেমনি

ছাপিয়া পড়িয়া যাইতেছে,—তাহার বসনে ভূষণে গমনে, তাহার বাহুর বিক্ষেপে, তাহার গ্রীবার ভঙ্গীতে, তাহার চঞ্চল চরণের উদ্দাম ছন্দে, নূপুর নিক্কনে, কঙ্কণের কিঙ্কিনিতে, তরল হাস্যে, ক্ষিপ্রভাষায়, উজ্জ্বল কটাক্ষে একেবারে উচ্ছৃঋল ভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে।

আপন সর্ব্বাঙ্গের এই উচ্ছ্বলিত মদিররসে গিরিবালার একটা নেশা লাগিয়াছে। প্রায় দেখা যাইত, একখানি কোমল রঙীন্ বস্ত্রে আপনার পরিপূর্ণ দেহখানি জড়াইয়া সে ছাতের উপরে অকারণে চঞ্চল হইয়া বেড়াইতেছে। যেন মনের ভিতরকার কোন এক অশ্রুত অব্যক্ত সঙ্গীতের তালে তালে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নৃত্য করিতে চাহিতেছে। আপনার অঙ্গকে নানা ভঙ্গীতে উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত প্রক্ষিপ্ত করিয়া তাহার যেন বিশেষ কি এক আনন্দ আছে;— সে যেন আপন সৌন্দর্য্যের নানা দিকে নানা ঢেউ তুলিয়া দিয়া সর্ব্বাঙ্গের উত্তপ্ত রক্তস্রোতে অপূর্ব্ব পুলক সহকারে বিচিত্র আঘাত প্রতিঘাত অনুভব করিতে থাকে। সে হঠাৎ গাছ হইতে পাতা ছিঁড়িয়া দক্ষিণ বাহু আকাশে তুলিয়া সেটা বাতাসে উড়াইয়া দেয়— অমনি তাহার বালা বাজিয়া উঠে, তাহার অঞ্চল বিস্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহার সুললিত বাহুর ভঙ্গীটি পিঞ্জরমুক্ত অদৃশ্য পাখীর মত অনন্ত-আকাশে মেঘরাজ্যের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়া যায়। হঠাৎ সে টব হইতে একটা মাটির ঢেলা তুলিয়া অকারণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়; চরণাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া বৃহৎ বহির্জগৎটা একবার চট্ করিয়া দেখিয়া লয়— আবার ঘুরিয়া আঁচল ঘুরাইয়া চলিয়া আসে, আঁচলের চাবির গোচ্ছা ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিয়া উঠে। হয় ত আয়নার সম্মুখে গিয়া খোঁপা খুলিয়া ফেলিয়া অসময়ে চুল বাঁধিতে বসে; চুল

বাঁধিবার দড়ি দিয়া কেশমূল বেষ্টন করিয়া সেই দড়ি কুন্দদন্ত-পংক্তিতে দংশন করিয়া ধরে, দুইবাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া মস্তকের পশ্চাতে বেণীগুলিকে দৃঢ় আকর্ষণে কুণ্ডলায়িত করে—চুল বাঁধা শেষ করিয়া হাতের সমস্ত কাজ ফুরাইয়া যায়—তখন সে আলস্য-ভরে কোমল বিছানার উপরে আপনাকে পত্রান্তরালচ্যুত একটি জ্যোৎস্নালেখার মত বিস্তীর্ণ করিয়া দেয়।

তাহার সন্তানাদি নাই, ধনীগৃহে তাহার কোন কাজকর্ম্মও নাই—সে কেবল নির্জ্জনে প্রতিদিন আপনার মধ্যে আপনি সঞ্চিত হইয়া শেষকালে আপনাকে আর ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। স্বামী আছে কিন্তু স্বামী তাহার আয়ত্তের মধ্যে নাই। গিরিবালা বাল্যকাল হইতে যৌবনে এমন পূর্ণবিকশিত হইয়া উঠিয়াও কেমন করিয়া তাহার স্বামীর চক্ষু এড়াইয়া গেছে।

বরঞ্চ বাল্যকালে সে তাহার স্বামীর আদর পাইয়াছিল। স্বামী তখন ইস্কুল পালাইয়া তাহার সুপ্ত অভিভাবকদিগকে বঞ্চনা করিয়া নির্জ্জন মধ্যাহ্নে তাহার বালিকা স্ত্রীর সহিত প্রণয়ালাপ করিতে আসিত। এক বাড়িতে থাকিয়াও সৌখীন চিঠির কাগজে স্ত্রীর সহিত চিঠিপত্র লেখালেখি করিত। ইস্কুলের বিশেষ বন্ধুদিগকে সেই সমস্ত চিঠি দেখাইয়া গর্ব্ব অনুভব করিত। তুচ্ছ এবং কল্পিত কারণে স্ত্রীর সহিত মান অভিমানেরও অসদ্ভাব ছিল না।

এমন সময় বাপের মৃত্যুতে গোপীনাথ স্বয়ং বাড়ির কর্ত্তা হইয়া উঠিল। কাঁচা কাঠের তক্তায় শীঘ্র পোকা ধরে—কাঁচা বয়সে গোপীনাথ যখন স্বাধীন হইয়া উঠিল তখন অনেকগুলি জীবজন্তু তাহার স্কন্ধে বাসা করিল। তখন ক্রমে অন্তঃপুরে তাহার গতি-বিধি হ্রাস হইয়া অন্যত্র প্রসারিত হইতে লাগিল।

দলপতিত্বের একটা উত্তেজনা আছে; মানুষের কাছে মানু-

ষের নেশাটা অত্যন্ত বেশি। অসংখ্য মনুষ্যজীবন এবং সুবিস্তীর্ণ ইতিহাসের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিবার প্রতি নেপোলিয়নের যে একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল—একটি ছোট বৈঠকখানার ছোট কর্ত্তাটিরও নিজের ক্ষুদ্র দলের নেশা অল্পতর পরিমাণে সেই এক জাতীয়। সামান্য ইয়ার্কিবন্ধনে আপনার চারিদিকে একটা লক্ষ্মীছাড়া ইয়ারমণ্ডলী সৃজন করিয়া তুলিলে তাহাদের উপর আধিপত্য এবং তাহাদের নিকট হইতে বাহবা লাভ করা একটা প্রচণ্ড উত্তেজনার কারণ হইয়া দাঁড়ায় সে জন্য অনেক লোক বিষয় নাশ, ঋণ, কলঙ্ক সমস্তই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয়।

গোপীনাথ তাহার ইয়ার সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ হইয়া ভারি মাতিয়া উঠিল। সে প্রতিদিন ইয়ার্কির নব নব কীর্ত্তি নব নব গৌরব লাভ করিতে লাগিল। তাহার দলের লোক বলিতে লাগিল—শ্যালকবর্গের মধ্যে ইয়ার্কিতে অদ্বিতীয় খ্যাতিলাভ করিল গোপীনাথ; সেই গর্ব্বে সেই উত্তেজনায় অন্যান্য সমস্ত সুখদুঃখকর্ত্তব্যের প্রতি অন্ধ হইয়া হতভাগ্য ব্যক্তিটি রাত্রি দিন আবর্ত্তের মত পাক খাইয়া খাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

এদিকে জগজ্জয়ী রূপ লইয়া আপন অন্তঃপুরের প্রজাহীন রাজ্যে, শয়ন-গৃহের শূন্য সিংহাসনে গিরিবালা অধিষ্ঠান করিতে লাগিল। সে নিজে জানিত বিধাতা তাহার হস্তে রাজদণ্ড দিয়াছেন—সে জানিত, প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া যে বৃহৎ জগৎখানি দেখা যাইতেছে, সেই জগৎটিকে সে কটাক্ষে জয় করিয়া আসিতে পারে—অথচ বিশ্বসংসারের মধ্যে একটি মানুষকেও সে বন্দী করিতে পারে নাই।

গিরিবালার একটি সুরসিকা দাসী আছে তাহার নাম, সুধো, অর্থাৎ সুধামুখী। সে গান গাহিত, নাচিত, ছড়া কাটিত,

প্রভুপত্নীর রূপের ব্যাখ্যা করিত, এবং অরসিকের হস্তে এমন রূপ নিষ্ফল হইল বলিয়া আক্ষেপ করিত। গিরিবালার যখন-তখন এই সুধোকে নহিলে চলিত না। উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া সে নিজের মুখের শ্রী, দেহের গঠন, বর্ণের উজ্জ্বলতা সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা শুনিত; মাঝে মাঝে তাহার প্রতিবাদ করিত, এবং পরম পুলকিত চিত্তে সুধোকে মিথ্যাবাদিনী চাটুভাষিণী বলিয়া গঞ্জনা করিতে ছাড়িত না;—সুধো তখন শত শত শপথ সহকারে নিজের মতের অকৃত্রিমতা প্রমাণ করিতে বসিত, গিরিবালার পক্ষে তাহা বিশ্বাস করা নিতান্ত কঠিন হইত না।

সুধো গিরিবালাকে গান শুনাইত—"দাসখত দিলাম লিখে শ্রীচরণে";—এই গানের মধ্যে গিরিবালা নিজের অলক্তাঙ্কিত অনিন্দ্য সুন্দর চরণপল্লবের স্তব শুনিতে পাইত এবং একটি পদ-লুণ্ঠিত দাসের ছবি তাহার কল্পনায় উদিত হইত—কিন্তু হায়, দুটি শ্রীচরণ মলের শব্দে শূন্য ছাতের উপরে আপন জয়গান ঝঙ্কৃত করিয়া বেড়ায় তবু কোন স্বেচ্ছাবিক্রীত ভক্ত আসিয়া দাসখৎ লিখিয়া দিয়া যয় না।

গোপীনাথ যাহাকে দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছে, তাহার নাম লবঙ্গ—সে থিয়েটারে অভিনয় করে—সে ষ্টেজের উপরে চমৎকার মূর্চ্ছা যাইতে পারে—সে যখন সানুনাসিক কৃত্রিম কাঁদুনীর স্বরে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া টানিয়া টানিয়া আধ-আধ উচ্চারণে "প্রাণনাথ প্রাণেশ্বর" করিয়া ডাক ছাড়িতে থাকে, তখন পাৎলা ধুতির উপর ওয়েষ্ট্‌কোট্‌-পরা, ফুল্‌মোজামণ্ডিত দর্শকমণ্ডলী "এক্সেলেণ্ট্‌" "এক্সেলেণ্ট" করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

এই অভিনেত্রী লবঙ্গের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার বর্ণনা গিরিবালা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার তাহার স্বামীর মুখেই শুনিয়াছে। তখনও

তাহার স্বামী সম্পূর্ণরূপে পলাতক হয় নাই। তখন সে তাহার স্বামীর মোহাবস্থা না জানিয়াও মনে মনে অসূয়া অনুভব করিত। আর কোন নারীর এমন কোন মনোরঞ্জনী বিদ্যা আছে যাহা তাহার নাই ইহা সে সহ্য করিতে পারিত না। সাসূয় কৌতূহলে সে অনেকবার থিয়েটার দেখিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত কিন্তু কিছুতেই স্বামীর মত করিতে পারিত না। অবশেষে সে একদিন টাকা দিয়া সুধোকে থিয়েটার দেখিতে পাঠাইয়া দিল—সুধো আসিয়া নাসাভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রামনাম উচ্চারণ পূর্ব্বক অভিনেত্রীদিগের ললাটদেশে সম্মার্জ্জনীর ব্যবস্থা করিল—এবং তাহাদের কদর্য্যমূর্ত্তি ও কৃত্রিম ভঙ্গীতে যে সমস্ত পুরুষের অভিরুচি জন্মে তাহাদের সম্বন্ধেও সেই একই রূপ বিধান স্থির করিল। শুনিয়া গিরিবালা বিশেষ আশ্বস্ত হইল।

কিন্তু যখন তাহার স্বামী বন্ধন ছিন্ন করিয়া গেল, তখন তাহার মনে সংশয় উপস্থিত হইল। সুধোর কথায় অবিশ্বাস প্রকাশ করিলে সুধো গিরির গা ছুঁইয়া বারম্বার কহিল বস্ত্রখণ্ডাবৃত দগ্ধ-কাষ্ঠের মত তাহার নীরস এবং কুৎসিৎ চেহারা। গিরি তাহার আকর্ষণী শক্তির কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না এবং নিজের অভিমানে সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া জ্বলিতে লাগিল।

অবশেষে এক দিন সন্ধ্যাবেলায় সুধোকে লইয়া গোপনে থিয়েটার দেখিতে গেল। নিষিদ্ধ কাজের উত্তেজনা বেশি। তাহার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যে এক মৃদু কম্পন উপস্থিত হইয়াছিল সেই কম্পনাবেগে এই আলোকময়, লোকময়, বাদ্যসঙ্গীতমুখরিত, দৃশ্য-পটশোভিত রঙ্গভূমি তাহার চক্ষে দ্বিগুণ অপরূপতা ধারণ করিল। তাহার সেই প্রাচারবেষ্টিত নির্জ্জন নিরানন্দ অন্তঃপুর হইতে এ

কোন্ এক সুসজ্জিত সুন্দর উৎসবলোকের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল! সমস্ত স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সে দিন মানভঞ্জন অপেরা অভিনয় হইতেছে। যখন ঘণ্টা বাজিল, বাদ্য থামিয়া গেল, চঞ্চল দর্শকগণ মুহূর্ত্তে স্থির নিস্তব্ধ হইয়া বসিল, রঙ্গমঞ্চের সম্মুখবর্ত্তী আলোকমালা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, পট উঠিয়া গেল, এক দল সুসজ্জিত নটী ব্রজাঙ্গনা সাজিয়া সঙ্গীত-সহযোগে নৃত্য করিতে লাগিল, দর্শকগণের করতালি ও প্রশংসাবাদে নাট্যশালা থাকিয়া থাকিয়া ধ্বনিত কম্পিত হইয়া উঠিল, তখন গিরিবালার তরুণ দেহের রক্তলহরী উন্মাদনায় আলোড়িত হইতে লাগিল। সেই সঙ্গীতের তানে, আলোক ও আভরণের ছটায়, এবং সম্মিলিত প্রশংসাধ্বনিতে সে ক্ষণকালের জন্য সমাজ সংসার সমস্তই বিস্মৃত হইয়া গেল—মনে করিল, এমন এক জায়গায় আসিয়াছে যেখানে বন্ধনমুক্ত সৌন্দর্য্যপূর্ণ স্বাধীনতার কোন বাধা-মাত্র নাই।

সুধো মাঝে মাঝে আসিয়া ভীতস্বরে কানে কানে বলে, বৌ-ঠাকরুণ, এই বেলা বাড়ি ফিরিয়া চল; দাদাবাবু জানিতে পারিলে রক্ষা থাকিবে না। গিরিবালা সে কথায় কর্ণপাত করে না। তাহার মনে এখন আর কিছুমাত্র ভয় নাই।

অভিনয় অনেক দূর অগ্রসর হইল। রাধার দুর্জ্জয় মান হইয়াছে;—সে মানসগরে কৃষ্ণ আর কিছুতেই থই পাইতেছে না;—কত অনুনয় বিনয় সাধাসাধি কাঁদাকাঁদি—কিছুতেই কিছু হয় না! তখন গর্ব্বভরে গিরিবালার বক্ষ ফুলিতে লাগিল। কৃষ্ণের এই লাঞ্ছনায় সে যেন মনে মনে রাধা হইয়া নিজের অসীম প্রতাপ নিজে অনুভব করিতে লাগিল। কেহ তাহাকে কখন এমন করিয়া সাধে নাই; সে অবহেলিত অবমানিত পরিত্যক্ত স্ত্রী, কিন্তু তবু সে এক অপূর্ব্ব

মোহে স্থির করিল, যে, এমন করিয়া নিষ্ঠুরভাবে কাঁদাইবার ক্ষমতা তাহারও আছে। সৌন্দর্য্যের যে কেমন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ তাহা সে কানে শুনিয়াছে অনুমান করিয়াছে মাত্র—আজ দীপের আলোকে, গানের সুরে, সুদৃশ্য রঙ্গমঞ্চের উপরে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিল। নেশায় তাহার সমস্ত মস্তিষ্ক ভরিয়া উঠিল।

অবশেষে যবনিকা পতন হইল, গ্যাসের আলো ম্লান হইয়া আসিল, দর্শকগণ প্রস্থানের উপক্রম করিল; গিরিবালা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসিয়া রহিল। এখান হইতে উঠিয়া যে বাড়ি যাইতে হইবে একথা তাহার মনে ছিল না। সে ভাবিতেছিল, অভিনয় বুঝি ফুরাইবে না, যবনিকা আবার উঠিবে, রাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণের পরাভব, জগতে ইহা ছাড়া আর কোন বিষয় উপস্থিত নাই। সুধো কহিল, বৌঠাকুরুণ, কর কি, ওঠ, এখনি সমস্ত আলো নিবাইয়া দিবে।

গিরিবালা গভীর রাত্রে আপন শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিল। কোণে একটি দীপ মিট্‌মিট্‌ করিতেছে—ঘরে একটি লোক নাই, শব্দ নাই—গৃহপ্রান্তে নির্জ্জন শয্যার উপরে একটি পুরাতন মশারি বাতাসে অল্প অল্প দুলিতেছে; তাহার প্রতিদিনের জগৎ অত্যন্ত বিশ্রী বিরস এবং তুচ্ছ বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। কোথায় সেই সৌন্দর্য্যময় আলোকময় সঙ্গীতময় রাজ্য যেখানে সে আপনার সমস্ত মহিমা বিকীর্ণ করিয়া দিয়া জগতের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করিতে পারে—যেখানে সে অজ্ঞাত অবজ্ঞাত তুচ্ছ সাধারণ নারীমাত্র নহে!

এখন হইতে সে প্রতি সপ্তাহেই থিয়েটারে যাইতে আরম্ভ করিল। কালক্রমে তাহার সেই প্রথম মোহ অনেকটা পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিল—এখন সে নটনটীদের মুখের রং চং, সৌন্দর্য্যের অভাব, অভিনয়ের কৃত্রিমতা সমস্ত দেখিতে পাইল, কিন্তু তবু

তাহার নেশা ছুটিল না। রণসঙ্গীত শুনিলে যোদ্ধার হৃদয় যেমন নাচিয়া উঠে, রঙ্গমঞ্চের পট উঠিয়া গেলেই তাহার বক্ষের মধ্যে সেইরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইত। ঐ যে, সমস্ত সংসার হইতে স্বতন্ত্র সুদৃশ্য সমুচ্চ সুন্দর বেদিকা, স্বর্ণলেখায় অঙ্কিত, চিত্রপটে সজ্জিত, কাব্য এবং সঙ্গীতের ইন্দ্রজালে মায়ামণ্ডিত, অসংখ্য মুগ্ধ-দৃষ্টির দ্বারা আক্রান্ত, নেপথ্য ভূমির গোপনতার দ্বারা অপূর্ব্ব রহস্য-প্রাপ্ত, উজ্জ্বল আলোকমালায় সর্ব্বসমক্ষে সুপ্রকাশিত,—বিশ্ববিজয়িনী সৌন্দর্য্যরাজ্ঞীর পক্ষে এমন মায়া-সিংহাসন আর কোথায় আছে?

প্রথমে যে দিন সে তাহার স্বামীকে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত দেখিল, এবং যখন গোপীনাথ কোন নটীর অভিনয়ে উন্মত্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন স্বামীর প্রতি তাহার মনে প্রবল অবজ্ঞার উদয় হইল। সে জর্জ্জরিত চিত্তে মনে করিল যদি কখন এমন দিন আসে যে, তাহার স্বামী তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া দগ্ধ-পক্ষ পতঙ্গের মত তাহার পদতলে আসিয়া পড়ে, এবং সে আপন চরণ নখরের প্রান্ত হইতে উপেক্ষা বিকীর্ণ করিয়া দিয়া অভিমান-ভরে চলিয়া যাইতে পারে তবেই তাহার এই ব্যর্থ রূপ ব্যর্থ যৌবন সার্থকতা লাভ করিবে।

কিন্তু সে শুভদিন আসিল কই? আজ কাল গোপীনাথের দর্শন পাওয়াই দুর্লভ হইয়াছে। সে আপন প্রমত্ততার ঝড়ের মুখে ধূলিধ্বজের মত একটা দল পাকাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার আর ঠিকানা নাই।

একদিন চৈত্রমাসের বাসন্তী পূর্ণিমায় গিরিবালা বসন্তীরঙ্গের কাপড় পরিয়া দক্ষিণ বাতাসে অঞ্চল উড়াইয়া ছাতের উপর বসিয়াছিল। যদিও ঘরে স্বামী আসে না তবু গিরি উল্টিয়া

পাল্টিয়া প্রতিদিন বদল করিয়া নূতন নূতন গহনায় আপনাকে সুসজ্জিত করিয়া তুলিত। হীরামুকুতার আভরণ তাহার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে একটি উন্মাদনা সঞ্চার করিত, ঝল্‌মল্‌ করিয়া রুনুঝুনু বাজিয়া তাহার চারিদিকে একটি হিল্লোল তুলিতে থাকিত। আজ সে হাতে বাজুবন্ধ এবং গলায় একটি চুণী ও মুক্তার কণ্ঠী পরিয়াছে এবং বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলীতে একটি নীলার আংটি দিয়াছে। সুধো পায়ের কাছে বসিয়া মাঝে মাঝে তাহার নিটোল-কোমল রক্তোৎপল পদপল্লবে হাত বুলাইতে ছিল—এবং অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসের সহিত বলিতেছিল, আহা বৌঠাকুরুণ আমি যদি পুরুষ মানুষ হইতাম তাহা হইলে এই পা দুখানি বুকে লইয়া মরিতাম। গিরিবালা সগর্ব্বে হাসিয়া উত্তর দিতেছিল, বোধ করি বুকে না লইয়াই মরিতে হইত—তখন কি আর এমন করিয়া পা ছড়াইয়া দিতাম? আর বকিস্‌নে; তুই সেই গানটা গা!

সুধো সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নির্জ্জন ছাদের উপর গাহিতে লাগিল—

দাসখৎ দিলেম লিখে শ্রীচরণে,
সকলে সাক্ষী থাকুক্ বৃন্দাবনে।

তখন রাত্রি দশটা। বাড়ির আর সকলে আহারাদি সমাধা করিয়া ঘুমাইতে গিয়াছে। এমন সময় আতর মাখিয়া উড়ানী উড়াইয়া হঠাৎ গোপীনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল - সুধো অনেকখানি জিব কাটিয়া সাত হাত ঘোমটা টানিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

গিরিবালা ভাবিল আজ তাহার দিন আসিয়াছে। সে মুখ তুলিয়া চাহিল না। সে রাধিকার মত গুরুমানভরে অটল হইয়া

বসিয়া রহিল। কিন্তু দৃশ্যপট উঠিল না—শিখিপুচ্ছচূড়া পায়ের কাছে লুটাইল না—কেহ কাফি রাগিণীতে গাহিয়া উঠিল না—

কেন, পূর্ণিমা আঁধার কর লুকায়ে বদন শশি!

সঙ্গীতহীন নীরসকণ্ঠে গোপীনাথ বলিল—একবার চাবিটা দাও দেখি! এমন জ্যোৎস্নায় এমন বসন্তে এতদিনের বিচ্ছেদের পরে এই কি প্রথম সম্ভাষণ! কাব্যে নাটকে উপন্যাসে যাহা লেখে তাহার আগাগোড়াই মিথ্যা কথা! অভিনয়মঞ্চেই প্রণয়ী গান গাহিয়া পায়ে আসিয়া লুটাইয়া পড়ে—এবং তাঁহাই দেখিয়া যে দর্শকের চিত্ত বিগলিত হইয়া যায়, সেই লোকটি বসন্ত নিশীথে গৃহছাদে আসিয়া আপন অনুপমা যুবতী স্ত্রীকে বলে, ওগো একবার চাবিটা দাও দেখি! তাহাতে না আছে রাগিণী না আছে প্রীতি, তাহাতে কোন মোহ নাই মাধুর্য্য নাই, তাহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর!

এমন সময়ে দক্ষিণে বাতাস জগতের সমস্ত অপমানিত কবিত্বের মর্ম্মান্তিক দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত হুহু করিয়া বহিয়া গেল—টবভরা ফুটন্ত বেলফুলের গন্ধ ছাদময় ছড়াইয়া দিয়া গেল—গিরিবালার চূর্ণ অলক চোখে মুখে আসিয়া পড়িল এবং তাহার বসন্তীরঙের সুগন্ধি আঁচল অধীরভাবে যেখানে সেখানে উড়িতে লাগিল। গিরিবালা সমস্ত মান বিসর্জ্জন দিয়া উঠিয়া পড়িল। স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, চাবী দিব এখন, তুমি ঘরে চল।—আজ সে কাঁদিবে কাঁদাইবে, তাহার সমস্ত নির্জ্জন কল্পনাকে সার্থক করিবে, তাহার সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্র বাহির করিয়া বিজয়ী হইবে, ইহা সে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছে। গোপীনাথ কহিল, আমি বেশি দেরী করিতে পারিব না—তুমি চাবি দাও।—গিরিবালা কহিল—আমি চাবি দিব এবং চাবির মধ্যে যাহা কিছু আছে সমস্ত দিব—কিন্তু আজ

রাত্রে তুমি কোথাও যাইতে পারিবে না।—গোপীনাথ বলিল—সে হইবে না। আমার বিশেষ দরকার আছে।—গিরিবালা বলিল—তবে আমি চাবি দিব না!—গোপী বলিল দিবে না বৈ কি? কেমন না দাও দেখিব! বলিয়া সে গিরিবালার আঁচলে দেখিল চাবি নাই। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার আয়নার বাক্সর দেরাজ খুলিয়া দেখিল তাহার মধ্যেও চাবি নাই। তাহার চুল বাঁধিবার বাক্স জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া খুলিল—তাহাতে কাজললতা, সিঁদুরের কৌটা, চুলের দড়ি প্রভৃতি বিচিত্র উপকরণ আছে—চাবি নাই। তখন সে বিছানা ঘাঁটিয়া গদি উঠাইয়া আল্মারি ভাঙ্গিয়া নাস্তানাবুদ্ করিয়া তুলিল। গিরিবালা প্রস্তরমূর্ত্তির মত শক্ত হইয়া দরজা ধরিয়া ছাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যর্থমনোরথ গোপীনাথ রাগে গর্গর্ করিতে করিতে আসিয়া বলিল—চাবি দাও বলিতেছি নহিলে ভাল হইবে না। গিরিবালা উত্তরমাত্র দিল না। তখন গোপী তাহাকে চাপিয়া ধরিল এবং তাহার হাত হইতে বাজুবন্ধ, গলা হইতে কণ্ঠী, অঙ্গুলি হইতে আংটি ছিনিয়া লইয়া তাহাকে লাথি মারিয়া চলিয়া গেল।

বাড়ির কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হইল না, পল্লীর কেহ কিছুই জানিতে পারিল না, জ্যোৎস্নারাত্রি তেমনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, সর্ব্বত্র যেন অখণ্ড শান্তি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু অন্তরের চীৎকারধ্বনি যদি বাহিরে শুনা যাইত তবে সেই চৈত্র মাসের সুখসুপ্ত জ্যোৎস্নানিশীথিনী অকস্মাৎ তীব্রতম আর্ত্তস্বরে দীর্ণ বিদীর্ণ হইয়া যাইত। এমন সম্পূর্ণ নিঃশব্দে এমন হৃদয়-বিদারণ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে!

অথচ সে রাত্রিও কাটিয়া গেল। এমন পরাভব এত অপমান গিরিবালা সুধোর কাছেও বলিতে পারিল না। মনে করিল,

আত্মহত্যা করিয়া, এই অতুল রূপ যৌবন নিজের হাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সে আপন অনাদরের প্রতিশোধ লইবে। কিন্তু তখনি মনে পড়িল, তাহাতে কাহারও কিছু আসিবে যাইবে না—পৃথিবীর যে কতখানি ক্ষতি হইবে তাহা কেহ অনুভবও করিবে না। জীবনেও কোন সুখ নাই, মৃত্যুতেও কোন সান্ত্বনা নাই।

গিরিবালা বলিল, আমি বাপের বাড়ি চলিলাম।—তাহার বাপের বাড়ি কলিকাতা হইতে দূরে। সকলেই নিষেধ করিল—কিন্তু বাড়ির কর্ত্রী নিষেধও শুনিল না কাহাকে সঙ্গেও লইল না। এদিকে গোপীনাথও সদলবলে নৌকাবিহারে কত দিনের জন্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গান্ধর্ব্ব থিয়েটারে গোপীনাথ প্রায় প্রত্যেক অভিনয়েই উপস্থিত থাকিত। সেখানে মনোরমানাটকে লবঙ্গ মনোরমা সাজিত এবং গোপীনাথ সদলে সম্মুখের সারে বসিয়া তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে বাহবা দিত এবং ষ্টেজের উপর তোড়া ছুঁড়িয়া ফেলিত। মাঝে মাঝে এক এক দিন গোলমাল করিয়া দর্শকদের অত্যন্ত বিরক্তিভাজন হইত। তথাপি রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ তাহাকে কখন নিষেধ করিতে সাহস করে নাই।

অবশেষে একদিন গোপীনাথ কিঞ্চিৎ মত্তাবস্থায় গ্রীন্‌রুমের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভারি গোল বাধাইয়া দিল। কি এক সামান্য কাল্পনিক কারণে সে আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া কোন নটীকে গুরুতর প্রহার করিল—তাহার চীৎকারে, এবং গোপীনাথের গালিবর্ষণে সমস্ত নাট্যশালা চকিত হইয়া উঠিল। সেদিন

অধ্যক্ষগণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া গোপীনাথকে পুলিসের সাহায্যে বাহির করিয়া দেয়।

গোপীনাথ এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে কৃতনিশ্চয় হইল। থিয়েটারওয়ালারা পূজার একমাস পূর্ব্ব হইতে নূতন নাটক মনোরমার অভিনয় খুব আড়ম্বরসহকারে ঘোষণা করিয়াছে। বিজ্ঞাপনের দ্বারা কলিকাতা সহরটাকে কাগজে মুড়িয়া ফেলিয়াছে;—রাজধানীকে যেন সেই বিখ্যাত গ্রন্থকারের নামাঙ্কিত নামাবলী পরাইয়া দিয়াছে।

এমন সময় গোপীনাথ তাহাদের প্রধান অভিনেত্রী লবঙ্গকে লইয়া বোটে চড়িয়া কোথায় অন্তর্দ্ধান হইল তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

থিয়েটারওয়ালারা হঠাৎ অকূলপাথারে পড়িয়া গেল। কিছু দিন লবঙ্গের জন্য অপেক্ষা করিয়া অবশেষে এক নূতন অভিনেত্রীকে মনোরমার অংশ অভ্যাস করাইয়া লইল—তাহাতে তাহাদের অভিনয়ের সময় পিছাইয়া গেল।

কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হইল না। অভিনয় স্থলে দর্শক আর ধরে না। শত শত লোক দ্বার হইতে ফিরিয়া যায়। কাগজেও প্রশংসার সীমা নাই।

সে প্রশংসা দূরদেশে গোপীনাথের কানে গেল। সে আর থাকিতে পারিল না। বিদ্বেষে এবং কৌতূহলে পূর্ণ হইয়া সে অভিনয় দেখিতে আসিল।

প্রথম পট উৎক্ষেপে অভিনয়ের আরম্ভ ভাগে মনোরমা দীনহীন বেশে দাসীর মত তাহার শ্বশুর বাড়িতে থাকে—প্রচ্ছন্ন বিনম্র সঙ্কুচিতভাবে সে আপনার কাজ কর্ম্ম করে—তাহার মুখে কথা নাই, এবং তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখাই যায় না।

অভিনয়ের শেষাংশে মনোরমাকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া তাহার স্বামী অর্থ লোভে কোন এক লক্ষপতির একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিতে উন্মত্ত হইয়াছে। বিবাহের পর বাসরঘরে যখন স্বামী নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল তখন দেখিতে পাইল—এও সেই মনোরমা,—কেবল সেই দাসীবেশ নাই—আজ সে রাজকন্যা সাজিয়াছে—তাহার নিরুপম সৌন্দর্য্য, আভরণে ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত হইয়া দশদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। শিশুকালে মনোরমা তাহার ধনী পিতৃগৃহ হইতে অপহৃত হইয়া দরিদ্রের গৃহে পালিত হইয়াছে। বহুকাল পরে সম্প্রতি তাহার পিতা সেই সন্ধান পাইয়া কন্যাকে ঘরে আনাইয়া তাহার স্বামীর সহিত পুনরায় নূতন সমারোহে বিবাহ দিয়াছে।

তাহার পরে বাসর ঘরে মানভঞ্জনের পালা আরম্ভ হইল।

কিন্তু ইতিমধ্যে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ভারি এক গোলমাল বাধিয়া উঠিল। মনোরমা যতক্ষণ মলিন দাসীবেশে ঘোমটা টানিয়া ছিল ততক্ষণ গোপীনাথ নিস্তব্ধ হইয়া দেখিতেছিল। কিন্তু যখন সে আভরণে ঝলমল করিয়া, রক্তাম্বর পরিয়া, মাথার ঘোমটা ঘুচাইয়া, রূপের তরঙ্গ তুলিয়া বাসর ঘরে দাঁড়াইল এবং এক অনির্ব্বচনীয় গর্ব্বে গৌরবে গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর প্রতি এবং বিশেষ করিয়া সম্মুখবর্ত্তী গোপীনাথের প্রতি চকিত বিদ্যুতের ন্যায় অবজ্ঞাবজ্রপূর্ণ তীক্ষ্ণকটাক্ষ নিক্ষেপ করিল—যখন সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া প্রশংসায় করতালিতে নাট্যস্থলী সুদীর্ঘকাল কম্পান্বিত করিয়া তুলিতে লাগিল—তখন গোপীনাথ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া গিরিবালা গিরিবালা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ছুটিয়া ষ্টেজের উপর লাফ দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল—বাদকগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। এই অকস্মাৎ

রসভঙ্গে মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া দর্শকগণ, ইংরাজিতে বাঙ্গলায়, দূর করে দাও, বের করে দাও, বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

গোপীনাথ পাগলের মত ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল, আমি ওকে খুন করব, ওকে খুন করব!

পুলিস আসিয়া গোপীনাথকে ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল। সমস্ত কলিকাতা সহরের দর্শক দুই চক্ষু ভরিয়া গিরিবালার অভিনয় দেখিতে লাগিল—কেবল গোপীনাথ সেখানে স্থান পাইল না।

লোরিকের গান।

সেবার গয়া জেলায় প্রবাস কালে আমরা বিখ্যাত পণ্ডিত গৃয়ারসন্ সাহেব মহোদয়কে "লোরিকের গান" গুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন—"It will be a most useful contribution to the study of folklore." সে প্রায় দশ বৎসরের কথা। যতদূর জানা গিয়াছে, গানগুলি এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

দুর্ভাগ্যবশতঃ তখন আমি গানগুলির নকল রাখি নাই। সংগ্রহ বৃহৎ পুঁথিতে পরিণত হওয়ায় সে চেষ্টায় বিরত হইয়াছিলাম। গৃয়ারসনের অনুরোধ ছিল, গানগুলি সচরাচর যে ভাবে মাঠে ঘাটে গীত হইয়া থাকে, তাহাই অবিকল যেন সংগৃহীত হয়। গায়ক গোয়ালারা নিজেদের চলিত ভাষায় যে "দেল্‌খেল," "খেল্‌কেন" প্রভৃতি বাক্য ব্যবহার করে, সংগ্রহে সুতরাং তাহাই স্থান পাইয়াছিল। এই বেহারী আহীর গোপদের নিকট

হইতে যেরূপে "লোরিক মল্‌কা সাত খণ্ড" গান আদায় করি, তার একটু বৃত্তান্ত পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু বন্ধুগণের কাযে আসিতে পারে। শ্যামল শৈলপ্রাচীরতলে দূরবিস্তৃত প্রান্তর, ছোট্কি বউড়ি ও মাঝোলি নামে ক্ষুদ্র আভীরপল্লীযুগল তাহার এক প্রান্তে পড়িয়া আছে। পাহাড় হইতে হরিণের দল প্রভাতে আসিয়া অনন্যমনে চরিতেছে, কচিৎ সচকিত হরিণযূথ বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া পলাইতেছে, গ্রাম দুখানির কথা মনে পড়িলে এই দৃশ্য আমার চক্ষের সমক্ষে ভাসিয়া উঠে। মনে পড়িতেছে একদিন আমায় হরিণের দৌড় দেখাইবার জন্য এক চারি বৎসরের গোপশিশু তাহার পিতার সঙ্গে কেমন ছুটিয়া গিয়াছিল। ক্ষুদ্র নগ্ন দেহখানি লইয়া অবলীলাক্রমে সে হরিণের পালের পশ্চাতে ছুটিয়া চলিল এবং যতক্ষণ তাহারা পাহাড়ে না উঠিল, ততক্ষণ সমানে সেই পলায়নপর মৃগযূথের অনুগমন করিল।

সেই আভীরপল্লী দুখানি লোরিকের গানের জন্য বিখ্যাত। সন্ধ্যার পর মহুয়া ফলের তৈলরচিত মশাল জ্বালাইয়া গায়কদের একত্রিত করিতে হইত। তাহারা গাহিয়া চলিয়াছে, ও দিকে "পাটোয়ারি"রা অবিশ্রান্ত লিখিয়া লইতেছে। এক প্রহরের ক্রমে এক "খণ্ড" গান গাওয়া শেষ হয় না। সাত খণ্ড শেষ করিতে এক সপ্তাহের উপর লাগিয়াছিল। শত শত বৎসর ধরিয়া সহস্র সহস্র আহীর গোপের সন্তান সন্ততি এই লোরিক গান গাহিয়া আসিয়াছে, সম্ভবতঃ এমন ভাগ্যবিপর্য্যয় ইহার আর কখন হয় নাই। এবং হিসাবে কুশাগ্রবুদ্ধি কায়স্থ সন্তান পাটোয়ারিজীরাও অনুমান করি এমন কাব্যরসের বিষম অগ্নিপরীক্ষায় আর কখন পড়েন নাই।

লোরিকের গানের গল্পাংশ এইরূপ। লোরিক মল গৌড়ে জন্ম-

গ্রহণ করে। তার বাপের নাম বুড়্ বাঁইয়া, মার নাম বুড়্ খুলেন। চানায়ান্ গৌড় দেশের রাজা মাহারার কন্যা। প্রথমতঃ সেওধারী আহীরের সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়। সেওধারী স্ত্রীকে দেখিতে পারিত না। চানায়ান পরমাসুন্দরী ছিল, কিন্তু "পার্ব্বতী জীউর" শাপে তাহাদের বিবাহ সুখের হইল না। তাহার ফলে নবদম্পতির চির-বিচ্ছেদ ঘটিল। চানায়ান পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিলে লোরিক মলের সঙ্গে তাহার প্রণয় জন্মিল। উত্তরে হর্‌দি নগরে গেল। লোরিক হরদি রাজার সরকারে পালোয়ান নিযুক্ত হইল। যে তাহার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সেই আহত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। দেখিয়া শুনিয়া রাজা সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। অথচ লোরিককে ঘাঁটাইতে সাহস হয় না। বরং একদিন বলিলেন, তুমি অত বড় বীর, এ রাজ্য তোমারই প্রাপ্য। আমি তোমার হাতে রাজ্য সমর্পণ করিয়া বন বাস করিব। ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র করিলেন, তাঁহার ভাগিনেয় রাজা হারোয়ার কাছে পাঠাইয়া লোরিকের সংহার সাধন করিবেন। হারোয়া নেওরাপুরের রাজা এবং খুব একজন শূরবীর। মাতুলের চিঠি লইয়া লোরিক ভাগিনেয়ের কাছে গেল। উভয়ের মধ্যে কলহ বাধিয়া গেল। হারোয়া লোরিক হস্তে নিহত হইলেন। মৃত রাজার মাথা কাটিয়া লইয়া লোরিক হর্‌দি নগরে ফিরিয়া গেল। দেখিয়া হরদির রাজা ভয়ে লোরিকমলকে রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন। এখান হইতে লোরিক চানায়ন সঙ্গে ঠক্‌পুর নামক স্থানে গেল। সেখানে রাজা জাতিতে দোষাদ্ এবং রাজা প্রজা সকলেই ঠক্ জুয়াচোর। তাহারা পাশক্রীড়ায় লোরিককে হারাইয়া প্রায় সর্ব্বস্বান্ত করিল, এমন কি চানায়নকেও জিতিয়া লইল। বাকী রহিল কেবল তিনটী সোণার পেটারা এবং চানায়নের পদাঙ্গুষ্ঠের অলঙ্কার। বিজয়ী

দোসাদ রাজা পাল্কী বেহারা লোকজন পাঠাইয়া সুন্দরী চানায়নকে প্রাসাদে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। চানায়ন রাজাকে বলিল এখনও আমার তিন সোণার পেটারা, পায়ের ঘুমুর বাকী। আমার স্বামী বীর পুরুষ যুদ্ধ করিতে জানেন, পাশা খেলার কি বোঝেন? ভাল, খেলায় আমায় হারাও দেখি! তা হলে তোমার ঘরে যাইব।” চানায়ানের সঙ্গে খেলায় রাজা ও তাঁহার দলের হার হইল এবং চানায়ন সব ফিরিয়া পাইল। তখন লোরিক *খড়্গ হস্তে লইয়া রাজার সমস্ত সৈন্য সামন্ত মারিয়া ফেলিল* এবং রাজাকে বাঁধিয়া হর্‌দিতে পাঠাইয়া দিল। লোরিক তার পর ঠক্‌পুরে একটী রাজ্য স্থাপন করিয়া কৈলরপুরের দিকে গেল। সেখানকার রাজা করিঙ্গা বড় বীর। লোরিক রাজার এক উদ্যানে বাসা লইল। হাওয়া খাইতে আসিয়া রাজা এক দিন চানায়নকে দেখিলেন এবং তাহার রূপে মোহিত হইলেন। তার পর চানায়নের জন্য তাঁর সঙ্গে লোরিকের লড়াই বাধিল। লোরিক হারিয়া রাজার কাছে বন্দী হইল। কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাজার অনুচরেরা তাহার কপালে ও দেহের নানাস্থানে লোহার কাঁটা ঠুকিয়া দিল। কিন্তু দুর্গা সহায় ছিলেন, চানায়ানের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং লোরিকমলকে কারামুক্ত করিয়া দিলেন। রাজার সঙ্গে লোরিকের সাত দিন সাত রাত্রি অবিশ্রান্ত যুদ্ধ হইল। করিঙ্গার রাজাকে বধ করিয়া লোরিক সেখানে এক বৎসর কাল রাজত্ব করিল। এক দিন চানায়ন স্বামীকে বলিল—“তোমার প্রসাদে অনেক দেশ দেখিলাম। ত্রিহুত একবার দেখাও।” সেখানে গিয়া দেশের অধিপতি হিউনি নবাবের সঙ্গে লোরিক যুদ্ধ করিল। এবং হারিয়া গিয়া লোহার কুঠরিতে আবদ্ধ হইল। নিরুপায় হইয়া চানায়ান দেবর সওয়াকে চিঠি লিখিল। সওয়া ভারি বীর—

লোরিকের চেয়েও অধিক বল ধরিত। সে আসিয়া নবাবকে পরাজিত এবং ভাইকে উদ্ধার করিল। তখনকার দিনে কেবল ত্রিহুতেই তামাকের চাষ হইত। ধাজভাণ্ডার তামাকে পরিপূর্ণ। সওয়া সে সব লুটিয়া লইল এবং ভাই ও ভ্রাতৃজায়াকে হরদিতে ফিরাইয়া আনিল। কিছু দিন গেলে লোরিক ভাবিল "যে সব মুল্লুকইত আমি দখল করিয়াছি, কেবল অতিরছা মুল্লুক এখনও বাকী। দুর্গাদেবী বলিলেন, "অতিরছা মুল্লুক আমি আমার বহিনকে দান করিয়াছি, সে দেশে গেলে আমি তোমার সহায় হইব না। দম্ভে লোরিক বলিল—"তুমি সহায় হও আর নাই হও, আমি সে দেশ জিতিয়া লইব।" লোরিক মল নিজের ঘোড়কাটর নামক অশ্বে আরোহণ করিয়া চানায়ান ও পুত্র চন্দ্রাজিৎ সঙ্গে অতিরছা অভিমুখে অগ্রসর হইল। কিন্তু সে দেশে বিস্তর বীর, পুরীতে হেলিতে পারিল না। যুদ্ধে চানায়ান চন্দ্রজিৎ ও ঘোড়া মরিল। স্বয়ং লোরিক ভয়ে কীটের রূপ ধরিয়া গাছে লুকাইয়া তবে বাঁচিল। লোরিকের এক বিবাহিতা স্ত্রী ছিল—নাম মাজর। সে স্বপ্নে স্বামীর বিপদ বুঝিতে পারিল। এই স্বপ্ন দুর্গা দিয়াছিলেন। মাজর আগে ইন্দ্রাসনের পরী ছিল। সে ভগবানের কাছে কাঁদিল—"আপনি আমায় ধরিত্রীতে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু আমার সিন্দুর-হরণ করিলে আমি বাঁচি কি রূপে?" বিধাতার দয়া হইল। মাজরকে নিজের সবুজ রংয়ের ঘোড়া দিয়া বলিলেন, এই নাও অমৃত বারি। ইহা ছিটাইয়া সকলকে গিয়া বাঁচাও। আমার বরে লোরিক মল "আড়াই ঘড়ির" জন্য অতিরছা দেশ দখল করিবে।" তাহাই হইল। "হরিয়র্" ঘোড়ায় চড়িয়া লোরিকমল আড়াই ঘড়ির জন্য অতিরছা দখল করিল এবং পরে স্ত্রী পুত্র সঙ্গে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

পাঁচ খণ্ড গান ইহাতেই সমাপ্ত। বাকী দুই খণ্ডের গল্প লেখকের জানা নাই। সম্ভবতঃ তাহাতে লোরিকমলের গয়া-বিজয় প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত আভীরপল্লীদ্বয়ের প্রায় ষোল মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণে "দুবৌর" নামে গবর্ণমেণ্টের এক খাস মহাল আছে। এখানে দুর্ব্বাসা মুনির আশ্রম ছিল। স্থানটী ক্ষুদ্র শ্যামল শৈলে বেষ্টিত এবং এক ধনার্য্যা নদী সাত স্থানে ইহাকে বেষ্টন করিয়া ভীম অজগরবৎ বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। দক্ষিণের শৈল-শীর্ষে দুর্ব্বাসার আশ্রম-ভূমি এখনও এদেশের তীর্থস্থান—অদূরে শৈলান্তরে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম। কথিত আছে, সে কালে এই স্থান হইতে রাজগৃহ বা রাজগির পর্য্যন্ত—প্রায় ত্রিশক্রোশের ব্যবধান—এক বিস্তৃত সুড়ঙ্গ পথ ছিল। এই "দুবৌর মাহালের" প্রবেশ পথে বড়কি বউড়ি নামে গ্রাম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলের কাছে লইয়া গিয়া আহীর গোপেরা লোরিকমলের কয়টী স্মৃতিচিহ্ন দেখাইয়া দেয়। একটা মাঝারি রকমের প্রস্তর খাত দেখাইয়া বলে, এই খাতে লোরিক সিদ্ধি ঘুঁটিয়া খাইত। পাহাড়ের গায়ে একটা পরিষ্কার কর্ত্তনের দাগ দেখাইয়া গল্প করে ইহা লোরিকের অস্ত্রাঘাত নৈপুণ্যের পরিচায়ক। গ্রিয়ারসন্ সাহেব এক দিন সস্ত্রীক এই স্মৃতিচিহ্নগুলি দেখিতে দেখিতে প্রজাদের কাছে লোরিকের গল্প শুনিতেছিলেন, আমি সঙ্গে ছিলাম। অবসর পাইয়া দুইজন প্রজা একটা ব্যয়সাপেক্ষ বাঁধ নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিল। সাহেব হাসিয়া বলিলেন—"সরকার বাহাদুর এই পাহাড়ের মত!" প্রজারা সমস্বরে বলিল "খোদাবন্দ, আমরা ত সেই পাহাড়কেই দেবতা বলিয়া জানি!"

এখন লোরিকের গানের কথা। সপ্ত খণ্ড গান বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইলে আর একখানা রামায়ণ হইতে পারে বটে, কিন্তু মজুরি

পোষায় না। অনেক স্থান রক্ষার অযোগ্য। আমরা মাঝে মাঝে গানের নমুনা দিতে চেষ্টা করিব।

লোরিকের সঙ্গে চানায়ানের পরিচয় হইয়াছে। চানায়ান-রাজার বেটী হইলেও গাই চরাইতে যায়—কেন না সে গোপকন্যা, গোচারণের মাঠে "সখী সব মেলি" চানায়ান কি ভাবে কাটাইত, গাভী ও "বাছারু"দের তৃণ ভোজনের অবসরে কেমন ঘুটিং (গান গোটী) খেলিত, আজ্ কেবল তাহার কথাই বলিব——

গাই চরাওয়ে হাম সখি সব গেঁলু।
বধিয়ামে হেরি হরি·ডুব॥
চল সখি হাম্ আগু পিছু যায়ব।
চরে লাগল মোরে ধেনু ধেনু গইয়া॥
চরে দেহ সখি ধেনু ধেনু গইয়া।
লাহ গঙ্গেটী হাম্‌রা গান গোটী খেলি।
গইয়া যে চরে হরি হরি ডুবিয়া।
বাছারু চরে চারি ঘাট॥
গইয়া না ছোড়ে সখি হরি হরি ডুবিয়া।
খেলাতে খেলাতে সখি ভেলা কুবেরা॥
রোষ করে সখি শুনি মোর বাতিয়া।
ভুখ্‌লাগে সখি হের ঘর্‌কে বাটিয়া॥
উঠ সখি সব খেল বিসর।
হের ঘরকো বাটিয়া॥
কই সখি ঢুঁরে ধেনু ধেনু বাছারু।
কই সখি লেলে হাতোয়ামে সেলি॥
আগু আগু চলে ধেনু মোর গইয়া।
সে কর পিছু চলে বাছারু॥

চল সখি সব যায়ব ঘরে।
চলত চলীত মোরে সাঁঝ ভইল।

মারাঠী ও বাঙ্গলা।

আজ কাল ভারতবর্ষের এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশের ভাষা শিক্ষা ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন—ইহা একটী শুভ চিহ্ন বলিতে হইবে। ভারতবাসীদিগের মধ্যে একতা স্থাপিত হইবার পক্ষে যতগুলি বাধা দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ভাষার বাধাও বড় একটী কম নহে। সচরাচর, ভারতবর্ষকে একটী দেশ বলিয়া ধরা হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাকে একটী মহাদেশ অথবা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। য়ুরোপ-খণ্ডের মধ্যে যেরূপ ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্মণ প্রভৃতি ভাষা, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সেইরূপ বাঙ্গলা, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি বিবিধ ভাষা প্রচলিত। আজকাল, রেল-পথের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দূরত্বের বাধা ক্রমশই অপসারিত হইতেছে এবং আমাদিগের রাষ্ট্রীয়-সভার অধিবেশন উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসী-দিগের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা ক্রমশই বৃদ্ধি হই-তেছে। কিন্তু উহাদিগের মধ্যে ভাষার বন্ধন ও একতা না থাকা প্রযুক্ত তেমন আশানুরূপ ফল লাভ হইতেছে না। ইংরাজী ভাষায় একরূপ কাজ চলিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু এই নিতান্ত পরকীয় ভাষার অবলম্বনে আমরা পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারি না। ভাষা-সম্বন্ধে আমাদের নিকট একজন

ইংরাজও যেরূপ, একজন মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুও সেইরূপ। উভয়েরই সহিত ইংরাজী ভাষায় আমাদিগের কথাবার্ত্তা চালাইতে হয়। ইহা কম অসুবিধার কথা নহে। এই ভাষার বাধা একেবারে অপসারিত হইবারও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। গণনা করিয়া দেখিলে, আমাদিগের প্রাদেশিক ভাষার সংখ্যা, বোধ করি, দ্বাদশেরও অধিক হইবে। এক বোম্বাই অঞ্চলের মধ্যেই তো কতকগুলি ভাষা। এই সমস্ত ভাষা আয়ত্ত করিতে হইলে আমাদের প্রত্যেকের এক একটী "সার উইলিয়ম জোন্‌স্" না হইলে চলে না। তবে, এই পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে—যাহার যতটুকু সাধ্য, আপনার ভাষা ছাড়া, আরও দুই একটী প্রাদেশিক ভাষা শিখিবার চেষ্টা করা;—তাহা হইলেও কতকটা কাজ হয়। বিশেষতঃ, যে উপ-ভাষাগুলির মধ্যে নৈকট্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান—প্রাকৃত হইতে যাহা-দিগের উৎপত্তি—সেই সকল ভাষার অনুশীলনে, আর কিছু না হউক, অন্ততঃ নিজ নিজ ভাষার ব্যুৎপত্তি বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান লাভ হইতে পারে। মারাঠী ও বাঙ্গলার মধ্যে এইরূপ নিকট-সম্বন্ধ বর্ত্তমান—উভয়ই এক জননী হইতে প্রসূত। সুতরাং মারাঠী ভাষার আলোচনায়, বাঙ্গলা ভাষারও কতকটা উপকার হইতে পারে। গত পৌষ মাসের "সাধনা"য় "মহারাষ্ট্রীয় ভাষা" এই নামে যে একটী সুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহাতে লেখক মহা-শয় মারাঠী ভাষার উৎপত্তি এবং বাঙ্গলা ও মারাঠী শব্দের ঐক্যা-নৈক্য সম্বন্ধে বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছেন। তাহারই অনুবৃত্তি স্বরূপ, দুই চারিটী কথা বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মারাঠী ও বাঙ্গলা ভাষার গঠনে দুই একটী মূলগত প্রভেদ লক্ষিত হয়। মারাঠী ভাষায় তিন লিঙ্গ;—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। এই লিঙ্গভেদ প্রকরণ সকল সময়ে স্বাভাবিক নিয়মানু-

সারে নিষ্পন্ন হয় না। "দউত" (দোয়াৎ) শব্দ, "বাট" (পথ) শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ; "বাস" (গন্ধ) শব্দ পুংলিঙ্গ; "মাঞ্জর" (মার্জ্জার-বিড়াল) শব্দ ক্লীবলিঙ্গ; "কুত্রা" (কুক্কুর) শব্দ পুংলিঙ্গ; "মনুষ্য" শব্দ কখনও পুংলিঙ্গ, কখনও ক্লীবলিঙ্গ। "বাট" শব্দ কেন স্ত্রীলিঙ্গ, এবং "মাঞ্জর" শব্দ কেন ক্লীবলিঙ্গ হইল, ইহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। চিরপ্রচলিত ব্যবহারই ইহার একমাত্র কারণ। নাম ও সর্ব্বনামের লিঙ্গ অনুসারে, স্থল-বিশেষে, ক্রিয়াপদের বিভক্তিতে রূপান্তর উপস্থিত হয়। বক্তা স্ত্রীলোক হইলে, "মী করিত্যে" (আমি করি) এবং পুরুষ হইলে "মী করিতো" এইরূপ প্রয়োগ হয়। এ গেল, কর্ত্তরী প্রয়োগ। আবার কর্ম্মণী প্রয়োগের সময়, কর্ত্তা যে লিঙ্গেরই হউক না, তাহার লিঙ্গ অনুসারে ক্রিয়াপদ পরিবর্ত্তিত না হইয়া, কর্ম্মপদের লিঙ্গ অনুসারে ক্রিয়াপদের রূপান্তর হয়। যথা, "মী কাম কেলে" (আমি কাজ করেছি—অথবা আমরা কর্ত্তৃক কাজ কৃত হয়েছে) "মী বাট পাহিলী" (আমি পথ দেখেছি—অথবা আমা কতৃক পথ দেখা হইয়াছে) এই দুই বাক্যের মধ্যে "কাম" ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া "কেলে" এই ক্রিয়াপদ একারান্ত হইল এবং "বাট" শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া "পাহিলী" এই ক্রিয়াপদ ঈকারান্ত হইল। ইহা কতকটা হিন্দী ভাষার অনুরূপ। আর এক প্রভেদ;- বাঙ্গলায়, বহুবচনে ক্রিয়ার বিভক্তিতে কোন রূপান্তর হয় না, কিন্তু মারাঠী ভাষায় তাহা হইয়া থাকে। যথা,—"সে করে," "তাহারা করে";—এই দুই বাক্যগত ক্রিয়াপদের রূপ একই; কিন্তু মারাঠী ভাষায় এই স্থলে "তো করিতো", "তে করিতাত" এইরূপ হইয়া থাকে। আরও কিছু কিছু প্রভেদ আছে। তাহা এখানে বলা অনাবশ্যক।

এই সকল কারণে,—বিশেষতঃ লিঙ্গভেদের কোন নিয়ম না

থাকায়, কোন বৈদেশিকের পক্ষে মারাঠী ভাষায় শুদ্ধরূপে কথা কহা বড়ই কঠিন। পদে পদে তাঁহার ভ্রম হইবার সম্ভাবনা। বাঙ্গলায় লিঙ্গভেদের কোন কড়াক্কড় নিয়ম নাই—এক প্রকার ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে। আমরা ভাষার সৌন্দর্য্য ও উপযোগিতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, স্থলবিশেষে কখন বা "সুন্দরী ললনা" কখন বা "সুন্দর মেয়েটী" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারি। এবিষয়ে মারাঠী ভাষায় আবার একটু স্বতন্ত্র নিয়ম। যে বিশেষ্য শব্দগুলি খাস মারাঠি, বিশেষ্যের লিঙ্গ অনুসারে সেই সকল বিশেষণ পদের লিঙ্গভেদ হইয়া থাকে—কিন্তু যে সকল বিশেষণ পদ খাস সংস্কৃত তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। মারাঠী "চাঙ্গলা" (ভাল-সুন্দর) শব্দ যখন স্ত্রী সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়, তখন "চাঙ্গলী" এইরূপ প্রয়োগ হয়—কিন্তু "সুন্দরী" এই শব্দ, কোন স্ত্রীলিঙ্গবাচক বিশেষ্য পদের পূর্ব্বে বসে না। "চাঙ্গলী বায়কো" (ভাল স্ত্রী) ও "সুন্দর স্ত্রী" এইরূপ প্রয়োগ হয়—কিন্তু "সুন্দরী স্ত্রী" এইরূপ প্রয়োগ কখনই হয় না। বাঙ্গলায় এই বিষয়ে আমাদের বিলক্ষণ স্বাধীনতা আছে। আমার বোধ হয়, কোন ভাষার মধ্যে কৃত্রিম নিয়মের যতই বাঁধাবাঁধি ও আঁটাআঁটি, ভাবস্ফূর্ত্তির পক্ষে ততই ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু মারাঠী ভাষায় এরূপ কৃত্রিম বাধাসত্ত্বেও, মারাঠী কবি মোরপন্ত কর্ত্তৃক ১০৮ প্রকারের পদ্য রামায়ণ রচিত হইয়াছে। ইহা সামান্য বাহাদূরী নহে। *মোরোপন্তরচিত একটী রামায়ণের নাম "পরন্তু রামায়ণ"*—অর্থাৎ, ইহার প্রত্যেক শ্লোকে "পরন্তু" এই শব্দটী কোন প্রকারে ঘটানো হইয়াছে। এই শব্দ-মল্ল কবিদিগের রচনায় ভাব অপেক্ষা কথার কৌশলই অধিক। ফরাসী ভাষার মধ্যে এইরূপ লিঙ্গভেদের কৃত্রিমতা লক্ষিত হয় কতকটা এই কারণে

হয় তো ইংরাজী কবিতা ফরাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। কবিতাতে কতকটা বন্ধন আবশ্যক বটে, কিন্তু অতিবন্ধনও দোষাবহ। এই বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্যই অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি হইয়াছে। সে যাহোক্, ভাষায় লিঙ্গভেদ রাখা যে একেবারেই দোষের, আমি এ কথা বলি না। তবে, মারাঠী ও ফরাসী ভাষার ন্যায় অতটা কৃত্রিম বাড়াবাড়ি ভাল নহে। লিঙ্গ ভেদে ভাষার কতকটা সুবিধাও আছে। সর্ব্বনামের মধ্যে লিঙ্গভেদ থাকায়, অনেক সময়, ভাষার অস্পষ্টতা নিবারণ হয় এবং বারম্বার নামের পুনরুক্তি করিতে হয় না। বাঙ্গলা ভাষায় এইরূপ লিঙ্গভেদ না থাকায়, সর্ব্বনাম ব্যবহার না করিয়া আসল নামই, অনেক সময়, পুনরাবৃত্তি করিতে বাধ্য হই। ইহাতে ভাষার জোরও কতকটা কমিয়া যায়।

বাঙ্গলা ভাষা অপেক্ষা, মারাঠী ভাষায় নাম ও সর্ব্বনামের বহুবচন অতি শোভন ও সহজ ভাবে নিষ্পন্ন হয়। বাঙ্গলায়, "তোমার" এই পদের বহু বচনে "তোমাদের" বলিতে হইবে। সেই স্থলে মারাঠীতে "তুম্চা"-র বহু বচনে "তুম্চে" এইরূপ প্রয়োগ হয়। তা ছাড়া, বাঙ্গলা ভাষায় বস্তুবাচক নাম কিম্বা সর্ব্বনামের বহুবচন নিষ্পন্ন করিতে হইলে "সকল," "সমূহ" প্রভৃতি কথা জুড়িয়া দিতে হয়। "হেঁ"র বহু বচনে যেখানে "হীঁ" বলিলেই চলে, বাঙ্গলায় সেই স্থলে "এই"—র বহু বচনে *"এই-সকল" বলিতে হয়। ফল কথা, ব্যাকরণের দিক্ দিয়া* দেখিতে গেলে, বাঙ্গলা অপেক্ষা মারাঠী ভাষার গঠন যে অধিকতর পরিপুষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই।

আর এক কথা, বাঙ্গলা অপেক্ষা মারাঠী জোরালো। তাহার প্রধান কারণ, বাঙ্গলা অপেক্ষা মারাঠী ভাষায় রূঢ়িক ক্রিয়াপদ

অধিক আছে। বাঙ্গলা ভাষায়, বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দের সহিত 'কৃ' ও 'ভূ'-ধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ যোগ করিয়া অধিকাংশ ক্রিয়াপদ সংগঠিত। এইরূপ যৌগিক ক্রিয়াপদের প্রয়োগে ভাষার জোর কমিয়া যায়। আমাদের কবিবর মাইকেল মধুসূদন, কবিতার ভাষায় বলবিধান করিবার জন্যই অনেক রূঢ়িক ক্রিয়াপদ রচনা করিয়া স্বীয় কবিতা মধ্যে প্রয়োগ করেন। এই সকল অভিনব ক্রিয়াপদের প্রয়োগ, সেই সময়ে, অনেকেরই অসহ্য মনে হইয়াছিল। পদ্যেই যখন এইরূপ—গদ্যের তো কথাই নাই। ফল কথা, এই প্রকার প্রয়োগ অধিক পরিমাণে আমাদের ভাষায় চলে না—ইহা বাঙ্গলার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আমরা বাঙ্গলা গদ্যে, "রুষিছে" কিম্বা "লাজিছে"—এইরূপ বাক্য, কখনই প্রয়োগ করিতে পারি না। কিন্তু মারাঠী ভাষায় এইরূপ রূঢ়িক ক্রিয়াপদের প্রচুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গলা অপেক্ষা মারাঠী যে জোরালো, তাহা এই উভয় ভাষার উচ্চারণেই কতকটা প্রকাশ পায়। মারাঠীর উচ্চারণ অনেকটা সংস্কৃতের অনুরূপ। যদিও মারাঠী অপেক্ষা বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ অধিক, তথাপি কোন মারাঠীর সম্মুখে বাঙ্গলা ভাষায় কথা কহিলে, তাহার মধ্যে যে কোন সংস্কৃত শব্দ আছে, এরূপ তাঁহার অনুভবই হয় না। আমাদের বিকৃত উচ্চারণই ইহার একমাত্র কারণ। আমাদিগের সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ যতই দিগ্‌গজ পণ্ডিত হউন না কেন, এই উচ্চারণের দোষে তাঁহারা অন্য প্রদেশীয় লোকদিগের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া থাকেন। সংস্কৃত, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় উচ্চারণের মুখ্য গতি যেরূপ খোলা আকারের দিকে, বাঙ্গলা ভাষার উচ্চারণপ্রবণতা সেইরূপ বোজা ও-কারের দিকে। আমার বোধ হয়, শারীরিক দুর্ব্ব-

লতাই ইহার মূল-কারণ। বাঙ্গালী অপেক্ষা মারাঠীদিগকে দেখিতে যেরূপ মজবুৎ, উহাদের ভাষাতেও সেইরূপ অধিক বলের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দেহ যেরূপ ক্ষীণ ও সুকুমার, আমাদের ভাষাও সেইরূপ।

পক্ষান্তরে বাঙ্গলা ভাষা মারাঠী অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সুললিত ও পরিমার্জ্জিত। মারাঠী ভাষার জোর, যেন একটু রূঢ়তার সীমায় গিয়া উপনীত হইয়াছে। 'ড়', 'ট', 'ণ', এই সকল কাঠ-খোট্টা কঠিন বর্ণ সকল মারাঠী ভাষায় বারম্বার শুনিতে পাওয়া যায়। মারাঠী ভাষা প্রথম শুনিলে মনে হয় যেন উহা উড়িয়া ও হিন্দী এই দুই ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন। মারাঠী ভাষার উচ্চারণে 'ড়', 'ঢ়' প্রভৃতি অক্ষর যেরূপ ক্রমাগত আমাদের কাণে আইসে, বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণে সেইরূপ 'চ', 'ছ', অক্ষর মারাঠীদিগের কাণে বারম্বার উপস্থিত হয়। মারাঠী ভাষায় দুই চারিটী বর্ণের উচ্চারণেও একটু বিশেষত্ব আছে—উহা সংস্কৃতের অনুরূপ নহে। মারাঠীতে 'ল' এই অক্ষরের উচ্চারণ দুই প্রকার;—এক, সাদাসিধা ল-য়ের মত; আর এক, কতকটা আমাদের 'ড়'-এর মত। মারাঠীদিগের 'ড়'-এর উচ্চারণ অনেকটা 'ড'-ঘেঁসিয়া। উহাদের মধ্যে চ, ছ, ঝ,—এই অক্ষরগুলিরও দুই প্রকার উচ্চারণ শুনিতে পাওয়া যায়। এক উচ্চারণ, আমাদের ন্যায়; আর এক উচ্চারণ, কতকটা আমাদের পূর্ব্ববঙ্গীয়দিগের ন্যায়। এই সকল বিভিন্ন উচ্চারণের স্বতন্ত্র লিপিচিহ্ন-পদ্ধতি আমাদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হওয়া নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। বিশেষতঃ, ইংরাজী শব্দ বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিবার সময় এই সম্বন্ধে অসুবিধা বিলক্ষণ অনুভব করা যায়। মহারাষ্ট্রীয়েরা তবু, এ বিষয়ে আমা-দিগের অপেক্ষা একটু অগ্রসর। ইংরাজী স্বরবর্ণের বিভিন্ন উচ্চারণ-

প্রকাশক দুই একটী চিহ্ন তাঁহারা পুস্তকাদি ছাপাইবার সময় প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইটালিক্স্" এর স্থলে একটু বড় ও মোটা অক্ষর ব্যবহৃত হয়। ইংরাজী v অক্ষর মরাঠীতে লিখিবার সময় "হ্ব" এই যুক্তাক্ষর তাঁহারা ব্যবহার করিয়া থাকেন। "গভর্ণমেণ্ট" না লিখিয়া তাঁহারা "গহ্বর্ণমেণ্ট"লিখেন। এইরূপ লিখিলে, ইংরাজী v অক্ষরের অনেকটা কাছাকাছি শুনায়।

বাঙ্গলা ভাষায় যদি একটী ভাল অভিধান প্রস্তুত করিতে হয়—যদি প্রচলিত দেশজ শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা আবশ্যক হয়, তবে মারাঠী প্রভৃতি প্রাকৃতের অপভ্রষ্ট ভাষাগুলির অনুশীলন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইহার একটী দৃষ্টান্ত—যথা,—আমাদের 'আনাড়ি" শব্দ—এই শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? মারাঠী ভাষাতে আড়ানী বলিয়া একটি শব্দ আছে উহার প্রায় একই অর্থ। হইতে পারে "আড়ানী" বলিয়া একটী শব্দ উল্টাইয়া "আনাড়ি" শব্দে পরিণত হইয়াছে। যাহা সরল ও সহজ নহে, "আড়" শব্দে তাহাই বুঝায়। যে অশোভন ও আড়ষ্টভাবে কাজ করে, তাহাকেই আনাড়ি বলা যায়। অনুসন্ধান করিলে, এরূপ আরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে।

মহারাষ্ট্রীয় ভাষার অনুশীলনে আর একটী উপকার আছে। আজকাল আমরা ইংরাজী বিদ্যা ও সাহিত্যের সংশ্রবে অনেক নূতন কথা ও নূতন ভাব অর্জ্জন করিতেছি। এই সকল ভাব আমাদের দেশ-ভাষায় প্রকাশ করা আবশ্যক হওয়ায়,কি মারহাট্ট, কি বাঙ্গালী আমরা উভয়েই এই সকল কথা ও ভাবের অনুরূপ শব্দ রচনা ও সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের উভয়েরই সাধারণ শব্দ-ভাণ্ডার—সংস্কৃত ভাষা। অতএব আমাদের উভয়ের রচিত ও সংগৃহীত প্রতিশব্দগুলি যদি পরস্পর মিলাইয়া দেখি, তাহা হইলে

বুঝিতে পারিব, সেগুলি যথাযথ হইতেছে কি না। যদি তাহাদিগের মধ্যে অমিল দেখি, তাহা হইলে আমাদিগের মনে স্বভাবতঃই সংশয় উপস্থিত হয়, এবং তখন, কোন্ প্রতিশব্দটী ঠিক্, তাহা আর একবার আমরা বিচার করিয়া দেখিতে পারি। দৃষ্টান্ত যথা, দুটী ইংরাজী শব্দ "nerve" ও "muscle"। ইহাদের প্রতিশব্দ কি? আমরা "nerve"কে স্নায়ু বলি। মারাঠীতে "muscle"কে স্নায়ু বলে ও "nerve"কে মজ্জাতন্তু বলে। চরক প্রভৃতি পুরাতন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে স্নায়ুর যেরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা অতি অস্পষ্ট, তাহা হইতে প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করা সুকঠিন। ইংরাজী "sinews" শব্দের সহিত "স্নায়ু" শব্দের কতকটা সাদৃশ্য আছে। এই জন্য মনে হয়, স্নায়ু "muscle" শব্দের প্রতিশব্দ হইলেও হইতে পারে। "মহারাষ্ট্রীয় ভাষা"য় লেখক মহাশয় ইতিপূর্ব্বে মারাঠী ও বাঙ্গলা প্রতিশব্দের তুলনা করিয়া কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। আমিও আর কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

রাষ্ট্রীয় সভা (National Congress) রাষ্ট্রীয় স্তোত্র (National Anthem) সংস্থা (Institution) অনুক্রম-পত্র (Programme) আবৃত্তি (Edition) পদবীদান-সমারম্ভ (Convocation) স্থানিক স্বরাজ্য (Local self-government) ব্যবস্থাপক মণ্ডলী অথবা অন্তরঙ্গ সভা (Executive committee) অধ্যক্ষ (President) উপাধ্যক্ষ (Vice president) প্রমুখ (Chairman) মন্ত্রী (Secretary) দেশবান্ধব (Fellow-countryman) স্বাগত-সভা (Reception committee) মৃত্যু-পত্র (Will) আরোপী (Accused) প্রেক্ষক (Visitor) সাংস্থানিক (Native states) ভূত-দয়া (Humanity.)

উপরোক্ত শব্দগুলি বাঙ্গলা প্রতিশব্দের সহিত মিলাইয়া দেখিলে, উহার মধ্যে কোন কোন শব্দ, বাঙ্গলা অপেক্ষা সুরচিত বলিয়া

মনে হয়। "জাতীয় সভা" অপেক্ষা "রাষ্ট্রীয় সভা" আখ্যাটী অধিকতর উপযুক্ত; কেননা, যে সভার অন্তর্ভূত হিন্দু, মুসলমান, পারসী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোক, তাহাকে জাতীয় সভা না বলিয়া "রাষ্ট্রীয় সভা" বলাই সঙ্গত। "দেশ-বান্ধব" কথাটী মন্দ নয়। Institution শব্দের বাঙ্গলা কোন প্রতিশব্দ প্রচলিত আছে কি না বলিতে পারি না; কখন কখন, অনুষ্ঠান-শব্দ প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু উহা ঠিক্ নহে। বরং "প্রতিষ্ঠা" কিম্বা "প্রতিষ্ঠান" এই অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। মারাঠী "সংস্থা" শব্দ কি বাঙ্গলায় গ্রহণ করা যায় না? Edition এই শব্দের মারাঠী প্রতিশব্দ "আবৃত্তি" ও বাঙ্গলা প্রতিশব্দ "সংস্করণ"; এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি ঠিক্? অনুক্রম-পত্র (Programme) ইহার স্থলে "অনুক্রমণিকা" বলিলে কি চলে না? "রাষ্ট্রীয় স্তোত্র" National anthemএর সুন্দর প্রতিশব্দ।

আর কতকগুলি ইংরাজী পারিভাষিক শব্দের মারাঠী প্রতিশব্দ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে —

উত্তর ধ্রুব (North Pole) গুরুত্ব-মধ্য (Centre of gravity) বর্গ (Class) "চতুর্থ ইয়ত্তা" (Fourth Standard) বাতাবরণ (Atmosphere) ভূশির (Cape) দ্বীপকল্প (Peninsula) দীর্ঘ-বর্ত্তুল (Ellipse) উপপদ (Article) সিদ্ধ বা অব্যুৎপন্ন শব্দ (Primitive word) সাধিত বা ব্যুৎপন্ন (Derivative word) উভয়ান্বয়ী (Conjunction) শব্দযোগী (Post-position) কেবল প্রয়োগী অথবা উদ্গারবাচী (Interjection) দর্শক সর্ব্বনাম (Demonstrative Pronoun) স্বল্প-বিরাম চিহ্ন (Comma) অর্দ্ধ-বিরাম চিহ্ন (Semicolon) অপূর্ণ-বিরাম চিহ্ন (Colon) পূর্ণ-বিরাম চিহ্ন (Full Stop) করণ-রূপ (Positive form) অকরণরূপ (Negative form)

আখ্যাতরূপ (Conjugation) উদ্গার-চিহ্ন (Sign of admiration) শক্যার্থ (Potential mood) স্বার্থ (Indicative mood) সংকেতার্থ (Conditional mood) প্রয়োজক ক্রিয়াপদ (Causal verb) পক্ষান্তর বাচক (Alternative) স্নায়ুবন্ধন (Tendon) মজ্জাতন্তু (Nerve) কর্ণিকা (Auricle) মধ্যপর্দ্দা (Diaphragm পরশু (Rib) কুর্চ্চাস্থি (Cartilage) জীবনেন্দ্রিয় শাস্ত্র (Physiology) দ্বাদশাঙ্গুলান্ত্র (Duodemum) দ্বিশির স্নায়ু (Biceps) অস্থিবন্ধন (Ligament) মনঃপ্রেরণা (Mental transmission) রক্তাভিসরণ (Circulation of blood) রক্ত পিণ্ড (Corpuscle) রক্তসঙ্কলন (Congestion) রক্তদ্রব (Serum) অন্তর্মিশ্রণ (Assimilation) আর্দ্রত্বচ (Mucus membrane) দুগ্ধবাহিনী (Lactile) পরাবর্ত্তন (Reflection) বক্রীভবন (Refraction) ব্যাপ্য-ব্যাপক অনুমান অথবা ব্যাপকানুমান (Induction) ব্যাপক-ব্যাপ্য অনুমান অথবা ব্যাপ্যানুমান (Deduction) সন্ধায়ক (Copula) ত্র্যবয়ব অনুমান-বাক্য (Sylcgism) ব্যাপ্যানুমান বিষয়ী ন্যায় (Deductive Logic) জাতিবর্গ (Genus) অন্তর্জাতি (Species) কাদাচিৎক (Incidental) বিধায়ক বাক্য (Positive proposition) নিষেধকবাক্য (Negative proposition) কাট কোণ (Right angle) বিশাল কোণ (Obtuse angle) লঘু কোণ (Acute angle) বায়ুভার মাপক (Barometre) উষ্ণতামাপক (Thermometre) বর্গীকরণ (Classification) সমুদায়ীকরণ (Generalization) কার্য্যানুক্রম (Process) নিরোধ (Resistance.)

উল্লিখিত পারিভাষিক শব্দের মধ্যে দুই চারিটী কথা আমরা বোধ হয় গ্রহণ করিতে পারি। ইহার মধ্যে কতকগুলি শব্দ আমাদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। Induction ও Deduction ইহাদের প্রতিশব্দ বাঙ্গলায় আছে কি না জানি না। যদি না

থাকে, তবে আমরা "ব্যাপকানুমান" ও "ব্যাপ্যানুমান" এই দুইটী শব্দ বোধ হয় গ্রহণ করিতে পারি। বাঙ্গলা "অন্তরীপ" অপেক্ষা "ভূশির" আমার বোধ হয়, Capeএর ঠিক প্রতিশব্দ। কেননা "অন্তরীপ" অর্থে দ্বীপ বুঝাইলেও বুঝাইতে পারে। আমাদিগের "উপদ্বীপ" অপেক্ষা মারাঠী "দ্বীপকল্প" শব্দটী Peninsula-র ঠিক্ প্রতিশব্দ। কেননা, উপদ্বীপ শব্দে ক্ষুদ্র দ্বীপও বুঝাইতে পারে। বিদ্যালয়ের "ক্লাস"কে আমরা "শ্রেণী" বলিয়া থাকি, তদপেক্ষা "বর্গ" শব্দটী উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়। বিদ্যালয়ের Standard শব্দের কোন প্রতিশব্দ বাঙ্গালায় আছে কি না জানি না। মারাঠী "ইয়ত্তা" শব্দটী কি গ্রহণ করা যাইতে পারে না? Sign of admiration-এর মারাঠী প্রতিশব্দ "উদ্গার-চিহ্ন"। বাঙ্গালায় ইহার কোন কথা আছে কি না জানি না। বাঙ্গলায় বরং ইহাকে "উদ্গীর্ণ উক্তি" বলা যাইতে পারে—কিন্তু এই অর্থে "উদ্গার" শব্দ বাঙ্গলায় অচল। কেননা, ইহা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত। এইরূপ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের দৃষ্টান্ত ইতিপূর্ব্বে "মহারাষ্ট্র ভাষা"র লেখক অনেকগুলি দিয়াছেন। আমিও আর কতকগুলি দিতেছি:—

(প্রথমে মারাঠী—তাহার পর বাঙ্গলা) অনুভব—অভিজ্ঞতা। অনুভবী—অভিজ্ঞ। প্রামাণিকপণা—খাঁটী ব্যবহার (honesty) শিক্ষা—দণ্ড। শিক্ষণ—শিক্ষা। অপবাদ—নিয়মের ব্যতিক্রম (exception) প্রান্ত—প্রদেশ। পারদর্শক—স্বচ্ছ (Transparent), স্বচ্ছ—পরিষ্কৃত। ভব্য—উন্নতকায়,মহৎ (noble, grand)। সূচনা—প্রস্তাব। প্রয়োগ—পরীক্ষা। বন্ধু—সহোদর ভ্রাতা। ইত্যাদি।

বাঙ্গলায় এক কথায় honestyর কোন প্রতিশব্দ আছে কি না জানি না। বাঙ্গলায় আমরা "examination" ও "experiment"

এই উভয় অর্থেই "পরীক্ষা" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি; কিন্তু exepriment এর একটী স্বতন্ত্র প্রতিশব্দ থাকা আবশ্যক। আমার বোধ হয়, "experiment"কে "প্রয়োগ-পরীক্ষা" বলিলে মন্দ হয় না।

বাঙ্গলা অপেক্ষা মারাঠী ভাষায় অনেকগুলি যাবনিক শব্দ পাওয়া যায়। "মহারাষ্ট্র ভাষা"র লেখক মহাশয় তাহার কারণও দেখাইয়াছেন। যবন-সংসর্গই তাহার কারণ। দেড় শতাব্দি পূর্ব্বে, পেষোয়ার দফ্‌তরখানার লেখা-পড়ার কাজ সমস্তই পারস্য ভাষায় সম্পন্ন হইত। উক্ত লেখক মহাশয়ের মতে, এই সকল যাবনিক শব্দ প্রবেশলাভ করিয়া মহারাষ্ট্র ভাষা যেন একটু অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের অনভ্যস্ত কানে, সংস্কৃত শব্দের পাশাপাশি, এই সকল যাবনিক শব্দ খারাপ শুনায় বটে; কিন্তু আমার বোধ হয় সে কেবল অভ্যাসের কথা। বাঙ্গলা ভাষায় যে সকল যাবনিক শব্দ মিশিয়া গিয়াছে, তাহা তো আমাদের কাণে খারাপ লাগে না। বরং স্থলবিশেষে তাহা সংস্কৃত শব্দ অপেক্ষা ভাবব্যঞ্জক। যথা, "জোর" এই যাবনিক শব্দ আর "বল" এই সংস্কৃত শব্দ। যেখানে "জোর" শব্দ বসে, সেখানে বল শব্দ কিছুতেই প্রযোগ করা যায় না। যেমন, "কথার উপর জোর দেওয়া"। যে সকল চলিত বৈদেশিক কথা ভাষার মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে, তাহার স্থলে নূতন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই কারণেই, শিবাজী, মহারাষ্ট্রীদিগের উপর অসীম আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও, তাঁহার পণ্ডিতগণের রচিত শব্দগুলি মহারাষ্ট্র ভাষার মধ্যে প্রচলিত করিতে সম্যক্‌রূপে সমর্থ হয়েন নাই। চলিত কথার মধ্যে এইরূপ অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিলে নিতান্ত হাস্যাস্পদ হইতে হয়। যদি এখন আমরা "চাদর"-এর স্থলে "প্রাবরণী,"

"গোলাপের" স্থলে "মকরন্দ," "কারখানার" স্থলে "সম্ভারগৃহ"— "ফতুয়ার" স্থলে "পাহু-কঞ্চুক" এবং "চৌকির" স্থলে "আসন্দিকা" ব্যবহার করি, তাহা হইলে কিরূপ শুনিতে হয়?

আর এক কথা, সংস্কৃত আমাদের গৃহ-ভাণ্ডার—উহার দ্বার আমাদিগের নিকট সততই উন্মুক্ত। যখন ইচ্ছা, আমরা সংস্কৃত ভাষা হইতে শব্দ সংগ্রহ করিয়া ভাষার পুষ্টি সাধন করিতে পারি। কিন্তু বৈদেশিক শব্দ, কোন ভাষার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে কাল ও ঘটনার অপেক্ষা করে। যদি সৌভাগ্যক্রমে, ঘটনাচক্রে কতকগুলি বৈদেশিক শব্দ ভাষার মধ্যে মিশিয়া গিয়া থাকে, সে তো আমাদিগের উপরি লাভ। তাহার জন্য আক্ষেপ কেন? এখন আবার মহারাষ্ট্র ভাষার মধ্যে সংস্কৃত শব্দ সকল প্রবিষ্ট হইতেছে। প্রায় ২০ বৎসর অতীত হইল, মহারাষ্ট্র পণ্ডিত মৃত মহাত্মা বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপ্‌লোঙ্কার, তাঁহার লেখায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ প্রথম ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন—ইনিই, বলিতে গেলে, মহারাষ্ট্র গদ্য-সাহিত্যের গতি ফিরাইয়া দিয়াছেন। ইনি মহারাষ্ট্র দেশে, মহারাষ্ট্রীয় "মেকলে" বলিয়া প্রখ্যাত। ইহাঁর প্রণীত "নিবন্ধ মালা" মহারাষ্ট্র গদ্যের আদর্শ স্থল। আধুনিক লেখকেরা এখন ইহাঁরই পদানুসরণ করিতেছেন। সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের দিকে ইহাঁদিগের প্রবণতা দেখা যাইতেছে। তা ছাড়া, আজকাল প্রসিদ্ধ ইংরাজী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থ সকল মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অনুবাদিত হইতেছে—সুতরাং অনেক শব্দ সংস্কৃত হইতে সংগৃহীত ও বিরচিত হইয়া উত্তরোত্তর ভাষার পুষ্টিসাধন করিতেছে।

তবে, এ কথা বলিতে হয়, মহারাষ্ট্র সাহিত্য, বাঙ্গলার তুলনায় এখনও অনেকটা পশ্চাদ্বর্ত্তী। এখনও উহার মধ্যে নবোদ্ভাবিনী প্রতিভার অভ্যুদয় হয় নাই। মারাঠী ভাষার অধিকাংশ আধুনিক

গদ্য উপন্যাস "কাদম্বরীর" ন্যায় প্রাচীন কালের আদর্শে বিরচিত। এই জন্য, মারাঠী ভাষায়, গদ্য উপন্যাস মাত্রেরই নাম "কাদম্বরী"। সম্প্রতি একটি উপন্যাস গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অনেকটা আধুনিক ধরণের। * একটী স্ত্রীলোক তাঁহার বাল্যাবস্থার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছেন—ইহাই গ্রন্থের বিষয়। বেশ স্বাভাবিক সহজ ভাষায়, ঘরের লোকদিগের কথা, ঘরকন্নার কথা, এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

. বাঙ্গলার ন্যায় বোম্বাই অঞ্চলেও নাট্যাভিনয়ের খুব ধুম। কোন মহারাষ্ট্র নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়া, মুণ্ডিত-মস্তক, শিখা-বিলম্বিত, তিলক-চর্চ্চিত-ললাট, প্রকাণ্ড উষ্ণীষধারী মহারাষ্ট্র শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যেও যখন "এন্‌কোর" "এন্‌কোর" ধ্বনি ও হাত-তালির চট্‌চটা শব্দ প্রথম শুনিলাম, তখন নিতান্তই বিস্মিত হইয়া-ছিলাম। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকাংশ নাটকই পুরাতন সংস্কৃত নাটক ও ইংরাজী সেকস্‌পিয়ারের নাটক অবলম্বনে রচিত। মহারাষ্ট্রীয়-দিগের মধ্যে অনেকগুলি কবিও হইয়া গিয়াছেন। "জ্ঞানেশ্বরী", একনাথকৃত রামায়ণ, মুক্তেশ্বর-কৃত চার পর্ব্ব মহাভারত, তুকা-রাম, নামদেব, প্রভৃতির অভঙ্গ নামক ছন্দের পদাবলী, মোরো-পন্ত-কৃত মহাভারত, ভাগবত ও রামায়ণ—এই সকল কবিতা-গ্রন্থ দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধ। ইহার মধ্যে অল্পই কবিদিগের স্বকল্পিত রচনা, অধিকাংশই রামায়ণ ও মহাভারতের ভাষান্তর। এই সকল মহারাষ্ট্র কবিতার মধ্যে বৈরাগ্য ও পারমার্থিক রসেরই প্রাদুর্ভাব। রসের বৈচিত্র্য কিছুমাত্র নাই। তুকারাম, রামদাস, ইহাঁরা কবি ও সাধু পুরুষ। তুকারামের অভঙ্গের ন্যায় ভক্তহৃদয়ের অক্ক-

* এই গ্রন্থের নাম "পণ কোণ লক্ষাত যেতো" অর্থাৎ—"কিন্তু কে লক্ষ্য করে'—একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী কর্তৃক প্রণীত।

ত্রিম উচ্ছ্বাস আর কোথাও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এক বিষয়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা ন্যায্যরূপে অহঙ্কার করিতে পারেন; তাঁহাদের মধ্যে "বখর" নামক স্বদেশীয় ইতিবৃত্ত আছে। আমরা ইতিহাসের কোন ধার ধারি না—আমাদের যাহা কিছু ঐতিহাসিক গ্রন্থ আছে, তাহার উপকরণ ইংরাজীগ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত।

আজকাল সংবাদপত্রাদির পরিচালনে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রভূত উদ্যম ও তৎপরতা দেখা যায়—কৃতবিদ্যমণ্ডলীর শক্তি-সামর্থ্য, বলিতে গেলে, উহাতেই পর্য্যবসিত। দুই চারিটী মাসিক প্রবন্ধ-পত্রও যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। ইহার মধ্যে, একটীর নাম "ভাষান্তর"—উহাতে, প্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থাদি ক্রমশঃ অনুবাদিত হইয়া পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইরূপে, মারাঠী ভাষায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ হইয়া গিয়াছে। মহারাষ্ট্রের কৃতবিদ্য মণ্ডলী আর একটী বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ওয়েবষ্টার-কৃত সমগ্র ইং-রাজী অভিধান ইহাঁরা মারাঠী ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন। এই-রূপ কৃত্রিম উপায়ে, মহারাষ্ট্র ভাষার বাস্তবিক উন্নতি হইবে কি না সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। যাহা হউক, ইহাতেও কতকটা উপকার হইতে পারে।

আমরা যেরূপ আজকাল মারাঠী ভাষার আলোচনা আরম্ভ করিয়াছি, মহারাষ্ট্রদেশের কৃতবিদ্য লোকেরাও সেইরূপ বাঙ্গলা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা অতীব আহ্লাদের বিষয়, সন্দেহ নাই। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা প্রার্থনা সমাজের অন্তর্ভূত, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ "ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ" ও "ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ব্যাখ্যান", মূল হইতে পড়িবার উদ্দেশেই বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করেন এবং কেহবা, বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত আয়ুর্ব্বেদ-

শাস্ত্রের গ্রন্থ পড়িবার জন্য, ও কেহ বা বাঙ্গলা সংবাদ পত্র ও সাহিত্যাদির গ্রন্থ পড়িবার জন্য বাঙ্গলাভাষা শিক্ষা করিতে উৎসুক। "বধূ দর্পণ" নামক একটী মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থে, শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের "মেঝ বৌ" এবং অন্যান্য বাঙ্গালী লেখকদিগের প্রবন্ধ অনুবাদিত হইয়াছে। এইরূপ সাহিত্যগত ভাবের আদান প্রদানে আমাদের মধ্যে প্রভূত উপকার হইবার সম্ভাবনা, তাহা কে অস্বীকার করিবে? য়ুরোপে যেমন, ফরাসী, জর্ম্মান, প্রভৃতি আধুনিক য়ুরোপীয় ভাষা শিক্ষা করা, কৃতবিদ্য মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়, সেইরূপ হিন্দী, বাঙ্গলা, মারাঠী, গুজরাটী, প্রভৃতির মধ্যে দুই একটী ভাষা আমাদের মধ্যে সকলেরই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। বিশ্ববিদ্যালয়, এ বিষয়ে উৎসাহ দিবেন, এরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, আর এক দিক দিয়া, ইহার উত্তেজনা অল্প স্বল্প আরম্ভ হইয়াছে। দেশীয় লোকেরা যাঁহারা চিহ্নিত পদবীর সরকারী কর্ম্মচারী হইয়া বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বপ্রদেশে নিযুক্ত না হইয়া, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে নিযুক্ত হইতেছেন—সুতরাং তাঁহাদিগকে ভিন্ন প্রদেশের ভাষা বাধ্য হইয়া শিক্ষা করিতে হইতেছে। এইরূপে প্রকারান্তরে দেশ-ভাষাগুলির প্রসার বৃদ্ধি হইবার উপক্রম হইয়াছে। যখন দেখিব, আমাদের সাময়িক সাহিত্যপত্রাদিতে, মারাঠী, গুজরাটী, হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় রচিত গ্রন্থ সকলের সমালোচনা প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখনই জানিব আমরা কতকটা উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছি এবং যখন দেখিব, এক সময়ে সমস্ত য়ুরোপে যেরূপ ফরাসী ভাষায় আদর ছিল, সেইরূপ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোক, বাঙ্গলার সাহিত্যসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া, বাঙ্গলা

ভাষা আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সহিত শিক্ষা করিতেছেন, তখনই জানিব, বঙ্গীয় সাহিত্যগগণে গৌরবরবির উদয় হইয়াছে।

ফয়জাবাদের সমাধিমন্দির।

অযোধ্যার পৌরাণিক কীর্ত্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও ঐতিহাসিকের নিকট একখানি সুবৃহৎ বৈচিত্র্যপূর্ণ ইতিহাস অপেক্ষা তাহা অধিক আদরণীয়। ইংরেজ রাজপ্রাসাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থপতি ওয়ারেন হেষ্টিংসের কঠোর দণ্ডাঘাতে তাহার বিপুল হর্ম্ম্যরাজি কম্পিত হইয়াছিল; তাহার পর যে দিন বৃটীশ রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডেলহৌসীর অঙ্গুলী সঙ্কেতে অক্ষম নবাব ওয়াজিদ আলী সা তাঁহার সুবর্ণময় সিংহাসন ও রত্নমণ্ডিত উষ্ণীষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিরজীবনের জন্য তাঁহার পিতৃ পিতামহের আনন্দনিকেতন বিলাসসৌধ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন সেই দিন সেই বৈদেশিক স্থপতির কার্য্য শেষ হইল।

কিন্তু এই রাজা ও রাজ্য পরিবর্ত্তনের সহিত একজন মুসলমান সাধ্বীর পবিত্র জীবন বিজড়িত ছিল; ইতিহাসে তাঁহার কথা অধিক উল্লেখ নাই এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও তাঁহাকে যে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল, তিনি যেরূপ উৎপীড়িত হইয়াছিলেন ও মনঃপীড়া পাইয়াছিলেন সংসারে তাহার দৃষ্টান্ত অতি বিরল; কিন্তু শোকদুঃখসংক্ষুব্ধ জীবনের অবসানে তাঁহার মৃতদেহ মহিমান্বিতা সাম্রাজ্ঞীর ন্যায় অতুল সম্মান লাভ করিয়াছিল। যে সুবর্ণহর্ম্ম্যে তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত হইয়াছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌধ তাজমহল অপেক্ষা তাহা নিকৃষ্ট নহে।—এই

রমণীরত্নের নাম শ্রীমতী আমেতু জাঁহারা বউ বেগম, এবং ফয়জাবাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌধ তাঁহার নশ্বরদেহের বিরামমন্দির।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে অযোধ্যার নবাব স্মজাউদ্দৌলার মৃত্যু হইলে আসফউদ্দৌলা সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, এবং আপনরি ঐশ্বর্য্যে সন্তুষ্ট না হইয়া দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ রোহিলাদিগের রাজ্য আত্মসাৎ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে; কিন্তু তাঁহার তদুপযোগী অর্থবল এবং সৈন্যবল ছিল না, সুতরাং তাঁহাকে বলবান, রাজনীতিকুশল ইংরেজদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল, অনতিবিলম্বে তিনি ঋণজালেও বিজড়িত হইয়া পড়িলেন।

ভারতের নবার্জ্জিত রাজ্য তখন ইংরেজ বণিকগণের করায়ত্ত; তাহাদের অধিনায়ক হেষ্টিংস চেৎসিংহের ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া বিশ লক্ষের অধিক টাকা প্রাপ্ত হন নাই, কিন্তু তাহাতে বণিক সম্প্রদায়ের প্রবল অর্থপিপাসা নিবারিত হইল না; আসফউদ্দৌলাকে ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হইল।

আসফউদ্দৌলার মাতা ও পিতামহী—মতি বেগম এবং বৌ বেগম। ১৭৭৫ সালের ১৫ অক্টোবর একখানি একরারনামা দ্বারা ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট বউ বেগমের ধনাগার এবং জায়গীর রক্ষার্থ নবাবের প্রতিভূ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কোম্পানী এবং নবাব—আসফউদ্দৌলা একমত হইয়া মতি বেগমকেও পূর্ব্বোক্ত প্রকার একখানি একরারনামা প্রদান করেন। কোম্পানীর, এই সদাশয়তার জন্য বেগমদ্বয় ইংরেজগণকে আসফউদ্দৌলার অঙ্গীকৃত টাকা দান করিলেন।

কিন্তু আরো অধিক টাকার প্রয়োজন, এই একরার ভঙ্গ না হইলে অর্থ সংগ্রহ দুরূহ, সুতরাং নানা প্রকার ছলনা উদ্ভাবিত হইল; তন্মধ্যে চেৎসিংহকে বেগমগণ সাহায্য করিয়াছেন ইহাই

প্রধান ছলনা, তাহার উপর আসফউদ্দৌলার ঋণ শোধের জন্য বিশেষ তাগাদা আরম্ভ হইল।

আসফউদ্দৌলা নিরুপায়, উপায় স্থির করিবার জন্য তিনি চুনারে আসিয়া হেষ্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং উপহার অথবা উৎকোচ স্বরূপ তাঁহাকে দশলক্ষ টাকা প্রদান করিলেন; কিন্তু হেষ্টিংস একা নহেন, তাঁহার বহুসংখ্যক সহচর এবং অনুচর ছিল, তাহাদিগকে অভুক্ত অবস্থায় রাখিয়া হেষ্টিংস এই টাকা গ্রহণ করা ন্যায়সঙ্গত জ্ঞান করিলেন না, আসফউদ্দৌলার মাতা ও পিতামহীর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন না করিলে আর উপায়ান্তর নাই। কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতক আসফউদ্দৌলাকে সেই প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল; হতভাগ্য নবাব আত্মরক্ষার জন্য আপনার বংশের গৌরব এবং সম্মান পদদলিত করিতে কুণ্ঠিত হইল না।

কিন্তু প্রকাশ্যে অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটী হইল না; ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ১৯এ সেপ্টেম্বর চুনারে যে সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হইল তাহা অপক্ষপাতে ঐতিহাসিকের নিকটও অতিশয় প্রশংসা লাভের উপযুক্ত। তাহা অতি উদার এবং সুন্দর।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মিড্‌ল্টন সাহেব ফয়জাবাদে উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে নবাব আসফউদ্দৌলা। এই সময় হইতেই বেগমদিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ হইল; সে অত্যাচার ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, এবং তাহা অতিরঞ্জিত হইবার নহে। এই অত্যাচারের প্রধান নায়ক, হায়দর বেগ খাঁ,—বৌ বেগমের কৃপায় এই ব্যক্তি সুজাউদ্দৌলার রাজত্ব কালে মন্ত্রিত্বপদ লাভ করিয়াছিল,—কৃতজ্ঞতার মস্তকে পদাঘাত করিয়া এই কৃতঘ্ন ব্যক্তি বেগমগণের দুঃসময়ে ইংরেজদিগের সহিত যোগদিয়া পরমহিতৈষিণীর সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইল, এবং অনাথা রমণীদ্বয়ের

প্রতি কিরূপ উৎপীড়ন আরম্ভ করিল বাগ্মীশ্রেষ্ঠ এড্‌মণ্ড বর্ক মহাসাগরের অপরপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া অগ্নিময় জ্বলন্ত ভাষায় তাহা বিবৃত করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন "Mr Middleton states that they found great difficulties in getting at their treasures, that they stormed their fort successively but found great reluctance in the sepoys to make their way into the inner enclosure of the women's apartment. বিস্তীর্ণ রাজভবন বেগম ও পরিচারিকাগণের ক্রন্দনে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, চারিদিকে উচ্চ অবরোধ, সিংহদ্বারে ভীমমূর্ত্তি সশস্ত্র দৌবারিক, কিন্তু প্রাসাদের অভ্যন্তরে রাজরাণী ভিখারিণীর ন্যায় দিনপাত করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের অবস্থা বুঝিয়া দোকানীগণ খাদ্যসামগ্রীর রোজ দিতে অসম্মত হইল, সুতরাং কোন ক্রমে কয়েকদিন অর্দ্ধাশনে অতিবাহিত হইল, তাহার পর অনশন।

কিন্তু এই দুর্দ্দিনে ইংরেজ কোম্পানী ভারতবাসীর প্রতি উৎপীড়ন করিলেও ভারতের ভাগ্যসূত্র কয়েকজন উন্নতমনা সাধুহৃদয় মহাপুরুষের করধৃত ছিল; ভারতের শাসনকর্ত্তাগণকে কোর্ট অব ডিরেকটরগণের আদেশ পালন করিতে হইত। তাঁহাদের আদেশে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বেগমদিগের জায়গীর প্রত্যর্পিত হইল, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অন্নকষ্টও প্রশমিত হইল। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে অনুতাপদগ্ধ অপদার্থ নবাব আসফউদ্দৌলা প্রাণত্যাগ করিলেন। জায়গীরের বন্দোবস্ত করায় বেগমদিগের হস্তে প্রায় এক কোটী টাকা সঞ্চিত হইল, অনেক বিবেচনার পর এই টাকা ইংরেজদিগের হস্তে গচ্ছিত রাখা হইল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে বৌ বেগম ইহলোক ত্যাগ করিলেন; ইহজীবনে তিনি বহু যন্ত্রণা ভোগ করি-

য়াছিলেন, তাঁহার মৃত দেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহার সমাধির উপর এক সুবিস্তীর্ণ সৌধ নির্ম্মিত হইল।

এই সতীর সমাধিমন্দির দর্শন করিবার জন্য আমি একবার ফয়জাবাদ গিয়াছিলাম। অযোধ্যা ও ফয়জাবাদ এই উভয় নগর পরস্পরের সন্নিকটবর্ত্তী। অযোধ্যায় রাজা রামচন্দ্রের কীর্ত্তি সন্দর্শন করা আমার অন্যতম অভিপ্রায় থাকিলেও অযোধ্যার বেগমের সমাধিস্থান আমার নিকট একটি পুণ্যতীর্থ বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

মনে আছে, যে দিন ফয়জাবাদে উপস্থিত হইলাম সেদিন ঝুলন পূর্ণিমা, তখন বর্ষা অতীত হইয়াছিল, এবং শরৎ তাহার মনোরম শুভ্র শান্ত বেশে আকাশ ও ধরাতল পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল। সেদিন আকাশে মেঘের অভাব ছিল না, কিন্তু তাহা অভ্রের ন্যায় স্বচ্ছ, এবং মুক্ত আকাশতলে তাহা লঘুপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় উড়িয়া যাইতেছিল। সুন্দর রাত্রি, শরৎ চন্দ্রের উজ্জ্বল কিরণে ঊর্দ্ধে স্তব্ধ নক্ষত্রলোক হইতে নিম্নে অগণ্য জনকোলাহলসংক্ষুব্ধ বসুন্ধরা বিধৌত হইতেছিল, এবং বোধ হইতেছিল প্রত্যেক অট্টালিকা, পর্ণকুটীর, গৃহপ্রাঙ্গণ এবং রাজপথ সমস্তই ঝুলন উৎসবমগ্ন নরনারীবর্গের ন্যায় কৌতুকহাস্যে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। নগর দীপমালায় সুসজ্জিত, গৃহে গৃহে, পথে পথে আনন্দ নৃত্য ও হর্ষসঙ্গীত। ইতিপূর্ব্বে বঙ্গদেশ ছাড়িয়া কখন উত্তরপশ্চিমের কোন নগরে পদার্পণ করি নাই, সুতরাং ঝুলনের এই আনন্দোৎসব আমার চক্ষে যথেষ্ট অভিনব ও বিস্ময়কর বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল।

ফয়জাবাদে তখন উত্তরপাড়ার জমীদার আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় সপরিবারে বাস করিতেছিলেন; পূর্ব্বেই সংবাদ দেওয়া ছিল এবং তিনি আমার

জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। যথাসময়ে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিলাম।

ঝুলন উপলক্ষে সে সময় অযোধ্যায় নানাস্থান হইতে লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। সে দিন অযোধ্যায় মহা আনন্দ ও নৃত্য-গীত হইবার কথা; আমি সেই অপরাহ্ণেই অযোধ্যায় যাইব এই-রূপ অভিপ্রায় ছিল, তাহার বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত করা হইয়াছিল; কিন্তু অবশেষে মত পরিবর্ত্তন হইল। ফয়জাবাদ নগরের এক প্রান্তে, একখানি ক্ষুদ্র জীর্ণ কুটীরে বহুদিন হইতে একজন বিশ্বাসী সাধু বাস করিতেছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়াই প্রথম কার্য্য বলিয়া স্থির করা গেল।

অপরাহ্ণে ফয়জাবাদের সুবৃহৎ বাজারের ভিতর দিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম, এবং অবিলম্বেই সেই অনতিদীর্ঘ সুন্দর নগরের প্রান্তদেশে সন্ন্যাসীর কুটীরে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, সেই সামান্য ভগ্নপ্রায় কুটীরে এক সৌম্যমূর্ত্তি অশীতিপর বৃদ্ধ উপবিষ্ট আছেন; তিনি আমাদিগকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। কথাবার্ত্তা শুনিয়া বোধ হইল এই সাধু পরম পণ্ডিত, বলিতে লজ্জা নাই, আমার পাণ্ডিত্যের বিশেষ অভাব, সুতরাং উপস্থিত ক্ষেত্রে মৌন-ব্রত অবলম্বন করাই আমি শ্রেয় মনে করিলাম। রাসবিহারী বাবু তাঁহার সহিত ধর্ম্ম ও বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে অনেক ক্ষণ আলাপ করি-লেন, আমি ইতস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর গৃহশোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম; আমার মনে হইল সংসারে যাঁহার এতখানি বৈরাগ্য—তাঁহার এ ভগ্ন কুটীরের বিড়ম্বনা কেন? বৃক্ষ-মূলেও ত তাঁহার দিন অবাধে কাটিতে পারিত, কিন্তু এ প্রশ্নের আর কোন প্রকার মীমাংসা হইল না।

সন্ন্যাসীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আমরা নগরের

অপর প্রান্তে বেগম সাহেবার সমাধিমন্দির দেখিতে গমন করিলাম। ফয়জাবাদ কেন, সমস্ত উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মধ্যে এই মন্দির একটি প্রধান দর্শনীয় বস্তু। তাজমহলের সহিত ইহার তুলনা হয় না বটে—কিন্তু কোন বিষয়েই ইহা তাজমহল হইতে অপকৃষ্ট নহে বলিয়া অনুমান হয়। তাজমহল শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং তাহাতে যে শিল্পনৈপুণ্য আছে তাহা অতুলনীয়, ক্ষুদ্র মানব কালের পরিবর্ত্তনশীল অঙ্কে অপরিবর্ত্তনীয় ভাবে তাহার অসামান্য ক্ষমতার চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে এবং এই বিপুল সৌধ প্রাচ্য জগতের গৌরব স্থানীয় হইয়া ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিতা রাজেন্দ্রানীর ন্যায় আপনার মহিমায় বিরাজিত রহিয়াছে। বৌ বেগমের এই সমাধি মন্দির সম্পূর্ণরূপে শ্বেতপ্রস্তরমণ্ডিত নহে, ইহার স্থানে স্থানে শ্বেত প্রস্তর সজ্জিত আছে, অভ্যন্তরেও তাজমহলের ন্যায় কারুকার্য্য নাই বটে—কিন্তু বহির্দেশ হইতে দেখিলে ইহাকে তাজমহল অপেক্ষাও মহান্ এবং গৌরবপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়।

এই সমাধিমন্দিরের গঠনকৌশল অতি সুন্দর, ইহা তাজমহল অপেক্ষা বৃহৎ এবং এখনও অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাজমহল দেখিলে মনে হয় অতি অল্প স্থানের মধ্যে ভারতের অতুল বিভব, অনন্ত ঐশ্বর্য্য স্তূপীকৃত রহিয়াছে কিন্তু ফয়জাবাদের এই সমাধিমন্দির আপনার নীরব সৌন্দর্য্যে একটী প্রস্ফুটিত পুষ্পদামের মত বিরাজিত আছে। গঠনকৌশলে উভয়েই সমতুল্য। তাজমহল রক্ষার জন্য ইংরেজ রাজ যে প্রকার বন্দোবস্ত করিয়াছেন, এই সমাধি মন্দির রক্ষার জন্য বন্দোবস্ত তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। বৌ বেগম ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে যে কোটী টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন তাহার আয় হইতে বেগমের পরিবারবর্গ মাসিকবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, মন্দির রক্ষার ব্যয়ও তাহা হইতে নির্ব্বাহ হয়।

এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড উপবন। তাহার পারিপাট্য রক্ষার জন্য অনেক লোক নিযুক্ত আছে। সিংহদ্বারে প্রকাণ্ড নহবৎখানা। সেখানে প্রতিদিন যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে নহবৎ বাজে। শুনিলাম উত্তরপশ্চিম প্রদেশে এ প্রকার সুন্দর নহবৎ আর নাই; আমার নহবৎ শুনিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হইল, শুনিলাম সন্ধ্যাকালে নহবৎ বাজিবে। আমি সৌধশোভা সন্দর্শন করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া উপবনে ভ্রমণ করিলাম, অবশেষে সন্ধ্যার প্রারম্ভে সিংহ-দ্বারের নিকটে একখানি কাষ্ঠাসনে উপবেশন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। সূর্য্য তখন অস্ত গমন করিয়াছিল কিন্তু অস্তগত তপনের লোহিত রাগ এই শোকমন্দিরের সমুন্নত শুভ্র শিখরদেশে স্বর্ণকান্তি প্রস্ফুট করিতেছিল, শারদ সন্ধ্যার পশ্চিম গগনবিলম্বিত রঞ্জিত মেঘখণ্ডগুলি কল্পনারাজ্যের মধুর দর্শন বিহঙ্গকুলের ন্যায় গগনের অনন্ত বিস্তৃতির মধ্যে ভাসিয়া যাইতেছিল এবং সেই সুদৃশ্য সুসজ্জিত উপবন প্রদেশ পক্ষীকুলের সান্ধ্য কাকলীতে ধ্বনিত হইতেছিল; সহসা "দূম্ দূম্ ভোঁ" শব্দে নহবৎখানায় নহবৎ বাজিয়া উঠিল। সে কি করুণ কি মধুর রাগিণী! সন্ধ্যা-সমাগমে ক্ষুব্ধ পৃথিবীর বিচিত্র কোলাহল নিবৃত্ত হইয়াছে, সমস্ত দিনের রৌদ্রতাপদগ্ধ ধরণীর ব্যথিত অঙ্গে সান্ধ্যসমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে, উদার আকাশ অবনত নেত্রে করুণ দৃষ্টিতে বসুন্ধরার দিকে চাহিয়া আছে এবং মূক পৃথিবীও স্তব্ধ আকাশের মধ্যে একটি বিমল শান্তিধারা ঢালিবার জন্যই বুঝি নহবৎ তাহার কোমল কণ্ঠ উন্মুক্ত করিল; সে সুর মানবের শ্রম-ক্লিষ্ট অবসন্ন হৃদয়ের সম্পূর্ণ অনুকূল, তাহাতে যে রাগিণী ধ্বনিত হইতেছিল তাহা মনের মধ্যে চাঞ্চল্য, একটি মহৎ আকাঙ্ক্ষা কিম্বা সংসারসংগ্রামে লিপ্ত হইবার জন্য অদম্য উৎসাহ এবং

আগ্রহ জাগাইয়া তুলে না, তাহাতে হৃদয়কে নির্ব্বাপিত করিয়া দেয়।

আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নহবৎ শুনিতে লাগিলাম; এমন কখন শুনি নাই, আর কখন শুনিব সে আশাও বড় অল্প! স্বপ্ন-শ্রুত সঙ্গীতের শেষ তানের ন্যায় তাহা সুমধুর, আমার "ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত্ত" তাহাতে পরিতৃপ্ত হইল। বোধ হইতে লাগিল আকাশের ঐ উর্দ্ধ দেশ হইতে নক্ষত্ররাজি বিস্ময়দৃষ্টিতে চাহিয়া এই সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছে এবং এই বিস্তীর্ণ অট্টালিকার অন্তর্বিন্যস্ত সংসারতাপক্লিষ্টা একটি ব্যথিতা রমণীর দেহাবশিষ্টে যেন ধীরে ধীরে প্রাণ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে!

দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব গগন উদ্ভাসিত করিয়া কৃষ্ণা তৃতীয়ার চন্দ্র উদিত হইল, এবং তাহার ঈষৎ ম্লান আলোকে নিস্তব্ধ উপবন, শ্বেত অট্টালিকা ও উন্মুক্ত প্রান্তর আলোকিত হইয়া উঠিল। নহবৎ থামিয়া গেল, আমরাও ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে উঠিলাম এবং বাপীতটে একটি শিলাতলে বসিয়া অযোধ্যার অতীত গৌরবের ধ্বংসাবশেষের দিকে চাহিয়া রহিলাম; সকলই রহস্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অযোধ্যার নবাবের গৌরবকাহিনী, তাঁহাদের অতৃপ্ত বিলাসিতার কথা, তাহার পর সেই আলোক-দীপ্ত, পুষ্পরাজিসমাকীর্ণ শোভনীয় নাট্যশালার এই শোচনীয় পরিণাম—এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতে করিতে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিলাম। চন্দ্রালোক আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং পশ্চাতে চিত্রপটের ন্যায় পরিস্ফুট পশ্চাদ্বর্ত্তী সুন্দর উপবন ও প্রশস্ত অট্টালিকা ক্রমে দূরতর হইতে লাগিল।

চড়ক সংক্রান্তি।

চৈত্রমাসে বসন্ত ও গ্রীষ্মের এই সন্ধিস্থলে পল্লীগ্রামের কৃষক জীবনে অনেকখানি প্রীতি বিকশিত হয়। গম, যব, ছোলা, অরহর প্রভৃতি রবিশস্যগুলি পাকিয়া উঠে, সুতরাং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আহারাভাবে শীর্ণদেহ ক্ষুধাতুর কৃষক পরিবারকে শস্য-সমাগমে আনন্দোৎফুল্ল দেখা যায়। এ সময় তরিতরকারীরও অভাব নাই ; বাগানে গাছে গাছে কচি আম, গৃহপ্রাঙ্গনে সজিনা গাছে দুল্যমান অগণ্য সজনে খাড়া, পুকুরের পাড়ে বেড়ার ধারে নিবিড়পত্র ডুমুরগাছে থোকা থোকা যগডুমুর এবং সংকীর্ণকায়া মৃদুগামিনী তটিনীর উভয় তীরে, যেখানে বালুকারাশি ভেদ করিয়া ছোট ছোট ঝরণা উঠিয়াছে এবং ছোট ছেলে মেয়ের দল তাহাদের ক্ষুদ্রহস্তে বালির বাঁধ দিয়া প্রাণপণ শক্তিতে সেই ঝরণার জল আটকাইতে চাহে—ক্ষুদ্র শিশুহস্তরচিত সেই সকল আইলের আশেপাশে রাশি রাশি সবুজ শুশুনির শাক গ্রাম্য কৃষক পরিবারের তরকারীর অভাব দূর করে। সকলের ঘরেই ময়দা, খেজুরে গুড়, যবের ছাতু, বুটের ডাল সঞ্চিত আছে। যে সকল কৃষকের অবস্থা ভাল তাহাদের দুগ্ধবতী গোরুরও অভাব নাই ; তাহারা কিম্বা সচ্ছল অবস্থাসম্পন্ন গোয়ালারা গোদুগ্ধ হইতে সঞ্চিত ননি জাল দিয়া ঘৃত পর্য্যন্ত সংস্থান করিয়া রাখে, সুতরাং যখন কোন গোপ কিম্বা কৃষকরমণী তাহার ক্ষুদ্র শিশুর কালো কুচকুচে শরীর প্রচুর তৈলে এবং অল্পজলে অভিষিক্ত করিয়া ও তাহা সযত্নে মুছাইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইবার জন্য অমুচ্চ স্বরে সুর করিয়া বলে—

"খোকা যাবে মোষ চরাতে খেয়ে যাবে কি
আমার শিকের উপর গোমের রুটি তবলাভরা ঘি।"

তখন এই ছড়া শুনিতে শুনিতে মাতৃক্রোড়শায়ী সেই কৃষক-শিশুর রসনেন্দ্রিয় উপাদেয় গোমের রুটি এবং তবলাভরা সদ্যোজাত ঘি আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হোক না হোক আমরা কিন্তু এই ছড়ার সুরে ও তাহার প্রত্যেক কম্পনে শুধু যে সেই অশিক্ষিত অসভ্য পরিবারে একটি সুকোমল মাতৃ হৃদয়ের স্নেহমধুর উচ্ছ্বাসের পরিচয় পাই তাহা নহে, তাহাদের পারিবারিক জীবনের একটি অমলসুন্দর শান্তিপূর্ণ গ্রাম্যচ্ছবি নয়নসমক্ষে সুস্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

অতএব আনন্দের এই পূর্ণ উচ্ছাসকালে পল্লীগ্রামের নিম্ন-শ্রেণীর লোক কয়েকদিনের জন্য একটা উৎসব উপলক্ষে একত্র সম্মিলিত হইয়া যে অনেকখানি আমোদ করিবে ইহা খুব স্বাভাবিক। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ শিবোপাসনার অধিকারী, সুতরাং চৈত্রমাসের অর্দ্ধেক গত হইতে না হইতে চড়কের ঢাক সজোরে সাধারণের নিকট সেই উৎসবের আবাহন কাহিনী ঘোষনা করে। চড়ক নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান উৎসব।

আগে আগে চৈত্রের পনেরই তারিখ হইতেই চড়কের ঢাক বাজিয়া উঠিত; এবং সেই সময় হইতে পল্লীবাসী কৃষক, রাখালের দল, ঘরামী, মজুর প্রভৃতি শ্রমজীবীগণ নিজ নিজ কাজ ছাড়িয়া গাজনের হুজুগে মাতিত। আজকাল জীবনযাত্রাটা কিছু সঙ্গীন হইয়া উঠাতে চড়ক সংক্রান্তির এত আগে উৎসব মগ্ন হওয়া আর তাহাদের পোষায় না; এখন সাধারণতঃ সংক্রান্তির ন দশদিন আগে হইতে উৎসবের আয়োজন হয়।

প্রত্যেক গ্রামেই তিন চারিটি করিয়া দল থাকে; গ্রাম বড়

হইলে দলের সংখ্যা আরো বেশী হয়। প্রত্যেক দলের একজন করিয়া দলপতি আছে, তাহাকে "মূলসন্ন্যাসী" বলে। মূলসন্ন্যাসীর জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ হওয়া নিতান্ত আবশ্যকীয় নহে, কৈবর্ত্ত গোয়ালা বণিক, গণ্ডক প্রভৃতি যে কোনজাতি মূল সন্ন্যাসী হইতে পারে, কিন্তু তাহার পরিণতবয়স্ক হওয়া দরকার। শিবের সিংহাসন টানিয়া বেড়ান, নিয়মিতরূপে শিবপূজা করা, দলস্থ অন্যান্য সন্ন্যাসীকে পরিচালিত করা মূল সন্ন্যাসীর কাজ, এতদ্ভিন্ন তাহার আরো দুই একটি কাজ আছে সে কথা আমরা পরে বলিব।

চৈত্র সংক্রান্তির দশদিন পূর্ব্বে মূল সন্ন্যাসী ক্ষৌরকর্ম্মের দ্বারা পবিত্র হইয়া ক্ষুদ্র কাষ্ঠসিংহাসনে একটি শিবলিঙ্গ সংস্থাপন পূর্ব্বক নিজ নিজ গাজনতলায় আখড়া জমকাইয়া বসে। মহাদেবের এই সকল নৈমিত্তিক সেবক এই সময় স্বস্ব বাড়ীতে থাকে না, কোন বৃক্ষতলে বা বনান্তরালে ইহাদের এক এক আড্ডা আছে তাহাকেই 'গাজনতলা' বলে। এক এক পাড়ায় এক একটি নির্দ্দিষ্ট গাজন তলা আছে, যেবৎসর যে লোকই মূল সন্ন্যাসী হোক—সেই সকল গাজন তলাতে তাহাদের আড্ডা ফেলিতেই হইবে।

'গাজনতলা' গুলির চারিদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর। নিকটে কোথাও জনমানবের ঘরবাড়ী নাই, চারিদিকে স্যাওড়া এবং ভাঁট বন, ভাঁট ফুলের সুগন্ধে জঙ্গলটি পরিপূর্ণ, নিকটে দীর্ঘশীর্ষ নারিকেল গাছের সারি, দুই একটি তমাল ও বেল গাছ বা বাঁসের ঝাড়; সমস্ত বৎসর এখানে মনুষ্য সমাগম হয় না। কেবল এই সময় যথানির্দ্দিষ্ট স্থানটি পরিষ্কার করিয়া সন্ন্যাসীর দল খেজুর পাতায় ছাওয়া ক্ষুদ্র কুটীর তুলিয়া সেখানে শিবস্থাপনা করে, এবং সন্নিকটবর্ত্তী বট পাকুড় অথবা তেতুল গাছের প্রচ্ছন্ন ছায়ায় আড্ডা পাতিয়া লয়।

ক্ষৌর কর্ম্মের দ্বারা আপনাকে পবিত্র করিয়া মূল সন্ন্যাসী পৈতা গলায় দেয়। এই পৈতা ব্রাহ্মণের উপবীতের ন্যায় নহে, ইহা শুধু তাহাদের গলায় ঝুলিতে থাকে, পৈতাগুলি হরিদ্রারঞ্জিত, এবং তাহাতে একটি করিয়া পিতলের আঙ্গটি ঝুলিতে দেখা যায়।

মূল সন্ন্যাসীর সঙ্গে আরো অনেকে দাড়ি গোঁফ কামাইয়া সন্ন্যাসী হয়; চড়ক সংক্রান্তির দশদিন আগে যাহারা কামায় তাহাদের কামানোর নাম "দশের কামান"—এইরূপ কামানোর দিন অনুসারে সাতের কামান, পাঁচের কামান, তিনের কামান নাম হইয়াছে। তিনের কামানই শেষ কামান। কামানোর পর এবং উৎসব শেষ হইবার পূর্ব্বে সন্ন্যাসীদের কোন গৃহকর্ম্মে যোগ দিবার যো নাই, শুধু দলের সঙ্গে ঘুরিয়া ভিক্ষা করা এবং গাজনতলায় রাত্রিযাপন করাই ব্যবস্থা; সুতরাং যাহারা খুব কাজের লোক, অথচ একটু সখের বাতিকও আছে তাহারা আগে না কামাইয়া শেষ দিন অর্থাৎ তিনের কামানের দিন কামায়। অনেকে মোটেই কামায় না, সংক্রান্তির দিন সন্ন্যাসীর দলে মিশিয়া খানিক আমোদ করিয়া আসে।

কি মূল সন্ন্যাসী কি তাহার অনুচরবর্গ সকলের হাতেই বেতের একরকম ছড়ি দেখা যায়, চার পাঁচ গাছ সরু বেত একত্র করিয়া, ঝাঁটার মত বাঁধিয়া এই ছড়ি তৈয়ারী হয়, সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন ইহা তাহাদিগের হাতে থাকে।

সংক্রান্তি যতই নিকট হইয়া আসে ঢাকের বাদ্য ততই উচ্চ হয় এবং সন্ন্যাসীদিগের "বলো শিবো মহাদেব দেব" ইত্যাকার কণ্ঠধ্বনি ঘনঘন শুনিতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট ছেলের দল ঢকাধ্বনি শুনিয়া তাহার অনুকরণে সুর করিয়া বলে "চড়ক চড়ক ড্যাডাং ড্যাং পাবদামাছের দুটো ঠ্যাং"। সন্ন্যাসীরা সংক্রান্তির

পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত লোকের বাড়ী সিংহাসন সমেত শিব মাথায় করিয়া ভিক্ষা করে—যত গোয়ালা ও কৈবর্ত্তের ছেলে পায়ে নূপুর বাঁধিয়া ভাল কাপড় পরিয়া বাজনার তালে তালে নাচিতে নাচিতে গ্রামস্থ গৃহস্থ ও ভদ্রলোকের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। লোকে ইহাদিগকে ঠিক ভিক্ষুকের হিসাবে দেখে না, সুতরাং ইহাদিগের ভিক্ষার থালীতে অধিক পরিমাণে চাল ডা'ল দান করে। ভিক্ষা করিয়া ইহারা যাহা পায়, সন্ধ্যাকালে স্নান করিয়া আসিয়া তাহাই রাঁধে এবং একত্র আহারাদি করে।

সংক্রান্তির দুই তিনদিন পূর্ব্ব হইতে গ্রামে আমোদের বড় ধুম পড়িয়া যায়। অপরাহ্ণে প্রত্যেক গাজন তলাতেই অনেকগুলি ঢাক বাজিয়া আকাশ ফাটাইয়া দেয়। সন্ন্যাসীদলের অবিশ্রান্ত নৃত্যে মাটি কাঁপিতে থাকে, পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ বৃদ্ধাপর্য্যন্ত গাজনতলার চারিদিকে সমবেত হইয়া ইহাদিগের এই প্রমোদনৃত্য নিরীক্ষণ করে; অনেক কুলবধূ জল আনিবার ছলে কলসীকাঁকে লইয়া গাজনতলা দিয়া নদীতে যায় এবং অন্তরালে দাঁড়াইয়া ঘোমটা ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া কৌতুকপ্রদীপ্ত চক্ষে এই দৃশ্য দেখিয়া লয় কিন্তু বড়জা, শাশুড়ী ও ননদীদের ভয়ে তাহারা বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারে না।

নাচিতে নাচিতে কোন কোন সন্ন্যাসীর অতিরিক্ত ভাবোদয় হয়; তাহারা মাটির উপর উবু হইয়া পড়িয়া যায় এবং অবনত মুখে ঢাকের বাজনার তালে তালে সবেগে মাথা নাড়িতে থাকে—ইহাকে "ধয়াল খাটা" বলে। ভাবোন্মত্ত সন্ন্যাসীগণ শুধু ধয়াল খাটিয়াই ছাড়ে না, এই রকম করিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে হামা দিয়া অনেক দূরে চলিয়া যায় এবং কখন কখন বনের মধ্যে কি গর্ত্তে গিয়া পড়ে। শুনিয়াছি যখনই ইহাদের উপর মহাদেবের

ভর হয় তখন ইহারা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে, তখন ঢাক আরো বেশী জোরে বাজিয়া উঠে এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীদের "বলো শিবো মহাদেব দেব" ধ্বনি ঘন ঘন উচ্চারিত হয়। অহার' পর তাহারা সেই ভরপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীকে হাতসাঁই করিয়া তুলিয়া লইয়া যায় এবং তাহার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করে।

সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে গ্রামের সমস্ত সন্ন্যাসী সমবেত হইয়া দলবাঁধিয়া নদীকূলে যায়; তাহার পর তাহাদের বেত্রদণ্ড হাতে লইয়া নদীর জলে নামিয়া চড়ক গাছের অনুসন্ধান করে। পূর্ব্বে পিট বা হাত ফুঁড়াইয়া চড়কে পাক খাওয়ার নিয়ম ছিল, কিন্তু ইদানীং পিনাল কোডের চোটে তাহা উঠিয়া গিয়াছে, এবং তদবধি চড়ক গাছ মহাশয় নদীর জলে গা ঢাকা দিয়া পেন্সন ভোগ করিতেছেন। সম্বৎসরের পরে এই দিনে সন্ন্যাসীরা এই সুদীর্ঘ চড়ক গাছ নদীতীরে টানিয়া তোলে এবং তাহার যথা-রীতি পূজা করিয়া আবার জলের মধ্যে ঠেলিয়া রাখিয়া আসে। ছেলেবেলায় শুনা যাইত এই চড়কগাছ বড় জীবন্ত দেবতা; ইনি সমস্ত বৎসর নদীতে নদীতে ঘুরিয়া ঠিক এই সময়টিতে পূজার লোভে নিজের পীঠস্থানে আসিয়া হাজির হন।

চড়কের পূজা শেষ হইলে সন্ন্যাসীগণ ঢাক বাজাইয়া পূর্ব্ববৎ নাচিতে নাচিতে নিজ নিজ গাজন তলায় ফিরিয়া আসে। এই দিন অন্নাহার নিষেধ, এদিন রাত্রে ফলভক্ষণ করিতে হয়; ফলা-হারের ব্যাপারটি বিশেষ আয়োজনেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। দিবসে ভিক্ষা করিবার সময় এই দিন ইহারা অনেক ফল ভিক্ষা পায়; তদ্ভিন্ন গাছ হইতে সুপক্ক নোনা, বেল, পেপে, পিয়ারা পাড়িয়া আনে, পল্লীগ্রামে নারিকেল গাছের অভাব নাই, দু চার কাঁদি নারিকেলও বৃক্ষস্বামীর অসাক্ষাতে চাহিয়া আনে। ফল

ভক্ষণের সময় অনেক বাঁহিরের লোক আসিয়া ইহাদের সঙ্গে যুটিয়া যায়—ইহাতে [illegible] কোন আপত্তি নাই।

এই দিন সমস্ত রাত্রি ঢাকের বাজনা আর "বলো শিবো মহাদেব দেব" শব্দে সমস্ত গ্রাম প্রতিধ্বনিত হয়। অনেক রাত্রে ইহারা আগুণ জ্বালিয়া এবং কণ্টকময় কুলের ডাল জড় করিয়া তাহার উপর দিয়া যাতায়াত করে, এই ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিবার কোন দিন সুযোগ হয় নাই, তবে শুনিয়াছি এই আগুণের উপর দিয়া যখন তাহারা চলে তখন অগ্নির দাহিকাশক্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়, ভস্মাবশেষ ভিন্ন তাহাতে আর কিছু থাকে না এবং কুলের ডালগুলি যতদূর সম্ভব নিষ্কণ্টক করিয়া ফেলা হয়।

রাত্রি শেষে 'কাকবলী' দিবার নিয়ম। কাকবলী জিনিষটার সঙ্গে বোধ করি অধিক পাঠকের পরিচয় নাই। সন্ন্যাসীরা চড়ক পূজার সময় শিবেরই উপাসনা করিয়া থাকে, অতএব শিবের অনুচর ভূতগণের প্রতি কিঞ্চিৎ সদাচার না করিলে পাছে সেই সকল অপদেবতা অসন্তুষ্ট হয় এই ভয়ে সন্ন্যাসীরা এই দিন রাত্রে ভূতের প্রীত্যর্থে যৎকিঞ্চিৎ আহারের যোগাড় করে এবং ভাত শোলমাছের ঝোল ও অম্বল রাঁধিয়া একটা মাল্‌সাতে লইয়া শেষরাত্রে ভূত মহাশয়ের সন্ধানে যায়। রাত্রি তিন চারিটার সময় সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী এবং শুদ্ধাচারী মূলসন্ন্যাসী সেই মালসাটি লইয়া নদীর দিকে অগ্রসর হয়; পাঁচ সাত জন বলবান সন্ন্যাসী তাহাকে বাহুদ্বারা দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিয়া চলে। এইরূপে চলিতে চলিতে তাহারা নদীর জলে নামে, জল যখন এক বুক হয় তখন সেই মালসা ভাসাইয়া দেয়, এবং সাগ্রহে ভূতগণকে আহ্বান করিয়া সেই খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করে। শুনিয়াছি ক্ষুৎকাতর ভূত কখন কখন সেইমালসা মূলসন্ন্যাসীর হাত হইতে

ছোঁ মারিয়া লইয়া চলিয়া যায়; এমন কি সন্ন্যাসীগণ মূলসন্ন্যাসীকে সবলে আটকাইয়া না রাখিলে ভূত তাঁহাকে শুদ্ধ টানিয়া লইয়া যায় এবং সেই জন্যই এরূপ সতর্কতা অবলম্বিত হয়। বাল্যকালে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যাইত, অমুক মূলসন্ন্যাসী কাকবলী দিতে গিয়াছিল, ভূতেরা মহা ঝড় তুলিয়া আসিয়া তাহাদের খাদ্য দ্রব্য এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়াছে; অন্যান্য সন্ন্যাসীগণ তাহাকে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারে নাই। পরদিন খুঁজিতে খুজিতে মূলসন্ন্যাসীকে দুই তিন ক্রোশ দূরে নদীতীরে, বা কোন বৃক্ষতলে অথবা কোন শ্মশানের কাছে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যাইত। শুনিয়াছি মূলসন্ন্যাসী সম্পূর্ণরূপ শুদ্ধাচারে না থাকিলে ভূত মহাশয়েরা তাহাকে এইরূপে বিপন্ন করে; কিন্তু আজ কাল ভূতের আর এরকম লোমহর্ষণ দৌরাত্ম্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না।

চড়ক সংক্রান্তির দিন সন্ন্যাসীদিগের সাজসজ্জার দিকে মনোযোগ কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি হয়। অপরাহ্ণে 'ধুপবান' খেলিতে হইবে, তাহারই আয়োজনে ইহারা বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠে। সকল সন্ন্যাসীই স্বস্ব পরিচিত অবস্থাপন্ন ভদ্র প্রতিবেশীর নিকট হইতে তাঁহাদের স্ত্রী কন্যাদিগের, পট্টবস্ত্র, শান্তিপুরে ডুরে, গুলবাহার প্রভৃতি সাড়ী এবং গোঠ, চন্দ্রহার, চিক, পাঁচনর, বাজু, বালা, তাবিজ প্রভৃতি গহনা চাহিয়া আনিয়া তদ্দ্বারা স্বস্ব দেহ সজ্জিত করে, এই সমস্ত বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইলে এই সকল কৃষ্ণকায় চাষার ছেলেদের কিম্ভূতকিমাকার দেখিতে হয়। তাহার পর ইহারা ধুনো কিনিয়া আনিয়া তাহা উত্তমরূপে পিষিয়া মালসা পূর্ণ করে ও তৈলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া রাখে; এই ধুপ এবং তৈলে অভিষিক্ত বস্ত্রখণ্ড 'ধুপবাণ' খেলার প্রধান উপকরণ।

এদিকে কে কি রকম সঙ বাহির করিবে তাহা নির্দ্ধারিত করি-বার জন্ত পাড়ায় পাড়ায় মিটিং বসিয়া যায়।

বেলা শেষ হইতে না হইতে চারিদিক হইতে তুমুল বেগে ঢাক বাজিয়া উঠে। সন্ন্যাসীগণ বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া এক একটি বান লইয়া নদী তীরে সমাগত হয়। এই বানগুলি দেখিতে অনেকটা সেকরাদের সাঁড়াসীর মত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর, তাহার দন্তদ্বয়ের অগ্রভাগ সূচ্যগ্র তীক্ষ্ণ এবং মাথার দিকটা ঠোঁট বাহির করা, তাহারই নিকট একটা করিয়া লোহার শিকলী লাগান থাকে। মূলসন্ন্যাসীগণকে কখন বাণ ফুড়িয়া খেলা করিতে দেখা যায় না, ইহারা নদীতীরে শিবের সিংহাসন বহিয়া আনে। নদীকূলে সেই সিংহাসন নামাইয়া শিব পূজা করা হয়; অনেক ধোপাদের কাপড় কাচিবার পাটের মত এক এক খানা পাট ঘাড়ে করিয়া যায়, তাহাকে যথারীতি সিন্দুর রঞ্জিত করিয়া পূজা করে। তাহার পর মূলসন্ন্যাসী অন্যান্য সন্ন্যাসী-দিগের চক্ষু পানের পাতা দিয়া ঢাকিয়া বাণের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ দুই পাঁজরের মাংসে বিঁধাইয়া দেয়, এবং গলদেশে পূর্ব্বকথিত শিকলী বাঁধিয়া বাণগাছটা বেশ আটকাইয়া রাখে; ইহাতে এই ফল হয় যে দুই হাত তুলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া যখন তাহারা সবেগে নৃত্য করে তখন বাণ খুলিয়া পড়িতে পায় না। ছোট ছোট ছেলেরা সখ করিয়া বাণ ফুড়িতে চায় কিন্তু অনেকে পাঁজরের মাংস ফুটাইবার সময় কাঁদিয়া অস্থির হয়, সেরূপ স্থলে তাহাদের বুকে ও পিঠে গামছা জড়াইয়া তাহারই মধ্যে বাণ বিঁধাইয়া দেয়।

সন্ন্যাসীদলের মধ্যে যাহারা বেশী সৌখিন তাহারা কাঠমল্লিকা বা আকন্দের ফুল ভাঙ্গিয়া তাহার মালা মাথায় এবং গলায় পরে ও তদ্দ্বারা শিবের কাষ্ঠ সিংহাসনখানি সজ্জিত করে।

বাণফোড়া হইলে বাণের মাথায় তৈলসিক্ত বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া তাহাতে আগুণ ধরাইয়া দেয়; মসালের মত আলো জ্বলিয়া উঠে তখন সকলে চক্রাকারে নাচিতে নাচিতে ভিন্ন ভিন্ন দলে নদীতীর হইতে গ্রামের দিকে অগ্রসর হয়; অনেক আমোদপ্রয়াসী লোক বাণ না ফুড়িয়াই এই দলের সঙ্গে মিশিয়া উৰ্দ্ধহস্তে ত্রিভঙ্গ ভাবে নাচিতে আরম্ভ করে। তাহাদের অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী দেখিলে হাস্য সম্বরণ করা দুরূহ হইয়া উঠে।

দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের ক্ষুদ্র বাজার এবং সংকীর্ণ রাজ-পথ লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। বাজারের শিবমন্দির-প্রাঙ্গণে এবং কালীবাড়ীতে বহুসংখ্যক স্ত্রীপুরুষের সমাগম হয়; হাসি গল্প, গান এবং উচ্চ কলরবে সমস্ত যায়গাটা গম্ গম্ করিতে থাকে। অনেক পুত্রবৎসল পিতা তাহাদের দুই তিন বৎসরের ছেলেদের নীলাম্বরী কাপড় পরাইয়া কোমরে লাল চাদর বা চিত্র বিচিত্র রুমাল বাঁধিয়া তাহাদিগকে কাঁধে লইয়া ধুপবাণ দেখিতে আসে।

বেলা শেষ হইতে না হইতে নানা রকমের সঙ বাজারে আসিয়া জড় হয়। স্থূল রসিকতা দ্বারা সাধারণ দর্শকের হাস্যরসের উদ্রেক করাই তাহাদের অভিপ্রায়; তাহাদের এই অভিপ্রায় সম্পূর্ণ রূপে সিদ্ধ হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে সকল সঙের মধ্যে হাস্য-রস উদ্রেকের জন্য কোনই আয়োজন থাকে না, না থাকিলেও পল্লীগ্রামের নিম্ন শ্রেণীর লোকের আমোদের একটা আদর্শ লক্ষ্য করা অল্প আনন্দজনক নহে। অতএব এখানে সঙের দুই একটা নমুনা দেওয়া যাইতে পারে। কেহ একটা মুখস পরিয়া গায়ে খানিক চিটাগুড় ও কতকগুলা শিমুলের তুলায় কৃত্রিম লোম লাগাইয়া এবং চাদর পাকাইয়া তাহারই একটা লেজ বাঁধিয়া বাঘ

সাজিয়া হাজির হয়, একজন লোক তাহার কণ্ঠলগ্ন দড়ি গাছটি ধরিয়া অগ্রসর হয়, তাহাদের চারিদিকে ছেলে ও বুড়োতে পঞ্চাশজন, কোন সাহসী'চাষার ছেলে রহস্যচ্ছলে সেই কৃত্রিম শার্দ্দূলের লেজে হাত দেয় আর ব্যাঘ্রপ্রবর 'আঁক' করিয়া তাহার দিকে লম্ফ প্রদান করে—দেখিয়া সকলে শশব্যস্তে ছুটিয়া পলায় এবং সকলের উদ্ঘাটিত মুখ বিবর হইতে হাসি উৎসারিত হইয়া পড়ে।

অন্যত্র একজন বৈরাগী অন্য একজন বাবাজীর সেবাদাসীকে সঙ্গে লইয়া খঞ্জনী বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে. এবং "বেলা গেল ও ললিতে কৃষ্ট এলো না" এই গান গাহিয়া আমোদলোলুপ পল্লী যুবকের দেহ ও মন আকর্ষণ করিতেছে; পথিমধ্যে বৈষ্ণবীহারা বৈরাগী বৎসহারা ধেনুর ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবীচোর বাবাজীউকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহার ঝুলি ধরিয়া টানিতে লাগিল, উভয় পক্ষে বিপরীত ঝগড়া—শেষে মারামারী, মারামারীর চোটে বাবাজীউদের টিকি কাঠের মালা ছিঁড়িয়া গেল, ঝোলার মধ্যে হইতে মদের বোতল, ছোলাভাজা প্রভৃতি বাহির হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে আর একজন লুব্ধ বৈরাগী আসিয়া বৈষ্ণবীকে লুকিয়া লইয়া গা ঢাকা দিল।

ক্রমে সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসে। বাজারের দোকানে দোকানে এবং গৃহে গৃহে মৃৎ প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে। সন্ন্যাসীর দল রাস্তা ঘুরিয়া গ্রাম্য জমীদারের বাড়ীর সম্মুখে খানিকক্ষণ খেলা করিয়া বাজারে প্রবেশ করে। একদল যাইতেছে, আর একদল আসিতেছে, ঢাক বাজিতেছে, এক সঙ্গে সন্ন্যাসীদের পা উঠিতেছে পড়িতেছে, বাণের আগায় ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া আলো জ্বলিতেছে এবং মিনিটে মিনিটে সেই আলোতে যুগপৎ এক একমুষ্ঠা ধূপের গুঁড়া নিক্ষিপ্ত হইতেছে। আলো এক সঙ্গে ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, কুণ্ডলী-

কৃত আলোকদীপ্ত ধূম অন্ধকারপূর্ণ আকাশ তলে অনেক দূর পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া দেয়, ঢাক আরো সজোরে বাজিয়া উঠে, ঘর্ম্মাপ্লুত দেহ সন্ন্যাসীর দল উন্মত্তপ্রায় হইয়া শূন্যে দুই হাত তুলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া আরো বেশী উৎসাহের সঙ্গে নাচিতে থাকে।

এইরূপে চক্রাকারে নাচিতে নাচিতে সমস্ত দল প্রথমে শিবমন্দিরের প্রাঙ্গনে তাহার পর কালীতলায় সমবেত হয়। সেখানে অনেকক্ষণ নৃত্য করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দল স্বস্ব গাজনতলায় ফিরিয়া আসে, আসিবার সময় গ্রামস্থ ভদ্রলোকের বাড়ীর সম্মুখে একবার তাহাদের নৃত্যকৌশল দেখাইয়া যায়। যে সকল কুলকামিনীর বস্ত্রালঙ্কারে ইহারা সজ্জিত হয় তাঁহারা বাতায়ন অন্তরাল হইতে কৌতুকপূর্ণ হাস্যবিস্ফারিত নেত্রে ইহাদের অপরূপ বেশ নিরীক্ষণ করেন কিন্তু তাঁহাদের বস্ত্রালঙ্কারের পরিণাম দেখিয়া তাঁহারা যে বিশেষ প্রীতি লাভ করেন এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

ক্রমে রাত্রি অধিক হয়। গার্জনতলার ঢক্কাধ্বনি ও কলরব থামিয়া যায়, ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম উন্মত্ত আনন্দোচ্ছ্বাসের পর শ্রান্তিভরে ঘুমাইয়া পড়ে; শুধু আকাশের অগণ্য নক্ষত্র মিটি মিটি চাহিয়া থাকে এবং উচ্ছৃঙ্খল বায়ু প্রবাহে গাছের পাতা ও বাঁসবন ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠে, তাহাতে বোধ হয় যেন একটি পরমায়ুহীন বৎসর তাহার আনন্দ এবং বিষাদপূর্ণ বিচিত্র স্মৃতিভার বক্ষে লইয়া এই গাঢ় অন্ধকার সমাচ্ছন্ন নিদ্রাহীন স্তব্ধ নিশীথিনীর সুকোমল ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

বাঙ্গলা জাতীয় সাহিত্য।

সহিত শব্দ হইতে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সে যে কেবল ভাবে ভাবে ভাষায় ভাষায় গ্রন্থে গ্রন্থে মিলন তাহা নহে,—মানুষের সহিত মানুষের, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের, দূরের সহিত নিকটের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ যোগসাধন সাহিত্য ব্যতীত আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর নহে। যে দেশে সাহিত্যের অভাব সে দেশের লোক পরস্পর সজীববন্ধনে সংযুক্ত নহে—তাহারা বিচ্ছিন্ন।

পূর্ব্বপুরুষদের সহিতও তাহাদের জীবন্তযোগ নাই। কেবল পূর্ব্বাপর-প্রচলিত জড় প্রথাবন্ধনের দ্বারা যে যোগসাধন হয় তাহা যোগ নহে তাহা বন্ধন মাত্র। সাহিত্যের ধারাবাহিকতা ব্যতীত পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত সচেতন মানসিক যোগ কখনই রক্ষিত হইতে পারে না।

এক শৃঙ্খলে সারি সারি পাঁচ জন কয়েদীকে বাঁধিয়া রাখিলে তাহাকে সজীব যোগ বলা যায় না; কিন্তু আমাদের জীবনের এক দিনের সহিত অন্য দিনের, শৈশবের সহিত যৌবনের, যৌবনের সহিত বার্দ্ধক্যের যে যোগ তাহাই সজীব যোগ। তাহা একদিকে নিত্য অপরদিকে পরিবর্ত্তমান; সেই প্রাণময় পরিবর্দ্ধনশীল চেতনা-সূত্র অকাট্য; তাহার কোথাও বিচ্ছেদ কোথাও জড়ত্ব নাই।

আমাদের দেশের প্রাচীনকালের সহিত আধুনিককালের যদিও প্রথাগত বন্ধন আছে কিন্তু সজীব মানসিক যোগ নাই। এক জায়গায় কোথায় আমাদের মধ্যে এমন একটা নাড়ীর বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে যে, সে কাল হইতে মানসিক প্রাণরস অব্যাহতভাবে

প্রবাহিত হইয়া একাল পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতেছে না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কেমন করিয়া চিন্তা করিতেন, কার্য্য করিতেন, নব তত্ত্ব উদ্ভাবন করিতেন; তাঁহাদের সমস্ত শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ কাব্যকলা ধর্ম্মতত্ত্ব, রাজনীতি, সমাজতন্ত্রের মর্ম্মস্থলে তাঁহাদের জীবৎশক্তি তাঁহাদের চিৎশক্তি জাগ্রত থাকিয়া কি ভাবে সমস্তকে সর্ব্বদা সৃজন এবং সংযমন করিত, কি ভাবে প্রতিদিন বৃদ্ধি লাভ করিত পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইত, আপনাকে কেমন করিয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিত, নূতন অবস্থাকে কেমন করিয়া আপনার সহিত সম্মিলিত করিত তাহা আমরা সম্যক্‌রূপে জানি না। মহাভারতের কাল এবং আমাদের বর্ত্তমান কালের মাঝখানকার অপরিসীম বিচ্ছেদকে আমরা পূরণ করিব কি দিয়া? যখন ভুবনেশ্বর ও কণারক মন্দিরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া যায়, তখন মনে হয় এই আশ্চর্য্য শিল্পকৌশলগুলি কি বাহিরের কোন আকস্মিক আন্দোলনে কতকগুলি প্রস্তরময় বুদ্‌বুদের মত হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়াছিল? সেই শিল্পীদের সহিত আমাদের যোগ কোন্‌খানে? যাহারা এত অনুরাগ, এত ধৈর্য্য, এত নৈপুণ্যের সহিত এই সকল অভ্রভেদী সৌন্দর্য্য সৃজন করিয়া তুলিয়াছিল—আর আমরা যাহারা অর্দ্ধনিমীলিত উদাসীন চক্ষে সেই সকল ভুবনমোহিনী কীর্ত্তির এক একটি প্রস্তরখণ্ড খসিতে দেখিতেছি অথচ কোনটা যথাস্থানে পুনস্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছি না এবং পুনস্থাপন করিবার ক্ষমতাও রাখি না, আমাদের মাঝখানে এমন কি একটা মহাপ্রলয় ঘটিয়াছিল যাহাতে পূর্ব্বকালের কার্য্যকলাপ এখনকার কালের নিকট প্রহেলিকা বলিয়া প্রতীয়মান হয়—আমাদের জাতীয়-জীবন-ইতিহাসের মাঝখানের কয়েকখানি পাতা কে একেবারে ছিঁড়িয়া লইয়া গেল।

যাহাতে আমরা তখনকার সহিত আপনাদিগের অর্থ মিলাইতে পারিতেছি না? এখন আমাদের নিকট বিধানগুলি রহিয়াছে কিন্তু সে বিধাতা নাই; শিল্পী নাই কিন্তু তাহাদের শিল্পনৈপুণ্যে দেশ আচ্ছন্ন হইয়া আছে। আমরা যেন কোন্ এক পরিত্যক্ত রাজধানীর ভগ্নাবশেষের মধ্যে বাস করিতেছি—সেই রাজধানীর ইষ্টক যেখানে খসিয়াছে আমরা সেখানে কেবল কর্দ্দম এবং গোময়পঙ্ক লেপন করিয়াছি—পুরী নির্ম্মাণ করিবার রহস্য আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অবিদিত।

প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষদের সহিত আমাদের এতই বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে যে, তাঁহাদের সহিত আমাদের পার্থক্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতাও আমরা হারাইয়াছি। আমরা মনে করি, সেকালের ভারতবর্ষের সহিত এখনকার কালের কেবল নূতন পুরাতনের প্রভেদ। সেকালে যাহা উজ্জ্বল ছিল, এখন তাহা মলিন হইয়াছে, সেকালে যাহা দৃঢ় ছিল এখন তাহাই শিথিল হইয়াছে—অর্থাৎ আমাদিগকেই যদি কেহ সোনার জল দিয়া, পালিশ করিয়া, কিঞ্চিৎ ঝক্‌ঝকে করিয়া দেয় তাহা হইলেই সেই অতীত ভারতবর্ষ সশরীরে ফিরিয়া আসে। আমরা মনে করি, প্রাচীন হিন্দুগণ রক্তমাংসের মনুষ্য ছিলেন না, তাঁহারা কেবল সজীব শাস্ত্রের শ্লোক ছিলেন—তাঁহারা কেবল বিশ্বজগৎকে মায়া মনে করিতেন এবং সমস্ত দিন জপতপ করিতেন। তাঁহারা যে যুদ্ধ করিতেন, রাজ্যরক্ষা করিতেন, শিল্প চর্চ্চা ও কাব্যালোচনা করিতেন, সমুদ্র পার হইয়া বাণিজ্য করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে যে ভাল মন্দের সংঘাত ছিল, বিচার ছিল, বিদ্রোহ ছিল, মত বৈচিত্র্য ছিল—এক কথায়, জীবন ছিল, তাহা আমরা জ্ঞানে জানি বটে কিন্তু অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারি না। প্রাচীন ভারতবর্ষকে কল্পনা করিতে গেলেই

নূতন পঞ্জিকার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সংক্রান্তির মূর্ত্তিটি আমাদের মনে উদয় হয়।

এই আত্যন্তিক ব্যবধানের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, আমাদের দেশে তখন হইতে এখন পর্য্যন্ত সাহিত্যের মনোময় প্রাণময় ধারা অবিচ্ছেদে বহিয়া আসে নাই। সাহিত্যের যাহা কিছু আছে তাহা মাঝে মাঝে দূরে দূরে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত। তখনকার কালের চিন্তাস্রোত ভাবস্রোত প্রাণস্রোতের আদিগঙ্গা শুকাইয়া গেছে, কেবল তাহার নদীখাতের মধ্যে মধ্যে জল বাধিয়া আছে—তাহা কোন একটি বহমান আদিম ধারার দ্বারা পরিপুষ্ট নহে, তাহার কতখানি প্রাচীন জল কতটা আধুনিক লোকাচারের বৃষ্টিসঞ্চিত, বলা কঠিন। এখন আমরা সাহিত্যের ধারা অবলম্বন করিয়া হিন্দুত্বের সেই বৃহৎ প্রবল নানাভিমুখী সচল তটগঠনশীল সজীবস্রোত বাহিয়া একাল হইতে সেকালের মধ্যে যাইতে পারি না। এখন আমরা সেই শুষ্কপথের মাঝে মাঝে নিজের অভিরুচি ও আবশ্যক অনুসারে পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহাকে হিন্দুত্ব নামে অভিহিত করিতেছি। সেই বদ্ধ ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন হিন্দুত্ব আমাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি; তাহার কোনটা বা আমার হিন্দুত্ব, কোনটা বা তোমার হিন্দুত্ব; তাহা সেই কণ্ব কণাদ, রাঘব, কৌরব, নন্দ উপনন্দ এবং আমাদের সর্ব্বসাধারণের তরঙ্গিত প্রবাহিত অখণ্ডবিপুল হিন্দুত্ব কিনা সন্দেহ।

এইরূপে সাহিত্যের অভাবে আমাদের মধ্যে পূর্ব্বাপরের সজীব যোগবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। কিন্তু সাহিত্যের অভাব ঘটিবার একটা প্রধান কারণ, আমাদের মধ্যে জাতীয়-যোগবন্ধনের অসদ্ভাব। আমাদের দেশে কনোজ কোশল কাশী কাঞ্চী প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ভাবে আপন আপন পথে চলিয়া গিয়াছে,

এবং মাঝে মাঝে অশ্বমেধের ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া পরস্পরকে সংক্ষেপ করিতেও ছাড়ে নাই। মহাভারতের ইন্দ্রপ্রস্থ, রাজতরঙ্গিনীর কাশ্মীর, নন্দবংশীয়দের মগধ, বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী, ইহাদের মধ্যে জাতীয় ইতিহাসের কোন ধারাবাহিক যোগ ছিল না। সেইজন্য সম্মিলিত জাতীয় হৃদয়ের উপর জাতীয় সাহিত্য আপন অটল ভিত্তি স্থাপিত করিতে পারে নাই। বিচ্ছিন্ন দেশে বিচ্ছিন্নকালে গুণজ্ঞ রাজার আশ্রয়ে এক এক জন সাহিত্যকার আপন কীর্ত্তি স্বতন্ত্র ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। কালিদাস কেবল বিক্রমাদিত্যের, চাঁদবর্দ্দি কেবল পৃথিরাজের, চাণক্য কেবল নন্দের। তাঁহারা তৎকালীন সমস্ত ভারতবর্ষের নহেন, এমন কি, তৎপ্রদেশেও তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কোন যোগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সম্মিলিত জাতীয় হৃদয়ের মধ্যে যখন সাহিত্য আপন উত্তপ্ত সুরক্ষিত নীড়টি বাঁধিয়া বসে তখনি সে আপনার বংশ রক্ষা করিতে, ধারাবাহিকভাবে আপনাকে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া দিতে পারে। সেই জন্য প্রথমেই বলিয়াছি সহিতত্বই সাহিত্যের প্রধান উপাদান; সে বিচ্ছিন্নকে এক করে, এবং যেখানে ঐক্য সেইখানে আপন প্রতিষ্ঠাভূমি স্থাপন করে। যেখানে একের সহিত অন্যের, কালের সহিত কালান্তরের, গ্রামের সহিত ভিন্ন গ্রামের বিচ্ছেদ, সেখানে ব্যাপক সাহিত্য জন্মিতে পারে না। আমাদের দেশে কিসে অনেক লোক এক হয়? ধর্ম্মে। সেই জন্য আমাদের দেশে কেবল ধর্ম্মসাহিত্যই আছে। সেই জন্য প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য কেবল শাক্ত এবং বৈষ্ণব কাব্যেরই সমষ্টি। রাজপুতগণকে বীরগৌরবে এক করিত, এই জন্য বীরগৌরব তাহাদের কবিদের গানের বিষয় ছিল। গ্রীক্‌গণ শিল্প-

চর্চ্চায়, জ্ঞানানুশীলনে, দেশরক্ষায়, রাজ্যচালনায়, আমোদ-প্রমোদে, সকল বিষয়েই একত্র হইতে জানিত, সেই জন্য প্রাচীন গ্রীস্ এমন সাহিত্যভূয়িষ্ঠ হইয়াছিল। রোমকেরা এবং ক্রমশঃ অধিকাংশ য়ুরোপীয় জাতিই সেই গ্রীসীয় প্রকৃতি লাভ করিয়া এমন বিচিত্র সাহিত্য এবং ঘনিষ্ঠ জাতীয় ঐক্য প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমাদের ক্ষুদ্র বঙ্গদেশেও একটা সাধারণ সাহিত্যের হাওয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মপ্রচার হইতেই ইহার আরম্ভ। প্রথমে যাঁহারা ইংরাজী শিখিতেন তাঁহারা প্রধানতঃ আমাদের বণিক ইংরাজ-রাজের নিকট উন্নতি লাভের প্রত্যাশাতেই এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন; তাঁহাদের অর্থকরী বিদ্যা সাধারণের কোন কাজে লাগিত না। তখন সর্ব্বসাধারণকে এক শিক্ষায় গঠিত করিবার সঙ্কল্প কাহারও মাথায় উঠে নাই; তখন কৃতীপুরুষগণ যে যাহার আপন আপন পন্থা দেখিত।

বাঙ্গলার সর্ব্বসাধারণকে আপনাদের কথা শুনাইবার অভাব খৃষ্টীয় মিশনরিগণ সর্ব্বপ্রথমে অনুভব করেন—এই জন্য তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের ভাষাকে শিক্ষা-বহনের ও জ্ঞানবিতরণের যোগ্য করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু এ কার্য্য বিদেশীয়ের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সম্ভবপর নহে। নব্যবঙ্গের প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা রাজা রামমোহন রায়ই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গলা দেশে গদ্যসাহিত্যের ভূমিপত্তন করিয়া দেন।

ইতিপূর্ব্বে আমাদের সাহিত্য কেবল পদ্যেই বদ্ধ ছিল। কিন্তু রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে পদ্য যথেষ্ট ছিল না। কেবল ভাবের ভাষা, সৌন্দর্য্যের ভাষা, রসজ্ঞের ভাষা নহে; যুক্তির ভাষা, বিবৃতির ভাষা, সর্ব্ববিষয়ের এবং সর্ব্বসাধারণের ভাষা তাঁহার আবশ্যক ছিল। পূর্ব্বে কেবল ভাবুকসভার জন্য পদ্য ছিল এখন জন-

সভার জন্য গদ্য অবতীর্ণ হইল। এই গদ্যপদ্যর সহযোগব্যতীত কথনও কোন সাহিত্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। খাষ্ দরবার এবং আম্ দরবার ব্যতীত সাহিত্যের রাজ দরবার সরস্বতী মহারাণীর সমস্ত প্রজাসাধারণের উপযোগী হয় না। রামমোহন রায় আসিয়া সরস্বতীর সেই আম্ দরবারের সিংহদ্বার স্বহস্তে উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন।

আমরা আশৈশবকাল গদ্য বলিয়া আসিতেছি কিন্তু গদ্য যে কি দুরূহ ব্যাপার, তাহা আমাদের প্রথম গদ্যকারদের রচনা দেখিলেই বুঝা যায়। পদ্যে প্রত্যেক ছত্রের প্রান্তে একটি করিয়া বিশ্রামের স্থান আছে, প্রত্যেক দুই ছত্র বা চারি ছত্রের পর একটা করিয়া নিয়মিত ভাবের ছেদ পাওয়া যায়; কিন্তু গদ্যে একটা পদের সহিত আর একটা পদকে বাঁধিয়া দিতে হয়, মাঝে ফাঁক রাখিবার যো নাই; পদের মধ্যে কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়াকে এবং পদগুলিকে পরস্পরের সহিত এমন করিয়া সাজাইতে হয় যাহাতে গদ্যপ্রবন্ধের আদ্যন্ত-মধ্যে যুক্তিসম্বন্ধের নিবিড় যোগ ঘনিষ্ঠরূপে প্রতীয়মান হয়। ছন্দের একটা অনিবার্য্য প্রবাহ আছে; সেই প্রবাহের মাঝখানে একবার ফেলিয়া দিতে পারিলে কবিতা সহজে নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু গদ্যে নিজে পথ দেখিয়া পায়ে হাঁটিয়া নিজের ভার সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে হয়;—সেই পদ-ব্রজ বিদ্যাটি রীতিমত অভ্যাস না থাকিলে চাল্ অত্যন্ত আঁকাবাঁকা এলোমেলো এবং টল্‌মলে হইয়া থাকে। গদ্যের সুপ্রণালীবদ্ধ নিয়মটি আজকাল আমাদের অভ্যস্ত হইয়া গেছে, কিন্তু অনধিক-কাল পূর্ব্বে এরূপ ছিল না।

তখন যে গদ্য রচনা করাই কঠিন ছিল, তাহা নহে—তখন লোকে অনভ্যাসবশতঃ গদ্য প্রবন্ধ সহজে বুঝিতে পারিত না।

দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর আদিম অবস্থায় যেমন কেবল জল ছিল, তেমনি সর্ব্বত্রই সাহিত্যের আদিম অবস্থায় কেবল ছন্দতরঙ্গিতা প্রবাহশালিনী কবিতা ছিল। আমি বোধ করি, কবিতায় হ্রস্ব পদ, ভাবের নিয়মিত ছেদ, ও ছন্দ এবং মিলের ঝঙ্কারবশতঃ কথাগুলি অতি শীঘ্র মনে অঙ্কিত হইয়া যায় এবং শ্রোতাগণ তাহা সত্বর ধারণা করিতে পারে। কিন্তু ছন্দোবন্ধহীন বৃহৎকায় গদ্যের প্রত্যেক পদটি এবং পদের প্রত্যেক অংশটি পরস্পরের সহিত যোজনা করিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া যাইতে বিশেষ একটা মানসিক চেষ্টার আবশ্যক করে। সেই জন্য রামমোহন রায় যখন বেদান্তসূত্র বাঙ্গলায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন, গদ্য বুঝিবার কি প্রণালী, তৎসম্বন্ধে ভূমিকা রচনা করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন। সেই অংশটি উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি।

"......এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোন শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস-প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেন না, ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থ-বোধের সময় অনুভব হয়।" অতঃপর কি করিলে গদ্যে বোধ জন্মে তৎসম্বন্ধে লেখক উপদেশ দিতেছেন।—"বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন।" ইত্যাদি।

পুরাণ ইতিহাসে পড়া গিয়াছে, রাজগণ সহসা কোন ঋষির

তপোবনে অতিথি হইলে তাঁহারা যোগবলে মদ্যমাংসের সৃষ্টি করিয়া রাজা ও রাজানুচরবর্গকে ভোজন করাইতেন। বেশ দেখা যাইতেছে তপোবনের নিকট দোকানবাজারের সংশ্রব ছিল না, এবং শালপত্রপুটে কেবল হরীতকী আমলকী সংগ্রহ করিয়া রাজ যোগ্য ভোজের আয়োজন করা যায় না—সেই জন্য ঋষিদিগকে তপঃপ্রভাব প্রয়োগ করিতে হইত। রামমোহন রায় যেখানে ছিলেন সেখানেও কিছুই প্রস্তুত ছিল না; গদ্য ছিল না, গদ্যবোধশক্তিও ছিল না;—যে সময়ে এ কথা উপদেশ করিতে হইত, যে, প্রথমের সহিত শেষের যোগ, কর্ত্তার সহিত ক্রিয়ার অন্বয় অনুসরণ করিয়া গদ্য পাঠ করিতে হয়, সেই আদিমকালে রামমোহন পাঠকদের জন্য কি উপহার প্রস্তুত করিতেছিলেন? বেদান্তসার, ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ প্রভৃতি দুরূহ গ্রন্থের অনুবাদ। তিনি সর্ব্বসাধারণকে অযোগ্যজ্ঞান করিয়া তাহাদের হস্তে উপস্থিতমত সহজপ্রাপ্য আমলকী হরীতকী আনিয়া দিলেন না। সর্ব্বসাধারণের প্রতি তাঁহার এমন একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। আমাদের দেশে অধুনাতন কালের মধ্যে রামমোহন রায়ই সর্ব্বপ্রথমে মানবসাধারণকে রাজা বলিয়া জানিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে বলিয়াছেন, সাধারণ নামক এই মহারাজকে আমি যথোচিত অতিথি সৎকার করিব—আমার অরণ্যে ইহার উপযুক্ত কিছুই নাই কিন্তু আমি কঠিন তপস্যার দ্বারা রাজভোগের সৃষ্টি করিয়া দিব।

কেবল পণ্ডিতদের নিকট পাণ্ডিত্য করা, জ্ঞানীদের নিকট খ্যাতি অর্জ্জন করা, রামমোহন রায়ের ন্যায় পরম বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষে সুসাধ্য ছিল। কিন্তু তিনি পাণ্ডিত্যের নির্জ্জন অত্যুচ্চশিখর ত্যাগ করিয়া সর্ব্বসাধারণের ভূমিতলে অবতীর্ণ হইলেন

এবং জ্ঞানের অন্ন ও ভাবের সুধা সমস্ত মানবসভার মধ্যে পরিবেশন করিতে উদ্যত হইলেন।

এইরূপে বাঙ্গলাদেশে এক নূতন রাজার রাজত্ব, এক নূতন যুগের অভ্যুদয় হইল। নব্যবঙ্গের প্রথম বাঙ্গালী, সর্ব্বসাধারণকে রাজটীকা পরাইয়া দিলেন—এবং এই রাজার বাসের জন্য সমস্ত বাঙ্গলা দেশে বিস্তীর্ণ ভূমির মধ্যে সুগভীর ভিত্তির উপরে সাহিত্যকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কালে কালে সেই ভিত্তির উপর নব নব তল নির্ম্মিত হইয়া সাহিত্যহর্ম্ম্য অভ্রভেদী হইয়া উঠিবে এবং অতীত ভবিষ্যতের সমস্ত বঙ্গহৃদয়কে স্থায়ী আশ্রয় দান করিতে থাকিবে অদ্য আমাদের নিকট ইহা দুরাশার স্বপ্ন বলিয়া মনে হয় না।

অতএব দেখা যাইতেছে বড় একটি উন্নত ভাবের উপর বঙ্গসাহিত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যখন এই নির্ম্মাণকার্য্যের আরম্ভ হয় তখন বঙ্গভাষার না ছিল কোন যোগ্যতা, না ছিল সমাদর; তখন বঙ্গভাষা কাহাকে খ্যাতিও দিত না অর্থও দিত না; তখন বঙ্গভাষায় ভাব প্রকাশ করাও দুরূহ ছিল এবং ভাব প্রকাশ করিয়া তাহা সাধারণের মধ্যে প্রচার করাও দুঃসাধ্য ছিল। তাহার আশ্রয়দাতা রাজা ছিল না, তাহার উৎসাহদাতা শিক্ষিতসাধারণ ছিল না। যাঁহারা ইংরাজি চর্চ্চা করিতেন তাঁহারা বাঙ্গলাকে উপেক্ষা করিতেন এবং যাঁহারা বাঙ্গলা জানিতেন তাঁহারাও এই নূতন উদ্যমের কোন মর্য্যাদা বুঝিতেন না।

তখন বঙ্গসাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতাদের সম্মুখে কেবল সুদূর ভবিষ্যৎ এবং সুবৃহৎ জনমণ্ডলী উপস্থিত ছিল—তাহাই যথার্থ সাহিত্যের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা-ভূমি; স্বার্থও নহে খ্যাতিও নহে, প্রকৃত সাহিত্যের ধ্রুব লক্ষ্যস্থল কেবল নিরবধিকাল এবং বিপুলা পৃথিবী।

সেই লক্ষ্য থাকে বলিয়াই সাহিত্য মানবের সহিত মানবকে, যুগের সহিত যুগান্তরকে প্রাণবন্ধনে বাঁধিয়া দেয়। বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি ও ব্যাপ্তিসহকারে কেবল যে সমস্ত বাঙ্গালীর হৃদয় অন্তরতম যোগে বদ্ধ হইবে তাহা নহে,—এক সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিকেও বঙ্গসাহিত্য আপন জ্ঞানান্ন বিতরণের অতিথিশালায়, আপন ভাবামৃতের অবারিত সদাব্রতে আকর্ষণ করিয়া আনিবে তাহার লক্ষণ এখন হইতেই অল্পে অল্পে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

এ পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা একক ভাবেই কাজ করিয়াছেন। এককভাবে সকল কাজই কঠিন, বিশেষতঃ সাহিত্যের কাজ। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাহিত্যের একটি প্রধান উপাদান সহিতত্ব। যে সমাজে জনসাধারণের মনের মধ্যে অনেকগুলি ভাব সঞ্চিত এবং সর্ব্বদা আন্দোলিত হইতেছে, যেখানে পরস্পরের মানসিক সংস্পর্শ নানা আকারে পরস্পর অনুভব করিতে পারিতেছে,—সেখানে সেই মনের সংঘাতে ভাব এবং ভাবের সংঘাতে সাহিত্য স্বতই জন্মগ্রহণ করে এবং চতুর্দ্দিকে সঞ্চারিত হইতে থাকে। এই মানবমনের সজীব সংশ্রব হইতে বঞ্চিত হইয়া কেবলমাত্র দৃঢ় সংকল্পের আঘাতে সঙ্গীহীন মনকে জনশূন্য কঠিন কর্ত্তব্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া চালনা করা, একলা বসিয়া চিন্তা করা, উদাসীনদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার একান্ত চেষ্টা করা, সুদীর্ঘকাল একমাত্র নিজের অনুরাগের উত্তাপে নিজের ভাবপুষ্পগুলিকে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিবার প্রয়াস করা এবং চিরজীবনের প্রাণপণ উদ্যমের সফলতা সম্বন্ধে চিরকাল সন্দিহান হইয়া থাকা—এমন নিরানন্দের অবস্থা আর কি আছে! যে ব্যক্তি কাজ করিতেছে কেবল যে তাহারই কষ্ট তাহা নয় ইহাতে কাজেরও অসম্পূর্ণতা ঘটে।

এইরূপ উপবাসদশায় সাহিত্যের ফুলগুলিতে সম্পূর্ণ রং ধরে না, তাহার ফলগুলিতে পরিপূর্ণমাত্রায় পাক ধরিতে পায় না। সাহিত্যের সমস্ত আলোক ও উত্তাপ সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে সঞ্চারিত হইতে পারে না।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন পৃথিবীবেষ্টনকারী বায়ুমণ্ডলের একটি প্রধান কাজ, সূর্য্যালোককে ভাঙ্গিয়া বণ্টন করিয়া চারিদিকে যথাসম্ভব সমানভাবে বিকীর্ণ করিয়া দেওয়া। বাতাস না থাকিলে মধ্যাহ্ন কালেও কোথাও বা প্রখর আলোক কোথাও বা নিবিড়তম অন্ধকার বিরাজ করিত।

আমাদের জ্ঞানরাজ্যের মনোরাজ্যের চারিদিকেও সেইরূপ একটা বায়ুমণ্ডলের আবশ্যকতা আছে। সমাজের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া এমন একটা অনুশীলনের হাওয়া বহা চাই যাহাতে জ্ঞান এবং ভাবের রশ্মি চতুর্দ্দিকে প্রতিফলিত বিকীর্ণ হইতে পারে।

যখন বঙ্গদেশে প্রথম ইংরাজি শিক্ষা প্রচলিত হয়, যখন আমাদের সমাজে সেই মানসিক বায়ুমণ্ডল সৃজিত হয় নাই তখন সতরঞ্চের শাদা এবং কালো ঘরের মত শিক্ষা এবং অশিক্ষা পরস্পর সংলিপ্ত না হইয়া ঠিক পাশাপাশি বাস করিত। যাহারা ইংরাজি শিখিয়াছে এবং যাহারা শেখে নাই তাহারা সুস্পষ্টরূপে বিভক্ত ছিল—তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সংযোগ ছিল না, কেবল সংঘাত ছিল। শিক্ষিত ভাই আপন অশিক্ষিত ভাইকে মনের সহিত অবজ্ঞা করিতে পারিত কিন্তু কোন সহজ উপায়ে তাহাকে আপন শিক্ষার অংশ দান করিতে পারিত না।

কিন্তু দানের অধিকার না থাকিলে কোন জিনিষে পূরা অধিকার থাকে না। কেবল ভোগস্বত্ব এবং জীবনস্বত্ব নাবালক এবং স্ত্রীলোকের অসম্পূর্ণ অধিকার মাত্র। এক সময়ে আমাদের

ইংরাজি পণ্ডিতেরা মস্ত পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু তাঁহাদের পাণ্ডিত্য তাঁহাদের নিজের মধ্যেই বদ্ধ থাকিত, দেশের লোককে দান করিতে পারিতেন না—এই জন্য সে পাণ্ডিত্য কেবল বিরোধ এবং অশান্তির সৃষ্টি করিত। সেই অসম্পূর্ণ পাণ্ডিত্যে কেবল প্রচুর উত্তাপ দিত কিন্তু যথেষ্ট আলোক দিত না।

এই ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ ব্যাপ্তিহীন পাণ্ডিত্য কিছু অত্যুগ্র হইয়া উঠে; কেবল তাহাই নহে, তাহার প্রধান দোষ এই, যে, নব-শিক্ষার মুখ্য এবং গৌণ অংশ সে নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারে না। সেই জন্য প্রথম প্রথম যাঁহারা ইংরাজি শিখিয়াছিলেন তাঁহারা চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তীদের প্রতি অনাবশ্যক উৎপীড়ন করিয়াছিলেন এবং স্থির করিয়াছিলেন মদ্য মাংস ও মুখরতাই সভ্যতার মুখ্য উপকরণ।

চালের বস্তার চাল এবং কাঁকর পৃথক্ বাছিতে হইতে একটা পাত্রে সমস্ত ছড়াইয়া ফেলিতে হয়—তেমনি নবশিক্ষা অনেকের মধ্যে বিস্তারিত করিয়া না দিলে তাহার শস্য এবং কঙ্কর অংশ নির্ব্বাচন করিয়া ফেলা দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। অতএব প্রথম প্রথম যখন নূতন শিক্ষায় সম্পূর্ণ ভাল ফল না দিয়া নানা প্রকার অসঙ্গত আতিশয্যের সৃষ্টি করে তখন অতিমাত্র ভীত হইয়া সে শিক্ষাকে রোধ করিবার চেষ্টা সকল সময়ে সদ্বিবেচনার কাজ নহে। যাহা স্বাধীনভাবে ব্যাপ্ত হইতে পারে তাহা আপনাকে আপনি সংশোধন করিয়া লয়, যাহা বদ্ধ থাকে তাহাই দূষিত হইয়া উঠে।

এই কারণে, ইংরাজি শিক্ষা যখন সঙ্কীর্ণ সীমায় নিরুদ্ধ ছিল তখন সেই ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে ইংরাজি সভ্যতার ত্যজ্য অংশ সঞ্চিত হইয়া সমস্ত কলুষিত করিয়া তুলিতেছিল। এখন সেই শিক্ষা চারিদিকে বিস্তৃত হওয়াতেই তাহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু ইংরাজি শিক্ষা যে ইংরাজি ভাষা অবলম্বন করিয়া বিস্তৃত হইয়াছে তাহা নহে। বাঙ্গলা সাহিত্যই তাহার প্রধান সহায় হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালী এক সময়ে ইংরাজ রাজ্য স্থাপনের সহায়তা করিয়াছিল—ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গসাহিত্য আজ ইংরাজি ভাবরাজ্য এবং জ্ঞানরাজ্য বিস্তারের প্রধান সহকারী হইয়াছে। এই বাঙ্গলা সাহিত্যযোগে ইংরাজিভাব যখন ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র সুগম হইল তখনই ইংরাজি সভ্যতার অন্ধ দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভের জন্য আমরা সচেতন হইয়া উঠিলাম। ইংরাজি শিক্ষা এখন আমাদের সমাজে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে এই জন্য আমরা স্বাধীনভাবে তাহার ভাল মন্দ তাহার মুখ্য গৌণ বিচারের অধিকারী হইয়াছি; এখন নানা চিত্ত নানা অবস্থায় তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে; এখন সেই শিক্ষার দ্বারা বাঙ্গালীর মন সজীব হইয়াছে, এবং বাঙ্গালীর মনকে আশ্রয় করিয়া সেই শিক্ষাও সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের জ্ঞানরাজ্যের চতুর্দ্দিকে মানসিক বায়ুমণ্ডল এমনি করিয়া সৃজিত হয়। আমাদের মন যখন সজীব ছিল না তখন এই বায়ুমণ্ডলের অভাব আমরা তেমন করিয়া অনুভব করিতাম না, এখন আমাদের মানসপ্রাণ যতই সজীব হইয়া উঠিতেছে ততই এই বায়ুমণ্ডলের জন্য আমরা ব্যাকুল হইতেছি।

এতদিন আমাদিগকে জলমগ্ন ডুবারীর মত ইংরাজি সাহিত্যাকাশ হইতে নলে করিয়া হাওয়া আনাইতে হইত। এখনো সে নল সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারি নাই। কিন্তু অল্পে অল্পে আমাদের জীবনসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চারিদিকে সেই বায়ুসঞ্চারও আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের দেশীয় ভাষার দেশীয় সাহিত্যের হাওয়া উঠিয়াছে।

যতক্ষণ বাঙ্গলা দেশে সাহিত্যের সেই হাওয়া বহে নাই, সেই

আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই; যতক্ষণ বঙ্গসাহিত্য এক একটি স্বতন্ত্র সঙ্গীহীন প্রতিভাশিখর আশ্রয় করিয়া বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছিল, ততক্ষণ তাহার দাবী করিবার বিষয় বেশি কিছু ছিল না। ততক্ষণ কেবল বলবান্ ব্যক্তিগণ তাহাকে নিজ বীর্য্যবলে নিজ বাহুযুগলের উপর ধারণপূর্ব্বক পালন করিয়া আসিতেছিলেন। এখন সে সাধারণের হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া বাসস্থান স্থাপন করিয়াছে - এখন বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্রই সে অবাধিত অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন অন্তঃপুরেও সে পরিচিত আত্মীয়ের ন্যায় প্রবেশ করে এবং বিদ্বৎসভাতেও সে সমাদৃত অতিথির ন্যায় আসন প্রাপ্ত হয়। এখন, যাঁহারা ইংরাজিতে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় ভাব প্রকাশ করাকে গৌরব জ্ঞান করেন; এখন অতিবড় বিলাতী-বিদ্যাভিমানীও বাঙ্গলা পাঠকদিগের নিকট খ্যাতি অর্জ্জন করাকে আপন চেষ্টার অযোগ্য বোধ করেন না।

প্রথমে যখন ইংরাজি শিক্ষার প্রবাহ আমাদের সমাজে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন কেবল বিলাতী বিদ্যার একটা বালীর চর বাঁধিয়া দিয়াছিল;—সে বালুকারাশি পরস্পর অসংসক্ত, তাহার উপরে না আমাদের স্থায়ী বাসস্থান নির্ম্মাণ করা যায়, না তাহা সাধারণের প্রাণধারণযোগ্য শস্য উৎপাদন করিতে পারে। অবশেষে তাহারই উপরে যখন বঙ্গসাহিত্যের পলিমৃত্তিকা পড়িল তখন যে কেবল দৃঢ় তট বাঁধিয়া গেল, তখন যে কেবল বাঙ্গলার বিচ্ছিন্ন মানবেরা এক হইবার উপক্রম করিল তাহা নহে, তখন বাঙ্গলা-হৃদয়ের চিরকালের খাদ্য এবং আশ্রয়ের উপায় হইল। এখন এই জীবনশালিনী জীবনদায়িনী মাতৃভাষা সন্তান-সমাজে আপন অধিকার প্রার্থনা করিতেছে।

সেই জন্যই আজ উপযুক্ত স্থলে এক সময়োচিত আন্দোলন স্বতই উদ্ভূত হইয়াছে। কথা উঠিয়াছে, আমাদের বিদ্যালয়ে অধিকতর পরিমাণে বাঙ্গলা শিক্ষা প্রচলিত হওয়া আবশ্যক।

কেন আবশ্যক? কারণ, ইংরাজি শিক্ষা দ্বারা আমাদের হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষা যে অভাবের সৃষ্টি হইয়াছে বাঙ্গলা ভাষা ব্যতীত তাহা পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংরাজি শিখিয়া যদি কেবল সাহেবের চাকরি ও আপিসের কেরাণীগিরি করিয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতাম তাহা হইলে কোন কথাই ছিল না। কিন্তু ইংরাজি শিক্ষায় আমাদের মনে যে কর্ত্তব্যের আদর্শ স্থাপিত করিয়াছে তাহা লোকহিত। জনসাধারণের নিকটে আপনাকে কর্ম্মপাশে বদ্ধ করিতে হইবে, সকলকে শিক্ষা বিতরণ করিতে হইবে, সকলকে ভাবরসে সরস করিতে হইবে, সকলকে জাতীয় বন্ধনে যুক্ত করিতে হইবে।

দেশীয় ভাষা ও দেশীয় সাহিত্যের অবলম্বন ব্যতীত এ কার্য্য কখনই সিদ্ধ হইবার নহে। আমরা পরের হস্ত হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছি দান করিবার সময় নিজের হস্ত দিয়া তাহা বণ্টন করিতে হইবে।

ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে, সর্ব্বসাধারণের নিকট নিজের কর্ত্তব্য পালন করিবার, যাহা লাভ করিয়াছি তাহা সাধারণের জন্য সঞ্চয় করিবার, যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছি তাহা সাধারণের সমক্ষে প্রমাণ করিবার, যাহা ভোগ করিতেছি তাহা সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু অদৃষ্টদোষে সেই আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার উপায় এখনও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট সুলভ হয় নাই। আমরা ইংরাজি বিদ্যালয় হইতে উদ্দেশ্য শিক্ষা করিতেছি কিন্তু উপায় লাভ করিতেছি না।

কেহ কেহ বলেন বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা প্রচলনের কোন আব-শ্যাক নাই; কারণ এ পর্য্যন্ত ইংরাজিশিক্ষিত ব্যক্তিগণ নিজের অনুরাগেই বাঙ্গলা সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, বাঙ্গলা শিখিবার জন্য তাঁহাদিগকে অতিমাত্র চেষ্টা করিতে হয় নাই।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন কেবল ক্ষমতাশালী লেখকের উপর বাঙ্গলা সাহিত্য নির্ভর করি-তেছে না, এখন তাহা সমস্ত শিক্ষিত সাধারণের সামগ্রী। এখন প্রায় কোন-না-কোন উপলক্ষে বাঙ্গলা ভাষায় ভাব প্রকা-শের জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই উপর সমাজের দাবী দেখা যায়। কিন্তু সকলের শক্তি সমান নহে; অশিক্ষা ও অনভ্যাসের সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার কর্ত্তব্য পালন সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। এবং বাঙ্গলা অপেক্ষাকৃত অপরিণত ভাষা বলি-য়াই তাহাকে কাজে লাগাইতে হইলে সবিশেষ শিক্ষা এবং নৈপু-ণ্যের আবশ্যক করে।

প্রচলিত পদ্ধতিতে যেমন করিয়া ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে ছাত্রদের সমস্ত অবসর এবং সেই সঙ্গে সমস্ত উৎসাহ ও স্বাধীন চেষ্টার উদ্যম শোষণ করিয়া লয়। বৃক্ষের চারিদিকে আকাশের ন্যায় শিক্ষার চারিদিকে খানিকটা অবকাশের আব-শ্যক করে;—এমন খানিকটা অবসর ও শক্তি থাকা চাই যাহা অবলম্বন করিয়া নবলব্ধ শিক্ষা সম্যক্‌রূপে আলোচিত প্রসারিত পরীক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু বাঙ্গালীর ছেলেকে যখন কেবল ইংরাজি ভাষামাত্র নহে পরন্তু সমস্ত পাঠ্য বিষয়গুলিকেও ইংরা-জিতে শিক্ষা করিতে হয় তখন তাহার অবকাশ এবং শক্তির শেষ সূচ্যগ্র ভূমি পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিতে হয়। অপরিচিত ভাষা এবং অপরিচিত বিষয় এই উভয় দৈত্যের দ্বারা একই সময়ে দক্ষিণে

বাসে আক্রান্ত হইয়া বাঙ্গালীর ছেলের চিন্তা করিবার অবসর-মাত্র থাকে না, কেবল সে অন্ধভাবে প্রাণপণ করিয়া যুঝিতে থাকে। অন্ততঃ যদি এণ্ট্রেন্স ক্লাস্ পর্য্যন্তও বাঙ্গলা ভাষায় বিষয় শিক্ষা ও ইংরাজিকে স্বতন্ত্র শিক্ষণীয় বিষয়স্বরূপে গণ্য করা হয় তবে ছাত্রগণ প্রকৃতরূপে শিক্ষা করিবার অবকাশ পায় এবং শিক্ষা সমাপনের পর স্বদেশের হিতসাধন ও জীবনের মহৎকর্ত্তব্য পালনের উপায় তাহাদের নিকট সুগম করিয়া দেওয়া হয়।

এখন বাঙ্গলা খবরের কাগজ, মাসিক পত্র,সভাসমিতি, আত্মীয়-সমাজ সর্ব্বত্র হইতেই বঙ্গভূমি তাঁহার শিক্ষিত সন্তানদিগকে বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্যে আহ্বান করিতেছে। যাহারা প্রস্তুত নহে যাহারা অক্ষম, তাহারা কিছু-না-কিছু সঙ্কোচ অনুভব করিতেছে। অসাধারণ নির্লজ্জ না হইলে আজ কাল বাঙ্গলা ভাষার অজ্ঞতা লইয়া আস্ফালন করিতে কেহ সাহস করে না। এক্ষণে আমাদের বিদ্যালয় যদি ছাত্রদিগকে আমাদের বর্ত্তমান আদর্শের উপযোগী না করিয়া তোলে, আমাদের সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন হিতসাধনে সক্ষম না করে, যে বিদ্যা আমাদিগকে অর্পণ করে সঙ্গে সঙ্গে তাহার দানাধিকার যদি আমাদিগকে না দেয়, আমাদের পরমাত্মীয়দিগকে বুভুক্ষিত দেখিয়াও সে বিদ্যা পরিবেশন করিবার শক্তি যদি আমাদের না থাকে—তবে এমন বিদ্যালয় আমাদের বর্ত্তমানকাল ও অবস্থার পক্ষে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা অভাবে ছাত্রগণ যে বাঙ্গলা সমাজের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইতে পারিতেছে না, কেবল তাহাই নহে, তাহাদের নূতন শিক্ষাও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে না। কখন কখন আমাদের ইংরাজ শিক্ষকগণও আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইংরাজি ও বাঙ্গলায় যে সকল প্রবন্ধ

রচনা করেন অনেক সময় তাহাতে চিন্তা ও ভাবের অকিঞ্চিৎ-করতা লক্ষিত হয়; স্পষ্টই বুঝা যায় আমাদের শিক্ষিত বিদ্যাকে আমরা নিজের মনের চিন্তায় পরিণত করিতে কোন কালে অভ্যাস করি নাই—সে গুলিকে বলপূর্ব্বক অশ্রুসিক্ত চক্ষে সমগ্র গলাধঃ-করণ করিয়াছি। কিন্তু পরকীয় বিদ্যাকে স্বকীয় চিন্তায় পরিণত করিতে হইলে মাঝখানে স্বদেশীয় ভাষা আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যা-লয়ের পাকশালায় ছত্রিশ অধ্যাপকে মিলিয়া ছত্রিশ বিদ্যার ব্যঞ্জন রন্ধন করিতে পারেন, কিন্তু নিজের হৃৎপিণ্ডের নিকটবর্ত্তী আজন্ম-কালীন পাকযন্ত্রটির মধ্যে তাহাকে পুনশ্চ পাক করিয়া লইলে তবেই সে যথার্থ আপনার হয়। আমরা রসনায় ইংরাজি বিদ্যার বিচিত্র আস্বাদ পাইতেছি সন্দেহ নাই কিন্তু যতক্ষণে তাহা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের নাড়ীতে নাড়ীতে উত্তপ্ত রক্তরূপে প্রবাহিত না হয় ততক্ষণ, সে বিদ্যা যে হজম হইয়াছে তাহার কোন প্রমাণ নাই।

যেমন মাছ ধরিবার সময় দেখা যায়, অনেক মাছ যতক্ষণ বঁড়-শিতে বিদ্ধ হইয়া জলে খেলাইতে থাকে ততক্ষণ তাহাকে ভারি-মস্ত মনে হয়, কিন্তু ডাঙ্গায় টান মারিয়া তুলিলেই প্রকাশ হইয়া পড়ে যত বড়টা মনে করিয়াছিলাম তত বড়টা নহে; যেমন রচনা-কালে দেখা যায় একটা ভাব যতক্ষণ মনের মধ্যে অস্ফুট অপরিণত আকারে থাকে ততক্ষণ সেটাকে অত্যন্ত বিপুল এবং নূতন মনে হয় কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করিতে গেলেই তাহা দুটো কথায় শেষ হইয়া যায় এবং তাহার নূতনত্বের উজ্জ্বলতাও দেখিতে পাওয়া যায় না—যেমন স্বপ্নে অনেক ব্যাপারকে অপরিসীম বিস্ময়জনক এবং বৃহৎ মনে হয় কিন্তু জাগরণমাত্রেই তাহা তুচ্ছ এবং ক্ষুদ্র আকার ধারণ করে তেমনি পরের শিক্ষাকে যতক্ষণে নিজের ডাঙ্গায় না টানিয়া তোলা যায় ততক্ষণ আমরা বুঝিতেই পারি না বাস্তবিক

কতখানি আমরা পাইয়াছি। আমাদের অধিকাংশ বিদ্যাই বঁড়শি-গাঁথা মাছের মত ইংরাজি ভাষার সুগভীর সরোবরের মধ্যে খেলাইয়া বেড়াইতেছে, আন্দাজে তাহার গুরুত্ব নির্ণয় করিয়া খুব পুলকিত গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছি। যদি বঙ্গভাষার কূলে একবার টানিয়া তুলিতে পারিতাম তাহা হইলে সম্ভবতঃ নিজের বিদ্যাটাকে তত বেশি বড় না দেখাইতেও পারিত; নাই দেখাক্, তবু সেটা ভোগে লাগিত এবং আয়তনে ছোট হইলেও আমাদের কল্যাণ-রূপিণী গৃহলক্ষ্মীর স্বহস্তকৃত রন্ধনে, অমিশ্র অনুরাগ এবং বিশুদ্ধ সর্ষপ তৈল সহযোগে পরম উপাদেয় হইতে পারিত।

বাইবেলে কথিত আছে, যাহার নিজের কিছু আছে তাহাকেই দেওয়া হইয়া থাকে। যে লোক একেবারে রিক্ত তাহার পক্ষে কিছু গ্রহণ করা বড় কঠিন। জলাশয়েই বৃষ্টির জল বাধিয়া থাকে, শুষ্ক মরুভূমে তাহা দাঁড়াইবে কোথায়? আমরা নূতন বিদ্যাকে গ্রহণ করিব সঞ্চিত করিব কোন্‌খানে? যদি নিজের শুষ্ক স্বার্থ এবং ক্ষণিক আবশ্যক ও ভোগের মধ্যে সে প্রতিক্ষণে শোষিত হইয়া যায় তবে সে শিক্ষা কেমন করিয়া ক্রমশঃ স্থায়িত্ব ও গভীরতা লাভ করিবে, সরস্বতীর সৌন্দর্য্যশতদলে প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে, আপনার তটভূমিকে স্নিগ্ধ শ্যামল, আকাশকে প্রতিফলিত, বহু-কাল ও বহুলোককে আনন্দে ও নির্ম্মলতায় অভিষিক্ত করিয়া তুলিবে?

বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে আরও একটি কথা বলিবার আছে। আলোচনা ব্যতীত কোন শিক্ষা সজীবভাবে আপনার হয় না। নানা মানব মনের মধ্য দিয়া গড়াইয়া না আসিলে একটা শিক্ষার বিষয় মানব সাধারণের যথার্থ ব্যবহারযোগ্য হইয়া উঠে না। যে দেশে বিজ্ঞান-শাস্ত্র আলোচনা বহুকাল হইতে প্রচলিত,

আছে সে দেশে বিজ্ঞান অন্তরে বাহিরে আচারে ব্যবহারে ভাষায় ভাবে সর্ব্বত্র সংলিপ্ত হইয়া গেছে। সে দেশে বিজ্ঞান একটা অপরিচিত শুষ্ক জ্ঞান নহে, তাহা মানব মনের সহিত মানব জীবনের সহিত সজীবভাবে নানা আকারে মিশ্রিত হইয়া আছে। এই জন্য সে দেশে অতি সহজেই বিজ্ঞানের অনুরাগ অকৃত্রিম হয়, বিজ্ঞানের ধারণা গভীরতর হইয়া থাকে। নানা মনের মধ্যে অবিশ্রাম সঞ্চরিত হইয়া সেখানে বিজ্ঞান প্রাণ পাইয়া উঠে। যে দেশে সাহিত্য চর্চ্চা প্রাচীন ও পরিব্যাপ্ত সে দেশে সাহিত্য কেবল গুটিকতক লোকের সখের মধ্যে বদ্ধ নহে। তাহা সমাজের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত প্রবাহিত, তাহা দিনে নিশীথে মনুষ্যজীবনের সহিত নানা ভাবে নানা আকারে মিশ্রিত হইতেছে এই জন্য সাহিত্যানুরাগ সেখানে সহজ, সাহিত্যবোধ স্বাভাবিক। আমাদের দেশে বিদ্বান লোকদের মধ্যে বিদ্যার আলোচনা যথেষ্ট নাই এবং বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকালের পূর্ব্বে অতি যৎসামান্যই ছিল।

কারণ, দেশীয় সাহিত্যের সম্যক্ বিস্তার অভাবে অনেকের মধ্যে কোন বিষয়ের আলোচনা অসম্ভব, এবং আলোচনা অভাবে বিদ্বান ব্যক্তিগণ চতুর্দ্দিক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল নিজের মধ্যেই বদ্ধ। তাঁহাদের জ্ঞানবৃক্ষ চারিদিকের মানব মন হইতে যথেষ্ট পরিমাণে জীবনরস আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে না।

আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হাস্যলেশহীন একটা সুগভীর নিরানন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, উপরোক্ত অভাব তাহার অন্যতম কারণ। কি করিয়া কালযাপন করিতে হইবে আমরা ভাবিয়া পাই না। আমরা সকালবেলায় চুপ করিয়া দ্বারের কাছে বসিয়া তামাক খাই, দ্বিপ্রহরে আপিসে যাই, সন্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া আসিয়া তাস খেলি। সমাজের মধ্যে এমন একটা সর্ব্বব্যাপী প্রবাহ

নাই যাহাতে আমাদিগকে ভাসাইয়া রাখে, যাহাতে আমাদিগকে এক সঙ্গে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। আমরা যে যার আপন আপন ঘরে উঠিতেছি বসিতেছি খড়াইতেছি এবং যথাকালে—অধিকাংশতই অকালে—মরিতেছি। ইহার প্রধান কারণ, আমরা বিচ্ছিন্ন। আমাদের শিক্ষার সহিত সমাজের, আদর্শের সহিত চরিত্রের, ভাবের সহিত কার্য্যের, আপনার সহিত চতুর্দ্দিকের সর্ব্বাঙ্গীন মিশ খায় নাই। আমরা বীরত্বের ইতিহাস জানি কিন্তু বীর্য্য কাহাকে বলে জানি না, আমরা সৌন্দর্য্যের সমালোচনা অনেক পড়িয়াছি কিন্তু চতুর্দ্দিকে সৌন্দর্য্য রচনা করিবার কোন ক্ষমতা নাই; আমরা অনেক ভাব অনুভব করিতেছি কিন্তু অনেকের সহিত ভাগ করিয়া ভোগ করিব এমন লোক পাইতেছি না। এই সকল মনোরুদ্ধ ভাব সকল ক্রমশঃ বিকৃত ও অস্বাভাবিক হইয়া যায়। তাহা ক্রমে অলীক আকার ধারণ করে। অন্যদেশে যাহা একান্ত সত্য আমাদের দেশে তাহা অন্তঃসারশূন্য হাস্যকর আতিশয্যে পরিণত হইয়া উঠে।

হিমালয়ের মাথার উপরে যদি উত্তরোত্তর কেবলি বরফ জমিতে থাকিত তবে ক্রমে তাহা অতি বিপর্য্যয় অদ্ভুত এবং পতনোন্মুখ উচ্চতা লাভ করিত এবং তাহা ন দেবায় ন ধর্ম্মায় হইত—কিন্তু সেই বরফ নির্ঝররূপে গলিয়া প্রবাহিত হইলে হিমালয়েরও অনাবশ্যক ভার লাঘব হয় এবং সেই সজীব ধারায় সুদূরপ্রসারিত তৃষাতুর ভূমি সরস শস্যশালী হইয়া উঠে—ইংরাজি বিদ্যা যতক্ষণ বদ্ধ থাকে ততক্ষণ তাহা সেই জড় নিশ্চল বরফভারের মত—দেশীয় সাহিত্যযোগে তাহা বিগলিত প্রবাহিত হইলে তবে সেই বিদ্যারও সার্থকতা হয়, বাঙ্গালীর ছেলের মাথারও ঠিক থাকে এবং স্বদেশের তৃষাও নিবারিত হয়। অবরুদ্ধ ভাবগুলি অনেকের মধ্যে

ছড়াইয়া গিয়া তাহার আতিশয্যবিকার দূর হইতে থাকে। যে সকল ইংরাজি ভাব যথার্থরূপে আমাদের দেশের লোক গ্রহণ করিতে পারে—অর্থাৎ যাহা বিশেষরূপে ইংরাজি নহে, যাহা সার্ব্ব-ভৌমিক,—তাহাই থাকিয়া যায় এবং বাকি সমস্ত নষ্ট হইতে থাকে। আমাদের মধ্যে একটা মানসিক প্রবাহ উৎপন্ন হয়—সাধারণের মধ্যে একটা আদর্শের এবং আনন্দের ঐক্য জাগিয়া উঠে; বিদ্যার পরীক্ষা হয়, ভাবের আদান প্রদান চলে; ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে যাহা শেখে বাড়িতে আসিয়া তাহার অনুবৃত্তি দেখিতে পায়, এবং বয়স্কসমাজে প্রবেশ করিবার সময় বিদ্যাভারকে বিদ্যালয়ের বহির্দ্বারে ফেলিয়া আসা আবশ্যক হয় না। এই যে স্কুলের সহিত গৃহের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ, ছাত্রবয়সের সহিত কর্ম্মকালের সম্পূর্ণ ব্যবধান, নিজের সহিত আত্মীয়ের সম্পূর্ণ ভিন্ন শিক্ষা, এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা দূর হইয়া যায়; দেশীয় সাহিত্যের সংযোজনীশক্তি প্রভাবে বাঙ্গালী আপনার মধ্যে আপনি ঐক্যলাভ করে—তাহার শিক্ষাও সম্পূর্ণ হইতে পারে তাহার জীবনও সফলতা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু এখনো আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে অধিকতর পরিমাণে বাঙ্গলা শিখাইবার আবশ্যকতা অনুভব করেন না—এমন কি, সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। যদি তাঁহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করা যায়, যে, আমরা যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেই দেশের ভাষায় আমাদের নবলব্ধ জ্ঞান বিস্তার করিবার, আমাদের নবজাত ভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা ন্যূনাধিক পরিমাণে আমাদের সকলেরই আয়ত্ত থাকা উচিত কি না—তাঁহারা উত্তর দেন উচিত; কিন্তু তাঁহাদের মতে সে জন্য বিশেষরূপে প্রস্তুত হইবার আবশ্যকতা নাই;

তাঁহারা বলেন ইচ্ছা করিলেই বাঙ্গালীর ছেলেমাত্রই বাঙ্গলা শিখিতে ও লিখিতে পারে।

কিন্তু ইচ্ছা জন্মিবে কেন? সকলেই জানেন, পরিচয়ের পর যে সকল বিষয়ের প্রতি আমাদের পরম অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, পরিচয় হইবার পূর্ব্বে তাহাদের প্রতি অনেক সময় আমাদের বৈমুখভাব থাকা অসম্ভব নহে। অনুরাগ জন্মিবার একটা অবসর দেওয়াও কর্ত্তব্য;—এবং পূর্ব্ব হইতে পথকে কিয়ৎপরিমাণেও সুগম করিয়া রাখিলে কর্ত্তব্যবুদ্ধি সহজেই তদভিমুখে ধাবিত হইতে পারে। সম্মুখে একেবারে অনভ্যস্ত পথ দেখিলে কর্ত্তব্য-ইচ্ছা স্বভাবতই উদ্বোধিত হইতে চাহে না।

কিন্তু, বৃথা এ সকল যুক্তি প্রয়োগ করা! আমাদের মধ্যে এমন এক দল লোক আছেন বাঙ্গালার প্রতি যাঁহাদের অনুরাগ, রুচি এবং শ্রদ্ধা নাই; তাঁহাদিগকে যেমন করিয়া যে দিকেই ফিরান যায় তাঁহাদের কম্পাসের কাঁটা ইংরাজির দিকেই ঘুরিয়া বসে। তাঁহারা অনেকে ইংরাজি আহার এবং পরিচ্ছদকে বিজাতীয় বলিয়া ঘৃণা করেন;—তাঁহারা আমাদের জাতির বাহ্য শরীরকে বিলাতী অশন বসনের সহিত সংসক্ত দেখিতে চাহেন না,—কিন্তু সমস্ত জাতির মনঃশরীরকে বিদেশীয় ভাষার পরিচ্ছদে মণ্ডিত এবং বিজাতীয় সাহিত্যের আহার্য্যে পরিবর্দ্ধিত দেখিতে তাঁহাদের আক্ষেপ বোধ হয় না। শরীরের সহিত বস্ত্র তেমন করিয়া সংলিপ্ত হয় না, মনের সহিত ভাষা যেমন করিয়া জড়িত হইয়া যায়। যাঁহারা আপন সন্তানকে তাহার মাতৃভাষা শিখিবার অবসর দেন না, যাঁহারা পরমাত্মীয়দিগকেও ইংরাজি ভাষায় পত্র লিখিতে লজ্জা বোধ করেন না, যাঁহারা "পদ্মবনে মত্তকরীসম" বাঙ্গলা ভাষার বানান এবং ব্যাকরণ ক্রীড়াচ্ছলে পদদলিত করিতে পারেন,

অথচ ভ্রমক্রমে ইংরাজির ফোঁটা অথবা মাত্রার বিচ্যুতি ঘটিলে ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলেন, যাঁহাদিগকে বাঙ্গলায় হস্তীমূর্খ বলিলে অবিচলিত থাকেন কিন্তু ইংরাজিতে ইগ্নোরেণ্ট্‌ বলিলে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে এ কথা বুঝান কঠিন, যে, তাঁহারা ইংরাজি শিক্ষার সন্তোষজনক পরিণাম নহেন।

কিন্তু ইংরাজি-অভিমানী, মাতৃভাষাদ্বেষী বাঙ্গালীর ছেলেকে আমরা দোষ দিতে চাহি না। ইংরাজির প্রতি এই উৎকট পক্ষপাত স্বাভাবিক। কারণ, ইংরাজি ভাষাটা একে রাজার ঘরের মেয়ে, তাহাতে আবার তিনি আমাদের দ্বিতীয় পক্ষের সংসার—তাঁহার আদর যে অত্যন্ত বেশি হইবে তাহাতে বিচিত্র নাই। তাঁহার যেমন রূপ তেমনি ঐশ্বর্য্য—আবার তাঁহার সম্পর্কে আমাদের রাজপুত্রদের ঘরেও আমরা কিঞ্চিৎ সম্মানের প্রত্যাশা রাখি। সকলেই অবগত আছেন ইহাঁর প্রসাদে উক্ত যুবরাজদের প্রাসাদদ্বারপ্রান্তে আমরা কখন কখন স্থান পাইয়া থাকি; আবার কখন কখন কর্ণপীড়নও লাভ হয়—সেটাকে আমরা পরিহাসের স্বরূপ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করি কিন্তু চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া পড়ে।

আর আমাদের হতভাগিনী প্রথম পক্ষটি—আমাদের দরিদ্র বাঙ্গলা ভাষা—পাকশালার কাজ করেন—সে কাজটি নিতান্ত সামান্য নহে, তেমন আবশ্যকীয় কাজ আর আমাদের আছে কি না সন্দেহ কিন্তু তাঁহাকে আমাদের আপনার বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা করে। পাছে তাঁহার মলিন বসন লইয়া তিনি আমাদের ধনশালী নব কুটুম্বদের চক্ষে পড়েন এই জন্য তাঁহাকে গোপন করিয়া রাখি;—প্রশ্ন করিলে বলি, চিনি না।

সে দরিদ্র ঘরের মেয়ে। তাহার বাপের রাজত্ব নাই। সে

সম্মান দিতে পারে না, সে কেবলমাত্র ভালবাসা দিতে পারে। তাহাকে যে ভালবাসে তাহার পদবৃদ্ধি হয় না, তাহার বেতনের আশা থাকে না, রাজদ্বারে তাহার কোন পরিচয় প্রতিপত্তি নাই। কেবল যে অনাথাকে সে ভালবাসে সেই তাহাকে গোপনে ভালবাসার পূর্ণ প্রতিদান দেয়। এবং সেই ভালবাসার যথার্থ স্বাদ যে পাইয়াছে সে জানে, যে, পদমান প্রতিপত্তি এই প্রেমের নিকট

রূপকথায় যেমন শুনা যায় এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ দেখিতেছি—আমাদের ঘরের এই নূতন রাণী সুয়ো রাণী নিষ্ফল, বন্ধ্যা। এতকাল এত যত্নে এত সম্মানে সে মহিষী হইয়া আছে কিন্তু তাহার গর্ভে আমাদের একটি সন্তান জন্মিল না। তাহার দ্বারা আমাদের কোন সজীব ভাব আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। একেবারে বন্ধ্যা যদি বা না হয় তাহাকে মৃতবৎসা বলিতে পারি, কারণ, প্রথম প্রথম গোটাকতক কবিতা এবং সম্প্রতি অনেকগুলা প্রবন্ধ জন্মলাভ করিয়াছে কিন্তু সংবাদপত্রশয্যাতেই তাহারা ভূমিষ্ঠ হয় এবং সংবাদপত্ররাশির মধ্যেই তাহাদের সমাধি।

আর, আমাদের দুয়ারাণীর ঘরে আমাদের দেশের সাহিত্য, আমাদের দেশের ভাবী আশা ভরসা, আমাদের হতভাগ্য দেশের একমাত্র স্থায়ী গৌরব জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই শিশুটিকে আমরা বড় একটা আদর করি না; ইহাকে প্রাঙ্গণের প্রান্তে উলঙ্গ ফেলিয়া রাখি, এবং সমালোচনা করিবার সময় বলি—ছেলেটার শ্রী দেখ! ইহার না আছে বসন, না আছে ভূষণ; ইহার সর্ব্বাঙ্গেই ধূলা! ভাল তাই মানিলাম,—ইহার বসন নাই, ভূষণ নাই, কিন্তু ইহার জীবন আছে। এ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে। এ মানুষ হইবে এবং সকলকে মানুষ করিবে। আর,

আমাদের ঐ সুয়ারাণীর মৃত সন্তানগুলিকে বসনে ভূষণে আচ্ছন্ন করিয়া যতই হাতে হাতে কোলে কোলে নাচাইয়া বেড়াইনা কেন কিছুতেই উহাদের মধ্যে জীবনসঞ্চার করিতে পারিব না।

আমরা যে কয়টি লোক বঙ্গভাষার আহ্বানে একত্র আকৃষ্ট হইয়াছি, আপনাদের যথাসাধ্য শক্তিতে এই শিশু সাহিত্যটিকে মানুষ করিবার ভার লইয়াছি—আমরা যদি এই অভূষিত ধূলি-মলিন শিশুটিকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া অহঙ্কার করি, ভরসা করি কেহ কিছু মনে করিবেন না। যাঁহারা রাজসভায় বসিতেছেন তাঁহারা ধন্য, যাঁহারা প্রজাসভায় বসিতেছেন তাঁহাদের জয়জয়-কার,—আমরা এই উপেক্ষিত অধীন দেশের প্রচলিত ভাষায় অন্তরের সুখ দুঃখ বেদনা প্রকাশ করি, ঘরের কড়ি খরচ করিয়া তাহা ছাপাই এবং ঘরের কড়ি খরচ করিয়া কেহ তাহা কিনিতে চাহেন না—আমাদের অনুগ্রহ করিয়া কেবল একটুখানি অহঙ্কার করিতে দিবেন! সেও বর্ত্তমানের অহঙ্কার নহে ভবিষ্যতের অহ-ঙ্কার—আমাদের নিজের অহঙ্কার নহে, ভাবী বঙ্গদেশের, সম্ভবতঃ ভাবী ভারতবর্ষের অহঙ্কার! তখন আমরাই বা কোথায় থাকিব, আর এখনকার দিনের উড্ডীয়মান বড় বড় জয়পতাকাগুলিই বা কোথায় থাকিবে! কিন্তু এই সাহিত্য তখন অঙ্গদকুণ্ডলউষ্ণীষে ভূষিত হইয়া সমস্ত জাতির হৃদয়সিংহাসনে রাজমহিমায় বিরাজ করিবে এবং সেই ঐশ্বর্য্যের দিনে মাঝে মাঝে এই বাল্য সুহৃদ-দিগের নাম তাহার মনে পড়িবে এই স্নেহের অহঙ্কারটুকু আমাদের আছে!

আজ আমরা এ কথা বলিয়া অলীক গর্ব্ব করিতে পারিব না, যে, আমাদের অদ্যকার তরুণ বঙ্গসাহিত্য পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যশালী বয়স্ক সাহিত্যসমাজে স্থান পাইবার অধিকারী হইয়াছে—বঙ্গসাহি-

ত্যের যশস্বীবৃন্দের সংখ্যা অত্যল্প, আজিও বঙ্গসাহিত্যের আদরণীয় গ্রন্থ গণনায় যৎসামান্য, এ কথা স্বীকার করি,—কিন্তু স্বীকার করিয়াও তথাপি বঙ্গসাহিত্যকে ক্ষুদ্র মনে হয় না। সে কি কেবল অনুরাগের অন্ধ মোহবশতঃ? তাহা নহে। আমাদের বঙ্গসাহিত্যে এমন একটি সময় আসিয়াছে যখন সে আপন ভাবী সম্ভাবনাকে আপনি সচেতন ভাবে অনুভব করিতেছে এই জন্য বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ ফল তুচ্ছ হইলেও সে আপনাকে অবহেলাযোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারিতেছে না। বসন্তের প্রথম অভ্যাগমে যখন বনভূমিতলে নবাঙ্কুর এবং তরুশাখায় নব কিশলয়ের প্রচুর উদ্গম আরব্ধ আছে —যখন বনশ্রী আপন অপরিসীম পুষ্পৈশ্বর্য্যের সম্পূর্ণ পরিচয় দিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই—তখনও সে যেমন আপন অঙ্গে প্রত্যঙ্গে শিরায় উপশিরায় এক নিগূঢ় জীবনরসসঞ্চার, এক বিপুল ভাবী মহিমা উপলব্ধি করিয়া আসন্ন যৌবনগর্ব্বে সহসা উৎফুল্ল হইয়া উঠে;—সেইরূপ আজ বঙ্গসাহিত্য আপন অন্তরের মধ্যে এক নূতন প্রাণশক্তি এক বৃহৎ বিশ্বাসের পুলক অনুভব করিয়াছে—সমস্ত বঙ্গহৃদয়ের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার আন্দোলন সে আপনার নাড়ীর মধ্যে উপলব্ধি করিতেছে—সে জানিতে পারিয়াছে সমস্ত বাঙ্গালীর অন্তর অন্তঃপুরের মধ্যে তাহার স্থান হইয়াছে; এখন সে ভিখারিণীবেশে কেবল ক্ষমতাশালীর দ্বারে দাঁড়াইয়া নাই, তাহার আপন গৌরবের প্রাসাদে তাহার অক্ষুণ্ণ অধিকার প্রতিদিন বিস্তৃত এবং দৃঢ় হইতে চলিয়াছে। এখন হইতে সে শয়নে স্বপনে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সমস্ত বাঙ্গালীর

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

নববঙ্গসাহিত্য অদ্য প্রায় একশত বৎসর হইল জন্মলাভ করি-

য়াছে; আর এক শত বৎসর পরে যদি এই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সভার শততম বার্ষিক উৎসব উপস্থিত হয় তবে সেই উৎসব সভায় যে সৌভাগ্যশালী বক্তা বঙ্গসাহিত্যের জয়গান করিতে দণ্ডায়মান হইবেন, তিনি আমাদের মত প্রমাণশূন্যরিক্তহস্তে কেবলমাত্র অন্তরের আশা এবং অনুরাগ, কেবলমাত্র আকাঙ্ক্ষার আবেগ লইয়া, কেবলমাত্র অপরিস্ফুট অনাগত গৌরবের সূচনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অতিপ্রত্যূষের অকস্মাৎ-জাগ্রত একক বিহঙ্গের অনিশ্চিত মৃদু কাকলীর স্বরে সুরে বাঁধিবেন না—তিনি স্ফুটতর অরুণালোকে জাগ্রত বঙ্গকাননে বিবিধ কণ্ঠের বিচিত্র কলগানের অধিনেতা হইয়া বর্ত্তমানের উৎসাহে আনন্দধ্বনি উচ্ছ্রিত করিয়া তুলিবেন—এবং কোন কালে যে অমানিশীথের একাধিপত্য ছিল, এবং অদ্যকার আমরা, কে, প্রদোষের অন্ধকারে ক্লান্তি এবং শান্তি, আশা এবং নৈরাশ্যের দ্বিধার মধ্যে সকরুণ-দুর্ব্বল কণ্ঠের গীতগান সমাপ্ত করিয়া নিদ্রা গিয়াছিলাম সে কথা কাহারও মনেও থাকিবে না।*

আলোচনা।

ফেরোজশা মেটা।

মাননীয় ফেরোজশা মেটা ভারতমন্ত্রীসভায় পুলিস্ বিলের যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের কর্ত্তৃপুরুষদিগের সহ্য হয় নাই। হঠাৎ একটা বজ্রের শব্দ শুনিলে ছেলেরা কাঁদিয়া

* এই প্রবন্ধ ১৫শে চৈত্র রবিবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাম্বৎসরিক উৎসব সভায় পঠিত হয়।

উঠে—তাঁহারা মনে করে কে যেন উপর হইতে তাহাদের প্রতি ভারি একটা অন্যায় করিল, যেন তাহাদের কোথায় এক জায়গায় ঘা লাগিয়াছে—শ্রীযুক্ত মেটা ভারত সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে যদিও তিনি কাহাকেও আঘাত করেন নাই তথাপি হঠাৎ তাহার শব্দে এবং নূতন আলোকের ছটায় সাহেবদের খামকা মনে হইল তাঁহাদের সিবিল সর্বিসের সুকোমল পৃষ্ঠে বুঝি কে মুষ্টিপাত করিল অমনি তাঁহারা বিচলিত হইয়া উঠিলেন। একটা নূতন আলোক অকস্মাৎ একটা জ্যোতির্ম্ময় কষাঘাতের মত মন্ত্রীসভার আকাশের গায়ে চমক দিয়া গিয়াছিল—তাই সাহেবরা অকস্মাৎ এতই চকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, যে, তাঁহারা মনে করিতে পারেন নাই তাঁহাদিগকে কেহ আঘাত করে নাই।

মেটা বলিয়াছিলেন—বিনা বিচারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার আপিলের অধিকার না দিলে অবিচারের সম্ভাবনা আছে। কর্ত্তৃপুরুষেরা ক্ষাপা হইয়া বলিয়া উঠিলেন—কেন, আমরা কি তবে সকলেই অবিচারী? গম্ভীরভাবে ইহার উত্তর দিতে বসিলে আমাদের কর্ত্তাদের বুদ্ধির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়—কেবল, এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করি, তবে কোন অপরাধের জন্য কোন প্রকার বাঁধা বিচারপ্রণালী থাকে কেন? আমাদের স্বর্গসম্ভব সিবিলসর্ব্বিসের সভ্যগণকেও আইন পালন করিয়া বিচার করিতে হয় এ অপমান তাঁহারা স্বীকার করেন কেন? নিয়ম মাত্রই ত মানুষের স্বেচ্ছাধীন বিবেচনা, স্বাধীন ধর্ম্মবুদ্ধি এবং অবাধ হৃদয়বৃত্তির প্রতি সন্দেহ প্রকাশ!

তাহার পরে আবার বাজেটের আলোচনা কালেও আমাদের বাঙ্গলাদেশের ছোট বিধাতা ইস্কুলমাষ্টারের মত গলা করিয়া, শ্রীযুক্ত মেটাকে বিস্তর উপদেশপূর্ণ ভৎসনা করিয়াছেন। তিনি

বলেন মেটা সাহেব খুব ভাল ছেলে শুনিয়াছিলাম কিন্তু তিনি আমাদের আশানুরূপ উচ্চ নম্বর রাখিতে পারিতেছেন না অতএব তাঁহাকে ভবিষ্যতের জন্ম সতর্ক করা যায়। কর্ত্তাদের মতে, বজেটের আলোচনায় শ্রীযুক্ত মেটা কোন প্রকার কাজের পরামর্শ দেন নাই কেবল সাধারণভাবে বিরোধ প্রকাশ করিয়াছেন।

মেটা সাহেব বলিয়াছিলেন, সৈন্যবিভাগের খরচ অত্যন্ত বেশি বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব রাজস্বসচিব সার্ অক্‌লাণ্ড কলভিন্‌ও ঐ কথা বলিয়াছেন।

ওয়েষ্ট্‌ল্যাণ্ড্ সাহেব পাকেপ্রকারে বলেন খরচ বাড়ে নাই এক্সচেঞ্জের দুর্ব্বিপাকে অধিক টাকা নষ্ট হইতেছে। তিনি বলেন পৌণ্ডের হিসাবে হিসাব ধরিলে খরচ কম দৃষ্ট হইবে। এ কৈফিয়ৎটার মধ্যে কিছু চোখে ধূলা দেওয়া আছে এইরূপ আমরা অনুমান করি। ভারতবর্ষে যখন রৌপ্যমুদ্রায় অধিকাংশ খরচ নির্ব্বাহিত হয় তখন পৌণ্ড্ হিসাবে হিসাব করিয়া খরচ কম দৃষ্ট হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাতে ব্যয়ের ন্যূনতা প্রমাণ হয় না। অতএব ওয়েষ্ট্‌ল্যাণ্ড্ সাহেবের এ যুক্তির মধ্যে সরলতা নাই এবং তাহাতে আমাদের কোন সান্ত্বনাও দেখি না।

আমরা কাজের কথা কি বলিব? আমরা যদি বলি, সাহেব কর্ম্মচারীদিগকে ক্ষতিপূরণবৃত্তি (কম্পেন্সেশন্ অ্যালাউয়েন্স) দিবার আবশ্যক নাই, তোমরা বলিবে, না দিলে নয়। বর্ত্তমান এক্সচেঞ্জের হিসাবে ধরিয়াও তোমাদের স্বদেশের সহিত এখানকার বেতনের তুলনা করিয়া দেখ। এখানে বিদেশে থাকিয়া তোমাদের খরচ বেশি হয়? কেন হয়? এমন যদি বুঝিতাম এখানে তোমাদের যেরূপ চাল্ বিলাতেও তোমাদের সেই চাল্ তাহা হইলে আমাদের কোন আপত্তির কারণ ছিল না। বিলাতের মধ্যবিত্ত অব-

স্থায় কয় জন লোক বৎসরের মধ্যে কয়দিন শ্যাম্পেন্-ডিনার ভোগ করিয়া থাকে? এ কথা কি সাহেবরা অস্বীকার করিতে পারেন যে, ভারতবর্ষে তাঁহারা বিস্তর অনভ্যস্ত এবং অনাবশ্যক নবাবী করিয়া থাকেন? সে সমস্ত যদি তাঁহারা কিঞ্চিৎ খাটো করিতে প্রস্তুত হইতেন তাহা হইলে কি আমাদের এই সকল অর্দ্ধ-উপবাসীদের কষ্টসঞ্চিত উদরান্নে হাত দিতে হইত?

গল্পে কথিত আছে, বাবু যখন গোয়ালার বিল্ হইতে তাহার অর্দ্ধেক পাওনা কাটিয়া দিলেন তখনো সে প্রসন্নমুখে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল—তাহার প্রসন্নতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, এখনো দুধে পৌঁছয় নাই। অর্থাৎ কাটাটা কেবল জলের উপর দিয়াই গিয়াছে। প্রতিকূল এক্সচেঞ্জেও এখনো সাহেবদের হুইস্কি সোডা এবং মুর্গি মটনে আঘাত করে নাই তাহা বড় জোর শ্যাম্পেন টোকে, এবং অতিরিক্ত ঘোড়া ঘোড়দৌড়ের উপর দিয়াই গিয়াছে; কিন্তু কম্পেন্‌সেশন্ অ্যালাউয়েন্স আমাদের মোটা চাউল এবং বহুজলমিশ্রিত কলাইয়ের ডালে গিয়া হস্তক্ষেপ করিয়াছে।

আমরা বলিতেছি, তোমাদের ভারত শাসনের যন্ত্রটা অত্যন্ত বহুব্যয়সাধ্য হইয়াছে—যদি অধিকতর পরিমাণে দেশী লোক নিয়োগ কর তাহা হইলে শস্তা হয়। তাহাতে যে কাজ খারাপ হয় এমন কোনও প্রমাণ নাই। তোমরা বলিবে সে কোন মতেই হইতে পারে না।

তোমাদের কথাটা এই, আমরা সৈন্য বিভাগের বিস্তার করিব, ভারতবর্ষের দুশো পাঁচশ মাইল দূরে যেখানে যত ভীমরুলের চাক আছে গায় পড়িয়া সবগুলাতে খোঁচা মারিয়া বেড়াইব, ইংরাজ-কর্ম্মচারীদিগকে ক্ষতিপূরণবৃত্তি দিব, এবং মোটা পদের ইংরাজ

কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া ভারতবর্ষের রক্তরিক্ত দেহে মোটা মোটা জোঁক বসাইয়া খাদ্য শোষণ করিব—ইহার অন্যথা হইবে না, এক্ষণে ব্যয়-সংক্ষেপ সম্বন্ধে আমাদিগকে কাজের পরামর্শ দাও।

অনেক সময় যথার্থ কাজের পরামর্শ অত্যন্ত সহজ এবং পুরাতন। অজীর্ণ রোগী যত বড় ডাক্তারের নিকট উপদেশ লইতে যাক্ সকলেই বলিবেন তুমি পথ্যসংযম কর। কিন্তু রোগী যদি বলে "ওটা কোন কাজের কথা হইল না—আমি ঘৃতপক্ক অখাদ্য খাইবই, এবং ক্ষুধার অবস্থা যেমনই থাক্ আহারের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিব, তুমি যদি বড় ডাক্তার হও আমাকে একটা চিকিৎসার উপায় বলিয়া দাও"—তবে সে রোগীর নিকট খাদ্য পরিবর্ত্তন, বায়ুপরিবর্ত্তন প্রভৃতি স্বাস্থ্যতত্ত্বের সমস্ত মূলনীতিই নিতান্ত বাজে এবং সাধারণ কথা বলিয়াই মনে হইবে।

বিবাহ করিতে উদ্যত কোন যুবকের প্রতি পাঞ্চ্ পত্রিকার একটি অত্যন্ত সহজ এবং সংক্ষিপ্ত উপদেশ ছিল—সেটি এই:—"এমন কাজ করিয়োনা!" অপব্যয় করিতে উদ্যত গবর্মেণ্টের প্রতিও এতদপেক্ষা সহজ এবং সঙ্গত উপদেশ হইতে পারে না। ফেরোজশা মেটা সেই উপদেশটি দিয়াছিলেন,—তাহাতেই কর্ত্তারা অত্যন্ত উষ্মা প্রকাশ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন ইহা কোন কাজের উপদেশ হইল না।

বেয়াদব।

কৌন্সিল্ সভায় একটা নূতন জীবনের লক্ষণ দেখা দিয়াছে ইহাতেই রাজপুরুষেরা কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এতদিন্ মন্ত্রণাকার্য্য যেন যন্ত্রের মত চলিয়া আসিতেছিল এখন হঠাৎ তাহারই মাঝখানে একটা ব্যথিত হৃদয়ের আওয়াজ শুনিয়া ছোট

হইতে বড়কর্ত্তা পর্য্যন্ত ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছেন, তাঁহারা বলিতেছেন মন্ত্রীসভার গম্বুজের মধ্যে ভারতবর্ষের হৃদয়ের মত এমন একটা সজীব পদার্থকে হঠাৎ আনয়ন করা কেহ প্রত্যাশা করে নাই—কৌন্সিল সভায় এত বড় বেয়াদবি ইতিপূর্ব্বে কখনো ঘটে নাই।

কিন্তু, হায়, এই অবাধ্য বেয়াদবটিকে আর ত চাপিয়া রাখা যায় না! এ এখন সর্ব্বত্রই প্রবেশ করিতেছে। সভা, সমিতি, সাহিত্য, সংবাদপত্র, সমুদ্রপারের পার্ল্যামেণ্ট্ পরিষদ্, সর্ব্বত্রই ইহার অভ্যুদয় দেখা যাইতেছে। অবশেষে সজীব ভারতবর্ষ তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গমতম স্থানের দ্বারমোচন করিয়াছে, সে ভারতমন্ত্রীসভায় প্রবেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

যাঁহার বক্ষ আশ্রয় করিয়া ভারতবর্ষের হৃদয় এমন অসম্ভব স্থানে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে সেই ফিরোজ শা মেটার নিকট অল্পকাল হইল আমরা ভারতবাসী প্রকাশ্যে কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছি। মেটা যে কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহাতে সফল হইতে পারেন নাই কিন্তু তাহা হইতে উচ্চতর সফলতা লাভ করিয়াছেন।

কিন্তু এই উপলক্ষ্যে গবর্মেণ্ট এবং প্রজার মধ্যে আর একটি বিভাগের সৃষ্টি হইল। মন্ত্রীসভায় এক পক্ষে ভারতবর্ষ এবং অন্যপক্ষে গবর্মেণ্ট দণ্ডায়মান হইলেন; ইহাতে মাঝে মাঝে সংঘাত সংঘর্ষ হইবেই। সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে। যেখানে জীবন প্রবেশ করিয়াছে সেইখানেই জীবনের যুদ্ধ অনিবার্য্য।

কিন্তু আমরা দুর্ব্বল পক্ষ। এ সংঘাতে কি আমাদের ভাল হইবে? যাঁহারা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ প্র্যাক্‌টিক্যাল্ ভালর দিকে দৃষ্টি রাখেন তাঁহারা অনেক সময় নিরাশ হইবেন, অনেক সময় কেবল দলাদলির জিদ্ বজায় রাখিতে গিয়া গবর্মেণ্ট আমাদের

সঙ্গত প্রস্তাবকেও অগ্রাহ্য করিবেন। কিন্তু সভ্যসমাজে গায়ের জোর একমাত্র জোর নহে; ক্রমশ আমরাই আবিষ্কার করিতে থাকিব যে যুক্তির বল, ঐক্যের বল, নিষ্ঠার বল, অধ্যবসয়ের বল সামান্য নহে। আমরা নিজে যুঝিয়া চেষ্টা করিয়া যতটুকু ক্ষুদ্র ফল পাই সেও পরের অযাচিত বদান্যতার অপেক্ষা মহত্তর।

আমরা যে আমরা, আমাদের লোক যে আমাদেরই লোক, এই চেতনাটি যত প্রকারে যত আকারে সজাগ হইয়া উঠে ততই আমাদের মঙ্গল; আমাদের কাজ আমাদের দেশের লোক করিতেছে ইহা আমরা যেখানে যত পরিমাণে দেখিতে পাই ততই আমাদের পক্ষে আনন্দের বিষয়। সম্ভবতঃ অনেকস্থলে আমরা অনেক ভ্রম করিব, অনেক অযথাচরণ করিব, এমন কি, অনভিজ্ঞতা বশতঃ আমাদের নিজেদের স্বার্থেও আঘাত দিব তথাপি পরিণামে তাহাতে আমাদের পরিতাপের বিষয় থাকিবে না। অতএব ভারতমন্ত্রীসভায় যে লোক আমাদের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষের লাঞ্ছনা শিরোধার্য্য করিয়া আমাদের হইয়া লড়িয়াছেন রাজপুরুষেরা তাঁহার উপদেশকে যতই তুচ্ছ জ্ঞান করুন, তাঁহার সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হউক, তথাপি তাঁহাকে আমরা ভারতবাসীরা যে আপনার লোক বলিয়া এক সকৃতজ্ঞ আত্মীয়তার আনন্দ অনুভব করিতেছি সেই আনন্দের মূল্য নাই। তাঁহাকে আমাদের সুহৃৎ জানিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের প্রীতি প্রকাশ করিয়া আমরা অলক্ষিত ভাবে আপনারা সকলেই ঘনিষ্ঠতর সৌহার্দ্দ্যবন্ধনে বদ্ধ হইতেছি।

এক্ষণে কর্ত্তৃগণের নিকট নিবেদন এই যে, ভারতবর্ষের নবজাগ্রত হৃদয়টি যদি তাঁহাদের রাজসভায়, আরামশালায়, পাঠাপুস্তকে, তাঁহাদের সুখস্বপ্নে, তাঁহাদের স্বরচিত সংকল্পের মাঝখানে

গিয়া হঠাৎ প্রবেশ করে তবে তাহার সেই বেয়াদবিটি মাপ করিতে হইবে। হৃদয় জিনিষটাই বেয়াদব—তাঁহাদের নিজের পার্ল্যামেণ্টে, সাহিত্যে, সমাজে, তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া পাওয়া যায়। তবে যে ভারতবর্ষে তাহার অস্তিত্ব তাঁহাদের অতিমাত্র অসহ্য বোধ হইতেছে, তাহার একটা কারণ, ভারতবর্ষবাসকালে হৃদয়ের চর্চ্চা তাঁহাদের অনভ্যস্ত হইয়া গেছে। অন্য কোন কারণ আছে কি না জানি না।

কথামালার একটি গল্প।

এক কৃষক কৃষিকর্ম্মের কৌশল সকল বিলক্ষণ অবগত ছিল। সে পুত্রদিগকে ঐ সকল কৌশল শিখাইবার নিমিত্ত, মৃত্যুর পূর্ব্ব ক্ষণে বলিল হে পুত্রগণ! আমি এক্ষণে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতেছি। আমার যে কিছু সংস্থান আছে, অমুক অমুক ভূমিতে অনুসন্ধান করিলে পাইবে। পুত্রেরা মনে করিল ঐ সকল ভূমির অভ্যন্তরে পিতার গুপ্তধন স্থাপিত আছে।

কৃষকের মৃত্যুর পর, তাহারা গুপ্তধনের লোভে সেই সকল ভূমির অতিশয় খনন করিল। এইরূপে যার পর নাই পরিশ্রম করিয়া তাহারা গুপ্তধন কিছু পাইল না বটে, কিন্তু, ঐ সকল ভূমির অতিশয় খনন হওয়াতে, সে বৎসর এত শস্য জন্মিল, যে, গুপ্তধন না পাইয়াও তাহারা পরিশ্রমের সম্পূর্ণফল পাইল।

কথামালা। ৩৮ পৃষ্ঠা।

আমাদের পোলিটিক্যাল ক্ষেত্র হইতে কোন গুপ্তধন পাইয়া আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে এরূপ যাঁহারা প্রত্যাশা করেন তাঁহারা নিরাশ হইবেন—কিন্তু সকলে একত্র মিলিয়া কর্ষণে যে শস্য জন্মিবে তাহাতে পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যাইবে।

প্রেম-পঞ্জিকা।

(Charles Kent-রচিত Love's Calendar কবিতার অনুকরণ)

চারিদিকে যবে ফুটিবে কুসুম,
গাছে বিকাশিবে কিশলয়,
বহিবে মন্দ দখিণা বাতাস,
পাখীরা গাহিবে বনময়;
জগৎ জুড়িয়া মধুরতা,
তখন কহিয়ো প্রেম-কথা।

বাতাস যখন ঢালিবে হুতাশ
কুসুম পত্র শুকাইবে;
ধূলা-বালুকায় ভরিবে ভুবন,
কোকিল পাপিয়া লুকাইবে,
জগৎ জুড়িয়া অলসতা,
তখন কহিয়ো প্রেম-কথা।

রিবে নিত্য ছুটে

হংসী ভাসিবে স্বচ্ছসরসে
কাশের চামর রবে ফুটি ;
জগৎ জুড়িয়া উজ্জলতা,
তখন কহিয়ো প্রেম-কথা।

শীতল যখন বহিবে সমীর
পড়িবে শিশির সারারাতি,
হবে নির্ম্মল নদনদীজল,
ক্ষেত্রে খেলিবে শ্যাম ভাতি।
জগৎ জুড়িয়া শীতলতা,
তখন কহিয়ো প্রেম-কথা।

গাঁদাফুলে যবে ভরিবে বাগান,
রবিকর হবে প্রিয়তর,
উষার দৃষ্টি কুহেলি-আকুল,
হিমে নিশীথিনী জরজর ;
জগৎ জুড়িয়া অসাড়তা
তখন কহিয়ো প্রেম-কথা।

প্রেমের নিন্দা কভু করিয়ো না,
ঘোর বিদ্রোহ জানিবে তা,
শীত বসন্তে সন্ধ্যা প্রভাতে
সকল সময় প্রেম নেতা।
প্রেমের সন্ধান কোথাও নাহি,
—আমরা যাহার বিজয় গাহি।

গ্রন্থ সমালোচনা।

রঘুবংশ। দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীনবীনচন্দ্র দাস এম, এ, কর্ত্তৃক অনুবাদিত। মূল্য এক টাকা।

বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ করা নিরতিশয় কঠিন কাজ; কারণ, সংস্কৃত কবিতার শ্লোকগুলি ধাতুময় কারু-কার্য্যের ন্যায় অত্যন্ত সংহতভাবে গঠিত—বাঙ্গলা অনুবাদে তাহা বিশ্লিষ্ট এবং বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু নবীন বাবুর রঘুবংশ অনুবাদ খানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। মূল গ্রন্থখানি পড়া না থাকিলেও এই অনুবাদের মাধুর্য্যে পাঠক-দের হৃদয় আকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। অনুবাদক সংস্কৃত কাব্যের লাবণ্য বাঙ্গলাভাষায় অনেকটা পরিমাণে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া-ছেন ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পঞ্চদশ সর্গে তিনি যে দ্বাদশাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা আমাদের কর্ণে ভাল ঠেকিল না। বাঙ্গলার পয়ার ছন্দে প্রত্যেক ছত্রে যথেষ্ট বিশ্রাম আছে,—তাহা চতুর্দ্দশ অক্ষরের হইলেও তাহাতে অন্যূন ষোলটি মাত্রা আছে—এই জন্য পয়ার ছন্দে যুক্ত অক্ষর ব্যবহার করিবার স্থান পাওয়া যায়; কিন্তু দ্বাদশাক্ষর ছন্দে যথেষ্ট বিশ্রাম না থাকাতে যুক্ত অক্ষর ব্যবহার করিলে ছন্দের সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায়; যেন কুঠির পাল্কীতে মহাজনী নৌকার মাল তোলা হয়। দ্বাদশাক্ষর ছন্দে ধীর গমনের গাম্ভীর্য্য না থাকাতে তাহাতে সংস্কৃত কাব্যসুলভ ঔদার্য্য নষ্ট করে। আমরা সমালোচ্য অনুবাদ হইতে একটি পয়ারের এবং একটি দ্বাদশাক্ষরের শ্লোক পরে পরে উদ্ধৃত করিলাম:—

প্রসবান্তে কৃশা এবে কোশল-নন্দিনী,
শয্যায় শোভিছে পাশে শয়ান কুমার—

শরদে ক্ষীণাঙ্গী যথা সুরতরঙ্গিনী
শোভিছে পূজার পদ্ম পুলিনে যাঁহার।

সে প্রভামণ্ডলী মাঝে সমুজ্জ্বলা
ফণীন্দ্রের ফণা-উৎক্ষিপ্ত আসনে
রাজিলা বসুধা স্ফুরিত কিরণে,
কটিতটে যার সমুদ্র-মেখলা।

শেষোদ্ধৃত শ্লোকটির প্রত্যেক যুক্ত অক্ষরে রসনা বাধা প্রাপ্ত হয় কিন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত পয়ারে প্রত্যেক যুক্ত অক্ষরে ছন্দের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। এমন কি, দ্বিতীয় ছত্রে আর একটি যুক্ত অক্ষরের জন্য কর্ণের আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়।

ফুলের তোড়া। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য এক আনা।

এই ক্ষুদ্র কাব্য গ্রন্থখানির মধ্যে "ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী কোকিল" কবিতাটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

নীহার-বিন্দু। শ্রীনিতাইসুন্দর সরকার প্রণীত। মূল্য চারি আনা।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিতেছেন—পাখী গান গাহিয়া যায়,—সুর, মিষ্ট কি কড়া,—মানুষে শুনিয়া, ভাল কি মন্দ বলিবে,—সে তার কোন ধার ধারে না; সে সুধু, আপন মনে আপনিই, নীলাকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া, গাহিয়া যায়।" অতএব ভরসা করি আমরা এই গ্রন্থলিখিত গান কটি ভাল না বলিলেও গ্রন্থকারের নীলাকাশ প্রতিধ্বনিত করিবার কোন ব্যাঘাত হইবে না।